রবি-রশ্মি

পূর্বভাগে

RABI-RASMI

PART ONE

Criticism on Rabindranath's Poetical and Dramatic Works—by Charuchandra Bandyopadhyaya.

Price : Rs 8·50 n. P. only

র বি র শ্মি

পূর্বভাগে

কবিত্ব-উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য ও কবিতার বিশ্লেষণ

*   *

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ.

কর্তৃক বিশ্লেষিত

*   *   *   *

স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ

কর্তৃক সম্পাদিত ও পুনর্বিবৃত

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

ভূমিকা

রবি সহস্র-রশ্মি। তাঁহার অজস্র রশ্মিচ্ছটার মধ্য হইতে কয়েকটি রশ্মি মাত্র আমার মানস-পরকলার সাহায্যে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে যে বর্ণচ্ছত্রের সুষমা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে রবির ঐশ্বর্য ও মাহাত্ম্য কত বিচিত্র ও কত বৃহৎ।

এই বিশ্লেষণ-কার্যে আমি আমার পূর্ববর্তী বহু লেখকের প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে অসঙ্কোচে উপকরণ ও ভাব আহরণ করিয়াছি। সকল স্থলে তাঁহাদের নাম ও উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যাঁহাদের নিকটে আমি ঋণী তাঁহাদের পুস্তক ও প্রবন্ধের নাম আমি প্রত্যেক আলোচনা-প্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়াছি। যদি কাহারও নাম ছাড় হইয়া থাকে তাহা ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতার ফল, এবং তাহার জন্য অজ্ঞাত ও অনুল্লিখিত লেখকের নিকটে ঋণ আমার কম নয়; ইহা স্বীকার করিয়া মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

আমি বারো বৎসর রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যাপনা করিতে করিতে যখন যেখানে আমার মনের অনুকূল যে-সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাইয়াছিলাম তাহা আমার অধ্যাপনার টীকা-টিপ্পনীর অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাতে সকল সময়ে লেখকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় নাই। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা হইতেও আমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের রচনা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আমার লেখার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছি। ইহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকটেও ঋণী ও কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ও ব্যাপক অধ্যাপনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এই অধ্যাপনায় যাঁহারা ব্রতী ছিলেন বা আছেন সেই সকল সহকর্মীর নিকটেও আমার অনেক ঋণ আছে, তাঁহাদের সহিত আলোচনাতেও অনেক জটিলতার মীমাংসা হইয়াছে।

সর্বোপরি আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বয়ং কবিগুরুর কাছে। যখন যেখানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়াছি এবং তিনি আমার প্রতি তাঁহার অহেতুক স্নেহাতিশয্যতার অনুরোধে সংশয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার অনেক কবিতা ও কাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও ভাব

আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এবং আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে অনেক স্থানে কবির ভাষাই পরিগৃহীত হইয়াছে। কবিগুরুর কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণের জন্য অনেক স্থানে তাঁহারই অন্য রচনার সাহায্য লইয়াছি, একটি কবিতাকে অন্য কবিতার বা প্রবন্ধের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে আমি অনেক স্থানেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সম্পন্ন করিয়াছি।

কবির মনোভাব বুঝিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বহু কবিতার বা প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাকে অনুমতি দিয়া অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ করিয়াছেন। কবির ভাব বুঝিবার জন্য বহু বিদেশী লেখকের কবিতাংশও উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের নিকটেও আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এই বিশ্লেষণ ব্যাপারে আমার কৃতিত্ব কেবল বহু-বিক্ষিপ্ত উপকরণ একত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতেই পর্যবসিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মালঞ্চ হইতে নানা পুষ্প আহরণ করিয়া আমি এই মালা গাঁথিয়া বিশ্বভারতীর চরণ-তলে উপহার দিতেছি। আমি মালাকর মাত্র, পুষ্পের শোভা ও মাধুর্য তাহাদের নিজস্ব, আমি যেমন করিয়া গাঁথিয়াছি তাহাতে অনেক স্থলে অনেক পুষ্পের শোভা হয়তো সম্যক্ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এই মাল্যগ্রন্থনের যাহা কিছু সৌন্দর্য ও উত্তমতা আছে তাহা বিভিন্ন কবিতা-কুসুমের, আর যাহা কিছু খুঁত আছে তাহা আমার মাল্যগ্রন্থনে অক্ষমতার ও সৌন্দর্যবোধের অভাবের জন্যই হইয়াছে।

"এষ স্যাম্ অহম্ অল্পবুদ্ধিবিভবোঽপ্যেকোঽপি কোঽপি ধ্রুবম্
মধ্যে ভক্তজনস্য মৎকৃতির্ ইয়ং ন স্যাদ্ অবজ্ঞাস্পদম্।
কিং বিদ্যাঃ শরঘাঃ কিম্ উজ্জ্বলাকুলাঃ কিং পৌরুষং কিং গুণাস্
তৎ কিং সুন্দরম্ আদরেণ রসিকৈর্ নাপীয়তে তন্-মধু ?"

"এই আমি অল্পবুদ্ধি, আমি একাকী, অখ্যাত ; তথাপি সাহিত্যভক্তগণের মধ্যে আমার এই কৃতি যেন অবজ্ঞাভাজন না হয় ; মধুমক্ষিকাগণ কি কোন বিদ্যা বা সৎকুল বা পৌরুষ বা গুণের গর্ব করিতে পারে ? তথাপি রসিকগণ কি সাদরে তাহাদের সংগৃহীত সুন্দর মধু পান করেন না ?"

এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু নাই। আমি মাধুকরী করিয়া এই তিলোত্তমা বিবৃতি রচনা করিয়াছি। তাজমহল-নির্মাণে মুটে-মজুরদের যে পরিমাণ কৃতিত্ব ছিল, আমার কৃতিত্ব তাহার অপেক্ষা অধিক নহে। তাজমহল

আজও লোকের প্রশংসা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়া বিগুমান, তাহার মজুরদের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। আমার এই নির্মিতি যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আকার ধারণ করিল, তাহারই সৌন্দর্যের জন্য ইহা রবীন্দ্র-কাব্য-রসিক সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হইবে আশা করি।

এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি বারো বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায়। লিখিতে লাগিয়াছে পুরা এক বৎসর। রবীন্দ্র-কাব্যতীর্থে পরিক্রমণের এই গুরুশ্রম সার্থক হইবে যদি ইহার দ্বারা একজনও তীর্থ-যাত্রীর যাত্রা-পথ সুগম করিয়া দিতে পারি।

গ্রন্থকার

সম্পাদকের নিবেদন

রবি-রশ্মি প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা আমার পিতার চরম এবং পরম সাধনার বিষয় ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট এবং ব্যাপক অধ্যাপনা যখন প্রথম আরম্ভ হইল, তখন তথায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অধ্যাপনার ভার পাইয়া তিনি দীর্ঘ বারো বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায় রবীন্দ্র-সাহিত্য বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। অবশ্য তৎপূর্বেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসজ্ঞ এবং মর্মজ্ঞ পাঠক এবং সমালোচক হিসাবে তাঁহার খ্যাতিলাভ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার মন অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যাপনার ভার পাইয়া তিনি পরম অনুরাগ এবং শ্রদ্ধার সহিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার অধ্যাপনার রীতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি নিজের মতামত, কাব্য ও কবিতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকাটিপ্পনী তাঁহার ব্যবহারের চয়নিকার মধ্যে এবং বিভিন্ন রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে সর্বদাই বিশদ করিয়া বিস্তৃতভাবেই লিখিয়া রাখিতেন। সেইসকল রবীন্দ্রকাব্য ও চয়নিকার বিভিন্ন সংস্করণ আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে।

সেই সকল টীকাটিপ্পনী-সমন্বিত রবীন্দ্রকাব্য ও চয়নিকার উপকরণ লইয়াই রবি-রশ্মি রচিত হয়। কিন্তু ঐসব আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির কোন কোন অংশ রবি-রশ্মির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিয়া পিতার সংগৃহীত ও লিখিত উপকরণ লইয়া রবি-রশ্মির পরবর্তী সংস্করণগুলি সম্পাদিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন লেখকের তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গদ্য রচনার উপরে আলোচনামূলক কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিচিতি' নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সে পুস্তক ছাপা নাই। উহার অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধও রবি-রশ্মির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রকাব্যামোদীদের নিকট গ্রন্থখানির মূল্য এবং উপযোগিতা বর্ধিত হইবে বলিয়াই মনে করি।

মহালয়া

॥ ১৩৬৭ সাল ॥

—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণচ্ছত্র

রবি-রশ্মি

রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ

রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকালেই স্বগৃহের সাহিত্যিক ও স্বাদেশিকতার আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হইয়া বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। কবির বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়ীতে সাহিত্যের হাওয়া বহিত। তাঁহার সহোদর দাদারা ও তাঁহার খুড়তুত দাদারা সর্বদা সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-রচনা করিতেন। সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নাটক রচনা করাইয়া তাঁহারা ঠাকুর বাড়ীতে অভিনয় করিতেন। তাঁহার দাদাদের বন্ধু অক্ষয় মজুমদার ও অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়েরা ঠাকুর বাড়ীর সাহিত্য, নাটক ও গানের আসরে যোগ দিয়া সেই সব আসর মাতাইয়া তুলিতেন। এই সময়কার পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তেই পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন—

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে খুব যখন শিশু ছিলাম, বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুখের বৈঠকখানা বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড় বড় গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কি হইতেছে ভাল বুঝিতাম না, কেবল আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম।……আমার খুড়তুত ভাই গণেন্দ্র দাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিত-কলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে তাঁহারা যেন সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।

'জীবনস্মৃতি'তে আরও কয়েক জায়গায় আমরা কবিকে বলিতে শুনিয়াছি যে এইরূপ সাহিত্যিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে উৎসাহ পাইয়া কবির সাহিত্যবোধশক্তি সচেতন হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।—

তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের

ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।......

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বাড়ীর সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বালকবয়সেই কাব্য নাটক প্রভৃতি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো, তখন ১২৭৯ সালের ফাল্‌গুন মাসে তিনি পিতার সহিত প্রথম বোলপুর—শান্তিনিকেতনে যান। এইখানে বালক-কবি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে এক বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে কেবল উল্লেখ মাত্র কবির 'জীবনস্মৃতি'তে আছে।—

বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু-নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

ইহার পরে কবি কয়েকটি গাথা রচনা করেন। 'শৈশব-সঙ্গীত' নামে সেগুলি একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত রবীন্দ্রজীবনীতে 'ফুলবালা' নামে একটি গাথার পরিচয়ও দিয়াছেন।

১২৮১ সালে বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে এক কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধ হিন্দুমেলায় তাহা পাঠ করেন। ইহা তখনকার বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে আর একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায় পাঠ করেন। ইহার উল্লেখ কবির 'জীবনস্মৃতি'তে ও কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে' আছে।—

আমাদের বাড়ির সাহায্যে 'হিন্দুমেলা' বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল।......ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।......এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কার্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি,—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে।……সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন উপস্থিত ছিলেন।—(জীবনস্মৃতি)

বাংলা ১২৮২ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে কবির প্রথম কাব্য-উপন্যাস 'বনফুল' ও পরে 'প্রলাপ' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পরে ১২৮৪ সালে কবির জ্যেষ্ঠ সহোদর সুপ্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম বৎসর হইতেই পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সঙ্কলন, সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে 'করুণা' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনায়ও প্রবৃত্ত হন। 'ভারতী'র প্রথম বৎসরে কবির 'আগমনী', 'ভারতী-বন্দনা', 'হরহৃদে কালিকা' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয় এবং এই সকল রচনায় কবির দেশীয় ভাবের প্রতি অনুরাগের পরিচয় রহিয়াছে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' নামে দুখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম বর্ষের 'ভারতী'র (১২৮৪ সাল) পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'কবি-কাহিনী'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। 'বনফুল' কাব্যোপন্যাসখানি 'কবি-কাহিনী'র আগে রচিত। কিন্তু পুস্তকাকারে উহা 'কবি-কাহিনী'র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্য ও 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' রচনার পরবর্তী বৎসর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার কাল। 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ডে'র প্রকাশকাল ১৮৮১, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের কাল ১৮৮২। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার পরে 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনার কাল ১৮৮৩। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার কাল পর্যন্ত কবিমনে একটা বিষাদের ভাব ছিল। 'প্রভাতসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথ সেই বিষাদের ভাবটুকু কাটাইয়া উঠেন এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতাবোধের আনন্দে তাঁহার হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া যায়—কবিহৃদয়ে মাধুরীর উৎস খুলিয়া যায়। নিজের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি 'প্রভাতসঙ্গীত'

রচনার কালে সচেতন হন। তথাপি 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী' রচনার কাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও প্রকাশারম্ভকাল ধরিতে হয়, 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনার কাল হইতে নহে। এ সম্বন্ধে কবির নিজের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

জ্ঞানাঙ্কুর কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ তাঁহারা নির্বিচারে প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছিলেন।

কবির নিজের এই উক্তি হইতেই দেখা যাইতেছে যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত-সঙ্গীত' রচনার বহু পূর্বেই—রবীন্দ্রপ্রতিভা তখনও বিচিত্র ও বহুমুখী না হইলেও, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তখনও সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও উল্লাস ফুটিয়া না উঠিলেও—তাঁহার প্রতিভার অঙ্করোদ্গম হইয়াছিল ঐ 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রকাশের কাল হইতেই। ভবিষ্যৎ যুগের কল্পনাভঙ্গি ও বর্ণনারীতির আভাস 'প্রভাতসঙ্গীতে'র পূর্বেকার রচনাবলীর মধ্যেও রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে তাহা লক্ষিত হইবে।

তবে 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ হইলেও, রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র এবং বহুমুখী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল বিশেষভাবে 'প্রভাতসঙ্গীত' রচনার কাল হইতে। ঐ সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভা নব নব উন্মেষশালিনী হইয়াছে। ঐ সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভা সাহিত্য-সৃষ্টির সমস্ত সঙ্কীর্ণ গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া শতমুখে শতধারায় অনন্তের অভিমুখে অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। তিনি তখন হইতে একাই সাহিত্যের সাত-মহলা ভবনের শত কক্ষের দ্বার সোনার চাবি দিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা—যেদিকেই তিনি তাঁহার প্রভাস্বর প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই দিক্‌টিই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এমনটি এদেশে আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। অন্য কোনো দেশে এত বিচিত্র শক্তির পরিচয় কোনো কবি বা লেখক দিয়াছেন কি না তাহা আমার জানা নাই।

রবীন্দ্রকাব্যের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। সার্থক কবির সকল লক্ষণই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে বর্তমান। মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দসৌন্দর্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে, এবং সৌন্দর্যে তাহা জগতের নিত্যসুন্দর অনির্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপে সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ। যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি; কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি, যিনি শুধু চিত্রাঙ্কনে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্মে মর্মে সঙ্গীতের অপূর্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি; কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি, যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ সৃজন করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি,—যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন, আমি আগন্তুক মাত্র, আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ; আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দে অধিক উদ্ভাসিত।

উচ্চতর কবির এই সমস্ত লক্ষণই আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভূরি পরিমাণে যথেচ্ছ দৃক্‌পাতে দেখিতে পাই। আমরা প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের যে-সমস্ত পদ ও শ্লোক উদ্ধৃত করিব তাহাতেই সপ্রমাণ হইবে, কবির কাব্য ছন্দের ঝঙ্কারে কি অপূর্ব সুললিত—তাহা যেন সঙ্গীতের আবেশে আপনা-আপনি গলিয়া পড়িতেছে। তাহা রসে মাধুর্যে অনির্বচনীয়।

কিন্তু আমরা যে রবীন্দ্রনাথের জন্য উচ্চতম কবির সিংহাসন দাবি করিতেছি, সে কোন্ লক্ষণে নির্ভর করিয়া? আমাদের মনে হয় উচ্চতম কবি তিনি,—যাঁহার কাব্য অতিমাত্র ব্যাপক, যাহা নিজে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। যাহার শিক্ষা —নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্। যাহা বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সহিত একাত্ম, যাহার মধ্যে জগতের নাড়ীস্পন্দন স্পষ্ট অনুভূত হয়, যাহা সামান্যতা পরিহার করিয়া ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে, যাহা মানবের মনকে আমিত্ব পরিহার করিয়া বিশ্বের দিকে প্রসারিত

করিয়া দেয়, যাহা বিশ্বের ভিতর দিয়া মানব-মনকে বিশ্বেশ্বরের চরণপদ্মের অভিমুখীন করে। ইহা ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সাধনা, এবং এই লক্ষণটি আমরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক স্যাঁৎ বিউবও প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর, প্রকৃতি, প্রতিভা, কলাচাতুর্য, প্রেম ও মানবজীবন—প্রধানত এই ছয়টি শ্রেষ্ঠ কবিতার মূল উপাদান।

বিশ্বকাব্যের অনাদি কবির লীলায় আমরা দেখিতে পাই Ethereal-কে Tangible-এর মধ্যে, Spirit-কে Matter-এর মধ্যে, অসীমকে সীমার মধ্যে ধরিয়া প্রকাশ করা। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যও সেই বিশ্বকাব্যেরই প্রতিধ্বনি।

এইরূপ প্রকাশ শুধু গীতি-কবিতাতেই সম্ভবপর। তাহাতে মানব-মনের সকল কালের ও সকল অবস্থার চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তোলা যায়। পরন্তু মহাকাব্য ঘটনা-বিশেষকে অবলম্বন ও কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার মধ্যে সমগ্রতা, বিশ্বজনীনতা ধরা দিতে পারে না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। অনেকে এজন্য ক্ষুণ্ণ। তিনি কৌতুকের সুর মিলাইয়া ইহার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। কবি তাঁহার 'মানসী' প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী।
হে প্রেয়সী!

* * * *

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়!

*   *   *   *

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত!
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ!
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্তি-কলাপ!

জগৎবাসীর সৌভাগ্যক্রমেই কবিপ্রিয়ার কাঁকনস্পর্শে হাজার গীতে কবির কল্পনাটি ফাটিয়া পড়িয়াছে, নয়ন-খড়্গে প্রেমের প্রলাপের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রেম সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে বুকে করিয়া ভূমার দিকে পরম আনন্দে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

সকল স্রষ্টার সৃজনীপ্রতিভা যে ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করে, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশও সেই ভাবেই হইয়াছে। প্রথম যৌবনে অন্তর্গূঢ় প্রতিভার বিকাশ-বেদনা তাঁহাকে আকুল করিয়াছে—তখন কুঁড়ির ভিতর কেঁদেছে গন্ধ আকুল হয়ে, তখন 'কস্তুরীমৃগ সম' কবি আপন গন্ধে পাগল হইয়া বনে বনে ফিরিয়াছেন। প্রথম জীবনের রচনায় এই আকুলতার বাণী, আশার বাণী, উৎকণ্ঠা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সঙ্কল্প, ক্ষণিক নৈরাশ্যে আত্মসান্ত্বনা, মহাসাগরের ডাক, বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম ইত্যাদির কথা আছে।

কিন্তু একদিন এক শুভমুহূর্তে কবির হৃদয়-দুয়ার অকস্মাৎ খুলিয়া গেল,—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

তখন অবারিত দ্বারে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য কবির অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কবির যৌবনস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বের চন্দ্রসূর্য হইতে পার্থিব রজঃ পর্যন্ত মধুমৎ প্রতিপন্ন হইল,—কবির যেন নব-দৃষ্টির দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি ঘটিল—সদ্যসঞ্জীবিত অহল্যার মতো সেই দৃষ্টি বিশ্বের সৌন্দর্যের পানে তাকাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য সমাহৃত হইয়া কবির হাতে নূতন রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তৃণাঙ্কুর ধূলিকণা শিশিরকণাটি পর্যন্ত নব নব শ্রী ও সম্পদ লাভ করিয়াছে। কবি পাঠকের মনেও স্বজনী-মাধুরীর প্রত্যাশা করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে ব্যঞ্জনাময়ী করিয়াছেন—ছবির আদ্‌রা আঁকিয়া কবি পাঠককে দিয়াছেন তাহার নিজের মনের রং দিয়া ভরিবার জন্য, কবি সোনার তরী গড়িয়াছেন পাঠকেরা তাহাদের চিত্তক্ষেত্রের সোনার ধানের মাধুরী দিয়া উহা ভরিয়া তুলিবে এই ভরসায়।

কবি কবিতাকে নব নব রূপ দান করিয়াছেন—তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করিয়া নূতন রূপসৃষ্টি করিয়াছেন। কবি নব নব ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার বাগ্‌বৈভবে ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায় কবি-মানসের যে একটি অভিনব রূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যরাশি, অপর দিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য একত্র সমাহৃত করিয়া নিজের প্রতিভার অপূর্ব ছাঁচে ফেলিয়া যে ললিত-ললামশায়িনী তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে। ভাব চিরপুরাতন, তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে অনেক কবির ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, রবীন্দ্রনাথের ভাব তাঁহার পরবর্তী বিদেশী কবির কাব্যেও প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই এমার্সন বলিয়াছেন, ভাবমাত্রেই প্লেটোর নিকট ধার করা এবং সংস্কৃত কবিরাও বলেন যে বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বং। ভাব পুরাতন চিরন্তন হইলেও তাহার নব নব প্রকাশ-ভঙ্গিমাই কবিত্ব। প্রকাশ-ভঙ্গিমার নবীনতায় রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ কবি যাঁহার রচনা কাব্যজগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। পূর্ববর্তী কবিগণের সহিত রবীন্দ্রনাথের কল্পনাদর্শ ভাবানুভূতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রভেদ বিস্তর। রবীন্দ্রনাথ কবিতাসুন্দরীকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। পূর্বের কবিগণ ভাব ও সৌন্দর্য হইতে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার শোভা দেখিয়াছেন, কবিতাসুন্দরীকে সরস্বতী বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাব ও সৌন্দর্যের মধ্যে একান্তভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহা উপভোগ করিয়াছেন। অন্য কবিদিগের নিকট কবিতা দেবী, কবিগণ পূজারী। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা সুন্দরী,—তিনি তাঁহার খেলার সঙ্গিনী, মর্মের গেহিনী, প্রণয়িনী। কবির কবিতাগুলি কবিতাসুন্দরীর পূজার অর্ঘ্যকুসুম।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্লিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রকর। তাঁহার মধ্যে সৌন্দর্যবর্ণনাকালে কখনো ভাববিহ্বলতা ঘটে না। কারণ, চিত্রকরের হৃদয় ভাবাবেশে অভিভূত হইলে তাঁহার চিত্রাঙ্কনশক্তির খর্বতা ঘটে, চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাব্যসৃষ্টিতে, সৌন্দর্যবর্ণনায় বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্লিষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও সৌন্দর্যের চিত্রাঙ্কন। বিশ্লেষণ তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের সহায় মাত্র। এইজন্য তিনি বিশ্লেষণে রত। সাধারণের চক্ষে যে দৃশ্য সামান্য বা যে ভাব নগণ্য, রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে তাহা পরম রমণীয়।

সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া সত্যের ও প্রেমের সাধনা করা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনের ইতিহাস। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন,—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ।" সৌন্দর্যপিপাসু কবি সসীম সৌন্দর্য ও অসীম অনন্ত সৌন্দর্যকে একটি সূত্রে গাঁথিয়া অবলোকন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার বিশেষত্ব এইখানে।

আবার ঐন্দ্রিয়িক (Sensuous) সৌন্দর্যের অতিরিক্ত যে বস্তু-নিরপেক্ষ (Absolute) সৌন্দর্য তাহাও কবির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই সৌন্দর্যকে কবি নারী-রূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভোগাতীত, প্রয়োজনাতিরিক্ত, অনির্বচনীয়—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!

এই উর্বশীরূপিণী সৌন্দর্যলক্ষ্মী 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' উঠে। তাহার প্রকাশ—

ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে,—

তাহারই নৃত্যলীলায়—

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।

এই যে অনির্বচনীয় বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য, যাহা কাহারও কোনো কিছুতেই

কাজে লাগে না, তাহাকেই কিন্তু সমস্ত জগৎ সকল স্বার্থ বলি দিয়া পূজা করিতেছে। সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকেই মানব পাইবার জন্য আর্তনাদ করিতেছে—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকসিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী॥

কিন্তু প্রতিদিবসই আমরা মিথ্যা প্রলোভনে বিভ্রান্ত হইতেছি। সুন্দর বলিয়া পদে পদে অসুন্দরকে ধরিয়া ভুল করিতেছি। তখন বুঝিতে পারি—

যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা চাই তাহা পাই না।

সুন্দরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিবার এই যে অনন্ত বাসনা তাহা যেন 'বিরহিণী'। তাহার যে কিসের বিরহ ঠিক পাই না। তাহার নিকটে আমরা নিজেকে নিঃশেষে দান করি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার কাব্যসাধনার একটি মাত্র ধারা বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়াছেন—

আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে,—সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।

বাস্তবিক, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই একটি বিষয়ই কবির সমস্ত কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু রূপদক্ষ ছন্দের যাদুকর সুললিত প্রকাশ-ভঙ্গিমার ওস্তাদ কবি একই জিনিস বার বার এমনই নূতন ঢঙে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন যে, কবির প্রতারণা আমরা ধরিতে পারি না এবং একই ভাবের বহু বিচিত্রতার কৌশলে মুগ্ধ হইয়া বিস্ময়মগ্ন হইয়া থাকি।

প্রত্যেক বড় কবির মধ্যে এইটিই প্রধান লক্ষণ যে, রচনার সীমার মধ্যে কবির ভাব অবরুদ্ধ থাকিতে চাহে না,—তদতিরিক্ত, সীমার বহির্ভূত একটু কিছু প্রকাশ করিবার আকুতি সেই রচনা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া ঐরূপ একটি আকুলতার সুর ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে শোনা যায়।

সে সুর হইতেছে সীমার মধ্যে অসীমের, বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির জন্য অধীরতার সুর,—এই ভাবটিকেই কবি একবার তাঁহার একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সে কবিতাটিকে আমি তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্য-চয়নিকায় তাঁহার সমগ্র কাব্যের মূল সুর স্বরূপ মুখবন্ধ-রূপে ছাপিয়াছিলাম—

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
> গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
> সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
> ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া॥
> অসীম যে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,
> সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
> প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
> ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
> বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
> মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥

এই ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান মর্মব্যাখ্যাতা বন্ধুবর অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ঐকান্তিক ভাবগতি' নাম দিয়াছিলেন। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে এই সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবার একটা আগ্রহ ও ব্যগ্র তাগাদা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যাহা লব্ধ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া তৃপ্তি নাই, অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিতে হইবে, অজ্ঞাতকে জানিতে হইবে, অদৃষ্টকে দেখিতে হইবে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী।

বৈদিক যুগে ইতরার পুত্র মহীদাস যেমন তূর্যকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন—চরৈবেতি, চরৈবেতি—চলো, চলো,—রবীন্দ্রনাথও তেমনি করিয়া ক্রমাগত সীমা অতিক্রম করিয়া, সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া সুদূরের পিয়াসী হইয়া চলার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন।—

> প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,—
> দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়।

তিনি পাঁজি-পুঁথি বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া 'মাতাল হয়ে পাতাল পানে' ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার যাত্রা নিরুদ্দেশ যাত্রা। মনোহরণ

কালোর বাঁশী তাঁহাকে ঘর ছাড়াইয়া উদাসীন করিয়াছে। নির্ঝর ও নদী তাঁহার গতি-উন্মুখ চিত্তের প্রতীক, বলাকা তাঁহার সহধর্মী, সেই বলাকার পক্ষধ্বনির মধ্যে কবি এই বাণী ধ্বনিত হইতে শুনিয়াছেন—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে'।

যেখানে গতি আছে, সেখানে ব্যাপ্তিও আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন অনন্তের সুদূরের পিয়াসী, তেমনি তিনি এই চিরজনমের ভিটাতে, এই সাতমহলা ভবনের বসুন্ধরার বুকে প্রবাসী হইয়া থাকিতে চাহেন না। কবি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'।

তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে সর্বানুভূতি—জল-স্থল-আকাশে, লোক-লোকান্তরে, সর্বদেশকালে ও সর্বমানবসমাজে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া মেলিয়া দিতে তিনি নিরন্তর উৎসুক। যে-কবি দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বত সত্যকে যত বেশী প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি তত বড় কবি। রবীন্দ্র এই হিসাবে কবীন্দ্র, তিনি শাশ্বত সত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সামান্য প্রাণকম্পের মাঝে, শিশুর হাস্য-কণিকায়, ফুলের হিল্লোলিত রূপসুষমায়, নদী-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে যে প্রাণ-শক্তি দীপ্যমান হইয়া উঠে, তাহাকে তিনি নব নব রূপ, নব নব শ্রী ও অভিনব মহিমা দান করিয়াছেন। তুচ্ছতমও তাঁহার কাব্যে মর্যাদা লাভ করিয়াছে, কারণ তুচ্ছতম ধূলিকণাকেও তিনি অসীম সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিয়াছেন। নামগোত্রহীন ফুলের মধ্যে বিশ্ব-সুষমার আভাস পাইয়াছেন, সমাজে ছোট বলিয়া গণ্য অতি সাধারণ লোকের মধ্যেও তিনি বিশ্বমানবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে সত্য স্থির। শঙ্করাচার্য সত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—'কালত্রয়াবাধিতম্ সত্যম্'—যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাধে অবস্থিতি করে, যাহার কস্মিন্ কালেও কোনো পরিবর্তন হয় না, তাহাই সত্য। কিন্তু বর্তমান যুগের য়ুরোপীয় দর্শনের বাণী,—সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়; যাহার গতি নাই, স্ফূর্তি নাই, তাহা জড়, তাহা কখনো সত্য হইতে পারে না। যাহার জীবনী-শক্তি আছে সে আর সকল জিনিসকে নিজের করিয়া লইয়া তবে নিজেকে প্রকাশ করে, তাহার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে, খণ্ডভাবে দেখিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাল অবিভাজ্য; কাল অনন্ত-প্রবাহ; মহাকালের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নাই; ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একটি বিশেষ খণ্ডকালের সম্পর্ক। একটি বিশেষ

ক্ষণের তুলনায় কবি কালিদাসের কাল তাঁহার কাছে ছিল বর্তমান, কিন্তু আমাদের কাছে তাহা ভূত বা অতীত হইয়া গিয়াছে; আবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাল আমাদের কাছে বর্তমান, কিন্তু তাহা 'আজি হতে শত বর্ষ পরে', 'দূর ভাবী শতাব্দীর' লোকেদের কাছে ভূত হইয়া যাইবে। এই অনন্ত কাল ও দেশ ব্যাপিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দেওয়ার ইচ্ছাই রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান সুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম যৌবন হইতে ক্রমাগতই এই গতির মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রকাব্য অনুশীলন করিলে আমরা দেখি যে, কবি কিশোর বয়সেই গতির মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য 'পথিক'-বেশে যাত্রা করিয়াছেন এবং সকলকে তাঁহার যাত্রা-পথের সঙ্গী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

> ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে,
> অতি দূর দূর যাব;
> কোথায় যাইবে? —কোথায় যাইব!
> জানি না আমরা কোথায় যাইব;—
> সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,—

এইরূপ 'অকারণ অবারণ চলা'র আবেগ তিনি বরাবর অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার 'চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে' আকৈশোর। এই গতির আহ্বানেই 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' হইয়াছে এবং কবির প্রতিভানির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গের পর হইতে ক্রমাগতই তিনি চলার আবেগে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত বদ্ধ গুহা ও সকল প্রকারের গণ্ডির প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া অনন্তের অভিসারে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন দেখা যায়। কবির 'প্রভাত-উৎসব' গতিরই উৎসব :—

> জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
> জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ-কি গান!

প্রভাত-উৎসবের এই গতি অন্তর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে অন্তরে, গতির এক অপূর্ব গতায়াত! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন অন্তরে গ্রহণ করিয়া আপন অন্তরকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মেলিয়া দিবার আনন্দ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কবির অন্তরের গতিবেগ 'স্রোত' হইয়া বহিয়া চলিয়াছে; এবং কবি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

> জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
> চলেছে যেথা রবি-শশী চল রে সেথা যাই।

কবির কাছে যাত্রার আহ্বানই 'মঙ্গল-গীতি'—

যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীত-কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্!
যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি' হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ!
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক!

কবির যৌবন-সুলভ হৃদয়াবেগ যখন তাঁহার মনোবীণায় 'কড়ি ও কোমলে'র সুর ধ্বনিত করিতেছিল, তখনও সেই সুরের মধ্যে গতির মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হইয়াছে। কবি লক্ষ্য করিয়াছেন—

মানব-হৃদয়ের বাসনা
বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায় হায়।

কবি অনুভব করিয়াছেন—

লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়,
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।

সমুদ্রের অস্থিরতা দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে!
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন!

আমাদের কবি সাগর-পারের অপরিচিতা বিদেশিনীর অভিসারে 'সোনার তরী'তে বার বার নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে সুন্দরী?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?

কবি শুধু 'অকূল-পাড়ির আনন্দ' অনুভব করিবার জন্য গতির আকাঙ্ক্ষা করেন—

সকাল বেলায় ঘাটে যে দিন
ভাসিয়েছিলেম নৌকা-খানি,
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি!"
*　*　*　*
দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে,
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাও রে আজি নিশীথ-রাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দ-গান।
যাক্ না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা,
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে;
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দু'হাত মেলি'
অন্তবিহীন অজানাকে।

কবির মনোরাজ্যের 'বনের পাখী' আসিয়া 'খাঁচার পাখী'কে বাহিরে উড়িয়া যাইবার নিমিত্ত ডাকাডাকি করিয়াছে; 'কন্যা মোর চারি বছরের' 'যেতে নাহি দিব' বলিয়া কাতর নিষেধ করিলেও কবি-চিত্তের যাত্রা স্থগিত হয় নাই—কবি-চিত্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দুনিবার গতির আবেগ দেখিয়া দুঃখ ও সান্ত্বনা দুই-ই অনুভব করিয়াছে—

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।

কবি 'মানস সুন্দরী'কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কোন্ বিশ্ব-পার
আছে তব জন্মভূমি। সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে—

জীবন-মরণের দোলায় কবি 'ঝুলন' খেলিতে ব্যগ্র; সমগ্র 'বসুন্ধরা' কবি-চিত্তের বিহার-ভূমি,—তাঁহার

চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে,……

বিশ্ব-বিমুখ স্বার্থপর ক্ষুদ্রতার বেদনা কবিকণ্ঠে কাতর ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছে 'এবার ফিরাও মোরে'—

দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তরপানে—

কবি তাঁহার 'অন্তর্যামী'কে পথিকের চঞ্চল সঙ্গীরূপেই উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন—

আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হ'তে পথে, ঘর হ'তে ঘরে,
দুরাশার পাছে পাছে।

তিনি 'অতিথি অজানা'র সঙ্গে 'অচেনা অসীম আঁধারে' যাত্রা করিবার জন্য উৎসুক; দিনশেষে কবির যদি বা কখনও তরণী বাঁধিবার প্রলোভন হইয়াছে কিন্তু সেও 'বহু দূর দুরাশার প্রবাসে', 'আসা-যাওয়া বারবার' করার পর কোনও অজানা বিদেশে অচেনা তরুণীর ভরা ঘটের ছল-ছল আহ্বানে। কিন্তু দিন-শেষেও কবির ভাগ্যে বিশ্রাম-লাভ ঘটে নাই; যখন

পৌষ প্রখর শীত-জর্জর ঝিল্লী-মুখর রাতি

তখনও এক অবগুণ্ঠিতা তাঁহার সুখনিদ্রা ভাঙিয়া 'সিন্ধুপারে' তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই।

কবির 'দুরন্ত আশা' 'বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' থাকিতে পারে না। সন্ধ্যার দুঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইলেও কবি তাঁহার চিত্ত-বিহঙ্গকে পাখা বন্ধ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
* * *
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কোথাও যদি কোনও আশ্রয় না থাকে, তবু নভ-অঙ্গন তো আছে, তাহার মধ্যেই স্বচ্ছন্দ-বিহার করিতে হইবে।

'বর্ষ-শেষে'র সঙ্গে-সঙ্গে কবি-চিত্ত বন্ধন-মুক্ত হইয়া অনন্তাভিমুখ হইয়া উঠিয়াছে—

চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
* * *
যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট্ স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।

রুদ্র বৈশাখের 'বিষাণ ভয়াল' তাঁহাকে ডাক দিলে তিনি বলিয়াছেন—

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ন-তন্দ্রা জাগি' উঠি বাহিরিব দ্বারে—

তিনি অচেনা বহু পথিকের সঙ্গে এক নৌকার 'যাত্রী', তিনি গৃহস্থের ঘরে 'অতিথি' মাত্র, 'ছুটি'র আনন্দে উল্লসিত হইয়া সকল বন্ধনের প্রতি 'উদাসীন', তিনি 'সুদূরের পিয়াসী', তিনি 'প্রবাসী'। তিনি বলিয়াছেন—

'ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

কিন্তু কবির এ 'যাত্রাশেষ' তো 'বিপুল বিরতি' নয়, এ যাওয়া যে দোলার ফিরিয়া আসার বেগ-সঞ্চয়ের জন্য—

এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা!

ইহা 'খেয়া-নেয়ে'র এপার-ওপার যাওয়া-আসার মত।

কবির 'পরাণ-সখা বন্ধু' 'ঝড়ের রাতে অভিসার' করেন কবির কাছে। কবি জানেন, তাঁহার বিধাতা তাঁহাকে কোন্ আদি-কাল হইতে জীবনের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন।—

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

কবি নিজে অনুভব করেন এবং সকলকে অনুভব করিতে বলেন—

জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।

সেই আনন্দ-যজ্ঞের নিমন্ত্রণে যাত্রা করিয়া—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

যাত্রার খেয়া-ঘাটে আসিয়া কবির আশঙ্কা 'ঐরে তরী দিল খুলে।' কিন্তু তখনি তিনি মনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন—

আমার নাই বা হ'ল পারে যাওয়া,
যে হাওয়াতে চলতো তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।

কিন্তু তিনি যদি-বা যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব সমাধা করিয়া প্রস্তুত হইলেন, কাণ্ডারীর তখনো উদ্দেশ নাই—

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;
ত্রিভুবনে জান্‌বে না কেউ আমরা তীর্থ-গামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।

তখন তিনি কাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানব-জন্ম-তরীর মাঝি,
শুন্‌তে কি পাস্ দূরের থেকে
পারের বাঁশী উঠ্‌ছে বাজি?
কাণ্ডারী গো, যদি এবার পৌঁছে থাক কূলে,
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার হাত ধ'রে লও তুলে।

কবি কাণ্ডারীর বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিয়া বলিয়াছেন,—

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা মরি গো মরি॥

কবি কাণ্ডারীকে হঠাৎ দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—

নাম-হারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে !

কিন্তু তরী যদি নাই মেলে তবে কি কবির যাত্রা বন্ধ থাকিবে ?

যে দিল ঝাঁপ ভব-সাগর মাঝ-খানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভব-সাগর মাঝ-খানে।

বহুদিন নদী-পথে যাত্রার প্রতীক্ষা করার পর কবি যখন দেখিলেন যে,—

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্র-ভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে !

তখন আনন্দিত কবির উৎফুল্ল কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—

যাত্রী আমি ওরে
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।

কবির 'পথ হ'ল সুন্দর'; তিনি যাত্রা করিতে পাইয়াই সন্তুষ্ট,—হয় তরীতে নতুবা রথে তাঁহার যাত্রা—সে একই কথা, বাহন তুচ্ছ-সাধন মাত্র! যাত্রা করিয়া চলাটাই কবির পরম ও চরম কাম্য।

কবি জানেন যে, গতির মাঝে মাঝে গতি-বিরতিও আছে। 'যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা'; কিন্তু পা ফেলিয়াই কবির ভয় হয় বুঝি-বা গতি স্থগিত হইল—

ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে !
*   *   *   *
পুরাতন পথ শেষ হ'য়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে !

কিন্তু চির-নবীন কবি-চিত্তের যাত্রা তো স্থগিত হইবার নয়—

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।

* * * *

বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালবাসা,
পথে চলার নিত্য-রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।

মাঝে মাঝে পথ খুঁজিতে গিয়া কবির পথ হারায়—

এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই,
চল্‌তে গেলে পথ ভুলি যে কেবলি তাই।

এবং 'খুঁজিতে গিয়া কাছেরে করি দূর', চলা আরো বাড়িয়া যায়—তখন হতাশ হইয়া কবি বলেন—

এম্‌নি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।

কিন্তু তাহাতেও লোক্‌সান নাই—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে যা'ব কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।

কবির 'চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে' দেখিয়া কবি পরম আনন্দিত—

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম কাজের পথে!
নইলে অভাবিতের দেখা ঘট্‌তো না কোনো মতে।

সেই অভাবিতের দেখাটি কি?—

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন?

সেই হারাপথে বিদেশী সাপুড়ের সঙ্গে যাত্রীর সাক্ষাৎ ঘটে—

কে গো তুমি বিদেশী,
সাপ-খেলান বাঁশী তোমার
বাজালো সুর কি দেশী!

লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভুঁই-চাঁপারে।

কবি সেই বাঁশীর সুর ধরিয়া যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন নিরুদ্দেশের পানে—

শুনেছি সেই একটি বাণী—
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো।
তোমার মাঝে আমার পথ
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো টলিয়ে দাও।
পথের শেষে মিল্‌বে বাসা—
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব,
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও।

কবি 'সুদূরের পিয়াসী', তাঁহার কাছে দূরের ডাক আসিয়া পৌছায়—

এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর-পারের গোপনপুরে।

কিন্তু সেই 'সাগর-পারের গোপনপুরে' কবি একা পথিক হইলেও তাঁহার সঙ্গী জুটিয়া যায়—

যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে ওরে এবার ঝড়কে পেলেম সাথী।

কবির এই যাত্রা তো আজ্‌কের নয়, তাহা অনাদি অনন্ত—

অনেক কালের যাত্রা আমার,
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।

তিনি সকল ভার বোঝা ফেলিয়া দিয়া লঘু হইয়া যাত্রা করিতে উৎসুক—

রিক্ত হাতে চল্‌ না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।

কবি পথিক। পথ চলাতেই কবির আনন্দ, পথের নেশায় তিনি বিভোর—

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

কারণ—

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

* * *

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।

কবি 'শিশু-ভোলানাথ' রূপে বলিতেছেন—

সাত সমুদ্র তের নদী
আজকে হবো পার।

'শিশু-ভোলানাথ' বলিয়াছে—

আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চ'লে।
যত তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ কর্‌তে পার্‌ব না তো
তোমায় ব'লে ব'লে।

* * *

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।

'ফাল্গুনী' নাটকটি আগা-গোড়া চলার মহিমা-কীর্ত্তনে ভরা—উহার মধ্যে চলার বাঁশীই বাজিয়াছে—

চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে,
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।

বাজিয়ে চলি পথের বাঁশী,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে-স্থলে।
পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিক জনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

চাঞ্চল্য হইতেছে প্রাণের ধর্ম। শিশু প্রাণের স্ফূর্তিতে সদা-চঞ্চল, যুবা প্রাণের প্রবল আবেগে উদ্দাম। তাই দেখিতে পাই যে, কবি কখনো শিশু, কখনো যুবা,—

সবার আমি সমান-বয়সী যে,
চুলে আমার যতই ধরুক পাক।

কবি 'শুধু অকারণ পুলকে' মাতিয়া তাঁহার যুবক সঙ্গীদের ডাকিয়া বলিয়াছেন—

অশ্লেষাতে যাত্রা ক'রে সুরু
পাঁজি-পুঁথি করিস্ পরিহাস,
অকারণে অকাজ ল'য়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস্,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের 'পরে লাগাস্ ঝড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
মাতাল হ'য়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

যৌবন তো সুখে-শান্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না, অসাধ্য সাধন করাই যৌবনের ধর্ম, যৌবনের মহিমা সেইখানেই—তাই কবি বলেন—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খ'সে যাবার, ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে!

* * * *

লুটে যাবার, ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে!

কবি সকল 'অচলায়তন' চূর্ণ করিয়া চলার নিমন্ত্রণ ঘোষণা করিয়াছেন। মহা-পরিব্রাজক কবি তাঁহার 'যাত্রী' পুস্তকের মধ্যেও এই একই কথা বলিয়াছেন। 'বলাকা'তে এই মহাবাণীই আগাগোড়া উদ্‌ঘোষিত হইয়া চলিয়াছে—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।"

কবির গানে যখন জীবন-সন্ধ্যার 'পূরবী' রাগিণী বাজিয়াছে, তখনও তাঁহার বিশ্রাম বা বিরতির কথা মনে হয় নাই, কেবলই 'চলো চলো' বাণী তখনও কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—

আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝরে-পড়া শিউলি ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তা'রা মরণ-কূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে 'চলো চলো'।

* * * *

ওরা ডেকে বলে, কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে··· ?

কবি বলেন,—

যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে—।

'মহুয়া' তাহার যৌবন-প্রেমের মাদকতা বিলাইয়া—

যাবার দিনের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকের স্নেহ-খানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি'।

তখনও মাদকতা-বিহ্বল কবি নিশ্চল হইয়া পড়েন নাই, তখনও তিনি যাত্রার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ?
তারি রথ নিত্যই উধাও···

কবি আকৈশোর চলার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

"না চল্‌তে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হ'লে খরচ কর্‌তে সঙ্কোচ হয়······এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল,—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' —সাগর-পারে যে অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন কর্‌বার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।"

কবি-চিত্ত সপ্ত-তন্ত্রী বীণার মতো, তাহাতে কত সুর, কত মূর্ছনাই বাজিয়াছে; কিন্তু আমার কানে এই গতির বাণীটিই খুব বেশী করিয়া ধরা পড়িয়াছে। জগতের সহিত মিলিত হইয়া 'জগৎস্রোতে' ভাসিয়া চলাই কবি-জীবনের একমাত্র কামনা।

যখন কবি নিজের শক্তি ও মাধুর্য নিজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী মৃগ সম!

যখন পর্যন্ত তাঁহার প্রতিভা উদ্দেশ্য খুঁজিয়া না পাইয়া যেন—

কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে
কাঁদিছে আপন মনে,
কুসুমের দলে বন্ধ হ'য়ে
করুণ কাতর স্বনে!

তখনো তাঁহার মন হইতে অভয়বাণী উচ্চারিত হইয়াছে—

ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ-প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি পূরাবি কামনা,
আপন অর্থ সে দিন বুঝিবি,
জীবন ব্যর্থ যাবে না!

'শৈশব সঙ্গীতে'ও কবি বলিয়াছেন—

জগৎ হ'য়ে রব আমি, একেলা রহিব না!
মরিয়া যাব একা হ'লে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ'য়ে যাই।

তপন ভাসে তারা ভাসে আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে!
প্রভাত সাথে মুদি আঁখি, তারার সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই,
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি!
মায়ের প্রাণে স্নেহ হ'য়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই,
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎস্রোতে দিবা নিশি ভাসিয়া চলে যাই!

কবির অনেক কবিতার মধ্যেই অদ্বৈতবাদের এই সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব তাঁহাতে বিধৃত। তাই কবি বলিতে পারেন—

ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে। নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবস নিশীথে। পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র-হ'তে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি।
.........ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে
দেশে-দেশান্তরে।

কবির মধ্যে এই বিশ্বজনীনতার ভাব থাকাতে কবি সকলপ্রকার বন্ধন ও সংকীর্ণতার বিরোধী। বিশ্বের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনের নিমিত্ত কবির প্রবল সাধ—

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা
নাহি কোনো বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নাই ঘর-পর

নৃত্য ক'রে চ'লে যায় আবেগে উল্লাসি'
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন, সে-ও ভালবাসি—
কতোবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণ-ঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণ পালভরে
লঘু তরী সম।

* * * *

ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি' বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে॥

'মাতাল' কবিতার মধ্যেও কবি এই কথাই বলিয়াছেন। সকল সংস্কার, সকল প্রথা, সকল বন্ধন দূর করিয়া প্রমুক্ত স্বাধীনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিবার এইরূপ উদগ্র বাসনা সূফী কবিদিগের ও আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যানের রচনায়ও দেখা যায়। ইহারা বলেন, প্রকৃতি ও মানব লইয়া জগৎ। সমস্ত মানব-পরিবার দেশকালে অখণ্ড ও তাহা শাশ্বত। শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আপনাকে অখণ্ড মানব-পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না। যিনি নিজেকে শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তিনি সকলের পরমাত্মীয়। তিনিই বলিতে পারেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

এবং তিনি,—

কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে

যে কর্ম করেন তাহা সকলের জন্য—

বলেছি যে-কথা করেছি যে-কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ
বিবিধ সাজে।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিশেষত্ব। তিনি প্রাণের মধ্যে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই জন্য সুখী দুঃখী, বালক বৃদ্ধ যুবা, নর নারী, ধনী দরিদ্র, ধার্মিক পাপী, স্বধর্মী বিধর্মী, স্বদেশী বিদেশী—সকলেই তাঁহার কাব্যে সমাদৃত এবং এইজন্য সকলেই নিজের নিজের হৃদয়ের কথাটি রবীন্দ্র-কাব্যে পরিব্যক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। যে যখন যে-কথাটি বলিতে চাহিয়াছে, তাহার হইয়া কবি আগে থাকিতেই সেই কথাটি ছন্দে ও ভাবসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া বলিয়া রাখিয়াছেন—

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

'উৎসবে' কবির বাঁশি যেমন আনন্দরাগে বাজিয়াছে, ব্যসনেও তেমনি করুণসুরে গলিয়া কাঁদিয়াছে। কিন্তু কবি প্রধানত সুখবাদী (Optimist) বলিয়া সকল দুঃখের মধ্যেই পরম কল্যাণ ও আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। তাঁহার জীবনের মন্ত্র—

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের। —(চৈতালী, অভয়)

এজন্য যে হতভাগ্য প্রণয়ে ব্যর্থ, ধনে বঞ্চিত, সমাজে নিগৃহীত, সেও কবির কাছ হইতে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। কবির আকাঙ্ক্ষা—'ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা'—(—উৎসর্গ, প্রবাসী)। জগতে ছোট, তুচ্ছ বলিয়া কিছু নাই। সীমাকে লইয়াই অসীম। সীমাকে ছাড়িয়া দিলে অসীম শূন্যতা। তাই ছোটকে, তুচ্ছকেও তিনি অসামান্য অসীম রহস্যময় বলিয়া জানিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার সর্বানুভূতি ও সকলের সহিত একাত্মতা এত প্রবল হইতে পারিয়াছে। তিনি বসুন্ধরার সর্বদেশে সর্বজীবের জীবনলীলা উপভোগ করিতে উৎসুক। কবি যে ঘর বাঁধিয়াছেন তাহা অবারিত—

এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে,
আনাগোনার পথে ? —(খেয়া, অবারিত)

পতিতা রমণীর প্রণয় কবির কাছে উপেক্ষার সামগ্রী নহে। যেদিন অকস্মাৎ পতিতার প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হইল সে দিন—

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,—

সে দিন তাহার কলুষিত অন্তরকে পবিত্র করিয়া—

নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।

তখন দেখিতে দেখিতে—

জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব-নীরব-প্রীতি,
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
জাগায়ে তুলিল মিলিত-গীতি।

মানবজগতে সবই গতিশীল, ঘূর্ণীর পাকে প্রমত্ত। কিন্তু

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণীর মাঝখানে।

সেই স্থির বিন্দুটি প্রেম।

হ প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর!
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণীর পাকে খরতর।

সেই প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন স্বর্ণকমলের শতদলে ভুবনলক্ষ্মী।

সেইখান হ'তে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্য পানে!
সুন্দরী, ওগো সুন্দরী!
শতদল-দলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি!
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে
অচল তোমার রূপরাশি!
নানা দিক হ'তে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ঐ হাসি!

ভুবনলক্ষ্মীর প্রেমলীলা মানবে মানবে, মানবে জড়ে, মানবে পশুতে কবির কাছে শতেক প্রকারে উদ্ভাসিত। 'সামান্য লোকের' অসামান্যতা, পশ্চিমী মজুরের ছোট মেয়ে 'দিদির' স্নেহ (চৈতালী), 'মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক হৃদয়'—তাহাদেরও প্রতি 'মানবের স্নেহের কৌতুক'—পুরাতন ভৃত্যের প্রভুভক্তি, 'রাজা ও রাণী'র ভৃত্য শঙ্কর, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণ, একবস্ত্রা অতিদীনা ভিখারিণী রমণীর শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা,—সমস্তই কবির কাছে বৃহৎভাবে ধরা

দিয়াছে। কবি দিব্যদৃষ্টির সহায়তায় সামান্যের মধ্যেও অপরূপের ও মহৎ সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। বিদেশ যাত্রাকালে চারি বৎসরের কন্যাটির 'যেতে নাহি দিব'—কবির প্রাণে অপূর্ব প্রেম-বেদনার সঙ্গীত রচনা করিয়াছে।

কবির দেশানুরাগ তাঁহার বাল্যকাল হইতে প্রবল। দেশমাতার প্রতিমা গড়িয়া তাহাতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। দেশমাতৃকার এমন মূর্তি ইতিপূর্বে আর কেহ গড়েই নাই, এ সৃষ্টি একেবারে নূতন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'ও এই বিচিত্ররূপিণী মাতৃদেবীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কবি দেশমাতৃকার পূজার মন্দির গড়িয়াছেন প্রাচীন ভারতের মহিমার উপকরণে। তাহার চারিপাশে আধ্যাত্মিক ভারতের তপোবনের পরিবেষ্টনী ঘিরিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের আশা ও মহত্ত্বের সম্ভাবনীয়তা দিয়া দেবীর বেদী রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক পৌরাণিক আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মহিমময় রূপ দান করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন ভারতের রাজপথ, পুর, জনপদ ইত্যাদিকে শ্রদ্ধার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন আমাদের এই কবি।

কবি দেশের অতি সামান্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের আত্মীয় হইতে ইচ্ছা করেন—

ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু। —(গীতিমাল্য)

কবির কাছে ধরণী তীর্থদেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণ (গীতালি), স্বদেশ 'মহামানবের সাগর-তীর', 'ভারত-তীর্থ'। কবি তাঁহার স্বদেশকে বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করেন।—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে ?
দেখিনু তোমারে পূর্ব-গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

বিশ্বের মধ্যে কবি বিশ্বেশ্বরকে উপলব্ধি করেন বলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার কাছে জড় মাত্র নহে। প্রকৃতি তাঁহার কাছে প্রাণময়ী, মমতাময়ী মাতৃরূপিণী।

প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী—(চিত্রা)। তিনি প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে—

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা ;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।—(চিত্রা, জ্যোৎস্নারাত্রে)

প্রকৃতির সহিত মানবমনের আনন্দের সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বগামী কবিগণ কেবলমাত্র প্রকৃতির বাহ্যদৃশ্য বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু এই কবি নববর্ষার সমারোহ দেখিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচেরে!

কবি যখন শৈশবে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসনে একটি ঘরের মধ্যে খড়ির গণ্ডিতে বন্দী হইয়া ছিলেন, তখন অতি-দুর্লভ বলিয়া প্রকৃতির সহিত কত ছলে তাঁহার যে চোরা-চাহনির বিনিময় হইয়াছিল, সে গুপ্তপ্রণয় কবি তাঁহার জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপে কবি প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, শেষ যৌবনে তিনি আর সেই ঐন্দ্রিয়িক সৌন্দর্যে তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই—বিশ্বপ্রকৃতিকে কবি অতঃপর নব নব রসৈশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছেন। তখন বর্ষা আসিয়াছে নবযৌবনা শ্যামগম্ভীরা সরসার রূপে ঘনগৌরবে, বসন্ত আসিয়াছে পীতাম্বর পরিয়া পীত উত্তরীয় উড়াইয়া, সন্ধ্যা আসিয়াছে খোলা জানালায় শব্দবিহীন চরণপাতে, রাত্রি দেখা দিয়াছে শ্যামা-সুন্দরী সুগম্ভীরা একেশ্বরী রাণীর রূপে, কালবৈশাখী আসিয়াছে তাণ্ডবরত ঈশানের বেশে, বৈশাখ দেখা দিয়াছে রুদ্র সন্ন্যাসীর বেশে। কবি জড় প্রকৃতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের কবি। প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্যের আধার—তাই তিনি প্রকৃতির রূপমুগ্ধ প্রেমিক। উন্মাদ মধুনিশিতে, আলো-ঝলমল শিশিরঢালা শরতে, রুদ্রভৈরব বৈশাখে, বাধাবন্ধহারা ঝড়ের দিনে, জ্যোতির্ময়ী জ্যোৎস্না-রাত্রে, বালুকা-শয়নপাতা নদীতে, আদিজননী সিন্ধুতে, দেবতাত্মা পর্বতে, প্রশান্ত প্রান্তরে—সর্বত্র এবং সর্বকালে কবি প্রকৃতির বিচিত্র এবং অপরূপ প্রকাশ দেখিয়া বিমুগ্ধ। মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করিয়াছেন। কবির কাছে,

প্রসন্ন আকাশ হাসিছে বন্ধুর মত।
সন্ধ্যা অন্ধকার মায়ের অঞ্চল সম।

তিনি বলিয়াছেন—'আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে'।

প্রকৃতির দুই রূপ—রুদ্র আর শান্ত। বিশ্বপ্রকৃতির ঐ দুই রূপই কবিকে

মুগ্ধ করিয়াছে। কালবৈশাখীর ঝড়, সিন্ধু-তরঙ্গ, বর্ষশেষের ঝড় কবিকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছে,—তেমনি আবার শরৎ, বসন্ত, বর্ষা ঋতুর শান্ত সৌন্দর্যও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

মানবের মনে প্রকৃতির সৌন্দর্যসঞ্জাত আনন্দ ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানবের মনন মিলাইয়া কবি উভয়ের ভেদরেখা লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কুটীরবাসী পাখী, নীলমণি লতা, আশ্রম-বৃক্ষ কেহই তাঁহার সমাদর হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কবির বৃক্ষবন্দনা যেন বৈদিক ঋষির সূক্তের ন্যায় উদাত্ত গম্ভীর মনোহর।

বিধাতার সৃষ্টি নারীকে কবি তাঁহার মনের ঐশ্বর্যে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন নিজস্ব ছাঁচে। তাঁহার কাব্যে নারী স্বপ্নসঙ্গিনী মর্মের গেহিনী হইয়াছে,—একদিকে রাত্রির নর্মসখী উর্বশী হইয়াছে,—অন্যদিকে মানসী হইয়াছে, বিজয়িনী হইয়াছে—তীর্থবারি বহন করিয়া নারী প্রভাতের লক্ষ্মী কল্যাণী হইয়াছে। এই কল্যাণী নারীমূর্তিকেই বন্দনা করিয়া কবি বলিয়াছেন,

সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

—(ক্ষণিকা, কল্যাণী)

কবির কাব্যে পতিতাও মহীয়সী হইয়াছে, নারী হইয়াছে অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক মানবী।

দেশের কাব্যসংসারে প্রেম ও কাম অবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু কামের বাহুপাশ হইতে কবি প্রেমকে উদ্ধার করিয়া বাঁচাইয়াছেন। এইরূপে রবীন্দ্রকাব্যে অনাবিল প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারী দেবী হইয়াছে,—কামের ভোগের উপকরণগুলিও পবিত্র মহিমা লাভ করিয়াছে। কবি বুঝাইয়াছেন—'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা'। কবি নারীত্বের দেব-মন্দির গড়িয়া স্বপ্নময় যৌবনকেও নূতন করিয়া গড়িয়াছেন তাহার পূজারী-রূপে। কবি মিলনকে সংযত রাজশ্রী দান করিয়াছেন, বিরহকে তপস্যায় পরিণত করিয়াছেন। পূর্বেই কবির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি বলেন—'জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করারই নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ'। এইজন্য কবি নর-নারীর প্রেমকে আধ্যাত্মিক সাধনা মনে করেন, তাহা ইহজীবনের ভোগেই পরিসমাপ্ত বা পর্যবসিত হয় না, তাহা জন্মজন্মান্তরের সাধনার ধন। তাই কবির কাছে

নর-নারীর প্রেম নির্মল, প্রশান্ত, বিক্ষোভবিহীন। 'অনন্ত প্রেম', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'প্রেমের অভিষেক' প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রেমসম্বন্ধীয় ধারণা পরিব্যক্ত হইয়াছে। দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ যে কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন 'মহুয়া'র 'নির্ভয়' নামক কবিতায়—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ, আমি আছি।

কবির কাছে নারীপ্রেমে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ একান্ত হইয়া উঠে নাই, 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় ('মানসী') কবি বলিয়াছেন—'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের'। অতএব 'নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে'।

নর-নারী যখন 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এবং 'নিমেষে শতেক যুগ দূর হেন মানে' তখন তাহারা অনেক সময়ে কামনার কলুষে প্রিয়তমকে কলঙ্কিত করে, তাই কবি তাহাদিগকে বলিতেছেন—

যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ—

(কড়ি ও কোমল, পবিত্র প্রেম)

যখন মানব-চিত্ত পূর্ণ মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রিয়ের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে প্রিয়কে বিলীন করিয়া দিতে চাহে অথচ পারে না, তখন তাহাদের সেই ব্যর্থতাকে দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।

—(কড়ি ও কোমল, পূর্ণ মিলন)

নারী কবির কাছে অবলা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যে আত্মাশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত হইয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে সে অচেতন বলিয়াই সে অবলা হইয়া অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়। তাই কবি সাধারণ মেয়েকে সম্বোধন করিয়া দুঃখ করিয়াছেন—

হায় রে সামান্য মেয়ে,
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

তিনি সকল নারীকে বিধাতার শক্তির অপব্যয় হইয়া না থাকিয়া 'সবলা' হইতে আহ্বান করিয়াছেন—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা?

* * *

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী!
বীর-হস্তে বরমাল্য ল'ব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে?
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তা'র,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

* * * *

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা!
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হ'তে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়। —(মহুয়া, সবলা)

সকল নারীর আদর্শরূপে চিত্রাঙ্গদাও এই কথা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই; অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। পার্শ্বে যদি রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। —(চিত্রাঙ্গদা, শেষ দৃশ্য)

নারীর নারীত্ব যে সর্বাবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা অবস্থা ও সময় বিশেষে সুপ্ত থাকে মাত্র, এই কথা কবি প্রচার করিয়া নারীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। পতিতা নারীর মধ্যেও তাহার হৃদয়ের মাধুর্য ও মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহাকে কবি সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। পতিতা নারীকে দিয়া তিনি বলাইয়াছেন—

নাহিক করম, লজ্জাসরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা ব'লে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা! —(কাহিনী, পতিতা)

পতিতার হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখাইয়া কবি দুটি সনেট লিখিয়াছেন, তাহার একটির নাম 'করুণা' ও অপরটির নাম 'সতী' (চৈতালী)।—

অপরাহ্ণে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড় ; কর্মশালা হ'তে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কশাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানীর খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি',
পাষাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি'!
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার!
স্বর্গে যেন দয়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিত-বসনা,
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা! —(চৈতালি, করুণা)

পতিতার মনে প্রকৃত প্রেমের স্পর্শে এক নিমেষেই যেমন—

জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব-নীরব-প্রীতি

ফুটিয়া উঠে, তেমনি সামাজিক বিচারে কলঙ্কিনী নারীও প্রেমের একনিষ্ঠতা ও প্রেমের জন্য দুঃখ-বরণের দ্বারা সতীত্বের মর্যাদা পাইবার যোগ্য হইয়া উঠে—

সতীলোকে বসি' আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্তিহীনা কত না কামিনী ;—
* * * *
শুধু প্রীতি ঢালি' দিয়া মুছি' ল'য়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি' মর্ত্যধাম।
তারি মাঝে বসি' আছে পতিতা রমণী,
মর্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি! —(চৈতালি, সতী)

কবি রবীন্দ্রনাথ মানব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি উভয়ের মধ্যেই অনন্তের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই ক্ষুদ্র নয়। তিনি বলিয়াছেন—'ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা'। এই চিত্ত-স্থাপনার ফলে তিনি বিশ্বরূপের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা অতি সহজেই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিকতা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' প্রভৃতির মধ্যে কবির আধ্যাত্মিকতার ক্রম-পরিণতির ও নিবিড়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ভগবান কখনো প্রভু, কখনো বন্ধু, কখনো বা প্রিয় বা প্রিয়া, কখনো বা কেবল মাত্র 'তুমি' বা 'তিনি', কখনো বা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক কবীর, দাদূ, নানক, রজ্জবজী, মালিক মহম্মদ জায়সী প্রভৃতি এবং সুফী সাধকেরা ভগবানকে লইয়া সাম্প্রদায়িকতার টানাটানি ও বিরোধ দেখিয়া ভগবানকে কোনো নামে অভিহিত করেন নাই। যিনি সকল নাম-রূপের অতীত তাঁহাকে কোনো একটি বিশেষ নামে অভিহিত করিলেই তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা হয়! এইজন্য আমাদের দেশের বাউল ও ভাটিয়াল গানে ভগবান কখনো দরদী, কখনো সাঁই, কখনো বন্ধু, কখনো বা কেবল মাত্র সর্বনাম, অর্থাৎ যাহা সকলেরই নাম। রবীন্দ্রনাথের ভগবান কোনো বিশেষ নামে চিহ্নিত হন নাই বলিয়াই তাঁহার 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি ভক্তিরসাত্মক কাব্য সর্বধর্মের সাধকদের সমাদরের সামগ্রী হইতে পারিয়াছে। কবির আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি কেবলমাত্র হৃদয়ের

আ-বেগ বা e-motion নয়, তাহা যুক্তির ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রমত্ত, বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর। এইজন্য কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা
নাহি চাহি নাথ॥
দাও ভক্তি শান্তি-রস,
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি' মঙ্গল-কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন॥
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর॥ —(নৈবেদ্য, অপ্রমত্ত)

অথচ কবির এই আধ্যাত্মিকতা কেবল মাত্র শুষ্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচার-বিতর্ক নহে,—এই আধ্যাত্মিকতায় সরস প্রেম-মধুর আত্ম-নিবেদনের ও প্রিয়-মিলন-সঞ্জাত আনন্দের অভাব নাই।

কবি নাম-রূপহীন অপরূপের প্রেমে মগ্ন। কবির এই মিস্‌টিসিজ্‌ম্ সলোমনের সাম, ডেভিডের গীতি, সেণ্ট্ ফ্রান্‌সিস্ অফ্ অ্যাসিসি, টমাস্ এ কেম্পিস্ প্রভৃতি ও সুফী কবিদের ভক্তির উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবানকে বর-রূপে বঁধু-রূপে বোধ করা বৈষ্ণব ভাব-সাধনার একটা অঙ্গ। বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর সবাই গোপী। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িতা প্রার্থনা করিয়াছেন—

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি।
প্রাণনাথ! শুন মোর সত্য নিবেদন। —(চৈ. চ. মধ্য ১৩)

ইংরেজ কবিরাও ভগবানকে বর ও বঁধু রূপে অনুভব করিয়াছেন।

What if this Friend happen to be—God.

—Browning, *Fears and Scruples*

For me the Heavenly Bridegroom waits;

—Tennyson, *St. Augustine's Eve*

The bridegroom of my soul I seek,
Oh, when will he reappear!

—Cowper

কবি জীবনকে নব নব রূপ ও রূপক দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মরণকেও তিনি নূতন রূপ ও মাহাত্ম্য মাধুর্য দান করিয়াছেন। আনন্দবাদী কবি মৃত্যুভয় জয় করিয়াছেন। মরণকে বরণীয় মনে করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান!

কবির কাছে মৃত্যু এই জীবনেরই একটি অবস্থা, ফুলের পরিণতি যেমন ফলে, তেমনি জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুতে। মরণ কবির কাছে 'এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা'। মরণকে বরণ করিতে কোনো কবির এমন ভাব হয় নাই—

তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে!

কবি মরণকে বামদেব রূপে না দেখিয়া রুদ্রের দক্ষিণরূপ তাহার মধ্যে দেখিয়াছেন। ভারতের উপনিষদের মৃত্যুঞ্জয় প্রভাব কবির চিত্তে মরণের রুদ্রতাকে লোপ করিয়াছে।

কবি তাঁহার পরাণসখা বন্ধু মরণদেবতার কাছ হইতে আহ্বানলিপি পাইয়াছেন। ইহাতে কবির আনন্দের অবধি নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি এই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ,
কারেও আমি দেখাব না তো সেটি।

কিন্তু হায়! কবির হৃদয়ানন্দ কবিকে যে কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না।

লিখন আমি নাহি জানি,
বুঝি না কি যে আছে বাণী,
যা আছে থাক আমারি থাক তাহা।
পেয়েছি এই সুখে আছি,
পবনে উঠে বেণু বাজি
পেয়েছি সুখে পরাণ গাহে আহা!

প্রতিবেশীরা পরামর্শ দিয়াছে তুমি পণ্ডিতের কাছে গিয়া চিঠিখানা পড়াইয়া লইয়া আইস—

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত।
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরাণো পুঁথি যত।

কবির প্রেমাস্পদের কথা কবি বুঝিতে পারেন, অপরে তাহা কি বুঝিবে? পণ্ডিত নিজের মতো করিয়া বুঝিয়া কবিকে যাহা বুঝাইবেন, তাহা তো পণ্ডিতের নিজের কথা; কবির সেই প্রেমাস্পদের কথা তো নহে। কবির গুরু কবি নিজেই হইবেন, অন্য গুরুঠাকুরের তাঁহার প্রয়োজন নাই। কারণ, গুরুঠাকুরের

শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে,
ধন্দ লয়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি'
যতনে কভু তুলিব ধরি' কোলে।

কবির চিঠিতে তাঁহার হৃদয়ানন্দের বাণী আছে, এইটুকু অনুভব করিয়াই তিনি ধন্য হইবেন। সেই অনুভূতিতেই সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে কবি সেই বাণী প্রতিধ্বনিত শুনিবেন।—

না-বোঝা মোর লিপিখানি,
প্রাণের বোঝা দিল টানি',
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

না-বুঝা লিপি পাইয়া কবির মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তখন বারবার কবি বলিতেছেন—

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে?
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচ্‌বে আমার তবে।

যে যাহাকে ভালোবাসে সে শুধু 'না-বুঝা লিপি' পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। তাই কবি হঠাৎ দেখেন—

পাঠালে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে,
তব আহ্বান করি' সে বহন
পার হ'য়ে এল পারে।

দূতের মূর্তি দেখিয়া প্রথমে বড় ভয় লাগিল, কিন্তু সে কবিরই প্রিয়তমের দূত বলিয়া চোখের জল মুছিয়া দূতকে তিনি বরণ করিয়া ঘরে লইলেন। তখন দেখিলেন, সে তো শুধু দূত নয়, সেই তো তাঁহার প্রিয়তম! বিরাট রুদ্ররূপে তিনি সাজিয়া আসিয়াছেন! তিনি তাঁহার প্রণয়িনীকে হরণ করিতে চুপি চুপি হৃদিতলে অবতরণ করিলেন। এখন—

প্রথম মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর
তোমার বিরাট-মূর্তি নিরখি' মধুর!

রুদ্রবেশী মহাদেব গৌরীকে বিবাহ করিতে আসিতেছেন—

তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

মৃত্যুর সঙ্গে যাহাদের অন্তরের মিল হইয়া গিয়াছে, তাহারা উহার বাহিরের রূপ দেখিয়া ভ্রান্ত হয় না। তাই রুদ্রবেশী প্রিয়তমকে দেখিয়াও প্রণয়িনীর আঁখি সুখে ছলছল। কিন্তু যাহারা ঠিক তেমন করিয়া চিনে না, তাহারা ভয়ানককে সমাদর করিতে পারে না।—

তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

মৃত্যুকে কবি এমনি আত্মীয়রূপেই চিনিয়াছেন। জীবন-মৃত্যু দুই-ই কবির কাছে বিশ্বেশ্বরের কোল।

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কি যে কর কেবা জানে!

কিন্তু তাঁহার কোল হইতে কিছুই বিনষ্ট হয় না ইহা নিশ্চিত।

হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু,
যে মরিল যেবা বাঁচিল।

কিন্তু মানুষ অজ্ঞাতকে বড় ভয় করে, তাই চির-পরিচিত জীবন ছাড়িয়া অজ্ঞাত 'মৃত্যুর মাধুরী' উপলব্ধি করিতে পারে না।

মৃত্যু কবির কাছে ঝুলন-খেলা, তাহা ইহ-জীবন ও পর-জীবনের মধ্যে দোল-খাওয়া। কবীর সাহেব ও সিন্ধী সাধক-কবি বেকস্ যেমন বলিয়াছিলেন যে মৃত্যু হইতেছে ঝুলন বা দোলা; বা ইহলোকে ও পরলোকে বল-লোফালুফি খেলা,—তেমনি কবিও জানেন যে মরণই জীবনের শেষ নহে, কবি জানেন যে শেষের মধ্যে অশেষ আছে!*

---

* কবীর মরণকে ঝুলনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

জীবন-মরণ-বীচ দেখ অন্তর নহী—
দাচ্ছ ঔর বাম য়ূঁ এক এক আহী।
জনম মরণ জহাঁ তারী পরত হৈ;
হোত আনন্দ তহঁ গগন গাজৈ।

ইহলোকে যে জীবনদেবতা অন্তর্যামী মানুষকে সার্থকতা দান করেন, তিনিই মরণ-সিন্ধুপারে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দেখা দেন, তখন বিস্ময়-স্তম্ভিত হৃদয়ে মানুষ বলিয়া উঠে—'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!'

উঠত ঝনকার তহঁ নাদ অনহদ ঘুরৈ,
তিরলোক-মহলকে প্রেম বাজৈ।
চন্দ্র তপন কোটি দীপ বরত হৈ,
তুর বাজে তহাঁ সন্ত ঝুলৈ।
প্যার ঝনকার তহঁ নূর বরষত রহৈ,
রস পীবৈ তহঁ ভক্ত ভুলৈ॥

সিন্ধুদেশের ভক্ত বেকস্ মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মারা যান। তিনি মৃত্যুর সময়ে মাতাকে প্রবোধ দিয়া জন্ম ও মৃত্যুকে জগজ্জননী ও পার্থিব জননীর মধ্যে বল লোফা-লুফি খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

উভয় মাতু বীচ খেল চলে—
গেঁদ জ্যু মোকো দেঈ লেঈ।
তেই ত জনম মোকো সুরু হৈ,
খেলু আজ মোকু দেঈ॥

—ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ

ইউরোপীয় লেখকেরাও মৃত্যুকে অমৃতের সেতু বলিয়াছেন—

Our life is a succession of deaths and resurrections;
We die, Christopher, to be born again.

—Romain Rolland

. . . . . and still depart
From death thro' life and life and find
Nearer and nearer Him, who wrought
Not matter nor the finite-infinite.

—Robert Browning

Earth knows no desolation.
She smells regeneration
In the moist breath of decay.

—Meredith

কবি মৃত্যুকে মাতৃপাণির ন্যায় পরম নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছেন—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে। —(নৈবেদ্য)

কবীর যেমন মৃত্যুকে তাঁহার জীবনের বর বলিয়া আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আমাদের কবির কাছেও মৃত্যু সেইরূপ, গৌরীর কাছে বিলোচনের তুল্য।

ভগবান্ তো মানুষের এই জীবনেই জন্ম-জন্মান্তর ঘটাইয়াছেন। অতএব যে মৃত্যু জন্মান্তরের সূচনা করিতেছে তাহাকে ভয় কি! এইজন্য কবি নিজেকে বলিয়াছেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়—

আমি মৃত্যু-চেয়ে বড় এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।

(পরিশেষ, মৃত্যুঞ্জয়)

এবং সর্বশেষে কবি এই বলিয়া মনকে অভয় দিয়াছেন—

নব নব মৃত্যু-পথে
তোমারে পুজিতে যাব জগতে জগতে।

আর—

যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।

এবং—

অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি'—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালবাসি।

দেশে দেবতার অভাব ছিল না, কিন্তু কবি পরের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট নহেন। জীবনের গভীরতম প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাধনার অর্ঘ্য প্রয়োগের জন্য কবি কল্পমহিমায় আপন মনের মাধুরী মিশায়ে জীবনদেবতা রচনা করিয়াছেন—জীবনের বৈচিত্র্যের সুরটি তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু কবি আপনার মনগড়া দেবতার সেবাতেই তুষ্ট রহেন নাই—আপনার আরাধ্য অন্তরতমের সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন; অবশেষে আপনার 'জীবনদেবতা'কে বিশ্বজীবন-

স্রষ্টার সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—জীবনের 'নৈবেদ্য' তাঁহার চরণে 'উৎসর্গ' করিয়াছেন।

ভগবানকে 'রাজা' বা 'প্রভু'র রূপে দেখিয়া কবি তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঐশ্বর্যের মধ্যে কাহাকেও আপনার করা যায় না। তাই মাধুর্যের মধ্যে ভগবানকে পাইয়া কবি তাঁহাকে আত্মার আত্মীয় করিতে চাহিয়াছেন। কবি 'খেয়া'-ঘাটে উপনীত হইয়াও 'জীবন মৃত্যু রৌদ্র ছায়া ঝটিকার বারতা'র মধ্যেও তাঁহার সঙ্গে নব নব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। খেয়া পার হইয়া কবি মিস্‌টিক সাধকের রূপে ভগবানের সহিত নব নব যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা তাঁহার কাছে কখনো অতিথি, কখনো বর, কখনো রাজার দুলাল, কখনো দয়িত, কখনো সখা, কখনো ভিখারী।

বিশ্বের সহিতও কবির সহস্র যোগসূত্র। কবির প্রতিভাধারা মহাসাগরে মিশিয়া শেষ হইয়া যায় নাই, শেষের মধ্যেও যে অশেষ আছে—কবিপ্রতিভা সেই অশেষে মিলিয়া চিরদিনের জন্য অশেষ হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ রোমাণ্টিক কবি। কবি যে একান্তভাবেই রোমাণ্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গিসম্পন্ন ছিলেন, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে—

আমারে বলে যে ওরা রোমাণ্টিক
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।
দুয়ার বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।

এই রোমাণ্টিক ভাবধারার সংজ্ঞানির্ধারণ সহজ নহে। একটিমাত্র সংজ্ঞার দ্বারা রোমাণ্টিসিজমের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপরও নহে। রোমাণ্টিক ভাবধারা রসের প্রসঙ্গ। রস অনুভূতির বস্তু—উহার আবেদন অতি সূক্ষ্ম, সুগভীর ও রহস্যময়। উহা আমাদের চিত্তে একটা ব্যঞ্জনা জাগাইয়া দিয়া আমাদিগকে এক রহস্যলোকের তীরভূমিতে উপনীত করিয়া দিয়া থাকে। তবে, রোমাণ্টিক ভাবধারার সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব না হইলেও, ইহার স্বরূপ-নির্ণয়মূলক লক্ষণগুলি

প্রকাশ করা চলে। সেই লক্ষণগুলির মধ্য দিয়া রোমান্টিক ভাবের কবিতা চিনিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশ্লেষণ করিলে রোমান্টিসিজ্‌মের সকল লক্ষণই চোখে পড়িয়া থাকে। শেলীর স্বাধীনচিত্তবৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়তা; কীট্‌সের ভোগসর্বস্ব সৌন্দর্যচেতনা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অতি-সাধারণ বস্তুগুণে সূক্ষ্ম আনন্দোপলব্ধি—ইহাদের কোনটিরই অভাব নাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। একটা সমাধানহীন রহস্যের মধ্যে জানা-অজানার মিশ্রণে যে আনন্দের উৎপত্তি রোমান্টিক কবিতার বিশেষত্ব,—রবীন্দ্রনাথে তাহাও আছে। অতীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ, কল্পনাপ্রবণতার অসাধারণ বিকাশ, বিস্ময়বোধ (Spirit of Wonder), পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, অপূর্ণতার বেদনা, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের সাক্ষাৎলাভ, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি ইউরোপীয় রোমান্টিক কবি-কল্পনার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথে এ সকলই আছে। অন্তর্দৃষ্টির আলোকে রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনকে সত্য করিয়া দেখিয়াছেন, খণ্ডের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে।—

> ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
> নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস।
> ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
> বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশ।

—(কড়ি ও কোমল, ছোট ফুল)

রোমান্টিক কাব্যে আমরা দেখিতে পাই অজানার এক তীব্র আকর্ষণ, সুদূরের আহ্বানে কবিচিত্তের আকুলতা। এই আকুলতাই রোমান্টিক কবিতাকে একটা অজানিত সুষমায় ভরিয়া তোলে। কবিতায় তখন যে সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহাই আমাদিগকে এত রূপাতীত লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। ঐ সুরের মূর্ছনায় আমাদের চারিদিকে এক স্বপ্নলোকের প্রতিবেশ রচিত হইয়া যায়।

সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষাজনিত বেদনাই রবীন্দ্রনাথকে দূর হইতে দূরে আহ্বান করিয়াছে। পরপারের তরুছায়া-মসীমাখা গ্রামখানি হইতে কবির কাছে আহ্বান আসিয়াছে। তিনি তখন ব্যাকুলভাবে বলিয়াছেন—

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
> হে সুন্দরী!

বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী ?

বলিয়াছেন—

সুদূর, বিপুল সুদূর,
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি'।

রোমাণ্টিক কবি-কল্পনার অন্যতম বিশেষত্বই হইল এই যে, তাঁহারা মাঝে মাঝে তাঁহাদের উপভোগের সাক্ষাৎ বস্তুটিতে পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পান না,—উহাকে অবলম্বন করিয়া, উহাকে ছাড়াইয়া অতীতের বা সুদূরের মাঝে কল্পনাকে বিস্তৃত করিয়া দেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে দেখি যে তিনি আপনার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশকে অতিক্রম করিয়া অতীতের তপোবনে, কালিদাসের কালের প্রাকৃতিক পরিবেশে মানস-ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

সকল রোমাণ্টিক কবির মতই রবীন্দ্রনাথ তন্ময় ভাবুক। বাহিরের রূপরস-বর্ণগন্ধময় পৃথিবীকে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া দেখিয়াছেন। পৃথিবীকে কবি চর্মচক্ষু দিয়া দেখেন নাই, দেখিয়াছেন মর্মচক্ষু দিয়া। তাই মানসরাগরঞ্জিত তাঁহার সৃষ্টি। তাই তাঁহার কাব্যে আসিয়া গিয়াছে আত্মস্বাতন্ত্র্য, আত্মবিভোরতা, ভাববাদ, কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগ। ধূলি-আবরণ বিমুক্ত করিয়া কল্পলোকের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে সাজাইয়া তোলেন।—

যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রং রস,
আনি তাঁরি যাদুর পরশ।

—(নবজাতক, রোমাণ্টিক)

রোমাণ্টিক কবি বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সকল প্রকাশের ভিতরে একটি ঐক্যবন্ধনী দেখিতে পাইয়াছেন, বাহিরের জগৎ ও মানুষের মনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও একাত্মতা লক্ষ্য করিয়াছেন। অতীত বর্তমান এবং অনাগত তাঁহার

কাছে পৃথক নয়। সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু কোনটাই একান্ত বা পরস্পরবিরোধী নয়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর যাহা অনুভূতিগ্রাহ্য—সকলকে মিলাইয়া তিনি এক আনন্দলোক বিরচনের প্রয়াসী। তাই তিনি বলেন—

যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যা দেখিছ না তারি ভিড়।

অধিকাংশ রোমান্টিক কবির কাব্যে যে কল্পলোকের চিত্র থাকে তাহা অপরূপ হইলেও প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহার সহিত পৃথিবীর সংস্রব মুছিয়া গিয়াছে। যেমন, শেলীতে। আবার বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে কাছের জিনিস এত স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাহিরের মুক্তবায়ুর জন্য প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আকাশের বিস্তার ও পৃথিবীর সরসতার সমাবেশ হইয়াছে। দূরত্বের সহিত নৈকট্যের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব রোমান্সের সৃষ্টি হয়, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তিনি বসুন্ধরাকে ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু সে বসুন্ধরা শুধু নিকটের জল বায়ু আকাশ ও আলোকের নহে। তিনি মমত্ব বোধ করিয়াছেন নানাদেশীয় লোকের সঙ্গে। সেই সব দূর দেশ ও জাতি তাঁহার কাছে অপরিচিত বলিয়া মনে হয় নাই। কারণ, তাহারা সেই বসুন্ধরারই অংশ, যে বসুন্ধরা কবির একান্ত পরিচিত, একান্ত আপনার—যে বসুন্ধরার সহিত কবি জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনা এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইংরেজ কবি কীট্সের সমধর্মী। কীট্স যেমন মাটির সৌন্দর্যরসের বাধাবন্ধহীন পরিপূর্ণ উপভোগ চাহিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ধরণীর ধূলিকণাতে পর্যন্ত অফুরন্ত সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন। কীট্সের মত তিনি পৃথিবীর কবি।—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে, ধরণীকে ভালবাসিয়াছেন। তাঁহার রোমান্টিসিজম বাস্তবসম্পর্কশূন্য নহে।

ধরণীর ধূলিমাটিকে ভালবাসেন বলিয়াই তিনি স্বর্গ হইতে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ পানে,
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।

জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

—(আত্মসমর্পণ, সোনার তরী)

রোমান্টিক কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় কবিদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনাভঙ্গির মধ্যে এমন বিশিষ্টতা রহিয়াছে, যাহার ফলে তিনি নিজের মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়া ইউরোপীয় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কবিদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজম, মিস্‌টিসিজমের আলোকে অনুরঞ্জিত। শেলী, কীট্‌স প্রভৃতি রোমান্টিক কবিগণ প্রকৃতিকে প্রাণবান্ ম ন করিয়াছেন, অন্তত মানব-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আপনার অন্তরের সকল চেতনা ও সকল বেদনার সহিত প্রকৃতিকে একাত্ম করিয়া লইতে পারেন নাই। এইখানে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার সহিত পাশ্চাত্ত্যের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্যের কবিদিগের মত প্রকৃতিকে কেবল প্রাণবান্ বা সচেতন ভাবিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত তিনি এক অচ্ছেদ্য অদৃশ্য নাড়ীর টানও অনুভব করিয়াছেন। মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির অচ্ছেদ্য একাত্মতায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার সহিত কবির যে গূঢ় পরিচয় ও অভিন্নতা, তাহাকে কবি সকল সময়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। কত লক্ষ শত বর্ষ পূর্বে এই ধরণীর ধূলির সহিত, সুদূর গগনের সন্ধ্যাতারার সহিত কবির আত্মীয়তা ছিল। তাহাদের সহিত একদিন তিনি একাত্ম হইয়া বিরাজমান ছিলেন। আজ তিনি নিখিলের সেই আনন্দলোক হইতে প্রবাসী হইয়া পৃথিবীতে আসিলেও, সেই অতীত স্মৃতি তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাই কুসুম-মুকুলের ফুটিয়া উঠিবার আনন্দ, তৃণের শিহরণ এ সকলই কবির কাছে অতি পরিচিত ও গভীর অর্থভরা। 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুইটি কবির এই অনুভূতির স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই নিগূঢ় পরিচয়, এই নিবিড় আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজমকে এক বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার রূপ দিয়াছে। প্রকৃতির সহিত আপন অন্তরের অখণ্ড যোগসূত্রের অস্তিত্বজ্ঞানের মধ্যে এক সূক্ষ্ম আনন্দরস আছে—সেই আনন্দের সন্ধানেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণ এক অতীন্দ্রিয়লোকে প্রয়াণ করিয়াছে।

বনফুল

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য-পুস্তক 'বনফুল' ১২৮৬ সালে গুপ্তপ্রেস হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য। ইহা আট সর্গে বিভক্ত। ইহা 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক মাসিক পত্রে প্রথমে ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু লেখা হইয়াছিল আরও অনেক দিন আগে। বইখানি কবির ১৩।১৪ বৎসর বয়সে লেখা।

'বনফুলে'র আখ্যানভাগ এই—কাব্যের নায়িকা কমলা শিশুকাল হইতে নির্জন কুটীরে পালিত হইয়া আসিয়াছে, শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পরে সে তাহার পিতা ভিন্ন অন্য কোনও মানুষকে দেখে নাই,—সে যেন দ্বিতীয় মিরাণ্ডা। কিন্তু শকুন্তলার ন্যায় কমলার সহিত কাননের তরুলতা-পশুপক্ষীর আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। কমলা যখন ষোড়শী যুবতী, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হইল। ইহার পরে বিজয় নামে এক পথিক নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বিজন বনে আসিয়া উপনীত হয়, এবং কমলাকে নিতান্ত একাকিনী অসহায়া দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লোকালয়ে লইয়া আসে ও পরে কমলাকে বিবাহ করে। কমলা লোকালয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিতা, সে বিবাহেরও কোন অর্থ বুঝে না,—যেন দ্বিতীয় কপালকুণ্ডলা। কমলা কিন্তু মনে মনে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে ভালবাসিল। ইহা লইয়া নানা অশান্তির সৃষ্টি হইল, এবং অবশেষে ঈর্ষাবিকল বিজয় নীরদকে হত্যা করিল। কমলা ভগ্ন-হৃদয়ে একাকিনী আবার তাহার পূর্ব-বাসস্থান বিজন বনে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানে গিয়াও সে আর শান্তি পাইল না, বনভূমির সহিত তাহার সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাননেও তাহার আর কোনও আশ্রয় বা আনন্দ রহিল না। ইহাই 'বনফুলে'র ট্র্যাজেডি। শকুন্তলা যেমন দুষ্মন্ত-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া আর আপনার শৈশবের তপোবনে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই, দুষ্মন্তের দোষারোপে সেই তপোবনের সহিত তাঁহার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তেমনি কমলা লোকালয়ে গিয়া সেখানকার দ্বেষ হিংসা ও নৈরাশ্যের বিষে জর্জরিত হইয়া শান্ত বনভূমির সঙ্গে আর হারানো যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এই কাহিনীটি Tempest, শকুন্তলা ও কপালকুণ্ডলার সমাবেশে গঠিত বলিয়া মনে হয়।

"বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে—এটি যেমন কালিদাসের কাব্যের মূল সুর,

তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্যেরও একটি মূল সুর। বালক-কালের লেখার মধ্যেও সেই সুর বাজিয়াছে, এবং এখনও সেই সুর বাজিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-মনের মিলন যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই সেখানেই বিরোধ, সেখানেই দ্বন্দ্ব। বনফুলের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির শান্ত সহজ সরলতার সহিত মানব-সমাজের ক্ষুব্ধ কৃত্রিম জটিলতার কোনও সামঞ্জস্য হইল না, বনভূমির সহিত মানব-সমাজের বিরোধ অত্যুগ্র আকার ধারণ করিল, কাননে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে স্নেহের সম্বন্ধটি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা লোকালয়ের সংস্পর্শে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—ইহাই বনফুলের করুণগীতির মূল সুর।

"মানুষের সুখদুঃখের পিছনে যে একটি বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, বনফুলের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমরা তাহার আভাস পাই।"—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

বালক-কবির প্রকৃতি-বর্ণনা একটি সরল স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যে মণ্ডিত, স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বের প্রকাশ বহু বয়স্ক কবিরও সাধনার ও লোভের সামগ্রী বলিয়া মনে হইবে। এই অল্প বয়সের লেখার মধ্যেও কবির সহৃদয়তার ও মানব-মনের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বনফুল কমলা যে-বনে লালিত-পালিত সেই বন হিমালয়ের পদপ্রান্তে অবস্থিত। বালক-কবি হিমালয়ের বর্ণনা লিখিয়াছেন—

প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ।
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্।
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে'
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান।

* * * *

মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে দেখে' রয় স্তব্ধ হ'য়ে
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!

* * * *

অন্ধকার রাত্রির বর্ণনায় বালক-কবির অসাধারণ কবিত্ব তাঁহার ভবিষ্যৎ স্পষ্ট সূচিত করিয়াছে—

আজ নিশীথিনী কাঁদে আঁধারে হারায়ে চাঁদে,
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি' কবরীর তারা!

কমলার পিতা মৃত্যুর সময়ে কন্যার নিকটে বিদায় লইয়া পৃথিবীর সকলের নিকটেও বিদায় লইতেছেন—

দিনকর নিশাকর গ্রহ তারা চরাচর
সকলের কাছে আমি লইব বিদায়।

গিরিরাজ হিমালয় ধবল তুষারচয়,
অয়ি গো কাঞ্চনশৃঙ্গ মেঘ আবরণ,
অয়ি নির্ঝরিণী মালা, স্রোতস্বিনী শৈলবালা,
অয়ি উপত্যকে, অয়ি হিমশৈল-বন,
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।

কমলার পিতার মৃত্যু হইলে কমলার শোকের সঙ্গে সঙ্গে—

গাইল নির্ঝর-বারি বিষাদের গান।

ইহা যেন শকুন্তলার তপোবন হইতে বিদায়ের চিত্র। যে কবি পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—

যে কবি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া বলিয়াছিলেন—

থাকো স্বর্গে হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী······

এই অন্তিম বিদায়ের মধ্যে সেই কবি-চিত্তেরই ভাবী পরিণাম অঙ্কুরিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পিতার মৃত্যুশোকাচ্ছন্না কমলা আগন্তুক বিজয়কে দেখিয়া বিস্ময়ে কৌতূহলে প্রশ্ন করিতেছে—

কোথা হ'তে তুমি আজ আইলে পৃথিবী-মাঝ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন?
তুমি কি তাহাই হবে— পিতা যাহাদের সবে
মানুষ বলিয়া আহা করিত রোদন?
কিম্বা জাগি' প্রাতঃকালে যাদের দেবতা ব'লে
নমস্কার করিতেন জনক আমার?
বলিতেন যার দেশে মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথায় কি নিবাস তোমার?

কমলার এই প্রশ্নের মধ্যে আমরা সেই কবিরই আভাস পাই যিনি পরে 'পতিতা' কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিজয় বিজন-বাসিনী কমলাকে লইয়া লোকালয়ে যাইবে। আবাল্যের আবাসভূমি বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে বনফুল কমলা শকুন্তলার ন্যায় তাহার আদরের হরিণ ও পাখীদের নিকটে বিদায় লইল। তখন কমলা বিলাপ করিয়া বলিতেছে—

হরিণ সকালে উঠি'   কাছেতে আসিত ছুটি'
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি   মুখেতে দিতাম তুলি'
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ রহিব কোথায়?

*   *   *   *

আয় পাখী, আয় আয়,   কার তরে র'বি হায়,
উড়ে যা উড়ে যা পাখী, তরুর শাখায়!
প্রভাতে কাহারে পাখী   জাগাবি রে ডাকি' ডাকি'
কমলা! কমলা! বলি' মধুর ভাষায়?

*   *   *   *

চলিনু তোদের ছেড়ে'   যা শুক শাখায় উড়ে,
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার।

কমলা চলিয়া যাইবে। তাহার আসন্ন-বিয়োগে সমস্ত বনভূমি কাতর—

সমীরণ ধীরে ধীরে   চুম্বিয়া তটিনী-নীরে
দুলাইতেছিল আহা লতায় পাতায়,—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায়?
সহসা রে জলধর,   নব অরুণের কর
কেন রে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে!
পাপিয়া শাখার 'পরে   ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি কর্ না গান, থামিলি কেন রে!

*   *   *   *

কুটীর ডাকিছে যেন 'যেও না, যেও না!'
তটিনী-তরঙ্গকুল   ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেও না, যেও না!'
বনদেবী নেত্র খুলি'   পাতার আঙ্গুল তুলি'
যেন বলিছেন আহা 'যেও না, যেও না!'

লোকালয়ে আসিবার পরে বিজয়ের এক সখী নীরজা কমলাকে নানা প্রকারে ভুলাইয়া তাহার বন-বিরহ দূর করিবার চেষ্টা করিত। নীরজা কমলাকে বলিতেছে—

আয় আয় সখি, আয় দু'জনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা!
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা,
হেথায় আয় লো বিপিন-বালা!

* * *

আয় বলি তোরে— আঁচলটি ভ'রে
কুড়ানা হোথায় বকুলগুলি।
মাধবীর ভারে লতা নুয়ে পড়ে,
আমি ধীরি ধীরি আনি লো তুলি'!

* * *

গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা,
দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্‌সে হেথায় কামিনী-পাতায়
গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে!
পারি না লো আর, আয় হেথা বসি,
ফুলগুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি।
হেথায় পবন খেলিছে কেমন
তটিনীর সাথে আমোদে মাতি'!

কিন্তু কমলা কিছুতেই আনন্দ পায় না, তাহার মন সেই বনবাসের জন্য ব্যাকুল হইয়াই থাকে। প্রকৃতির কোলে তাহার শৈশবের স্মৃতি তাহাকে উতলা করিয়া তোলে। কমলার পূর্বস্মৃতির বর্ণনা মনোহর—সে তুষার কুড়াইয়া জড়ো করিত, তাহার উপরে অস্তসূর্যের আভা লাগিয়া নানা বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইত। অস্তমান রবির অস্তগমন দেখিবার জন্য সে শৈলশিখরে আরোহণ করিত, এবং যতই উচ্চে আরোহণ করিত ততই রবিকে দূর হইতে দূরে দেখিতে পাইত। এইসব বর্ণনার মধ্যে বালক-কবির শব্দচিত্রণের শক্তি বিস্ময় উদ্রেক করে। কমলা সরসীর জলে চাঁদের ছায়া দেখিলে—

চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম, জল উঠিত জাগি'!

কমলা লোকালয়ে আসিয়া ক্রমেই সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতেছে—

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে !
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে !
জেনেছি রে হায় ভালোবাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে !

কমলা নীরদের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত বিষাদ-সঙ্গীত শুনিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়াছে। যখন নীরদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল তখন—

চাহিতে নারিনু মুখপানে তাঁর,
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
সরমে পাসরি' বলি বলি করি'
তবুও বাহির হ'লো না কথা !
কাল হ'তে ভাই, ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হয়েছে কেমন ধারা !
থাকি' থাকি' থাকি' উঠি লো চমকি',
মনে হয় কার পাইনু সাড়া।

কমলা নীরদকে ভালবাসিয়াছে অথচ সে অনাস্বাদিতপূর্ব এই ভালোবাসাকে চিনিতে পারিতেছে না। এখানে বালক-কবি অনভিজ্ঞা কুমারীর অনুরাগের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, এবং বালক-কবির পক্ষে মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের বিস্ময়কর পরিচয় দিয়াছেন।

কমলা নীরদের দিকে চাহিবে-না চাহিবে-না করিয়াও যখন না চাহিয়া পারিল না, তখন—

যেন দোঁহে জ্ঞানহত নীরব চিত্রের মতো
দোঁহে দোঁহে হেরে একমনে।
* * * *
দেখি' দেখি' থাকি' থাকি' আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র, অবশ পলক-পত্র,
অপূর্বমধুর ভাবে বালিকা বিবশা !

নীরদ বন্ধুপত্নীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে

সমাজে স্বামী ভিন্ন অপর কাহাকেও ভালোবাসিতে নাই, অপর কাহাকেও ভালোবাসিলে পাপ হয়। কিন্তু কমলা প্রত্যুত্তর দিল—

বিবাহ কাহারে বলে জানি না তো আমি—
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী।
এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি—
দেখিবারে আঁখি মোর ভালোবাসে যারে,
শুনিতে বাসি গো ভালো যার সুধাবাণী,—
শুনিব তাহার কথা, দেখিব তাহারে!

কমলার অসামাজিক এই কথা শুনিয়া—

ভর্ৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে,
আদরেতে স্বর কিন্তু হ'য়ে এল নত।
কমলা নয়ন-জল ভরিয়া নয়নে
মুখপানে চাহি' রয় পাগলের মতো।

নীরদ অশ্রু সংবরণ করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল। কমলা ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বালক-কবি ঐ অল্প বয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে অনাবশ্যকরূপে জটিল করিয়া তুলিয়া মানুষ কত দুঃখ পায়, বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্যেও কৃত্রিমতা থাকিতে পারে', এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে নরনারী যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে, তাহার ফল আস্বাদ করিতে গিয়া তাহারা কেমন করিয়া মরে।

পঞ্চম সর্গে আমরা দেখিতে পাই যে, সংসারের জটিলতা আরও ঘনাইয়া উঠিতেছে; বনভূমির সরল স্বাভাবিকতা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল নীরদ-কমলাকে লইয়া নহে, চারিদিকে আরও বহু অশান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হইল; মানুষ পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া বহু বিরোধ বহু বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। নীরজা বিজয়কে ভালোবাসে, কিন্তু বিজয় তাহা বুঝিতে পারে না, সে তাহার সুখ-দুঃখের সব কথা নীরজাকে ডাকিয়া ডাকিয়াই শুনায়। নীরজা বুঝিল যে বিজয় কমলাকেই প্রাণমন দিয়া ভালোবাসিয়াছে, বিজয়ের ভালোবাসা পাইবার আর কোনই আশা নাই, তখন তাহার হৃদয় ভাঙিয়া গেল, কমলার প্রতিও তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিল। বিজয়ের নিকট নীরজা কমলার সখী মাত্র, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সে কমলার হৃদয় জয় করিতে চায়, তাই সে নীরজার কাছে অসঙ্কোচে নিজের

প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করে। বাণভট্টের কাদম্বরী-কথায় যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যেমন পার্শ্বচারিণী সখী পত্রলেখাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রণয়তৃষার্ত চিরবঞ্চিত নারীহৃদয়ের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং কাদম্বরীর প্রতি নিজের প্রণয়ের দূতীরূপে পত্রলেখাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, বিজয়ও তেমনি নীরজার অন্তরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাকে নিজের প্রণয়ের উত্তরসাধিকা নিযুক্ত করিয়াছিল।

কবি বাণভট্ট পত্রলেখার অন্তরবেদনার কথা কোথাও পরিব্যক্ত করেন নাই, তাই রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী-সমালোচনার মধ্যে পত্রলেখাকে কাব্যের উপেক্ষিতা বলিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নীরজাকে বিস্মৃত হন নাই, নীরজার কোমল নারী-হৃদয়ের বেদনাবিধুর শোক তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন।

বিজয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে—আর,

> নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
> উঁকি মারিতেছে মুখের পানে ;
> খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
> উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
> জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
> অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি' !

পরিণত বয়সে যে কবি 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মধ্যস্থিত পুঞ্জীভূত অতৃপ্ত বাসনা ও তৃষ্ণাকে ভাষা দিয়াছিলেন, সেই কবিই এখানে ক্ষুধিত ক্রন্দসী আকাশের ছবি আঁকিয়াছেন। উপেক্ষিতা নীরজার ব্যথায় সমস্ত আকাশ সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে।

বিজয় যখন স্বপ্নমগ্ন, কমলা তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে যে এবার তাহাকে তাহার অতীত কাননবাসের সুখময় স্মৃতি ভুলিতে হইবে, সমাজে সংসারে মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে হইবে। এমন সময়ে সে দেখিল সেখান দিয়া নীরজা যাইতেছে। নীরজাকে দেখিয়াই কমলার মন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—

> ওই যে নীরজা আসে পরাণ-স্বজনী,
> একমাত্র বন্ধু মোর পৃথিবী-মাঝার !
> হেন বন্ধু আছে কি রে, নির্দয় ধরণী !
> হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর !

কিন্তু নীরজা বিরাগভরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া কমলা তাহাকে ডাকিল—

ওকি সখী, কোথা যাও? তুলিবে না ফুল?
নীরজা আজিকে সই গাঁথিবে না মালা?

* * * *

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখিজল?
কোথা যাও, কোথা সই, যেও না, যেও না।
কি হয়েছে?—বল্‌বিনে?—বল্ সখী, বল্—
কি হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা?

নীরজা চলিয়া গেল, যাইবার সময়ে কেবল বলিয়া গেল, "জ্বালালি! জ্বলিলি!"

নীরজার এই উপেক্ষা ও কটুভাষণ কমলার পক্ষে বড় রূঢ়, বড় করুণ, অথচ ইহার জন্য নীরজাকে কোনও দোষ দেওয়া যায় না। সংসারে তো প্রতিনিয়ত এই প্রকার অঘটন ঘটিতেছে, ইহার জন্য যদি কাহাকেও দায়ী করিতেই হয় তবে তাহা মানুষের জটিল গহন মনঃস্বভাব!

কমলা অশ্রু-উদ্বেল হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া নীরজার কঠোর ভর্ৎসনার কথাই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু সত্বরই বনফুলের মন প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইল—

আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে,
যমুনা-তরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর,
তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজতময় কর!
হেরিল আকাশ-পানে সুনীল জলদ-যানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে!
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কি মনে লাগিল ভাবিতে!

ভাবিতে ভাবিতে কমলার মনে পড়িল নীরদকে। কমলা কিছুতেই বুঝিতে পারে না নীরদকে ভালোবাসার মধ্যে দোষ কোথায়?—সে তো নীরদের প্রতি আপনার অন্তরের আকর্ষণ কাহারও কাছে গোপন করে নাই—

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল—
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালোবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান!

কমলার মন এমন সরল ও কৃত্রিমতাশূন্য যে, সংসারের কলঙ্ক কিছুতেই তাহার মন কলুষিত করিতে পারিতেছিল না, সে অতি সহজেই নিজের স্বচ্ছ নির্মলতা রক্ষা করিতে পারিতেছিল, সে সরলা অরণ্যের মৃগীর মতো, নির্ঝরের জলধারার মতো মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।

কমলা দেখিতে পাইল সেইখান দিয়া নীরদ চলিয়া যাইতেছে।

মুখপানে চাহি' রয় বালিকা বিবশা,
হৃদয়ে শোণিতরাশি উঠে উথলিয়া!

কিন্তু—

যুবা কমলারে দেখি' ফিরাইয়া লয় আঁখি,
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি'।

নীরদ উপেক্ষা করিয়া অবহেলা করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া কমলা ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িল, তাহার গতিরোধ করিয়া সে তাহাকে হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রণয়ের কথা জানাইল।

কিন্তু নীরদ কমলাকে বলিল—তাহার বন্ধু বিজয় তাহাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতে বলিয়াছে। সে বন্ধুর অনুরোধ পালন করিবে। সে কমলার নিকটে বিদায় চাহিল। নীরদের কথা শুনিয়া কমলা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—

কমলা তোমারে আহা ভালোবাসে ব'লে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয়!
প্রেমেরে ডুবাবো আজ বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয়!
তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন?
নিষ্ঠুর আমারে আর পাবি কি কখন?
পদতলে পড়ি' মোর, দেহ কর্ ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয়?

বালক-কবি জানিয়াছিলেন যে জোরজবরদস্তি করিয়া প্রেম লাভ করা যায় না।

কমলা নীরদকে স্পষ্ট অনুরোধ করিল যে, সে যেখানে যাইতেছে তাহাকেও সেখানে লইয়া চলুক, সে বিজয়ের কাছে কিছুতেই থাকিবে না। এমন সময়ে বিজয় অতর্কিতভাবে নীরদকে ছুরিকাঘাত করিল, নীরদ হতচেতন হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল।

যুবকের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি' রহিল তথায়।
একবিন্দু পড়িল না নয়নের জল,
একবারো বহিল না দীর্ঘশ্বাস-বায়!

কমলার শুশ্রূষায় নীরদের একবার চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে বন্ধুর কথা স্মরণ করিল, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা তাহার ছুরিকার অপেক্ষা তাহাকে অধিক আঘাত করিয়াছে, যেমন বাজিয়াছিল বাঘের বক্ষে সিপাহির ছুরিকা ফরাশী লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের "লাভ্ ইন্ এ ডেজার্ট" গল্পে। কিন্তু নীরদের বিশ্বাস ছিল যে, একদিন বিজয় নিজের ভুল বুঝিয়া নিহত বন্ধুর শোকে অশ্রুপাত করিবেই করিবে। সে কমলার কাছে বিদায় লইয়া মরিয়া গেল।

কমলা যতক্ষণ প্রিয়তম নীরদের শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ তাহার শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু নীরদের মৃত্যু হইলে তাহার বিলাপ উচ্ছল হইয়া উঠিল—

জ্বলন্ত জগৎ! ওগো চন্দ্র সূর্য তারা!
দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে!
পৃথিবীর পাপপুণ্য হিংসা রক্তধারা
তোমরাই লিখে রাখো জ্বলদ্ অক্ষরে!

* * * *

এখনই অস্তাচলে যেও না তপন!
ফিরে এস, ফিরে এস তুমি দিবাকর,
এই—এই রক্তধারা করিয়া শোষণ
ল'য়ে যাও, লয়ে যাও স্বর্গের গোচর!

* * * *

অবাক্ হউক পৃথ্বী সভয়ে বিস্ময়ে!
অবাক্ হইয়া যাক আঁধার নরক!
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে!
প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়ন-পলক!

বিজয়কে নীরদ ক্ষমা করিয়াছিল, কিন্তু কমলা ক্ষমা করিতে পারিল না। সে বিজয়কে অভিসম্পাত দিল—

রক্তে লিপ্ত হ'য়ে যাক বিজয়ের মন!
বিস্মৃতি! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে! . . . .

শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ-হৃদয়ে !
বিষাদ ! বিলাসে তার মাখি' হলাহল
ধরিও সম্মুখে তার নরকের বিষ !

এইখানে কমলার চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তপোবনের শান্ত ভাব তাহার চরিত্রকে ক্ষমাশীল করিতে পারে নাই। দুষ্মন্ত-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হওয়া সত্ত্বেও শকুন্তলা যেমনভাবে তাঁহার স্বামীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, অথবা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের সৃষ্টি কচ যেমন করিয়া দেবযানীকে অভিশাপের বদলে বর দিয়াছিলেন, সে ধীরতা কমলার চরিত্রে বালক-কবি দেখাইতে পারেন নাই। কমলার চরিত্রে হিংসার পরিবর্তে হিংসাই প্রকাশ পাইয়াছে। তপোবনের পবিত্র পরিবেষ্টনে মানুষ হইয়া উঠিয়াও তাহার চরিত্র ধৈর্যে ক্ষমায় কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সপ্তম সর্গে শ্মশানের ভয়ঙ্কর বর্ণনা বালক-কবির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।—

গভীর আঁধার রাত্রি, শ্মশান ভীষণ !
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন !
সরসর মরমরে সু-ধীরে তটিনী ব'য়ে যায় !
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায় !
গাছপালা নাই কোথা, প্রান্তর গভীর !

* * *

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢাকিয়াছে বুক !
হেথা-হোথা অস্থিরাশি ভস্ম-মাঝে লুকাইয়া মুখ !
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি' যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গারশিখায় !
বিকট দশন মেলি' মানব-কপাল—
ধ্বংসের মরণস্তূপ—ছড়াছড়ি, দেখিতে ভয়াল
গভীর আঁখিকোটর আঁধারেরে দিয়েছে আবাস
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস !

নীরদের চিতা জ্বলিতেছে—

ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধূমরাশি শ্বাসে !
একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে—
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা নিক্ষেপিয়া আকাশের 'পরে !

*   *   *

তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
  নিশীথ-শ্মশান-বায়ু স্বনিছে উচ্ছাসে !
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া !
  অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিঃশ্বাসে !
শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া
  নীরব শ্মশানময় তুলি' প্রতিধ্বনি !
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
  বাদুড় চলিয়া গেল করি' ঘোরধ্বনি !

*   *   *

এহেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা !
  কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ !
শূন্য নেত্রে, শূন্য হৃদে চাহি' আছে বালা
  চিতার অনলে করি' নয়ন নিবেশ !

কিন্তু কমলার মন তাহাকে বলিতেছিল—

সুধাময়ী বীণাখানি লয়ে' কোল 'পরে—
  সমুচ্চ হিমাদ্রি-শিরে বসি' শিলাসনে—
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
  গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে !
হরিণেরা বন হ'তে শুনিয়া সে স্বর
  শিখরে আসিত ছুটি' তৃণাহার ভুলি',
শুনিত ঘিরিয়া বসি' ঘাসের উপর—
  বড় বড় আঁখি দুটি মুখ-পানে তুলি' !
আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
  নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল ;
তটিনী বহিছে যেথা কলকল স্বরে,
  সুবাস নিঃশ্বাস ফেলে বনফুলদল !

নীরদের চিতা যতক্ষণ জ্বলিতেছিল ততক্ষণ কমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঐ প্রকার চিন্তা করিতেছিল ; কিন্তু যেই চিতা নিভিয়া আসিল অমনি সে মূর্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল। ক্রমে চিতা নির্বাপিত হইল, রাত্রি ভোর হইয়া আসিল—

ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি' পূর্বাশার সুবর্ণ তোরণে,

রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতি-ভালে দিল পরাইয়া।

তখন কমলা জ্ঞানলাভ করিল এবং শ্মশান ও লোকালয় ত্যাগ করিয়া তাহার পিতার পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরে আবার ফিরিয়া গেল। সেখানকার বহিঃপ্রকৃতি পূর্ববৎ আছে—

আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর।
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।

* * *

কুটীর তটিনী-তীরে লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিল-দর্পণে।
হরিণেরা তরু-ছায়ে খেলিতেছে গায়ে গায়ে
চমকি' হেরিছে দিক্ পাদপ-কম্পনে।

কমলা হৃদয়-বেদনা ভুলিবার জন্য এই বিজন বনে তাহার পুরাতন আবাসে আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানকার বাহ্যপ্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকিলে কি হয়, তাহার নিজের অন্তর-প্রকৃতি যে সংসারের সংস্রবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাই—

নির্ঝরের ঝরঝরে হৃদয় তেমন ক'রে
উল্লাসে হৃদয় আর উঠে না নাচিয়া।

তাহার নিজের হৃদয় শূন্যপ্রায় হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছে—

প্রাণহীন যেন সবি, যেন রে নীরব ছবি,
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী ব'হে যায়।

* * *

দেখিয়া লতার কোলে ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—
হৃদয় নাচেনা তো গো তেমন উল্লাসে!
তেমন জীবন্ত ভাব নাই তো অন্তরে!

আগে যে-সব পাখী তাহাকে আনন্দ-কাকলিতে মোহিত করিত, তাহারাও আর তেমন নাই—

শুক আর গাবে না কো খুলিয়ে পরাণ।
সেও যে গো ধরিয়াছে বিষাদের তান।

* * *

হরিণ নিঃশঙ্ক মনে শুয়ে ছিল ছায়া-বনে,
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি' নয়নদ্বয় মুখপানে চাহি' রয়,
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।

কমলা ব্যথিত মনে বলিল—

ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে!

সে সংসারের বেশ-বাস ত্যাগ করিয়া কবরী খুলিয়া ফেলিল, বল্কল পরিধান করিল, তথাপি সে আর অরণ্যের পশুপক্ষীদের বিশ্বাস প্রত্যানয়ন করিতে পারিল না। যে তপোবন হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই সরলতার বিশ্বাসভূমিতে আর তাহার পূর্বাধিকার মিলিল না। এই অবস্থার কথা কবি রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা-সমালোচনা-প্রসঙ্গে পরে বলিয়াছেন—

তাহার পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদ মাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্ত-ভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহিল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুর ভাবে প্রকাশিত হইত।

কমলার পক্ষেও তাহাই ঘটিল, সে কাননে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু কোথাও কাহারও কাছে আশ্রয় পাইল না। কমলা তাহার শৈশবে যে স্বর্গে ছিল, তাহা সুন্দর, সম্পূর্ণ; কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণের পরে সেখানে আর ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। সংসারের জটিলতা ও হিংসা তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল, সে আপনার শৈশব-স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কোথাও সে আর সেই পূর্বের বিশ্বাস ও আশ্রয় লাভ করিল না। সংসারের কঠিন স্পর্শে কাননের কোমলতার সহিত তাহার স্নেহ-মাধুর্যের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বনফুলের ট্র্যাজেডি এইখানেই চরমতায় উপনীত হইয়াছে। নীরদের মৃত্যু কমলার পক্ষে চরম দুঃখ নহে, তাহা অপেক্ষা কঠিন আঘাত কমলাকে সহ্য করিতে হইল, এই কাননভূমির সহিত বিচ্ছেদে। এইখানেই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিলে ভাল হইত। কিন্তু বালক-কবি আর্টের নির্দেশ অপেক্ষা আতিশয্যের প্রলোভনে পড়িয়া ইহার পরে কমলার মৃত্যু ঘটাইয়া ট্র্যাজেডিকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাব্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল না।

তাছাড়া, কেবল মৃত্যুতেও কবি নিরস্ত হন নাই, কবি দেখাইয়াছেন যে মৃত্যুর মধ্যে কমলা পরমা শান্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছে। কাব্যের শেষভাগে হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস সংযত হইয়া আসিয়াছে, বর্ণনার অত্যুজ্জ্বলতা শেষ হইয়া গিয়াছে, কমলার মৃত্যুদৃশ্য প্রশান্ত গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। কমলা হিমালয়ের শিখরে আরোহণ করিতেছে—

দেখে বালা নেত্র তুলে'—
চারিদিক্ গেছে খুলে'
উপত্যকা বনভূমি বিপিন ভূধর।
তটিনীর শুভ্র রেখা
নেত্রপথে দিল দেখা—
বৃক্ষছায়া দুলাইয়া ব'হে ব'হে যায়।
ছোট ছোট গাছপালা,
সঙ্কীর্ণ নির্ঝরমালা,
সবি যেন দেখা যায় রেখা-রেখা-প্রায়।

* * *

অনন্ত তুষার-মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী।
মোহ-স্বপ্ন গেছে ছুটে'—
হেরিল চমকি' উঠে'—
চৌদিকে তুষাররাশি শিখর আবরি'!
উচ্চ হ'তে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি'
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন!

মৃত্যুর মধ্যে প্রকৃতির সহিত কমলার পুনর্মিলন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

তেরো-চৌদ্দ বৎসরের বালক-কবি তাঁহার এই বয়স হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত নানা স্থানে দেখাইয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ। বনফুলের মধ্যে বিজন-কানন ও তপোবনের পার্থক্য যেরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি পরবর্তীকালে মিরাণ্ডার বিজন-দ্বীপের সহিত শকুন্তলার তপোবনের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। "তপোবন সমাজের একেবারে বহির্বর্তী নহে, তপোবনেও গৃহকর্ম পালিত হইত।" সেখানে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নহে; সমাজগতভাবে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত।

তাই কণ্বাশ্রমের পরিপূর্ণতা শকুন্তলার চতুর্দিকে এমন একটি রক্ষাকবচ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা সংসারের সমস্ত কপটতা ও দুঃখের আঘাতেও বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিপদ-বিক্ষোভের মধ্যেও শকুন্তলাকে রক্ষা করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে ; মারীচের তপোবন "শকুন্তলার বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান" করিয়াছিল। বিজন-কানন মানব-সমাজের সম্পূর্ণ বহির্বর্তী, সেইজন্য সেখানে পরিপূর্ণতার অভাব ঘটিয়াছে। বিজন-কানন কমলার চরিত্রে এমন কোন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয় নাই যাহা সংসারের আঘাত হইতে কমলাকে রক্ষা করিতে পারে। বালক-কবি স্বাভাবিক আকর্ষণবশে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

কমলার পরাভবের ভিতর দিয়া বিজন-কাননের ব্যর্থতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তপোবনের সার্থকতা ও শকুন্তলার জয় পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় সহানুভূতির ইহা একটি নিদর্শন।

'বনফুলে'র ভাষা ও ছন্দের মধ্যে অনেক অপরিপক্কতা আছে, ত্রুটি আছে ; কবির উপর বিহারীলাল চক্রবর্তী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনার প্রভাবও অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বালক-কবির প্রতিভার ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট। বাংলায় একটা প্রবচন আছে যে, উঠন্তি মূলা পত্তনেই চেনা যায়, আর কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিয়াছেন—Child is father of the man! এ-কথার সত্যতা রবীন্দ্রনাথের এই বাল্যরচনা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। ঐ অল্প বয়সে কবি তাঁহার কবিতায় সর্বত্র মিলের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে যুক্তাক্ষর ব্যবহার করাতে ছন্দ শ্রুতিকটু হইয়াছে। তবে ইহার জন্য তাঁহার সময়ই দায়ী। তখন পর্যন্ত ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে কোনো কবি সচেতন ছিলেন না। কিন্তু সেই অল্প বয়সেই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ সঙ্গীত-নিপুণতার জন্য ধরিতে পারিয়াছিলেন যে, যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে এক মাত্রা না ধরিয়া দুই মাত্রা ধরিলে ছন্দ শ্রুতিমধুর হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঐ অল্প বয়সে প্রণয়ের নিরঙ্কুশতা ও সমাজবিধির কঠোরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বাধীনতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। মানবহৃদয় যে সমাজশাসনের উর্ধ্বে তাহাও তিনি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

কবি-কাহিনী

এই খণ্ডকাব্যখানি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮৪ সালে) প্রথম বর্ষের 'ভারতী' পত্রিকায় পৌষ মাসের সংখ্যা হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে ষোল বৎসর। 'বনফুল' ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১২৮২-১২৮৩ সালের (১৮৭৫-১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের) 'জ্ঞানাঙ্কুরে' বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'কবি-কাহিনী'ই ১২৮৬ সালে (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির জীবনস্মৃতিতে আছে—

এই কবি-কাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম, তখন আমার কোন উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন।

এই কবি-কাহিনী পুস্তকটি পরে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

ইহার আখ্যান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন—

যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়া-মুর্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশ জনে মাথা নাড়িয়া বলিবে—হাঁ, কবি বটে!—ইহা সেই জিনিসটি?—(জীবনস্মৃতি)

প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক-কবি তাহার শৈশবকালের যে পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শৈশব-স্মৃতিই প্রকাশ পাইয়াছে। শিশু-কবি আপন মনে প্রকৃতির কোলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, মনের আনন্দে গান করিতেছে—

জননীর কোল হ'তে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে বাহিরের জগতের সহিত মিশিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু কবি-কাহিনীর শিশু-কবি অবাধে বাহিরের জগতের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত—

বিমল সরসী যবে হ'ত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রুজলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি-নিঃশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর,
যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শীষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি' গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শৈশবে ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ জীবনের বিপরীত চিত্র কল্পনা করিয়াছেন এই 'কবি-কাহিনী' কাব্যে। শিশু-কবির শৈশব ক্রমে যৌবনে প্রবেশ করিল, এবং প্রকৃতির সহিত কবির যোগ তখন আরও ঘনিষ্ঠ হইল।

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি-দেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

কবি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তন্ময় হইয়া যাইত, আপনার মনে কত চিন্তাই করিত—

ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া—
নিশাই কবিতা, আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চোখের 'পরে হবে প্রকাশিত;

দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি'।
কিন্তু কবি, নিশাদেবী কি মোহন মন্ত্র
পড়ি' দেয় সমুদয় জগতের 'পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন।

কল্পনাদেবী তখন কবির প্রতি অনুকূল—

কল্পনা, সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া
বীণা ল'য়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীর-তলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।

রাত্রির অন্ধকারে যখন সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া পড়িত, কবি তখন একাকী পর্বতশিখরে উঠিয়া প্রকৃতির স্তবগান করিত। কিন্তু—

সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না,
কেবল আকাশব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
কেবল পর্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান
কেবল সুদূর-বনে দিগন্ত-বালার
হৃদয়ে সে গান পশি' প্রতিধ্বনি-রূপে
মৃদুতর হ'য়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে-নির্ঝরিণী-বালা
সে গভীর গীতি-সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সম্মুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথ-বায়ু কাঁপাত পল্লব।

কল্পনাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছে—

শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি' উঠে থরথরি, তোমার নিঃশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্বচরাচরে
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি' হে আদি জননী,
শাবকের মতো এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।

ইহার পরে কবি নীহারিকাপুঞ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা বলিয়াছেন—

এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে—
কক্ষ ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য-চন্দ্র-তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি' লক্ষ সূর্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে পড়ে হেথায়-হোথায় ;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন-অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হ'য়ে রহে অনন্ত আকাশে।

কবি প্রকৃতির প্রলয়-রূপেও মুগ্ধ—

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মতো
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্বতশিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হ'তে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকাদেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়িছে খসিয়া
শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গান্তরে উলটি' পালটি'।

কবি রাত্রির রূপে মুগ্ধ—

অমা-নিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার-গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে স্থজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর 'পরে
নীরবে রয়েছে চাহি' পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের 'পরে রহে বিকশিত।

কবি উষার রূপেও কম মুগ্ধ নন—

কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষার—
হাসি-হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মতো
আধ-ঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি।
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ-বালারে
যেদিকে দক্ষিণ-বধূ ফেলেন নিঃশ্বাস
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্তলক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।

প্রকৃতির প্রতি প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া কবি-জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবি-হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছিল না—

এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?
মনের মন্দিরমাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতেছিলেন—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল,
* * *

পারে না পুরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন ॥

'কবি-কাহিনী'র নায়ক-কবি শূন্যহৃদয়ে বনে বনে বেড়াইত। একদিন অপরাহ্ণে সে শ্রান্ত-হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িল।

হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি'
দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে—
কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার,
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময়
কি দুখে উদাস হ'য়ে করিছ ভ্রমণ?

বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিল। কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণকুটীরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটীর ওই,
চল যাই ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হ'তে ফলমুল আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি' আনিব সলিল।
যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কালে সেথা লভিবে বিরাম।
আমার বীণাটি ল'য়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।

বনফুলের নায়িকা কমলার ন্যায় এই কাব্যের নলিনীর সহিতও বনের হরিণ-পাখী-গাছপালার একটি সুমধুর হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের মিলনের যে আদর্শ কবি কালিদাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকালেই মুগ্ধ করিয়াছিল, ইহা আমরা বনফুলের মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছি।

হরিণশাবক এক আছে ও গাছের তলে,
সে যে আসি' কত খেলা খেলিবে পথিক।
দূরে সরসীর ধারে আছে এক চারু কুঞ্জ,
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন,

কবি রাত্রির রূপে মুগ্ধ—

অমা-নিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার-গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর 'পরে
নীরবে রয়েছে চাহি' পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের 'পরে রহে বিকশিত।

কবি উষার রূপেও কম মুগ্ধ নন—

কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষার—
হাসি-হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মতো
আধ-ঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি।
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ-বালারে
যেদিকে দক্ষিণ-বধূ ফেলেন নিঃশ্বাস
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্তলক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।

প্রকৃতির প্রতি প্রীতিতে পরিপূর্ণ হইয়া কবি-জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবি-হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতেছিল না—

এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পুরিবে না আর?
মনের মন্দিরমাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিতেছিলেন—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল,

*   *   *

পারে না পূরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন ॥

'কবি-কাহিনী'র নায়ক-কবি শূন্যহৃদয়ে বনে বনে বেড়াইত। একদিন অপরাহ্নে সে শ্রান্ত-হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িল।

হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি'
দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে—
কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক ?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার,
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময়
কি দুখে উদাস হ'য়ে করিছ ভ্রমণ ?

বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিল। কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণকুটীরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটীর ওই,
চল যাই ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হ'তে ফলমূল আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি' আনিব সলিল।
যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কালে সেথা লভিবে বিরাম।
আমার বীণাটি ল'য়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।

বনফুলের নায়িকা কমলার ন্যায় এই কাব্যের নলিনীর সহিতও বনের হরিণ-পাখী-গাছপালার একটি সুমধুর হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের মিলনের যে আদর্শ কবি কালিদাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকালেই মুগ্ধ করিয়াছিল, ইহা আমরা বনফুলের মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছি।

হরিণশাবক এক আছে ও গাছের তলে,
সে যে আসি' কত খেলা খেলিবে পথিক।
দূরে সরসীর ধারে আছে এক চারু কুঞ্জ,
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন,

কত পাখী তালে তালে সারাদিন গাহিতেছে,
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে ল'য়ে যাব আমি।

নলিনীর সহিত কবি তাহার কুটিরে গেল। ক্রমে কবির মন নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে না পারিয়া কবির চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল।

কবি তার মরমের প্রণয়-উচ্ছ্বাস-কথা
কি করি' যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া,
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাহিক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।

একদিন কবি মনের কথা নলিনীকে বলিতে গিয়া অসংলগ্ন কথায় মনের ভাবকে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু—

কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা।

বালিকা নলিনীও কবির কাছে নিজের প্রণয় প্রকাশ করিল। তাহার পরে উভয়ে একত্র জীবন যাপন করিতে লাগিল।

অরণ্যে দুজনে মিলি' আছিল এমন সুখে,
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন;
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু,
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।

উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—

শুধু সে বালিকা ভালোবাসিত কবিরে।
শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভালো,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।
* * *
শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভালো
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার,
কিন্তু সে কথায় কবি কত কি পাইত অর্থ,
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতার।

চরিত্রে বিচিত্রতার সমাবেশে সেই বনবালা মনোহারিণী হইয়াছিল—

বনদেবতার মতো এখন সে এলোথেলো,
কথনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কথনো এমন শান্ত প্রভাতের বায়ু যথা,
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত।

কিন্তু এত পাইয়াও কবির মন ভরিল না—

এখনো কহিছে কবি—আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢালো ভালোবাসা হৃদয়ে আমার।

কারণ, কবিহৃদয় অল্পে সন্তুষ্ট হইবার মতন ক্ষুদ্র নয়—

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে, দেবী,
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম আছে যাহাদের মন,
তাহাদের তরে, দেবী নহে এ পৃথিবী!
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে চায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙে-চুরে যায় মন,
জগৎ পুরায় তারা আকুল বিলাপে।

কবি ও শিল্পীর অন্তরে অপূর্ণতার ও অতৃপ্তির বেদনা পুঞ্জীভূত থাকে, কবিহৃদয় অসীমের সঙ্গলাভ করার প্রয়াসী। তাই প্রাণের শূন্যতা ভরিয়া তুলিবার জন্য—

বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি—
আরো দাও ভালবাসা হৃদয় ঢালিয়া।
আমি যত ভালোবাসি তত দাও ভালোবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা।

নলিনী কবিকে বলিল—

যা ছিল আমার কবি, দিয়াছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমার প্রেমে দিছি বিসর্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর,
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।

কিন্তু যাহা পাওয়া যায় না, তাহাই কবি চায়—

ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি,
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?

সারা দিন সাধ যায় দেখি ও-মুখের পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা ?

* * *

এত তারে ভালোবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।

অন্য কোথাও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিবার জন্য কবি নানা দেশ পর্যটনে বাহির হইল।

কবি ত' চলিয়া যায়—সন্ধ্যা হ'য়ে এলো ক্রমে,
আঁধার কানন-ভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে।

* * *

তখন বনান্ত হ'তে সুধীরে শুনিল কবি
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ণ সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরব অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।

কবি নলিনীর গান শুনিতে লাগিল—

কেন ভালোবাসিলে আমায় ?
কিছুই নাহিক গুণ, কিছুই জানি না আমি,
কি আছে ? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয় ?

কবি কত দেশ কত লোকালয় দেখিল, কিন্তু তাহার হৃদয় শান্ত হইল না। নলিনীর বিরহে প্রকৃতির সৌন্দর্যেও আর তাহাকে তৃপ্তি দেয় না।

নভ-প্রতিবিম্ব-শোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র-তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন।
স্নিগ্ধ রাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার প'ড়ে আছে হেথায়-হোথায়।
অধীর বসন্তবায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।

এমন জ্যোৎস্না-রাত্রে কবির পুরাতন সুখের কথা মনে পড়ে, কবির মন উদাস হইয়া যায়।

কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি'।

ওদিকে বনবালার পূর্বের সেই সদানন্দ ভাব আর নাই।

আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে।
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির,
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ।

বনবালা নলিনী মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মনের এক সাধ যে সে কবিকে একবার দেখিয়া মরিবে। পর্যটনক্লান্ত কবি নলিনীর কুটীরে প্রত্যাবর্তন করিল। সে দেখিল—

তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাহিছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝরঝর করি'।—

বাহ্য প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় নাই বটে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে—

দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে, শীতল তুষার 'পরে
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্ধ-নিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।

ইহা নলিনীর মহানিদ্রা। কবির সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ ঘটিল না। কবিকেও ইহার পরে আর সেই কাননে দেখা গেল না।

মানুষ নিকটের জিনিসকে অবহেলা করিয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহাতে সে নিকটকে হারায়, দূরকেও পায় না,—এই কথাটি কবি রবীন্দ্রনাথ এই বাল্যকালের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত বহুবার

বলিয়াছেন। 'ভগ্নহৃদয়', 'মায়ার খেলা' ও 'লিপিকা' পুস্তকে 'তপস্বী' ও 'পরীর কথা' নামক দুটি কথিকায় এই তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে দেখা যায়। 'উৎসর্গ' কাব্যের 'পাগল' বা 'মরীচিকা' নামক কবিতাতেও কবি এই কথা বলিয়াছেন—

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

অতএব 'কবি-কাহিনী'র মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল সুরের সন্ধান আমরা পাইতেছি। প্রিয়কে প্রিয় বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া এবং পরে তাহার জন্য হাহাকার করিয়া মরা—ক্ষেপার পরশ-পাথর খোঁজার মতই করুণ।

চতুর্থ সর্গে নলিনীর মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাস, ক্রমে শান্তিলাভ, পরে বৃদ্ধ বয়সে কবির সুখ-দুঃখের কথা ও আশার কথা এবং কবির মৃত্যু বর্ণনা করিয়া কাব্য শেষ হইয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে। তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন যাহা স্বতঃই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক্ হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথা খুব ঘটা করিয়া বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিণত বয়সের লেখার সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে যতটা হাস্যকর মনে করিয়াছেন, অপরের সেরূপ মনে হইবে না।

নলিনীর মৃত্যুর পরে কবির মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিল যে সত্যই কি সমস্তই ফুরাইয়াছে? যে মানুষ এমন একান্ত সত্য ছিল, সে কি এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া গেল? মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই থাকিবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিশায়ে তাহাতে?

* * *

এই ভালোবাসা যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?

শোকাচ্ছন্ন কবি তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া দেখিল—কালস্রোতে সমস্তই ভাসিয়া চলিয়াছে, কিছুই স্থির হইয়া নাই।

হিমাদ্রির এই স্তব্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছি বসি',
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্তমান,
বর্তমান মিশিতেছে অতীত-সমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে মানুষের অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্তনের পথে যেতেছে লইয়া।

কবি বুঝিল—কালস্রোতে সমস্তই চলিয়াছে, কিন্তু কিছুই বিলীন হইতেছে না, অনন্ত কালের মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কবি দেখিল—পাখীরা গান করিতেছে, কাননে বায়ু বহিতেছে, উপত্যকায় ফুল ফুটিতেছে, কেহ চুপ করিয়া বসিয়া নাই। প্রকৃতির প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কবি নিজের শোক ভুলিল।

ধীরে ধীরে দূর হ'তে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।

* * *

কখনো বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মতো আছিল মধুর,
এমনি স্বপ্নময়, এমনি অস্ফুট :
তাই শুনি' ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতর যেন উথলিয়া উঠে।

ক্রমে কবি বার্ধক্যে উপনীত হইল। বৃদ্ধ কবির শ্বেতজটাসমাকীর্ণ মুখশ্রী গম্ভীর, সে হিমালয়ের পাদদেশে বসিয়া গান করিতেছে—

কি সুন্দর সাজিয়াছে, ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা। সুনীল গগন
ভেদিয়া তুষারশুভ্র মস্তক তোমার।

হিমালয়ের শোভা দেখিতে দেখিতে কবির মনে পড়িল—এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানবসভ্যতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কত পাপ কত রক্তপাত কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া মানুষ কিরূপ হীনতায় নিমজ্জিত হয় তাহা দেখিয়াছে—

দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার ক'রে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা।
যে-পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হাত মাতারে তার পরায় শৃঙ্খল
সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন—সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন—সে স্বাধীনেরে পুজিবারে শুধু!
সবল—সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্বল—বলের পদে আত্ম-বিসর্জিতে।

অন্যদিকে সভ্যতার নামে কি অত্যাচারই চলিয়াছে—

সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া।
তবুও মানুষ বলি' গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি' করে অহঙ্কার!

এইসব কথা স্মরণ করিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল, তথাপি সে বিশ্বাস হারাইল না। আসন্নমৃত্যু কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শান্তিলাভ করিল —

কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি' প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি'।
নাহিক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা;
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্যাদার অপমান করিবে না মনে,

সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।

সেদিন আসিবে, গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে,—
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়।

কিন্তু কবি জানে—

প্রকৃতির সব কার্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ কবির যে আদর্শ-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সর্বত্র শান্তিময় বিশ্বপ্রেমকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার বা স্বাজাত্যের অহমিকাকে তিনি কখনো প্রাধান্য দেন নাই।

কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস 'বনফুলে'র ন্যায় 'কবি-কাহিনী'র বিষয়-নির্বাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার পরিণত জীবনের আদর্শের ছায়াপাত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে নিজেই বলিয়াছেন—

কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছ্বাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে তাহার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশী, তখন সর্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণ বয়সের আরম্ভে এও সেই রকম একটা কাণ্ড।

রুদ্রচণ্ড

'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল' প্রকাশের পরে কবি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য ও গাথা পর পর প্রকাশিত হয়। ১২৮৫ সালে কবি তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নিকটে আহমদাবাদে যান। সেখানে তিনি 'প্রতিশোধ', 'লীলা', 'অপ্সরা-প্রেম' নামে কতকগুলি গাথা রচনা করেন। পর বৎসর বিলাতে গিয়া 'ভগ্নতরী' নামে একটি গাথা লিখেন। সবগুলিই উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনীমূলক, এবং ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত। 'প্রতিশোধ' ও 'লীলা' গাথার গল্পাংশ 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে দেওয়া হইয়াছে। ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৮৮ বাংলা সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রুদ্রচণ্ড' নামক নাটিকা প্রকাশিত হয়। এই নাটিকাখানি কাব্য, চতুর্দশ সর্গে ৮০০ লাইনে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত দুইটি গান রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত টালি-আকারের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছাপা হইয়াছিল। কবি তাঁহার জ্যোতিদাদাকে এই নাটিকা উৎসর্গ করেন, সেই উৎসর্গ-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—

তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি' রেখেছ মোরে,—
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি' যেতে হবে পরবাসে,
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।

এখানে প্রবাস-যাত্রার উল্লেখ থাকাতে অনুমান হয়, কবির প্রথম বিলাত-যাত্রার পূর্বে এই নাটিকা রচিত হইয়াছিল। ১২৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যখন বিলাতে যান, তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর। কবি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে এই নাটিকার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই।

নাটিকা আরম্ভ হইয়াছে, রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরব-মন্দিরে। রুদ্রচণ্ড রাজা হস্তিনাপুরের রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি রাজ্যভ্রষ্ট, এখন অরণ্যে অরণ্যে তাঁহার দিনাতিপাত

হইতেছে, কেবল প্রতিহিংসাস্পৃহা রুদ্রচণ্ডকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তিনি নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কালভৈরবের পূজা করিতেছেন এবং স্তব করিতেছেন—

মহাকাল ভৈরব-মুরতি,
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি।
কটাক্ষে প্রলয় তব চরণে কাঁপিছে ভব,
প্রলয়-গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন,
তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার-ছায়া
অমাবস্যা-রাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি',
দশন-বিদ্যুৎ-বিভা দিগন্তে খেলায়।
তোমার নিঃশ্বাসে খসি' নিভে রবি, নিভে শশী,
শতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।
প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে জগতের শ্মশানেতে
প্রেত-সহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে,
নিদারুণ অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে করপুটে।
প্রলয়-মুরতি ধর, থরথর সুর নর,
চারিপাশে দানবেরা করুক বিহার,
মহাদেব শুন শুন, নিবেদিনু পুনঃ পুনঃ,
আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড, সেবক তোমার।

রুদ্রচণ্ডের মনে কেবল এক চিন্তা—প্রতিহিংসা। রাত্রির অন্ধকারে কুঠার দিয়া গাছ কাটিতে কাটিতে রুদ্রচণ্ড ভাবেন, পৃথ্বীরাজকে নিজ হস্তে যন্ত্রণা দিয়া অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে হইবে। দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি রুদ্রচণ্ডের নিদ্রা হয় না। রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়া কিন্তু এ সম্বন্ধে উদাসীন, সে ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথে, আপন মনে গান গায়।' তাহার এ-সমস্ত খেলা রুদ্রচণ্ড একেবারেই দেখিতে পারেন না। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ্, তিনি অনেক সময়ে অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন। পৃথ্বীরাজ-সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তি তাঁহার কন্যার সহিত আলাপ করিবে, ইহা রুদ্রচণ্ডের কাছে অসহ্য। তাই রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে কঠোর তিরস্কার করিয়া

বলিয়া দিলেন যে, চাঁদকবিকে পুনরায় অমিয়ার নিকটে দেখিতে পাইলে চাঁদকবির আর নিস্তার থাকিবে না।

কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে রুদ্রচণ্ড আবার দেখিলেন যে, চাঁদকবি অমিয়াকে গান শুনাইতেছেন। তখন আর তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি চাঁদকবিকে আক্রমণ করিলেন। রুদ্রচণ্ডের শরীরে আর পূর্বের ন্যায় বল নাই, তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে চাঁদকবির নিকটে পরাজিত হইলেন। পরাজিত হইয়া তিনি চাঁদকবির নিকটে প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, কারণ তখনও তিনি পৃথ্বীরাজের উপর প্রতিহিংসা লইতে পারেন নাই। কিন্তু সেই প্রাণভিক্ষার অপমান রুদ্রচণ্ডের মনে শেলের অধিক আঘাত করিল।—

> জীবন মাগিতে হলো তোর কাছে আজ,
> শতবার মৃত্যু এই হইল আমার।
> রুদ্রচণ্ড যে-মুহূর্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে,
> রুদ্রচণ্ড সে-মুহূর্তে গিয়াছে মরিয়া।
> আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম ল'য়ে
> কেবল শরীর তার ; কহিতেছি তোরে—
> এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন।
> ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়।
> এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে,
> তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
> চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ করে দেবো।

প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতিও একদিন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, এবং ভিক্ষালব্ধ দুইটি দিনের কলঙ্কে রঘুপতির সমস্ত গর্ব, সমস্ত তেজ নিভিয়া গিয়াছিল। রুদ্রচণ্ডের মধ্যে আমরা যেন রঘুপতির চরিত্রের পূর্বাভাস দেখিতে পাই।

অনুগ্রহ-ক্ষুব্ধ রুদ্রচণ্ড রোষে অপমানে জ্বলিতে লাগিলেন। অমিয়ার জন্যই এই অপমান মনে করিয়া তিনি অমিয়াকেও দুই চক্ষের বিষের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। অমিয়া পিতার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তাঁহার মন নরম হইল না।—

শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিস্ তুই!
দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস।
এখনি ও-অশ্রুজল মুছে ফেল তুই,
অশ্রুজলধারা মোর দু'চক্ষের বিষ।

তিনি অমিয়াকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অমিয়া বিষণ্ণ-হৃদয়ে চাঁদকবির সন্ধানে হস্তিনাপুরে চলিয়া গেল।

এই সময়ে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার একজন দূত রুদ্রচণ্ডের সন্ধানে তাঁহার অরণ্যনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্রচণ্ড মানুষের সংসর্গ সহ্য করিতে পারেন না, দূতকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।—

নগর-ফুলের কীট, হেথা তোরা কেন?

দূত বলিল যে, সে রুদ্রচণ্ডের কোনও অপকার করিতে আসে নাই, বরং উপকার করিতে আসিয়াছে। উপকারের কথা শুনিয়াই রুদ্রচণ্ড আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। দূত তখন জানাইল যে, মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, তিনি রুদ্রচণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রতিশোধ-গ্রহণের উপযুক্ত সুযোগ তাঁহার নিকট উপস্থিত। কিন্তু এই সংবাদ শুনিয়া রুদ্রচণ্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—এতদিন ধরিয়া তিনি পৃথ্বীরাজকে নিজহস্তে শাস্তি দিবার অবসরের অপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আজ মহম্মদ ঘোরী বুঝি তাঁহার শিকার কাড়িয়া লয়! রুদ্রচণ্ড দূতকে দূর করিয়া দিলেন এবং মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ-সংবাদ প্রচার করিয়া দিবার জন্য পৃথ্বীরাজের রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন।

নগরে আসিয়া রুদ্রচণ্ড বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন—

এ কি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে দক্ষিণে বামে সহস্র বর্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!

* * *

যেথা যাই শত আঁখি মোর মুখ চেয়ে,—
আঁখিগুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে।

কিন্তু পৃথ্বীরাজকে না পাইলে তো তাঁহার চলিবে না—ভিক্ষা-পাওয়া জীবন যে তাঁহার দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পথে শুনিলেন যে, পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত

হইয়াছেন। ইহাতে রুদ্রচণ্ড সেই সংবাদদাতার উপরই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। পরে রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে কাতর হইয়া পড়িলেন, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের জীবনের একমাত্র অবলম্বন যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে,—

মুহূর্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন।
পৃথ্বীরাজ মরে নাই মরেছে যে-জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয়-মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার।
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।

রুদ্রচণ্ডের জীবনধারণের আর কোনও কারণ রহিল না, তিনি নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন।

যদিও এই নাটিকাখানির প্রধান পাত্র রুদ্রচণ্ড, তথাপি অমিয়ার করুণ কাহিনী নাটিকার মধ্যে একটি সামান্য বস্তু নহে। অমিয়া আপন মনে প্রকৃতির সহিত মিলিয়া জীবন যাপন করিত, পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিত,—তাহার পিতা যে তাহাকে কেন তিরস্কার করিতেন, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। যখন রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে চাঁদকবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন অমিয়ার মন ভাঙিয়া পড়িল। সে যাহাকে এত ভালবাসে, তাহাকে তাহার পিতা কেন দেখিতে পারেন না, ইহা তাহার কাছে এক মহারহস্য। সে বিষণ্ণ-হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া ভাবে—

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি।
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জ্যোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া।

পরদিন যখন আবার চাঁদকবি অমিয়ার কাছে আসিলেন, তখন অমিয়ার হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, সে চাঁদকবিকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু

চাঁদকবি তাহার ভয় হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন অমিয়া চাঁদকবিকে বলিল—

> পিতারে বুঝায়ে তুমি বলো একবার—
> বোলো তুমি অমিয়ারে ভালোবাস বড়,
> মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে।

চাঁদকবি বলিলেন—আচ্ছা, সে পরে বলা যাইবে, এখন তোমাকে যে গান শিখাইয়া দিয়াছি সেই গানটি আমাকে শুনাও। অমিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

> বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল
> প্রথম মেলিল আঁখি তার,
> চাহিয়া দেখিল চারিধার। ইত্যাদি।

এই গানটি অতি সুন্দর কবিত্বময়, খাঁটি লিরিকের গুণযুক্ত। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত টালি-আকারের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কৈশোরক পর্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

অমিয়ার গান শেষ হইলে চাঁদকবি বলিলেন—আমি তোমাকে আর একটি গান শিখাইয়া দিই—

> তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
> মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
> চাহিয়া দেখিল চারিধার। ইত্যাদি।

এই গানটি প্রথম গ্রন্থাবলীতে ছিল, পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ এ গানটিও অতি সুন্দর ও মধুর।

চাঁদকবির গান চলিতেছে, এমন সময়ে রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত। পিতার ক্রোধ হইতে চাঁদকবিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অমিয়া সমস্ত দোষ নিজের উপরে আরোপ করিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তথাপি রুদ্রচণ্ড চাঁদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে অমিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। রুদ্রচণ্ড পরাজিত হইয়া চাঁদকবির নিকট জীবনভিক্ষা করিলেন। এমন সময়ে একজন দূত আসিয়া চাঁদকবিকে রাজ্যের বিপদের বার্তা জানাইল। অমিয়ার তখনো মূর্ছাভঙ্গ হয় নাই। চাঁদকবি অমিয়াকে কিছু বলিয়া যাইবার অবসর পাইলেন না, তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে অমিয়া যখন পিতা-কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া চাঁদকবিকে খুঁজিবার জন্য রাজধানীতে আসিল, তখন চাঁদকবি মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়া গিয়াছেন। অমিয়া সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইল। রাত্রি আসিল, ঝড়-বিদ্যুৎ-অন্ধকারে বিহ্বল ও হতাশ হইয়া অমিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বনের এক কাঠুরিয়া অমিয়াকে আশ্রয় দেওয়ায় অমিয়ার প্রাণরক্ষা হইল।

ওদিকে চাঁদকবি অমিয়ার জন্য ভাবিয়া আকুল, শিবিরে বসিয়া কেবল অমিয়ার কথাই তাঁহার মনে হইতেছে—

প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী,
কবে এ আঁধার রাত্রি ফুরাইবে তোর?

একদিকে নগরে যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা চলিতেছে, অন্যদিকে অমিয়া চাঁদকবির শেখানো শেষ গানটি গাহিয়া চলিয়াছে। সেই গান শুনিয়া চাঁদকবির মনে হইল তিনি যেন অমিয়ার কণ্ঠস্বর শুনিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, মধ্যাহ্নে রাজপথে অমিয়া কেমন করিয়া আসিবে! চাঁদকবি যখন আবার যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইতেছেন, তখন অমিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যগণ চাঁদকবিকে আর বিলম্ব করিতে দিল না, দুন্দুভির শব্দে চাঁদকবির কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল, তাঁহার সাড়া আর অমিয়ার কানে পৌঁছিল না। অমিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না, অবসন্ন-হৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিযা পড়িল। অমিয়ার মন ভরিয়া শুধু এক চিন্তা—'স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো!' অমিয়া আবার অরণ্যে পিতার নিকটেই ফিরিয়া চলিল। অরণ্যে ফিরিয়া অমিয়া দেখিল তাহার পিতা নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন। অমিয়া পিতার পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল।

অমিয়াকে দেখিয়া রুদ্রচণ্ড চমকিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসাবৃত্তির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া রুদ্রচণ্ডের পিতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল।—

আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা।
এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।

এতদিন পরে অমিয়া এই প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় পাইল। আসন্নমৃত্যু রুদ্রচণ্ড কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

এদিকে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়াছেন, পৃথ্বীরাজ পরাভূত। চাঁদকবি গৌরবের ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়া অমিয়ার সন্ধানে অরণ্যে আসিলেন এবং নিঃশব্দে কুটীরদ্বার সন্তর্পণে খুলিয়া দেখিলেন রুদ্রচণ্ডের মৃতদেহের পার্শ্বে মুমূর্ষু অমিয়া। আকুল কণ্ঠে চাঁদকবি অমিয়াকে ডাকিলেন—

> অমিয়া, অমিয়া, স্নেহের প্রতিমা,
> চাঁদকবি ভাই তোর এসেছে হেথায়।

এইখানেই নাটিকার পরিসমাপ্তি।

এই নাটিকার মধ্যে অপরিণত বয়সের অপূর্ণতা আছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন—

> যেমন নীহারিকাকে সৃষ্টিছাড়া বলা চলে না, কারণ তাহা সৃষ্টির একটা সবিশেষ অবস্থার সত্য—তেমনি কাব্যের অস্ফুটতাকে ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্য-সাহিত্যের একটা সত্যেরই অপলাপ হয়।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

> বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্বে পর্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।

এই নাটিকা প্রকাশিত হইলে ইহার উল্লেখ করিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ মে তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট্ কাগজে লিখিত হইয়াছিল—

> "This is the title of the melodrama from the pen of a writer who belongs to a nest of singing birds, and to whose credit it may be said that amid great temptations they have made literature and poetry the vocation of life....As regards the performance under notice we need scarcely say it is not a drama properly so called nor an opera....It is a sort of an interlocutory poem, short but sweet.
>
> The writer, we may add, not long ago visited Europe, and though fond of English scenes and the English people, his Anglican partiality has not made him so unpatriotic as to abjure his national language and the habits and customs of the country of his birth. He is culling honey from foreign flowers to enrich his home, but is quite national in his tone and feeling."

'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'রুদ্রচণ্ড'—এই তিনখানি কাব্যের মধ্যেই কবির নগরের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং কেবলমাত্র আরণ্যজীবনকেও তিনি প্রশংসা করেন নাই। ভোগের ও ত্যাগের জীবনের সামঞ্জস্যই যে

আদর্শ-জীবন, তাহা কবি তাঁহার কিশোর বয়স হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রচার করিয়াছেন। এই কৈশোর-রচনার মধ্যে যে সমস্যা কবির মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার পরবর্তীকালের 'নৈবেদ্য' কাব্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

ভগ্নতরী

বিলাত যাইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে গাথা ও কাব্যোপন্যাস লিখিতেছিলেন, তাহার ধারা বিলাতেও চলিতেছিল। টর্কী শহরে বাসকালে তিনি 'ভগ্নতরী' নামে **একটি** গাথা রচনা করেন; সে সম্বন্ধে কবি স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে বিস্তৃত ভাবেই বলিয়াছেন।

গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ। অজিত ও ললিতা প্রেমিক ও প্রেমিকা। একদিন তাহারা নৌকাযোগে বেড়াইতে গিয়াছে, এমন সময় ঝড় উঠিল; উভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে স্রোতে উভয়কে পৃথক্ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। পরদিন প্রাতে এক দ্বীপের উপর ললিতার মূর্ছিত দেহ সুরেশ নামক এক যুবকের চোখে পড়িল। যুবক ললিতাকে বাঁচাইল; তারপর ভীষণ বিকার-জ্বরে ললিতা ভুগিল। সবিশেষ সেবা করিয়া সুরেশ ললিতাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইল; সুরেশ নিজের দেশে বালিকাকে লইয়া গিয়া স্বচ্ছন্দে আছে। একদিন উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, এমন সময়ে ঝড় উঠিল। আশ্রয়ের জন্য তাহারা ছুটিয়া গিয়া এক ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে এক অর্ধ-উন্মাদ সন্ন্যাসী বাস করিত —সে হইতেছে অজিত। ললিতার শোকে সে সংসারবিরাগী। ললিতাকে দেখিয়া অজিত তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। ললিতা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জিল অশনি,
জীর্ণ গৃহ কাপাইয়া ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ—গৃহ পুরিল আঁধারে।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর বয়সেই দু'খানি কাব্য 'বনফুল' ও 'কবি-কাহিনী' রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে প্রথমবার বিলাতে যান।

বিলাতে থাকিতেই রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' নামে একখানি কাব্য-নাটিকা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহা বাংলা ১২৮৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকার কার্ত্তিক হইতে মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়, এবং পরে ১৮০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বা বাংলা ১২৮৮ সালে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহা আর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় নাই, কেবল ইহার কোনো কোনো অংশ স্বতন্ত্র গীতিকবিতার আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কৈশোরক'-পর্যায়ে ছাপা হইয়াছিল। এই নাট্য-কাব্য রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল উনিশ বৎসর মাত্র।

এই কাব্যের পাত্র-পাত্রীগণ—কবি, অনিল, মুরলা (অনিলের ভগিনী ও কবির বাল্য-সহচরী), ললিতা (অনিলের প্রণয়িনী), নলিনী (এক চপল-স্বভাবা কুমারী), চপলা (মুরলার সখী), লীলা, সুরুচি, মাধবী প্রভৃতি (নলিনীর সখীগণ), সুরেশ, বিজয়, বিনোদ প্রভৃতি (নলিনীর বিবাহ-প্রার্থী বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষী)।

কাব্যখানি ৩৪ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে বনের দৃশ্য। বনের মধ্যে মুরলা একাকিনী বসিয়া আছে, চপলা তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া বলিল—

সখী তুই হলি কি আপন-হারা ?

*　　*　　*

জটিল-মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি' !

দুয়েকটি রবিকর　　　সাহসে করিয়া ভর

অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।

চপলা মুরলাকে বলিল—'মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ ?' ইহার পরে সে অনিল ও ললিতার পূর্বরাগের কাহিনী বিবৃত করিল, কেমন করিয়া একদিন সে লুকাইয়া থাকিয়া অনিল ও ললিতার মিলন দেখিয়াছিল এবং তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ইহা শুনিয়া মুরলা বলিল,—'আহা, কেন বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে ?' ইহার উত্তরে চপলা বলিল,—'বাধা না পাইলে সখী সুখেতে কি সুখ আছে ?'

ইহার পরে কথায় কথায় চপলা মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে কোন্ ব্যক্তি যাহাকে ভালোবাসিয়া মুরলা দিবারাত্র এমন বিজনে চিন্তা করে ?

মুরলা বলিল—সে ব্যক্তি উচ্চ, আর আমি তুচ্ছ, সুতরাং তাহার নাম আমি মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহস পাই না।—

ভালোবাসি ; শুধায়ো না কারে ভালোবাসি।
সে নাম কেমনে সখী, কহিব প্রকাশি'।
আমি তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবী-কাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি' শুকায়ে পড়ে সে ঝরি',
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার।—
তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হা রে,
তবুও লুকানো রবে একথা আমার!

চপলা বলিল—মুরলার এ প্রণয় সৃষ্টিছাড়া। প্রণয়িনী তো প্রণয়ীর নাম জপমালা করে, তাহার রসনার খেলনা করে। মুরলা যদি তাহার প্রণয়ীর নাম প্রকাশ করিয়া বলে তাহা হইলে তাহার সখী চপলা তাহাকে অবিরাম তাহার নাম গান করিয়া শুনাইবে, আর—

ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি' দিব সেই নাম ;
গলায় পরিবি—মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি,
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুম-দাম!

তখন মুরলা দূরে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া কবিকে দেখাইয়া দিল।

কবি দুই সখীর নিকটে আসিল এবং মুরলাকে বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিল,—চপলা প্রস্থান করিল। কবি মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কোনো যুবাকে কি ভালোবাসিয়াছে, যাহার জন্য সে এমন নিভৃতে চিন্তামগ্না হইয়া থাকে? কে সেই যুবা? কবির প্রশ্ন শুনিয়া মুরলা কাতর হইল এই ভাবিয়া যে, কবি তাহার হৃদয়ের গূঢ়তত্ত্ব এখনো ধরিতে পারে নাই। কবিও মুরলাকে

বলিল—তাহার অন্তরে যেন কিসের অভাববোধ তাহাকে পীড়িত করিতেছে, সে কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না।

> প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,
> মহা-উচ্ছ্বাসে সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে ;
> মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখান করি' বিদারিত
> সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখী করিতে প্লাবিত !
> অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
> অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলনা কেবল,
> চৌদিকে দিগন্ত আসি' রুধিত না অনন্ত আকাশ,
> প্রকৃতি-জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
> দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি'
> আনন্দ-সঙ্গীত-স্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি'।

কবি-মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কবিকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কে এই অনন্ত ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিবে? মুরলা পারে, কিন্তু সে তো তাহার প্রাণের অপরিমেয় প্রণয় কবিকে নিবেদন করিতে সাহস পায় না। সে গান গাহিয়া তাহার শৈশব-সহচর কবিকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—সেই গানের ভিতর দিয়া কাব্যের পরিণামের পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছে—

> কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
> তবু জানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে।
>
> *   *   *
>
> অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন,
> ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন,
> লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী
> তখন জানিনু সখী কত ভালোবাসি।

দ্বিতীয় সর্গের স্থান ক্রীড়াকানন। নলিনী ও তাহার সখীগণ সেখানে রহিয়াছে। নলিনী ফুলবেশ পরিতেছে। নলিনী তাহার পোষা শ্যামা-পাখীকে 'গান গেয়ে গেয়ে তালি দিয়ে দিয়ে' নাচাইতে লাগিল—'নাচ শ্যামা, তালে তালে!' এই কবিতাটি প্রথম-গ্রন্থাবলীর 'কৈশোরক' বিভাগে ছাপা হইয়াছিল, পরে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজ বিবাহ-সভায় নলিনীর ভক্ত অনুচরেরা সকলে আসিবে, তাহাদের

মনোহরণের জন্য নলিনীর বেশভূষা শোভন ও লোভন করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও নলিনীর পছন্দ নয়, সে সখীদের বলিল—

হেথা আয় তোরা দে সখী সাজায়ে
শ্যামা পাখীটিরে মোর!
দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়,
বেলকুঁড়ি-মালা কেমন মানায়
সুগোল গলায় ওর!

তৃতীয় সর্গে মুরলা ও তাহার দাদা অনিলের কথাবার্তা বর্ণিত হইয়াছে। মুরলা এক দুর্বল মুহূর্তে তাহার প্রাণের গোপন প্রণয়ের কথা তাহার দাদার নিকটে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। অনিল কবিকে মুরলার প্রতি উদাসীন দেখিয়া ও ভগিনীর বিষণ্ণতা দেখিয়া কবিকে নিন্দা করিতে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু মুরলা তাহাকে বাধা দিল, সে কবির নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

চতুর্থ সর্গে কবি একাকী গাহিয়া ফিরিতেছে—

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা ঘেরা জানালা-মাঝারে
একটি মধুর মুখ।
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপালে ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপালে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক!

* * *

পর পর ছয়টি গানে কবি সেই মনোরম-মুখ-ধারিণী রমণীর প্রতি নিজের প্রেমের কথা ব্যক্ত করিল, এবং অবশেষে তাহার নামও বলিয়া ফেলিল—

শুনেছি—শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি—শুনেছি তাহা।
নলিনী—নলিনী—নলিনী—নলিনী—
কেমন মধুর আহা!

* * *

নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম !

পঞ্চম সর্গের স্থান কানন ; কাল রাত্রি ; পাত্র-পাত্রী অনিল, ললিতা, নলিনী, নলিনীর সখীগণ, বিজয়, সুরেশ, বিনোদ, প্রমোদ, অশোক, নীরদ। কাননের এক পাশে অনিল তাহার নব-পরিণীতা বধূ ললিতাকে গান করিয়া বলিতেছে—

'বউ! কথা কও!'

অনিল তাহার নবোঢ়া লজ্জিতা প্রণয়িনীকে কথা কহাইবার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিল, কিন্তু লাজময়ী ললিতা কিছুতেই তাহার প্রাণের প্রণয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। বিবশা ললিতা সুখাতিশয়তার অসহনীয়তায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কাননের অপর পার্শ্বে নলিনী অভিমান করিয়া বিজয়কে তাহার ভালোবাসার অগভীরতার জন্য ভর্ৎসনা করিতেছিল—কেবল মুখে ভালোবাসি বলিলে ভালোবাসার ও রমণী-হৃদয়ের অপমান করা হয়। যদি প্রকৃত ভালোবাসার পরিচয় দিতে হয়, তবে 'হৃদয়ের অশ্রু ফেল দিবানিশি পদতলে'। ইহার পরে নলিনী বিজয়কে একটি কামিনী-ফুলের গুচ্ছ তুলিয়া দিতে বলিল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল—'কি পাইব পুরস্কার ?' নলিনী বলিল—

একটি কুসুম, যদি ঠাঁই পায়
আমার অলক-মাঝে,
একটি কুসুম নুয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল 'পরে,
একটি পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুধু মুহূর্তের তরে,
তুলে যদি রাখি একটি কুসুম
রচিতে এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল' আছে ভাগ্যে তব
আর কিবা পুরস্কার !

বিজয় ফুল তুলিয়া দিল। নলিনী সেই ফুল পদদলিত করিয়া বলিল—

অনুগ্রহ করি' এ চরণ দিয়া
ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া,

বিজয় বলিয়া উঠিল—

আহা ! আমি যদি হতেম স্বজনী,
একটি কুসুম ওর,—
ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যজিতাম দেহ মোর !

নলিনী বিজয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ মনে গাছের দিকে চাহিয়া ফুলগুলিকে সম্বোধন করিয়া গান করিতে লাগিল। দূর হইতে অশোক, স্থরেশ, বিনোদ, নীরদ, প্রমোদ বিজয়কে নলিনীর নিকটে দেখিয়া তাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমোদ নলিনীর নিকটে গিয়া গান ধরিল—

আঁধার শাখা উজল করি'
হরিৎ পাতা ঘোম্‌টা পরি'
বিজন বনে মালতী-বালা
আছিস কেন ফুটিয়া ?

* * *

নলিনীও গান গাহিয়া উত্তর দিল—

আঁধার বনে আছি গো ভালো,
অধিক আশা রাখি না।
তোদের চিনি চতুর অলি,
মন-ভুলানো বচন বলি'
ফুলের মন হরিয়া ল'য়ে
রাখিয়া যাস যাতনা।

* * *

নলিনী প্রমোদকে পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ের কাছে গেল। বিজয় প্রত্যাখ্যানের ভয়ে নলিনীর কাছে যায় না, কিন্তু নলিনী] তো চায় প্রণয়াভিলাষী পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করিবার আনন্দ। তাই সে যাচিয়া গিয়া বিজয়কে তাহার প্রগল্‌ভ বচনে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল—

এ মুখ আমার, এ রূপ আমার
পুরাতন হইয়াছে ?
ভালো সখা ভালো, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে ?

কিন্তু বিজয় নলিনীর চপল চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছিল, সে আর কিছুতেই নলিনীর নিকটে ধরা দিল না।

ষষ্ঠ সর্গে পুনরায় কবি ও মুরলার কথোপকথন। কবি মুরলার মুখ ম্লান দেখিয়া তাহার ম্লানিমার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কবির করুণায় মুরলা মুগ্ধ হইল। কবি মুরলাকে বলিল—'আমার একটি গোপন কথা আজ আমি তোমাকে বলিব।' মুরলা ইহা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কবি সেই গোপন কথা মুরলাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিল—'শূন্য এ হৃদয় মোর ভালোবাসিয়াছে।' মুরলা এই কথা শুনিয়া আশান্বিতা হইয়া উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—

ভালোবাসে? কারে কবি? কারে সখা? কারে?

কবি উত্তর করিল—

মধুর নলিনী-সম নলিনীবালারে!

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মুরলার বুক ভাঙিয়া গেল, তথাপি সে মনের ক্লেশ গোপন রাখিয়া দেবতার কাছে তাহার বাল্যসখাকে সুখী করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। সে আবার কবিকে জিজ্ঞাসা করিল—'বড় ভালোবাস কি সে নলিনীবালারে?'

তাহার উত্তরে কবি বলিল—

শুধু যদি বলি সখী ভালোবাসি তায়,
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়!

* * *

মনে কর যেন সখী এতো ভালোবাসা
কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা।

এই সময়ে নলিনী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কবিকে লক্ষ্য না করিয়াই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তখন কবি গাহিয়া উঠিল—

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা, কোথা যাও, কোথা যাও!
একবার এই দিকে মু'খানি তুলিয়া চাও!

কবি মুরলাকেই জিজ্ঞাসা করে যে, সে কি কোথাও নলিনীর অপেক্ষা সুন্দরী কাহাকেও দেখিয়াছে? মুরলা বলিল—হাঁ, ঐ সৌন্দর্য-প্রতিমাই কবি-প্রিয়া হইবার যোগ্য; এবং সে মনে মনে বলিল,—'তুমি যদি সুখী হও, কি দুঃখ আমার!'

চপলা আসিল গান গাহিতে গাহিতে—

সখী, ভাবনা কাহারে বলে ?
সখী, যাতনা কাহারে বলে ?
তোমরা যে বলো দিবস রজনী
ভালোবাসা, ভালোবাসা,
সখী, ভালোবাসা কারে কয় ?

চপলা মুরলার হাসি দেখিয়া তাহাকে সুখী মনে করিল এবং তাহাকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তম সর্গে অনিল ও ললিতার কথা। অনিল ললিতাকে কাছে চায়, তাহার মুখে প্রণয়ের কথা শুনিতে চায়, কিন্তু ললিতা লজ্জায় পারে না, কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তর তাহাই চায়, সে তাহার দয়িতের আদর-সোহাগ আরও—আরও চায়। কিন্তু সে নিজেকে এমন সামান্য, এমন অনুপযুক্ত মনে করে যে, সে সহসা সাহস করিয়া তাহার হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারে না।

অষ্টম সর্গে মুরলা ও চপলার কথা। মুরলা যে তাহার সখীর নিকটেও হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত করে না, ইহার অভিযোগ চপলা জানাইল। মুরলা বলিল—

যাহাদের সুখে আমি সুখে রই,
সকলেই সুখী তারা।

চপলা মুরলাকে সংবাদ দিল যে—

এতদিনে দেখি কবির অধরে
হরষ-কিরণ জ্বলে,—
যেন আঁখি তার ডুবিয়া গিয়াছে
সুখের স্বপন-তলে!

মুরলা জিজ্ঞাসা করিল—'বড় কি সে সুখে আছে ?' চপলা সংবাদ দিল যে, কবি নলিনীকে ভালোবাসে ; কিন্তু নলিনী নিষ্ঠুর-হৃদয়া, তাহাকে চপলা দেখিতে পারে না। তখন মুরলা নলিনীকে সমর্থন করিতে লাগিল, তাহার প্রিয় কবি যে-রমণীকে ভালোবাসিয়াছে তাহার নিন্দা মুরলা সহ্য করিতে পারে না। পরে চপলা সংবাদ দিল যে, নলিনীও বুঝি কবিকে ভালোবাসিয়াছে। তখন মুরলা বলিল—

নলিনীবালারে ভালোবেসে যদি
কবি মোর সুখে থাকে,

তাহা হ'লে, সখী, বল দেখি মোরে,
কেন না বাসিবে তাকে ?
মোরা তাহা লয়ে ভাবি কেন এত ?
চপলা লো, আমরা কে ?

চপলা সেইভাবে গান ধরিল—

কাজ কি লো, মন লুকানো থাক,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ।
হাসিয়া-খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক !

নবম সর্গে নলিনী ও সখীগণ। নলিনী গান গাহিয়া সখীদিগকে বলিতেছে—

কি হলো আমার ? বুঝিবা স্বজনী
হৃদয় হারায়েছি !

সে কবির দর্শন পাইবার জন্য ব্যগ্র। সে সখীকে বলিল—

পথের ধারেতে বসি' র'ব মোরা,
সেই পথে যাবে কবি।

দশম সর্গে মুরলার স্বগতোক্তি। কবি তাহার কাছে আসিয়া, নলিনীর প্রতি প্রণয়ে তাহার মন যে কেমন করিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই বার্তা শুনাইতে লাগিল। অধীর হর্ষে তাহার শূন্য অন্তর যে পূর্ণ হইয়াছে তাহা সে তাহার বাল্যসখী মুরলাকে না শুনাইয়া কোথাও শান্তি পাইতেছিল না। কবি মহানন্দে গান ধরিল—

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙে গেল—গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর !
তোমার সৌন্দর্যভারে দুর্বল হৃদয় হা রে
অভিভূত হ'য়ে যেন পড়েছে আমার !
* * *
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার।
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা বালা, থাক' হৃদি করি আলা,
হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তোমার !

একাদশ সর্গে অনিল ও ললিতা। অনিল ললিতার কাছে প্রণয়ের পরিচয় পায় না বলিয়া ক্ষুণ্ণ। ললিতা প্রণয়ের ব্যগ্রতা-বিহীন প্রণয়িনী—

যেন গো যাহার তরে মন ব্যগ্র আছে,
অশরীরী ছায়া যেন দাঁড়াইয়া আছে।

ললিতা প্রিয়তমকে বিষণ্ণ দেখিয়া চিন্তিত ও ব্যাকুল। কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। ইহাতে অনিল আরও ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রস্থান করিল। ললিতাকে সে সম্ভাষণ না করিয়াই চলিয়া গেল দেখিয়া ললিতার হৃদয় হাহাকার করিতে লাগিল।

দ্বাদশ সর্গে নলিনী ও তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিগণ। পুরুষ-পতঙ্গ রূপসীর রূপের শিখায় পাখা পুড়াইয়া আর নড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু নলিনীর ইহা মনঃপূত হইতেছিল না—

রূপ—রূপ—রূপ—পোড়া রূপ ছাড়া
আর কিছু মোর নাই?

নলিনী সকলকে উপেক্ষা করিয়া বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। অনিল নলিনীকে দেখিল এবং মনে মনে ললিতার সহিত নলিনীর রূপ তুলনা করিতে লাগিল।

উভেরি মধুর মুখ, ললিতার নলিনীর,
অধীর সৌন্দর্য কারো, কারো বা প্রশান্ত স্থির!

কিন্তু সব আলোচনা করিয়া অনিল বুঝিতে পারিল—

ললিতা নলিনী-কাছে, না-হয় রূপেতে হারে,
ভালোবাসি—ভালোবাসি তবু আমি ললিতারে।

অনিল প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেল দেখিয়া নলিনীর মন কাতর হইল। সে দেখিল কবি তাহার দিকে আসিতেছে। সে কবির প্রণয় চাহে না—

আমি গো অবলা—কবির প্রণয়
অত নাহি করি আশা।
আমি চাই নিজ মনের মানুষ,
সাদাসিধে ভালোবাসা।

ত্রয়োদশ সর্গে আমরা দেখি ললিতার লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়াছে। সে মুখ ফুটিয়া প্রিয়কে প্রশ্ন করিতেছে—

দিয়েছি তো যাহা কিছু ছিল আপনার
তবু কেন শুকাল না অশ্রুবারিধার ?

অনিল তাহাকে বলিল—যাহার এমন প্রেমময়ী প্রণয়িনী আছে তাহার আর কিসের অভাব, কিসের দুঃখ ? কিন্তু ললিতার প্রেমের দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না, তাহার হাসি যে যন্ত্রণার ছদ্মবেশ তাহা ললিতা বুঝিয়া বলিল—

মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে।

চতুর্দশ সর্গে কবি মুরলাকে বলিতেছে যে, আমি অনেকদিন তোকে বিরলে কাঁদিতে দেখিয়াছি, তুই কি কাহাকেও ভালোবাসিয়াছিস ? যদি আমার এ অনুমান সত্য হয়, তবে তাহা আমাকে বলিস। কিন্তু মুরলা সঙ্কোচে নিজের ব্যথার কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। সে নলিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিল। কবি নিষ্ঠুরা নলিনীর আচরণে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছে, সে পুনরায় নলিনীর মন জানিবার জন্য প্রস্থান করিল। মুরলার সব আশা নির্মূল হইয়া গেল, সে সন্ন্যাসিনী হইবে সঙ্কল্প করিল।

পঞ্চদশ সর্গে কবি ও মুরলার পুনর্মিলন। মুরলা কবিকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি মরিয়া গেলে, তোমার কি বড় কষ্ট হইবে ? কবি বলিল—অমন কথা বলিতে নাই, হাজার হোক 'তুই ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী আমার !' মুরলা বলিল—'কবি, তুমি ফুল ভালোবাসো বলিয়া আমি তোমার জন্য কিছু রজনীগন্ধা-ফুল আনিয়াছি, তুমি কি সেগুলি লইবে ?' কবি সেই ফুল লইবার কথা ভুলিয়া নলিনী যে তাহাকে ফুল দিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ তুলিল—

সখী লো, নলিনী কাল দুটি চাঁপা তুলি'
পরায়ে দেছিল মোর দুই কর্ণমূলে ;
পরশিত দলগুলি পড়িছে ঝরিয়া,
এখনো সুবাস তার যায়নি মরিয়া।

মুরলা ছল করিয়া কবির হাত ধরিল—

দেখি সখা, একবার দেখি হাতখানি,
এ হাত কাহারে কবি করিবে অর্পণ ?
কত ভালো তোমারে সে বাসিবে না জানি ?
না জানি, তোমারে কত করিবে যতন !

কিসে তুমি র'বে সুখী সকলি সে জানিবে কি ?
দেখিবে কি প্রতি ক্ষুদ্র অভাব তোমার ?
তোমার ও-মুখ দেখি' অমনি সে বুঝিবে কি
কখন পড়েছে হৃদে একটু আঁধার ?

কবি কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না যে, তাহার মনের শূন্যতা কেন পূর্ণ হইতেছে না—

কিছু হারাইনি তবু খুঁজিয়া বেড়াই,
কিছুই চাই না, তবু কি যেন কি চাই !
কোন আশা না করিয়া নৈরাশ্যেতে দহি,
কোন কষ্ট না পাইয়া তবু কষ্ট সহি ।

কবি মনে করিল, তাহার এই যে অতৃপ্তি তাহা বোধ হয় মুরলার মনের কোনো অতৃপ্তির জন্যই । তাই সে মুরলাকে তাহার অন্তরের কথা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিল । কিন্তু মুরলা বলিল—

তুমি সুখী হও কবি, এই আমি চাই,
তুমি সুখী হ'লে মোর কোন দুঃখ নাই ।

কবি সুখী হইবার জন্য নলিনীর সন্ধানে প্রস্থান করিল । মুরলা উভয়-সঙ্কটে পড়িল ; কবির কাছে থাকিলে সে নিজে সুখী হয়, কিন্তু কবি তাহার বাল্য-সহচরীর গোপন দুঃখ অনুভব করিয়া দুঃখিত হইয়া মুরলাকে দুঃখিততর করিয়া তোলে । সে একবার মনে করে যে, কবির নিকট হইতে চির-বিদায় লইয়া যাইবে, আবার মনে করে—

কিন্তু কবি মোর আহা ভালোবাসাময়,
আমারে না দেখি' যদি তার কষ্ট হয় !

কিন্তু অবশেষে মুরলা স্থির করিল সে কবিকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে । যাইবার আগে সে প্রার্থনা করিল—

অন্তর্যামী দেবতা গো শুন একবার,
যদি আমি ভালোবাসি কবিরে আমার,
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়,
সখারে আমার আমি ভালোবাসি যত,—
নলিনী-বালাও যেন ভালোবাসে তত ।

নলিনী-বালার যত আছে দুঃখ জ্বালা,
সব যেন মোর হয় ; সুখে থাক বালা !
তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম,
মুরলা করিছে এই বিদায় প্রণাম।

ষোড়শ সর্গে ললিতার স্বগতোক্তি। সে লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রিয়কে প্রণয় নিবেদন করিতে পারে নাই, তাহার ফলে প্রিয়ের মন তাহার প্রতি বিমুখ করিয়া দিয়াছে এবং সেই সর্বনাশের উপক্রম করিয়া এখন সে লজ্জা ত্যাগ করিয়াও আর সর্বনাশ রক্ষা করিতে পারিল না। সে তাহার প্রিয়ের মনের পরিবর্তন বুঝিয়া চিন্তিত অনুতপ্ত ভীত হইয়াছে। অনিল তাহাকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিপাশার তীরে নির্জনে যাপন করে, ললিতা তাহার কাছে গেলে তাহার মুখে বিরক্তির ভাব তাহার অজ্ঞাতসারেই ফুটিয়া উঠে ; অথচ কেন যে সে ললিতাকে ত্যাগ করিয়া একাকী বিপাশার তীরে গিয়াছে তাহার শত সহস্র কারণ প্রদর্শন করিতে থাকে। ললিতা তাহার কাছে গেলেই ললিতা দেখে—

সহসা চমকি উঠি' কি যেন হয়েছে ত্রুটি
আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান।
* * *
আপনি বলেন আসি ভালোবাসি, ভালোবাসি,—
সন্দেহ করেছি যেন প্রণয়ে তাঁহার।

সপ্তদশ সর্গে মুরলা একাকিনী প্রান্তরে চিন্তা করিতেছে—

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে ;
তারি তরে উঠে রবি শশী তারা,
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাহিক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
একটি যাহার নাই সখা-সখী
কেহই তাহার নহেকো পর।

মুরলা এইরূপ দার্শনিক চিন্তা করিয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে।

যে কবি পরবর্তী কালে লিখিয়াছিলেন—

মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান্ রাখিবে না মোহগর্তে
তাই লিখি' দিল বিশ্ব-নিখিল দু-বিঘার পরিবর্তে।

তাঁহারই দার্শনিকতা এই সর্গে দেখিতে পাই।

অষ্টাদশ সর্গে ললিতা চিন্তা করিতেছে যে, সে তো এখন না ডাকিতে কাছে যায়, যাচিয়া সোহাগ করে, তবু সে যেন তাহার প্রিয়তমকে সুখী করিতে পারিতেছে না। চপলা আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া বলিল—'তুমিও কি শেষে মুরলারই মতো হইতেছ?' এমন সময়ে কবি সেখানে আসিল। চপলা কবিকে মুরলার নিকটে যাইতে অনুরোধ করিল। কবি মুরলার জন্য দুঃখিত; মুরলা যে তাহার মনের বেদনা প্রকাশ করিয়া কবিকে বলে না, ইহার জন্য কবি ব্যথিত। কিন্তু কবি কিছুতেই অনুভব করে না যে, সে তাহার বাল্যসখী মুরলাকে ভালোবাসে বা মুরলা তাহাকে ভালোবাসে। ইহা অতি পরিচিত ঘনিষ্ঠতার ফল—নূতনত্ব না থাকিলে প্রণয় মনকে সচেতন করিয়া তোলে না।

উনবিংশ সর্গে অনিল বিপাশার তীরে আসিয়াছে, তখন তাহার মনেও ঝড় বহিতেছে, বাহিরেও ঝড় বহিতেছে। ললিতা আসিয়া উপস্থিত। সে তো ছায়ার ন্যায় অনিলের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। তাহাকে দেখিয়া অনিল আগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিল এবং তাহার ম্লান মুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য অনিল ললিতাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিল। ললিতা গান গাহিল—

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়,
ও মিছে আদর তবে না করিলে নয়?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা সে-সব পুরাণো কথা
মনে ক'রে দেয় শুধু, ভাঙে এ হৃদয়।

অনিল ললিতার তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইল, সে মনে করিল যে, সে তো ললিতার প্রতি কোন প্রণয়হীনতার পরিচয় দেয় নাই, তবে কেন সে বৃথা তিরস্কার সহ্য করিবে। সে ললিতাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

ললিতাও অভিমানে স্থির করিল—

হবে যা হবার,
না ডাকিলে কাছে কভু যাব নাকো আর।

বিংশ সর্গে নলিনী একাকিনী গান গাহিতেছে—

পেয়েছি পেয়েছি আমি সখী,
একটি সমগ্র মন প্রাণ।

দেবো কি ইহারে দূরে ফেলে,
অথবা রাখিব কাছে ক'রে,
তাই ভাবিতেছি মনে মনে,
কি করিব, বল্ তাহা মোরে!

একবিংশ সর্গে অনিল চিন্তা করিতেছে—

ভেবেছিলি যাবি ভেসে কোনো ফুলময় দেশে
চাঁদের চুম্বনে যেথা ঘুমায়ে গোলাপ
সুখের স্বপনে কহে সুরভি-প্রলাপ।

কিন্তু তাহা তো তাহার ভাগ্যে হয় নাই। হৃদয়কে হত্যা করা যাহার ব্যবসায়, এমন রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ জন্মিয়াছে, তাই সে নলিনীকেও আর চায় না, কিন্তু ম্লানমুখী ললিতাতেও তাহার আর তৃপ্তি নাই। কাজেই সে ললিতাকে আসিতে দেখিয়া প্রস্থান করিল। ললিতা অনিলকে জিজ্ঞাসা করিল—

বলো সখা কোথা যাও, চাও কি করিতে?

অনিল উত্তর করিল—

মরিতে! মরিতে বালা! যেতেছি মরিতে!

অনিল প্রস্থান করিল এবং ললিতা মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

দ্বাবিংশ সর্গে নলিনীকে সম্বোধন করিয়া বিনোদের গান—

তুই রে বসন্ত-সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন!

এই গানটি ও পূর্বের কয়েকটি গান ও কবিতা সম্পূর্ণ 'কৈশোরক'-এ ছাপা

ত্রয়োবিংশ সর্গে কবি মুরলাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, মুরলার সখী চপলাও মুরলাকে খুঁজিতে খুঁজিতে কবিকে দেখিল এবং উভয়ে মুরলার সন্ধানে যাত্রা করিল।

চতুর্বিংশ সর্গে নলিনীর মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ না পাইয়া হতাশ হইয়া চলিয়া যায় কেন?—

এ কি তবে মন বিনিময়?
হৃদয়ের বিসর্জন নয়?

পঞ্চবিংশ সর্গে মুরলা পথশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে চপলার অভাব বোধ

করিতেছে এবং খেদ করিতেছে তাহার একাকী জীবনের জন্য, কবির জন্যও তাহার মন হাহাকার করিতেছে। কিন্তু সে মনকে সান্ত্বনা দিতেছে—

সম্বন্ধ হয়েছে তোর মরণের সাথে—
দে রে তোর হাত তার অস্থিময় হাতে!
এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালোবাসে
সে কেবল ওই মৃত্যু—ওই রে আকাশে!
গুরুভার রক্তহীন হিম-হস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার।
হে মরণ প্রিয়তম— স্বামী গো—জীবন মম,
কবে আমাদের এই সম্মিলন হবে?
জীবনের মৃত্যু-শয্যা তেয়াগিব কবে?

ষড়্‌বিংশ সর্গে নলিনী তাহার প্রেমিকদের প্রত্যাখ্যানে ব্যথিতা হইয়া চিন্তা করিতেছে যে, ইহার আগে যে ব্যক্তি তাহার চরণের ধূলা হইবার জন্য ব্যগ্র ছিল সেই ব্যক্তিই আজ তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল?

সপ্তবিংশ সর্গে কবি মুরলাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

অষ্টবিংশ সর্গে নলিনী যৌবনের অবসান অনুভব করিয়া চিন্তিতা হইয়াছে, সকলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার ভয় হইতেছে—তবে কি 'নলিনী হতেছে পুরাতন?' তাই সে সখীদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

ভালো ক'রে সাজায়ে দে মোরে।
বুঝি রূপ পড়িতেছে ঝ'রে!
করিতে করিতে খেলা— জীবনের সন্ধ্যাবেলা
বুঝি আসে তিল তিল ক'রে!

* * *

চির আত্ম-বিসর্জন করে যে ভকত-মন
হেন মন কোথা সখী পাই?

ঊনত্রিংশ সর্গে ললিতা শ্রান্ত জীবনে মৃত্যুর বিশ্রাম প্রার্থনা করিতেছে, তাহার "নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ।"

ত্রিংশ সর্গে নলিনীর

বড় সাধ গেছে মনে ভালোবাসিবারে,
সখী, তোরা, বল্ দেখি, ভালোবাসি কারে?

একত্রিংশ সর্গে অনিল কবিকে মুরলার অবস্থা দেখিতে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। মুরলার মৃত্যু আসন্ন, সে মরিবার আগে একবার কবিকে দেখিবার জন্য ভ্রাতাকে কবির সন্ধানে পাঠাইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গে নলিনীর নিঃসঙ্গ জীবনের হাহাকার বর্ণিত হইয়াছে—

আজ আমি নিতান্ত একাকী,
কেহ নাই, কেহ নাই হায়!

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গে মুরলা পর্ণশয্যায় শয়ানা, তাহার পার্শ্বে চপলা আসীনা, কবি ও অনিলের প্রবেশ। আজ কবি মুরলাকে চিরকালের জন্য হারাইতে বসিয় বুঝিতে পারিতেছে যে মুরলা—

প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার!

*　　*　　*

এত দিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে সখী, ঘটিবে এমন—
মরণের উপকূলে হইবে মিলন!

আজ মুরলার আর সুখের অবধি নাই, সে তাহার প্রিয়তম কবির মুখে শুনিল যে, সে তাহাবে ভালবাসে। তাই সে কবিকে বলিল—

এই মরণের দিন যদি না ফুরায়—
মরিতে মরিতে যদি বেঁচে থাকা যায়—

কবিও তাহাকে বলিল—

বিবাহ হইবে সখী, আজ আমাদের,
দারুণ বিরহ ওই। আসিবার আগে সই,
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের!
আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,—
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের!
আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
হোক তবে হোক সখী, বিবাহ সুখের—
চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের!

আজ মুরলার আনন্দের দিন, সে কবিকে অনুরোধ করিল—

তবে তুলে আনো ত্বরা রাশি রাশি ফুল !—
চিতাশয্যা হোক আজি কুসুমে আকুল !
রজনীগন্ধার মালা গাঁথো গো ত্বরায়,—
সে মালা বদল করি' দিও এ গলায়—

অনিল ফুল আনিতে গেল ও ফুল লইয়া আসিল। মুরলা আনন্দে বলিল—

কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কভু
শেষ দিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু !

কবি ফুলমালা বদল করিয়া মুরলার শয্যা কুসুমভূষিত করিয়া দিতে দিতে বলিল—

বিবাহ মোদের আজ হ'ল এই তবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে !

মুরলা চিরবিদায় লইল কবি, ভ্রাতা ও সখীর নিকটে। তাহার মুখের শেষ কথা—

আজ তবে বিদায় বিদায় !

চতুস্ত্রিংশ সর্গে ললিতার অন্তিমকাল, সেও শেষ-শয্যায় শয়ানা থাকিয়া আপন মনে গান গাহিতেছিল—

বায়ু বায়ু, কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা ?
কৌতুকে আকুল !
আমি একটি জুঁই ফুল !
সারা রাত এ মাথায় পড়েছে শিশির—
গণেছি কেবল !
প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত হে সমীর !
অতি হীনবল !
ভাঙা বৃন্তে ভর করি' রয়েছি জীবন ধরি'
জীবনে উদাস !
ওগো উষার বাতাস !

* * *

কাননে হাসিত চাঁপা, হাসিত গোলাপ,
আমি যবে মরিতাম কাঁদি',

আজো হাসিবেক তারা শাখায় শাখায়
হাতে হাতে বাঁধি' !
সে অজস্র হাসি-মাঝে—সে হরষরাশি-মাঝে
ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি !

অনিল প্রবেশ করিল। সব ফুরাইয়া গেল !

এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি। এই কাব্য আখ্যায়িকামূলক হইলেও ইহা 'লিরিক'-এর মালা এবং ইহার অধিকাংশ গীতিকবিতাই কবির গ্রন্থাবলীর 'কৈশোরকে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে আর কোনো কবিতা ছাপা হয় নাই। আমি 'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস'-এর পক্ষ হইতে কবির সমস্ত বই প্রকাশের ভার লইয়া এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যে বইখানি হইতে অংশ নির্বাচন করিয়া ও বাল্যরচনা সংশোধন করিয়া কবি খণ্ড খণ্ড কবিতার বিভিন্ন নাম রাখিয়া 'কৈশোরকে' সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই বইখানিই তিনি আমাকে প্রেস-কপি করিবার জন্য দিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকে কবির নিজের হাতের সংশোধন ও নামকরণ প্রভৃতি থাকাতে উহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে মনে করিয়া আমি সমস্ত বই হাতে লিখিয়া নকল করিয়া প্রেসে 'কপি' দি, আসল বইখানি দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য বলিয়া আমি নষ্ট করি নাই। সমস্ত বইখানি একসঙ্গে কম্পোজ করাইয়া 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' যখন কবির কাছে প্রুফ্ পাঠাইলেন, তখন কবি প্রুফ্ পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া প্রুফ্ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "এ কি আবার লেখা ! আর এই তুমি ছাপ্‌তে চাইছ ! নাঃ, এ ছাপা হবে না।"

কবি তাঁহার নিজের পরিণত প্রতিভার বিচারে যাহাকে ছাপার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা যে-সমস্ত অংশ অল্প অল্প উদ্ধার করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে কি কবিত্ব ও কৃতিত্ব ছিল। ইহার মধ্যে কাঁচা অপরিণত রচনাও অনেক আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে মধ্যে বিকাশোন্মুখ মহাপ্রতিভার পরিচয়ও পদে পদে পাওয়া যায়। ইহা প্রতিভার সৌরমণ্ডলের নীহারিকা-অবস্থা, সে কথা কবি নিজেও তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে স্বীকার করিয়াছেন।

নারীকে যে বিশিষ্ট কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতির মধ্যে দেখিয়াছেন, তাহার আভাস এই ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে প্রথম ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর দুই রূপ,—একজনা—

উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী।

এই নারী মানুষের কামনা বাসনাকে জাগাইয়া দেয়, কিন্তু বাসনার শান্তি আনে না।

"গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় নিভৃত তার রয়েছে, নীরবে ঝঙ্কারের অপেক্ষায়,—যে ঝঙ্কারে বেজে ওঠে সর্ব দেহে-মনে অনির্বচনীয়ের বাণী"—(দুই বোন)

এই শ্রেণীর নারী—

তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুধাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি'—
দুহাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর আর এক রূপ,—নারীর কল্যাণীমূর্তি।

লক্ষ্মী সে কল্যাণী,—
বিশ্বের জননী তারে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই নারী যেন বর্ষা ঋতু—

"জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, উর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।"—(দুই বোন)

এই নারী—

ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়,
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে—ললিতা, মুরলা ও নলিনী, এই তিনটি নারীচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ললিতা ও মুরলা নাম্নী নারীচিত্র দুইটি দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর। নলিনী প্রথমোক্ত শ্রেণীর। কবি তাঁহার অনেক পরবর্তী কাব্য উপন্যাসের মধ্যে, নাটকের মধ্যে, এই দুই শ্রেণীর নারীর কথা বলিয়াছেন, তাহাদের প্রকৃতি ও প্রেমের আদর্শ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 'চিত্রা' কাব্যের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় নারীর প্রেয়সী রূপ ও দেবীরূপ—উভয়ই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'বলাকা', 'মহুয়া' প্রভৃতি পরিণত বয়সের কাব্যমধ্যেও কবীন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এক নারী বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাহিরে বিকীর্ণ করিয়া দেন,—সেই নারীই প্রেয়সী। অন্যজনা বিশ্বকে শিশিরস্নাত করিয়া অন্তরের মাধুর্যে ফলবান্ করিয়া তোলেন,—এ নারী কল্যাণী, ইনি দেবীরূপিণী। ইঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই কবি বলিয়াছেন—

সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

এবং

তোমার নাহি শীতবসন্ত,
জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তব নিত্য নব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি'
চির বিরাজ করে।

ইনিই উদ্ধত বাসনাকে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরাইয়া আনেন। 'রাজা ও রাণী' নাটকের মধ্যেও কবি এই কল্যাণী নারীমূর্তিরই জয়গান করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে নারীকে কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কামনা লালসার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই প্রেমের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, জীবন ব্যর্থতার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠে।

'ভগ্নহৃদয়' কবির অপরিণত রচনা হইলেও ইহার মধ্যে নীহারিকা অবস্থায় কবির পরিণত বয়সের একটি বিশেষ উপলব্ধির ইঙ্গিতটুকু রহিয়াছে বলিয়াই এ রচনা উপেক্ষণীয় নহে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

কবির কিশোর-কালে সারদাচরণ মিত্র আর অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়েরা 'প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ' নাম দিয়া কতকগুলি বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ করেন। এই বই কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতেন। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার পদ ও অন্যান্য কবিদের মৈথিলী-মিশ্রিত ব্রজবুলির পদ রবীন্দ্রনাথের মনে একটি বোঝা ও না-বোঝা মিলাইয়া আলো-আঁধারি ভাবের রহস্য ঘনাইয়া তুলিতেছিল। তাহার ফলে কবি রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছা হইল যে, তিনি তাঁহার ভাষাকে ঐরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের কাহিনী শুনিয়াছিলেন যে, তিনি প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে, অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। কবি কীট্স্ যেমন মধ্যযুগের ইটালীয় রোমান্স অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; মরিস, রসেটি এবং ব্রাউনিং-দম্পতি যেমন নব্য ইটালীয় কাব্য অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তেমনি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এ সম্বন্ধে কবি নিজের জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

> একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'।

এই রচনাগুলি কিছুদূর অগ্রসর হইলে একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষকে বলিলেন, "সমাজের লাইব্রেরী খুঁজিতে খুঁজিতে বহু-কালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোন প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি।" তাঁহার বন্ধু সেই পদগুলি শুনিয়া বলিলেন, "এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

এই কবিতাগুলি ক্রমে ক্রমে ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে ২১টি পদ আছে, ১৩ নম্বর পদটি প্রথম আশ্বিন মাসের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভারতী'তে মোটে ৭টি পদ প্রকাশিত

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জার্মানিতে ছিলেন। তখন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্যসম্বন্ধে একখানি চটি-বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন, কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।—জীবনস্মৃতি।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাবলীতে কৈশোরক-বিভাগেই অন্যান্য কবিতার শেষে ছাপা হইয়াছিল। কৈশোরকের অন্য কবিতা-গুলিকে আর ছাপিতে না দিলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রতি তিনি নির্মম হইতে পারেন নাই। তবে প্রথম সংস্করণের পরে কতকগুলি কবিতা বাদ দিয়াছেন, কতকগুলির পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন, আর 'কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়' শীর্ষক কবিতাটি নূতন সংযোজন করিয়াছেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রকাশের পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের যে বৎসর জন্ম হয় সেই বৎসরেই, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় বৈষ্ণব কবিতার অনুসরণ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—

যে প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী উদ্‌গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায় অবশ্য তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ভাবাবেশ বঙ্গ-সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তেমন ভাব আর কোথা হইতে উঠিবে? তথাপি ব্রজাঙ্গনার দুই-একটি পদ শ্রবণ করিলে, বহুপূর্বশ্রুত পরিচিত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লিখিবার অধিকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের কাব্য গীতি-মাধুর্য ও ভাবের সম্মিলনে মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। মধুসূদন প্রেমিক হইলেও ভক্ত ছিলেন না। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গীত কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না।

ঐ উক্তি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়া তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতী টুংটাং মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে যে পরিমাণে খেলো প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা যে সেই পরিমাণে খেলো নয়, পাঠকমাত্রেই উহা অবগত

আছেন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যেও অনেক কবিতায় গভীর ভাবাবেগ আছে,—বিশেষ করিয়া যে দুইটি কবিতা 'চয়নিকা'য় ও 'সঞ্চয়িতা'য় পরিগৃহীত হইয়াছে সেই দুইটি—'মরণ' ও 'কো তুঁহু'—অতুলনীয় কবিত্বে ও ভাবমাধুর্যে বিভূষিত।

মরণ

(১৮৮৮ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়)

এই কবিতায় বিরহ-বিধুরা শ্যাম-পরিত্যক্তা রাধা মরণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, "মরণ! তুমি আমার শ্যামের সমান। তোমার বর্ণ মেঘের মতন নবঘনশ্যাম, তোমার জটাজূট যেন মেঘের মতন গুরুগম্ভীর রহস্যঘন, তোমার কর কোমল ও আলোহিত; তোমার অধরও রক্তবর্ণ,—এই রক্তবর্ণ একাধারে তোমার কমনীয়তা কোমলতা এবং নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেছে; তুমি কত হৃদয় নিপীড়ন করিয়া তাহার রক্তে রঞ্জিত হইয়া আছ। তোমার ক্রোড় যাহাকে আশ্রয় দেয়, তাহার সকল সন্তাপ বিমোচিত হয়। তুমি মৃত্যুর ভিতর দিয়া সন্তপ্তকে অমৃত দান করো। অতএব তুমি আমার শ্যামসুন্দরের তুল্য!

"হে মরণ, তোমারই নাম শ্যাম! মাধব আমাকে চিরকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু তুমি আমার প্রতি কখনো বাম হইতে পারিবে না। রাধার হৃদয় আকুলতাতে জর্জরিত হইয়াছে, তাহার দুই নয়ন অনুক্ষণ ঝরঝর করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে; তুমিই আমার মাধব, তুমিই আমার বন্ধু, তুমি আমার সন্তাপ মোচন করো। হে মরণ! তুমি এসো এসো। তুমি আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করো, তাহা হইলে তোমার আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া সুখাবেশে আমার অক্ষিপল্লব মুদ্রিত হইয়া আসিবে, এবং তোমার কোলের উপর রোদন করিতে করিতে আমার সর্বাঙ্গে চিরনিদ্রা ভরিয়া আসিবে! তুমি আমাকে কখনো বিস্মৃত হইবে না, তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না। কারণ, মৃত্যু অবধারিত। সে কাহাকেও ত্যাগ করে না। অতএব তুমি আমাকে নিরাশ করিয়া রাধার হৃদয় ভাঙিয়া দিবে না, বরং তুমি অনুদিন—এমন কি অনুক্ষণ—আমাকে বুকে করিয়া রাখিবে, তোমার স্নেহ যে অতুলনীয়! তুমি দূর হইতে বাঁশী বাজাইয়া অনুক্ষণ আমাকে ডাকিতেছ—রাধা! রাধা! রাধা! আমার

জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, এখন আমি তোমার আহ্বানে অভিসারে যাত্রা করিব, তুমি যে আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছ, তোমার বিরহতাপ আমি ঘুচাইব, আমি এখন কুঞ্জ-পথে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য ধাবিত হইব, আমি কোন বাধা মানিব না।

"এখন গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন, বিশ্ব তিমির-মগ্ন, বিদ্যুৎ বিলসিত হইতেছে, মেঘ ভয়ঙ্কর রব করিতেছে, শাল-তালতরু ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, পথ অতীব ভীষণ, জনহীন (অর্থাৎ, মৃত্যুর পথে ভয়ও আছে এবং সে পথে মানুষকে একাকীই যাইতে হয়), আমি একাকিনীই তোমার অভিসারে যাইব, কারণ যাহার তুমি প্রিয় তাহার আর ভয় কিসের! যে মৃত্যুকে বরণ করিতে যাইতেছে, তাহার তো আর কিছুতেই ভয় থাকে না, বরং সকল ভয় এবং বাধা মৃত্যুরই সখারূপে আমাকে অভয় দান করিবে এবং আমাকে তাহারা মৃত্যুরই পথ নির্দেশ করিবে (অর্থাৎ, পথে যদি সাপ থাকে তাহার দংশনে মৃত্যুই তো আসিবে,—যাহাকে আমি চাহিতেছি! পথে যদি বজ্রাঘাত হয়, তবে সেও তো মৃত্যুরই অনুচর! অতএব জীবনের সকল ভয় ও বাধা মৃত্যুকেই আবাহন করিয়া আনিয়া আমার সঙ্গে মিলিত করিয়া দিবে)। কিন্তু ভানুসিংহ ঠাকুর বলিতেছেন, 'ওগো রাধা, এমন কথা তুমি কেমন করিয়া বলিলে? ছি ছি! তোমার হৃদয় অতি তরল, আমার প্রভু মাধব মরণেরও অধিক প্রিয়তম, তিনি জীবন-মরণকে পরিব্যাপ্ত করিয়াও অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, ইহা তুমি এখন বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখ।' "

প্রিয়ের বিরহে মানুষের জীবন দুর্বিষহ বোধ হয়, ইহার উদাহরণ সকল দেশের সাহিত্যেই আছে।—তুলনীয়—

"She only said, 'My life is dreary,
He cometh not,' she said;
She said, 'I am aweary, aweary,
I would that I were dead.' "

—Tennyson, Mariana

কো তুঁহুঁ

(সম্ভবতঃ ১২৯২ সালে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত)

প্রেমিক বা প্রেমিকা তাঁহার প্রিয়তমকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—তুমি যে কে তাহা আমাকে বলিয়া বুঝাইয়া দাও। তুমি অনুক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত থাক,

আমি যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকে যেন তোমার মোহনমূর্তি দেখিতে পাই, যেন তুমি আমার অক্ষিপল্লবের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছ, আর তোমার অরুণ-নয়নের সঙ্গে আমার মর্মের এমন মিলন ঘটিয়া গেছে যে তাহা এক নিমেষেও অন্তর্হিত হয় না।

আমার হৃদয়-কমল তোমার চরণে টলমল করে, আমার যুগল নয়ন তোমার দর্শন-রসে উচ্ছলিত হইয়া ছলছল করে, আমার প্রেমপূর্ণ তনু তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় পুলকে ঢলঢল করে। তুমি কে, আমাকে বলো।

তোমার বংশীধ্বনি অমৃত ও গরলে মিশ্রিত—চণ্ডীদাস যাহাকে বলিয়াছেন 'কিছু কিছু সুধা, বিষ-গুণা আধা'—তাহা শুনিতে আনন্দ হয়, আবার তোমার সঙ্গে মিলন-লালসে হৃদয় ব্যাকুল ও দুঃখাভিভূতও হয়; সেই বাঁশীর স্বর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া হৃদয় হরণ করিল, তাহার আকুল কাকলি ভুবন ভরিয়া যেন বাজিতেছে, আমার প্রাণ উতলা হইয়া সেই বাঁশীর স্বর অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে। তুমি কে, আমাকে বলিয়া দাও।

তোমারই হাসির শোভায় মোহিত হইয়া মধুঋতু আবির্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ, বসন্তের যে শোভা সে যেন তোমারই হাসির প্রভায় উদ্‌ভাসিত (গীতায় ভগবান্ যেমন বলিয়াছেন যে 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতূনাং কুসুমাকারঃ' তেমনি প্রেমিক দেখিতেছেন—প্রিয়ের হাস্য-প্রভায় বসন্তের শোভা), তোমারই বাঁশীর স্বর শুনিয়া মুগ্ধ কোকিল অনুসরণ করিতেছে, এবং ত্রিভুবন বিকল-ভ্রমর-সমান মুগ্ধ হইয়া তোমারই চরণ-কমলযুগল ছুঁইবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিতেছে। তুমি কে?

বিকশিত-যৌবনা গোপবধূজন, পুলকিত যমুনা, পুষ্পমুকুলে ভরা উপবন, এবং যমুনার নীল জলের উপর সঞ্চরমাণ ধীর সমীরণ সকলেই পলকে তাহাদের প্রাণ-মন তোমারই চরণে বিসর্জন দিতেছে। তুমি কে গো, আমায় বলিয়া বুঝাইয়া দাও।

আমার তৃষিত অক্ষি তোমার মুখের উপরই নিরন্তর বিহার করে, তোমার মধুর স্পর্শ লাভ করিয়া রাধার সর্বাঙ্গ ও মন শিহরিয়া উঠে, প্রেম-রত্ন হৃদয়-প্রাণে পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া আপনাকে তোমার পদতলে স্থাপন করে। তুমি কে, আমায় বলিয়া দাও।

সকল লোকই কেবল এই প্রশ্ন করে যে, তুমি কে? তুমি কে? এবং এই প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অনুদিন সঘন নয়নজল মুছে। ভানুসিংহ এই প্রার্থনা

করিতেছেন যে, সকল সংশয়মুক্ত হইয়া তাঁহার জীবন যেন তাঁহারই চরণে অতিবাহিত হয় এবং তখন তিনি যেন জানিতে পারেন যে, তাঁহার প্রিয়তমের স্বরূপটি কি ?

বাল্মীকি-প্রতিভা

ইহা একখানি গীতিনাট্য। বিলাত হইতে দেশে আসিবার পরে বাংলা ১২৮৭ সালে লিখিত হয়। এই বইয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি স্বয়ং তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে কবি মুরের রচিত একখানি সচিত্র 'আইরিশ্ মেলডীজ' ছিল, তাহাতে একটি বীণা আঁকা ছিল। তাহা দেখিয়া কবির মনে ইচ্ছা হয় যে, তিনি আইরিশ সুর শিখিয়া দেশকে শুনাইবেন। তিনি বিলাতে গিয়া আইরিশ সুর শিখিলেন। দেশে আসিয়া—

> দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দেশী······বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি বৈঠকি গান ভাঙা—অনেকগুলি জ্যোতি-দাদার রচিত গতের সুরে বসানো—এবং গুটি-তিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া।············বিলাতী সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপ-গানে বসাইয়াছি। বস্তুতঃ বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে······য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে। —জীবনস্মৃতি

কবির বিলাত যাইবার আগে হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত, তাহার নাম ছিল 'বিদ্বজ্জনসমাগম'। এই সমাগমের শেষ অধিবেশন হয় কবির বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিবার পরে সম্ভবত ইংরেজী ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বাংলা ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে। সেই সম্মিলন উপলক্ষ্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত হয় এবং অভিনীত হয়। কবি নিজে বাল্মীকি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতী সাজিয়াছিলেন। বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু আছে।

বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়কুমার চৌধুরীর কয়েকটি গান আছে, এবং ইহার

দুইটি গানে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল কাব্যের ভাষা অল্প আসিয়া পড়িয়াছে।

এই নাটিকার বিষয় হইতেছে—রত্নাকর দস্যু দেখিলেন যে এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটিকে বধ করাতে অপরটি শোকার্ত হইয়া মৃত প্রিয়ের জন্য বিলাপ করিতেছে, তখন রত্নাকরের মুখ হইতে শোকের আবেগে যে শ্লোক নির্গত হইল, তাহাতে তাঁহার কবিত্বস্ফূর্তি হইল—দেবী বীণাপাণি সরস্বতীর আবির্ভাব হইল, এবং কবি দেবী বীণাপাণির করুণা লাভ করিলেন।

এই নাটিকার অভিনয় দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। কবির কাছে শুনিয়াছি যে বঙ্কিম-বাবু আনন্দে আসরের মধ্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। গুরুদাস-বাবু সেই সময়ে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহা তিনি সযত্নে রক্ষা করিয়া বহুবৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাঁহাকে টাউন হলে যে সংবর্ধনা করা হয় সেই সভায় পড়িয়া সকলকে শুনাইয়াছিলেন। সেই গানটি এই—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আরো,
অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠেছে নবীন রবি নব জগতের ছবি
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হের' তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের শ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও-ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর'।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সমস্ত গানের স্বরলিপি করিয়া দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কাল-মৃগয়া

ইহা নাটিকা। এই নাটিকাখানি বোধ হয় 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পরে রচিত হয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবনস্মৃতিতে ইহাকে বাল্মীকি-প্রতিভার পূর্ববর্তী বলিয়াছেন। ইহা প্রথম অভিনয় করা হয় ১৮৮২ সালের ২৩এ ডিসেম্বর, অর্থাৎ বাংলা ১২৮৯ সালের ৯ই পৌষ। ইহা ১২৯২ সালে প্রতিভা দেবীর কৃত স্বরলিপির সহিত বালক-পত্রে প্রকাশিত হয়। এখানিও গীতিনাট্য। দশরথ-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ নাট্যের বিষয়। কবির বাড়ীর তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল—ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কবি ইহার পুনঃপ্রকাশ আবশ্যক মনে করেন নাই। এই নাটিকা-রচনা-সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া…গানের সূত্রে নাট্যের মালা।……বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম, সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।…একটা দস্তুর-ভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছবিচার নাই।……এই দুই গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম!"

—জীবনস্মৃতি

এ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—

এই সময় আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র [চৌধুরী] ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্‌সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্মা সিগার টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাকমুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া চুরুটের টুক্‌রাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন, এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া 'হয়েছে হয়েছে' বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন; রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য কচিৎ লক্ষিত হইত।

অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই রীতি। কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা, সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। স্বর্ণকুমারীও অনেক সময়ে আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য-সঙ্গীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা (?) 'কাল-মৃগয়া' গীতিনাট্যে ও তাঁহার দ্বিতীয় রচনা (?) 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল। —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার কাল পর্যন্ত কবি তাঁহার পূর্বজ কবিগণের অনুকরণ করিয়া আসিতেছিলেন কাব্যের ধরণে ও ছন্দে। একটা কোনও আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনা করা, অথবা রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া গীতিকবিতা রচনা বঙ্গের কবিগণের চিরাগত প্রথা ছিল। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সেই প্রকারের গীতিকবিতা। সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশের আগে ঈশ্বর গুপ্তের কিছু খণ্ডকবিতা ও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী ছাড়া উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িকা-নিরপেক্ষ কবিতা কেহ লিখেন নাই।

বাংলা ১২৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাড়ীর তেতলার ছাদের ঘরগুলিতে একাকী বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি একটা শ্লেট লইয়া কবিতা-রচনার বাঁধা দস্তুর পরিহার করিয়া স্বেচ্ছামতো কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। দুই একটা কবিতা লিখিবার পরে তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল, তিনি নিজের প্রতিভার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। এই খেলা করিতে গিয়া তিনি কাব্যের যে নূতন রূপ সৃষ্টি করিলেন, তাহা দেখিয়া তিনি নিজেই চমৎকৃত হইলেন—তিনি বুঝিলেন এই সৃষ্টি তাঁহার একান্ত নিজস্ব। আদিকবি ব্রহ্মা যেমন নিজের মানস-সৃষ্টি সরস্বতীকে দেখিয়া "অহো রূপম্! অহো রূপম্! ইতি প্রাহ পুনঃ পুনঃ",—কবি রবীন্দ্রনাথেরও তেমনি সেদিন নিজের স্বাধীন রচনা দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল। এই সময়ে কবির বয়স ১৯ পূর্ণ। এ সম্বন্ধে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

কিন্তু এমনি করিয়া দুটো-একটা কবিতা লিখতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি

সম্পূর্ণ আমারই।...এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম।...আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্য-হিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্য বেশী না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ও ভাব মূর্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুশি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।

বাংলা ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে বই ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্তু বই প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের আষাঢ় মাসে, ইংরেজী ১৮৮২ সালের ৫ই জুলাই। পুস্তকের পরিচয়-পত্রে বই ছাপা আরম্ভের তারিখই ছাপা হইয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কতক কবিতা কলিকাতার বাড়ীতে ও কতক কবিতা চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক বাগান-বাড়ীতে লেখা।

কবি রবীন্দ্রনাথ এতদিন তাঁহার পূর্ববর্তী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতির ভাব ভাষা ও ছন্দ অনুকরণ করিয়া রচনা করিতেছিলেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতায় তিনি প্রথম সেই অনুকরণের বন্ধন ছেদন করিয়া নিজের ইচ্ছার অনুরূপ ছন্দ ও স্বকীয় ভাব অবলম্বন করেন।

কবি বাল্যকালে বাড়ীর মধ্যে নিতান্ত বন্দী অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—ইহাতে তিনি বাহিরের সহিত নিজের যোগ স্থাপন করিতে না পারিয়া নিজের মধ্যেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই অবস্থাকে তিনি 'হৃদয়-অরণ্য' বলিয়া পরে নির্দেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—

নবযৌবনের আরম্ভে অন্তরে যখন হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অথচ বিশ্বজগতের সহিত তাহার যথোচিত যোগ ঘটিতেছে না—হৃদয়ের অনুভূতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য হয় নাই, তখন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরতা তাহাই সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। মোহিতবাবু তাঁহার সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে এই শ্রেণীর কবিতার 'হৃদয়ারণ্য' নাম দিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে কবি কীট্‌সের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"The imagination of a boy is healthy, and the mature imagination of a man is healthy, but there is a space of life between, in which the soul is in ferment, the character undecided, the ambition thick-sighted."
—Keats, Preface to *Endymion.*

কবি নিজের কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে লিখিয়াছিলেন—

সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে—গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে ......ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে, তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।...আমার কাব্যসংগ্রহে এমন অনেক রচনা স্থান পাইল যাহারা কেবলমাত্র পরিত্যক্ত নদীপথের নুড়িগুলির মতো পথের ইতিহাস নির্দেশ করিবে, কিন্তু রসধারাকে রক্ষা করিবে না।

১৩৩৮ সালে প্রকাশিত 'সঞ্চয়িতা' পুস্তকের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

আমার অল্প বয়সের যে-সকল রচনা খলিত পদে চল্‌তে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছায় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।...বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হ'য়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলির মধ্যে একটা বিষাদের সুর আছে। উদাহরণ-স্বরূপ কতকগুলি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে—সন্ধ্যা, আত্ম-হারা, আশার নৈরাশ্য, পরিত্যক্ত, দুঃখ-আবাহন, হলাহল, পরাজয়-সঙ্গীত ইত্যাদি। মানুষের মনে অবস্থা-বিশেষে একটা আবেগ আসে, যা অব্যক্তের বেদনা, যা অপরিস্ফুটতার ব্যাকুলতা। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মিলে না, সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না, তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। সন্ধ্যাসঙ্গীতে বিশ্বের সঙ্গে যোগের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থার অধীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই অধীরতা তিনি পরের একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি, আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী-মৃগ সম। —উৎসর্গ

এই কবিতাগুলির ছন্দ এলোমেলো, ভাষা ও ভাব অপরিস্ফুট হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কবির আত্মশক্তি আবিষ্কারের ও আত্মপ্রত্যয় লাভের মূল্য অবহেলার সামগ্রী নহে।

কবি তখনও পর্যন্ত নিজের বক্তব্য বিষয়টির সুস্পষ্ট সন্ধান পান নাই। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে মনুষ্যপ্রকৃতিতে যাহা সত্য তাহা আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিবার আকূতিই সন্ধ্যাসঙ্গীতের বিষণ্ণতার কারণ। "সমস্ত জীবনের একটি

-মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনমতে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না।" সামঞ্জস্যকে পাইবার ও প্রকাশ করিবার জন্য আবেগ অসামঞ্জস্যের বেদনারূপে কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

মানুষের সহিত বাহিরের যোগ স্থাপন করে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি। এই দুইয়ের সঙ্গে যোগ-স্থাপনের জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবের জগৎ খোলাই পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কবি নিজেকে মিলাইয়া দিতে পারিতেছেন না। তাঁহার রুদ্ধ হৃদয় অনুভূতি-শক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইজন্যই তাঁহার হৃদয়ের অসন্তোষ ও বিষণ্ণতা তাঁহার এই সময়ের কবিতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে আচার্য স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—

"The singer, indeed, appears to be under the influence of a poetic henotheism, that is to say, the entire universe assumes the hue of the poet's mood, while it lasts, giving rise to a kind of hallucination."

—Sir Brajendranath Seal

কবির এই অসন্তোষ ও বিষাদের কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনী-প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকগণ ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে রবীন্দ্রনাথ তেরো হইতে আঠারো বৎসর পর্যন্ত যে কয়টি কাব্য রচনা করেন—সবগুলিই ট্রাজেডি। ইহারই অন্তে সন্ধ্যাসঙ্গীত ; তাহার মধ্যে বিষাদ-জড়িত হৃদয়ের বেদনা তীব্র।"

"সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ব পর্যন্ত কবি তাঁহার অস্পষ্ট হৃদয়াবেগগুলিকে অন্যের জবানী প্রকাশ করিতেছিলেন—কাব্যের নায়ক-নায়িকার উক্তির মধ্য দিয়া। 'কবিকাহিনী'র কবির ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবির জীবনীতে তরুণ কবির হৃদয়াবেগ ব্যক্ত হইতেছিল, ইহার কারণ তখন বয়স অল্প, নিজের অন্ধ অস্পষ্ট আবেগ তখন মূর্তি গ্রহণ করে নাই, ভাষা পায় নাই, প্রকাশের সাহস পায় নাই। 'বনফুল' হইতে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত কাব্যোপন্যাসগুলি ও 'শৈশবসঙ্গীতে'র কবিতাগুলি সন্ধ্যাসঙ্গীতের সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; ইহাদের মধ্যে ভাবের বিচ্ছেদ টানা কঠিন, যথার্থ পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বলিবার ভঙ্গীতে—সে-ভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব।" —রবীন্দ্র-জীবনী

ইহাকে কবি তাঁহার হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের আকুতি বলিয়াছেন, এবং সেইজন্য মোহিত-সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীতে এই জাতীয় কবিতাগুলিকে 'হৃদয়-অরণ্য' এবং 'নিষ্ক্রমণ' নামের পর্যায়ে ফেলা হইয়াছিল।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায়—১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ—'যথার্থ দোসর' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' মনোভাবের তত্ত্বটি পাওয়া

যায়।[১] 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই কবি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র 'সুখের বিলাপ' নামক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ কবিতাটি ১২৮৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী কালে কবি যদিও এই কাব্যখানি অপরিণত মনের ও কাঁচা হাতের রচনা বলিয়া বর্জন করিতে চাহিয়াছেন, তথাপি এই কাব্য পাঠ করিয়া তখনকার কালের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে নিজের গলার ফুলের মালা রবীন্দ্রনাথকে পরাইয়া দিয়া সংবর্ধনা করিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমবাবুর কাছে প্রশংসা ও প্রশ্রয় পাওয়া এমনই দুর্লভ ছিল যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পরে ঐ ফুলের মালা পাওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তদপেক্ষা উচ্চতর পুরস্কার আর এ জীবনে প্রত্যাশা করিতে পারিব না।" (সাধনা, ১৩০১ বৈশাখ—দ্রষ্টব্য—জীবনস্মৃতি ও রবীন্দ্র-জীবনী[১])

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারা কবি একজন সাহিত্যরসিক বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন,—তাঁহার নাম প্রিয়নাথ সেন। তাঁহার উৎসাহে কবির সাহিত্য-সাধনা অগ্রসর ও জয়যুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার প্রতি কবির শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতা জীবনস্মৃতিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের মাত্র একটি কবিতার একাংশ কবি তাঁহার সঞ্চয়িতায় স্বীকার করিয়াছেন। চয়নিকায় কিন্তু অন্য দুটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। আমরা সেই তিনটিকেই ব্যাখ্যা করিব।

সন্ধ্যা

(সম্ভবতঃ ১২৮৮ সালে বিরচিত)

কবি সন্ধ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে,—আমি যখন তোমার কাছে আসিয়া বসি, তখন শিশু-জগৎকে ঘুম পাড়াইবার গান আমি শুনিতে পাই, কিন্তু তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি না। আমার মনের মধ্যে অতি দূর-দূরান্তের উদাসী প্রবাসী কাহার যেন কণ্ঠস্বর শুনি, সে তোমার স্বরে স্বর মিলাইয়া গান গাহে। মানুষমাত্রেই অনন্ত-পথযাত্রী। সে কেবল বিশেষ স্থানে ও কালে অতিথি মাত্র। সে যখন সেই অনন্তকে অন্তরে ধারণ করিতে পারে না, তখন সে অস্বস্তি অনুভব করে।

[১] রবীন্দ্র-জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কত কালের কত কাহিনী, কত কবির কত বিস্মৃত গান, কত প্রণয়ীর প্রণয়সম্ভাষ গুপ্ত হইয়া সে অন্ধকারকে পূর্ণ করিয়া আছে। সন্ধ্যার বিজনতায় বসিলে সেই সকল কথা কবির মনে পড়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বসিলে কবির মনে কত অতীতের স্মৃতি ফুটিয়া উঠে। ঠিক ঐভাবে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনে কোকিলের কুহুরব চিন্তারাজ্য উন্মুক্ত করিয়া দিত—

"And unto me thou bring'st a tale
Of visionary hours"—Wordsworth, *To the Cuckoo.*

কবি সন্ধ্যাকে বলিতেছেন যে তিনি তো কবি, তিনিও কত গান গাহিবেন। সেইসব গান যদি কেহ সমাদর করিয়া নাই শুনে, তাহারা যদি জগতে অমরত্ব নাই পায়, তথাপি তাহা তো একেবারেই হারাইয়া যাইবে না—বিস্মৃতির ভাণ্ডারে যেখানে দেশ-দেশান্তরের ও কাল-কালান্তরের কত কত কবির গান ও দার্শনিকের চিন্তা সঞ্চিত আছে, সেই ভাণ্ডারেই তাঁহার গানের স্থান হইবে।

এই কবিতায় কবি বলিতে চাহিতেছেন যে, বিজ্ঞান যে বলিয়াছে Matter is indestructible—তাহা কেবল জড়ের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য নহে, ভাব সম্বন্ধেও তাহা প্রযুজ্য—বলা যাইতে পারে যে Thought also is imperishable. ইহা বালক-কবির কল্পনা নহে, বৈজ্ঞানিক সত্য—

"The air itself is one vast library, on whose pages are for ever written all that man has ever said or ever whispered."—Jevons, *Principles of Science.*

এই কথা কবি পরে 'চিত্রা' পুস্তকের অন্তর্গত 'সাধনা' নামক কবিতায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে সেই কবিতাটি দ্রষ্টব্য। রবার্ট ব্রাউনিং এইরূপ কথা বলিয়াছেন—

"All we have willed or hoped or dreamed of good, shall exist."
—Robert Browning, *Abt Vogler*

তারকার আত্মহত্যা

(১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়)

একটি তারকা খসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কবির মনে হইল—তারকা মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিবার জন্য উত্তুঙ্গ স্থান হইতে অন্ধকারের মহাগহ্বরে

ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তারকা তাহার একঘেয়ে সুখময় জীবনে ক্লান্ত হইয়া—কেবল জ্বালায় জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া—অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়া হাসি নিভাইয়া ফেলিতে গেল। যেমন অঙ্গার তাহার অন্তরের দুঃখ-কালিমা লুকাইবার জন্য কেবল হাসির জ্বালায় জ্বলে, তেমনি ঐ তারকার অন্তর্দাহ তাহার হাসি হইয়া ফুটিয়াছিল। সে তো চিরনির্বাণের দেশে চলিয়া গেল, তাহার অভাব কেহ বোধ করিল না। কিন্তু সে তো তাহার অভাব বোধ করাইবার জন্য আত্মবিনাশে উদ্যত হয় নাই, সে কেবল নিজের হাসির যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নির্বাণ লাভ করিতে গিয়াছে।

ইহার সহিত জর্জ্ ডার্লির একটি কবিতা তুলনীয়—সেই কবিতাতেও তারকার পতন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্খলন দেখিয়া তাহার সঙ্গী তারকারা তাহাকে উপহাস করে নাই, বরং তাহার বেদনায় সহানুভূতি ও মমতা প্রকাশ করিয়াছে—

THE FALLEN STAR

A star is gone! a star is gone!
There is a blank in Heaven;
One of the cherub choir has done
His airy course this even.

He sat upon the orb fire
That hung for ages there,
And lent his music to the choir
That haunts the nightly air.

But when his thousand years are pass'd,
With a cherubic sigh
He vanished with his car at last,
For even cherubs die!

Hear how his angel-brothers mourn—
The minstrels of the spheres—
Each chiming sadly in his turn
And dropping splendid tears.

* * *

—George Darley (1795-1846)

দৃষ্টি

ইহা সন্ধ্যাসঙ্গীতের শেষ কবিতা 'উপহার'-এর ভগ্নাংশ। ইহাতে কোনো প্রেমিক তাহার প্রণয়িনীকে বলিতেছে যে, সে একদিন তাহার হৃদয়ের সন্নিকটে আসিয়া আজ দূরে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই যে সে তাহাকে তাহার হৃদয়ের পরিচয় তাহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া দিয়া-গিয়াছে, তাহার সেই দৃষ্টি দেখিলে তাহার শূন্য স্মৃতি-মন্দিরে আনন্দের আলোক জ্বলিয়া উঠে।

পাষাণী

এই কবিতায় কোনো প্রেমিক বলিতেছে যে, জগতের সমস্ত বস্তুই করুণা প্রকাশ করে, কেবল তাহার প্রণয়িনীই কঠিন পাষাণী; জগতের করুণা-ধারায় তাহাকে অভিষিক্ত করিলে, তবে যদি তাহার হৃদয় কোমল হয়।

প্রভাতসঙ্গীত

সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার পরে কবি চন্দননগরের বাগান-বাড়ীতে কিছু কিছু গদ্য রচনাও করিতেছিলেন, সেগুলি 'আলোচনা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই সময়েই তিনি 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

ইহার পরে কবি তাঁহার জ্যোতি-দাদার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। যাদু-ঘরের পাশ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই 'সদর স্ট্রীট্'-এর একটি বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন। একদিন প্রভাতে সূর্যোদয় দেখিতে দেখিতে কবির মনে হইল—

আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।

এই দিন হইতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার কাছে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইল, এবং সমস্ত মানবের মধ্যে তিনি একটি অনির্বচনীয় মহিমা উপলব্ধি করিলেন। সেই অনুভবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন যে—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।

আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া কবি বিশ্বকে দেখিলেন।

মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে এই-সমস্ত কবিতাকে 'নিষ্ক্রমণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন—'প্রভাত-সঙ্গীতেই কবির সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত আছে।' বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যসাধনার ও জীবনের মূল সুর হইতেছে এই নিষ্ক্রমণ—সীমা উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া চলা, কোথাও স্থাবরত্ব স্থবিরত্ব স্বীকার না করা।

প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলি সূত্রপাত হয় বোধ হয় ১২৮৮ সালে, এবং পুস্তকাকারে ছাপা হয় ১২৯০ সালে, ১৮০৫ শকে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১২৮৯ সালের আশ্বিন হইতে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত প্রভাতসঙ্গীতের পাঁচটি কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। উহাই হইল প্রভাতসঙ্গীতের যুগ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে যেমন বিশ্বের সহিত য়োগের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থার অস্থিরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি প্রভাতসঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যোগের আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের বিষাদময় অন্ধকার অবরুদ্ধতা কবির আর ভালো লাগিতেছিল না। কবির মহৎ উদার অপর্যাপ্ত প্রাণ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ, সুখ-দুঃখ ও দুর্বলতার মধ্যে প্রকৃতির সহজ আনন্দের অভাব দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তাই প্রভাতসঙ্গীতে দেখি, কবি প্রকৃতির মধ্যে ও মানব-সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি খুঁজিতেছেন। প্রভাতসঙ্গীতে প্রকৃতির আহ্বান প্রবল হইয়া কবির সুকোমল প্রাণকে বিহ্বল করিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি প্রকৃতিকে মানবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রভাতসঙ্গীতে ইহার বিপরীত সুর—এখানে মানবকে প্রাকৃতিক ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়া বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া কবি এক অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছেন। কবির কুঞ্চিত হৃদয় প্রকৃতির প্রসারতা ও স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কবি এখন বলিতেছেন যে, প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কবি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইলেন এই প্রভাতসঙ্গীতে। তাঁহার কবিতার মধ্যে যে একটি বিশেষ বাণী আছে, বিশেষ ভঙ্গি আছে, তাহা কবি এখন জানিতে পারিলেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতের সময়ে কবির মন নৈরাশ্যে পূর্ণ ছিল; কেমন করিয়া আরো ভালো কবিতার আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহারই চিন্তায় তিনি বিভোর ছিলেন। প্রভাতসঙ্গীতে কবির প্রতিভা অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়গুহা ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিভা আলো-বাতাসের মুক্ত জগতে বাহির হইয়া আসিল। প্রকৃতির আহ্বানে প্রথম জাগরণের উদ্দাম সাড়া 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' অপূর্ব ছন্দে ও গানে স্রোতস্বিনীর ন্যায় গলিয়া বহিয়া ছুটিয়াছে।

সীমাবদ্ধ কবি-মন অকস্মাৎ অসীম বিশ্বপ্রকৃতির আভাস অনুভব করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি সেই অনন্ত অসীমকে অনুভব ও উপলব্ধি করিবার জন্য গীতময় আনন্দময় স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবন পাইতে চাহিতেছেন।

দিন ও রাত্রি যথাক্রমে কর্ম ও বিরামের প্রতীক। দিনের বেলায় সমস্ত জ্যোতিষ্কলোক আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়, তখন এক পৃথিবী ছাড়া আমাদের গোচরে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীটাই যায় লুপ্ত হইয়া বা গুপ্ত হইয়া, আর অনন্ত জ্যোতিষ্ক-জগৎটাই অধিক উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। যখন সন্ধ্যা দিবসের আলোক নির্বাণ করিয়া দিয়া বিশ্রাম

দিতে আসে, তখন এই পৃথিবীটাকে হ্রাস করিয়া দেওয়াই দরকার, তখন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বিরাট্‌ যোগ আছে তাহাকেই বড় করিয়া দেখা চাই। আবার প্রভাতে উঠিয়া জানা চাই যে আমরা পৃথিবীর মানুষ, সমগ্র পৃথিবী আমার স্বদেশ, ও সমস্ত মানব আমার স্বজন। দিন অবসান হইয়া আসিলে অনুভব করা চাই আমরা জগৎবাসী, বিশ্বচরাচর আমার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই তথ্যটি কবির সন্ধ্যাসঙ্গীত ও প্রভাতসঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রভাতসঙ্গীতের কবিতা সম্বন্ধে কবির নিজের অভিমত এই—

প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়াছে।
(গ্রন্থাবলীর ভূমিকা)

প্রভাতসঙ্গীতের মধ্যে 'পুনর্মিলন' নামে যে কবিতাটি আছে, তাহাতে কবির জীবনের দুইটি অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়—

(১) কবি শৈশব ও কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন নিজের হৃদয়ভাবের জটিলতায় নিজে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন—

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা;
তারি মাঝে হনু পথহারা।

ইহা তাঁহার 'হৃদয়-অরণ্য' বা 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র যুগ।

(২) ইহার পরে হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণ—

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

ইহা হইল কবির 'প্রভাতসঙ্গীতে'র যুগ—প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলনের যুগ। কবি শৈশবে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের প্রকৃতির সহিত যে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নানা বিক্ষেপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এখন আবার তাহা পুনঃস্থাপিত হইল।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

(১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত)

প্রভাতসঙ্গীতে কবি তাঁহার অন্তরকে বাহিরে প্রসারিত করিয়াছেন। বিশ্ববোধের আনন্দ হইতে ইহার উদ্‌ভব। কবির অন্তর্গুহায় যে তীব্র আবেগ সঞ্চিত হইতেছিল, বিশ্ব-সংসারে হৃদয়-মনকে প্রসারিত ব্যাপৃত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা যে চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিল, সেই উদ্দাম বৃহৎ আবেগের প্রতীক হইতেছে নির্ঝর। যে মহতী বাণী 'প্রভাতসঙ্গীতে'র অন্তর্নিহিত হইয়া আছে, তাহাকে এই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। নিজের স্বার্থের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রধাবিত হওয়াই কবির অন্তরের সাধ; কবিপ্রতিভার সার্থকতা তাহাতেই। আমাদের চারিদিকে,—মাথার উপরে, চক্ষুর অগোচরে কত জ্যোতিষ্কের পরিবর্তন চলিতেছে, জগতে প্রাণ-লীলার কত কত পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার সহিত সমান তালে যদি মনোলোকেও গতিপ্রবাহের অগ্রগমন না থাকে, তবে কবির জীবন বৃথা। কবি তো এই বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানব-মনকে প্রবাহিত করিয়া দিবার কর্তব্য স্বীকার করিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই যে আন্তরপ্রেরণা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতেই তিনি সঙ্কল্প করিতেছেন যে, তিনি আর স্ব-কে লইয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন না, তিনি তাঁহার প্রাণ-মন-শক্তিকে বিশ্বে বিস্তারিত করিয়া দিবেন এবং যে প্রাণশক্তির ধারা জগৎ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিপ্রতিভারই আত্মজীবনচরিত; ইহা কবিপ্রতিভারই স্বপ্নভঙ্গ বা জাগরণ। ইহার মধ্যে এক বিপুল কবিপ্রাণ, সহৃদয় সহানুভূতি ও সহমর্মিতা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার যে বিশেষত্ব পরবর্তী কালে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সেই সর্বপ্লাবিনী ঐকান্তিকী ভাবগতি ও বিশ্বানুভূতি এই কবিতার মধ্যে প্রথম উন্মেষ লাভ করিয়াছে।

নির্ঝর পূর্বে গিরিগহ্বরে কঠিন বরফ হইয়া বদ্ধ ছিল, বাহিরের জগতের সহিত তাহার কোনো যোগ বা সম্বন্ধ ছিল না, তাহার কোন গতিশক্তিও ছিল না। সহসা সেখানে রবিরশ্মিরেখা বা নবপ্রেরণা প্রবেশ করাতে হঠাৎ তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল, এবং সে বাহিরের জগতের প্রাণ-আনন্দ-আশা-আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট

ভাবে অনুভব করিল। প্রভাতের সূচনায় যখন উষার আলোক-বিকাশ হয় নাই, তখনই আলোকের আগমনের পূর্বাভাস পাইয়াই পাখীরা জাগিয়া উঠে ও গান গাহিয়া সেই নবারুণের অভ্যুদয়কে অভ্যর্থনা করে; নির্ঝরের কারাগারে সেই বাহিরের আনন্দবার্তা আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

এখন সে কেবলমাত্র প্রকাশ পাইতে চায়, বাহিরের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে চায়। তাহার অন্তর-আবেগে কঠিন শিলা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতেছে; পর্বত বিদীর্ণ করিয়া বিহ্বল হইয়া সে জগৎমাঝারে প্রবাহিত হইয়া যাইতে চায়।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার ভাষা চঞ্চল, ছন্দ দ্রুত বহমান, হঠাৎ-মুক্তির উল্লাস ও চাঞ্চল্য ছন্দে ও ভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছে; হঠাৎ-মুক্তির আনন্দ, আগ্রহ ও তীব্র উৎসাহ নির্ঝরের গতিবেগে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈশ্বর অনন্ত সর্বব্যাপী, কিন্তু নির্ঝর বা কবির প্রাণশক্তি সীমাবদ্ধ। তাই কবি জানিতে চাহিতেছেন যে, ঈশ্বর নিজে অনন্ত অসীম হইয়া মানবকে কেন প্রথা আচার সংস্কার ইত্যাদির সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! পরমুহূর্তেই কবি বলিতেছেন যে—মানব-হৃদয়কে সেই বন্ধন ছেদন করিতে হইবে। মানবের যে প্রাণ আছে, তাহার যে প্রাণশক্তি আছে, তাহার পরিচয় দিতে হইবে সকল গণ্ডির সীমা লঙ্ঘন করিয়া। কারণ, প্রাণের লক্ষণই হইতেছে গতি ও পরিবর্তন, আর জড়ের লক্ষণ স্থিতি ও স্থাবরতা। নির্ঝরকে প্রাণের সাধনা করিতে হইবে, ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়া গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া চলিতে হইবে। যখন প্রাণে প্রেরণা ও উল্লাস আসে, তখন আর অন্ধকারে পাষাণ-কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকা যায় না,—তখন আর কোনো ভয়ও থাকে না; সে বিগত-ভী হইয়া সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

কবি এখন এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের, এক জাতির সহিত আর এক জাতির মৈত্রী স্থাপন করিবেন—নদী যেমন তাহার করুণা-ধারা দেশে দেশে বহন করিয়া লইয়া সকলের তৃষ্ণার পানীয় জোগায়, সকলের মলিনতা ধৌত করে, ভূমিতে উর্বরতা দান করে, এক দেশের সম্পদ্ অপর দেশে উপনীত করে, এক জনপদের সংস্কৃতি অপর জনপদে বিতরণ করে, কবি তেমনি নিজের দেশের ভাবসম্পদ্ আর এক দেশে লইয়া যাইতে চাহেন, এক দেশের সহিত অপর দেশের সংস্কৃতির আদানপ্রদান করিয়া মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। বাস্তবিক তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে; তিনি ভারতের সহিত পৃথিবীর সকল সভ্য

দেশের যোগ স্থাপন করিয়াছেন, অন্যান্য দেশের জ্ঞান-সংস্কৃতি ভারতে আনিয়া শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং আমাদের বুদ্ধিকে সতেজ ও প্রমুক্ত করিয়া তুলিয়া আমাদের বহু অচলায়তন ভঙ্গ করিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া পাগলের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কবির সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

নির্ঝরের উচ্চ হইতে নিম্নে পতনের ধারা যেন সুন্দরীর আলুলায়িত কেশ-কলাপ। নির্ঝর যখন ঝরিয়া পড়ে, তখন যেমন তাহার তীরবর্তী তরুলতা হইতে ফুল খসিয়া তাহার স্রোতে পড়ে, তেমনি কবি জগতের সমস্ত সুন্দর সামগ্রী স্বদেশের জন্য আহরণ করিতে করিতে চলিবেন। নির্ঝর যখন বারিশীকর বিকীর্ণ করিয়া ক্ষরিত হয়, তখন যেমন তাহার উপর রবিরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া রামধনুর বর্ণবিভঙ্গ বিচিত্র সুষমায় প্রতিচ্ছুরিত করে, তেমনি কবিও জগতের সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধির ও সংস্কৃতির আলোক বিচ্ছুরিত করিবার ব্রতে নিজের প্রাণধারাকে উৎসর্গ করিবেন।

কবি দেশ-দেশান্তরে নব নব বার্তা বিতরণ করিয়া চলিবেন, তাঁহার প্রাণের অফুরন্ত সম্পদ্ তাহাতে নিঃশেষ হইবে না। ভাবের প্লাবনে ও ভাবের প্রাচুর্যে বর্ষা ও বসন্তের আগমনে নির্ঝরের ন্যায় তাঁহার চিত্ত আনন্দে ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইবে। ভাবাবেগে কবির মন উল্লসিত, তাই এই কবিতার সুর আনন্দময়। প্রকৃতির প্রাণশক্তির আবেগ কবি নিজের প্রাণে পূর্ণ ভাবে অনুভব করিতেছেন।

কবির নিকট দুইটি বস্তু সত্য—প্রাণ ও প্রকৃতি। কবির অন্তরে অনন্ত পিপাসা। বাহিরের জগতের অনন্ত সৌন্দর্য ও প্রাণলীলা কবিমনের সেই পিপাসা মিটাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। সেই জন্য কবি সমস্ত প্রাণমন লইয়া চরাচরময় পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইতে চাহিতেছেন।

কবির সংরুদ্ধ প্রতিভা-নির্ঝরিণী আজ অনন্তের মহাসাগরের ডাক শুনিতে পাইয়াছে। বৃহৎ সর্বদাই ক্ষুদ্রকে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে, বিশ্বাত্মা সর্বদাই ব্যক্তিকে আহ্বান করিতেছে, পরমাত্মা সর্বদা জীবাত্মাকে আহ্বান করিতেছে। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে মানব কেন তাহার চারিদিকে কারাগারের প্রাচীর তুলিয়া বন্দী হইয়া থাকে? সমস্ত বাধা, সমস্ত সংস্কার ক্ষুদ্রতা ও সমস্ত স্বার্থপরতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কঠিনকে রসসিক্ত করিয়া, বনের ন্যায় গহন জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুন্দর করিয়া,—যে-সকল চিত্ত-মুকুল বিকাশোন্মুখ তাহাদিগকে

প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়া, সকলের হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া তোলাই হইতেছে কবির জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। তাই কবি সকলকে তাঁহার উদার মহাপ্রাণতায় পরিতৃপ্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। (দ্রষ্টব্য—'সোনার তরী' পুস্তকে 'হৃদয়-যমুনা' কবিতা)।

কবি নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়া বাহির হইবেন, অনন্তের মধ্যে মহাসাগরের বুকে নির্ঝরের ন্যায় তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া নিজের কবিত্বের মর্যাদা রক্ষা করিবেন। অতএব জীবনে সকল বাধা ভঙ্গ করিয়া তিনি অগ্রসর হইবেন, তাঁহার প্রাণে নব প্রেরণা আসিয়াছে, জগতের জাগরণের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ব্যক্তি সমাজ জাতি—ইহাদের কেহই অনন্তকাল সুপ্তির ঘোরে মগ্ন থাকিতে পারে না। প্রকৃতির বিধানে বাহিরের আঘাতে ও আহ্বানে একদিন তাহার মোহমূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়, একদিন তাহার লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসে, একদিন তাহার আত্মবিস্মৃতির অবসান ঘটে। আবার এই জাগরণের সঙ্গে-সঙ্গেই সে আপন প্রাণের মুখ্য আকাঙ্ক্ষার ভাববস্তুটিকে রূপায়িত করিতে এবং উভয়েরই মহিমা প্রচার করিতে প্রয়াসী হয়। তখন ইহাই হয় তাহার জীবনের ব্রত এবং এই ব্রতের উদ্‌যাপনেই তাহার জীবনের সার্থকতা। প্রাণের আবেগে এই ব্রতধারী তখন অন্যমনা হইয়া যাবতীয় বাধাবিঘ্ন নির্মম করে অপসারণ করিয়া উদ্দাম গতিতে সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং সিদ্ধিলাভের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আপন গতি অক্ষুণ্ন রাখে।

এই কবিতার মধ্য দিয়া কবি-গুরু এই চিরন্তন সত্যটিকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে আপন হৃদয়-নিহিত আশা-আকাঙ্ক্ষার অপরূপতার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছেন।

কবি আজ জাগ্রত—আজ তাঁহার হৃদয়ে মহামানবের মুক্তির আহ্বান প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই আহ্বান আজ তাঁহার প্রাণে এক অভিনব আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে—সেই হেতু তিনি ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণতার সীমারেখা নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া অনন্তপ্রসারী বিশ্বপ্রাণের সহিত একীভূত হওয়ার বাসনা করিতেছেন। ইহাই তাঁহার মুক্তি, আর বিশ্বপ্রেমই এই মুক্তির একমাত্র সাধনা।

জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) বলিয়াছেন যে, মানবসত্তা সতত নিজের সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইবার সাধনা করিতেছে। সেই ভাবটি এই প্রভাতসঙ্গীত রচনার যুগ হইতেই কবির অন্তরে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল।

ফাউস্ট নির্ঝর দেখিয়া বলিয়াছিলেন—ইহাই তো মানবশক্তির প্রতিচ্ছবি। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে—এই রঙীন প্রতিবিম্বই আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছায়া।

এ সম্বন্ধে কবি অনেক পরে লিখিয়াছেন—

উপনয়নের সময়ে গায়ত্রী-মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল।······এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হতো বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক অন্তরীক্ষ, আমি তারি সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন, তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।······ তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত।······যখন বয়স হয়েছে, হয়তো আঠার কি উনিশ হবে, বা বিশও হ'তে পারে, তখন চৌরঙ্গীতে ছিলুম দাদার সঙ্গে।······তখন প্রত্যূষে ওঠা প্রথা ছিল।······সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসায় বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম।······চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য উঠ্‌ছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হলো গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হলো মানুষ আজন্ম এই আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হ'লে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খ'সে পড়্‌ল। মনে হলো সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখ্‌লেম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখ্‌লেম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলেছে। তাদের দেখে মনে হলো কি অনির্বচনীয় সুন্দর! মনে হলো না তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখ্‌লুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ। সুন্দর কাকে বলি? বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ, তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ-ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর,—যে মানুষ, তার কাছে—কেবল পাপ্‌ড়ি না, বোঁটা না,—। একটা সমগ্র, আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।······আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হলো এই মুক্তি।······সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল······তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে ভাব আমাকে আবিষ্ট করেছিল, তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার এই সময়কার কবিতাতে—'প্রভাতসঙ্গীতে'র মধ্যে। তখন স্বতঃই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে, তাই ধরা পড়েছে 'প্রভাতসঙ্গীতে'।······

······আমাদের একদিক্ অহং, আর একটা দিক্ আত্মা। 'অহং' যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম মামলা-মোকদ্দমা, এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সে আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বল্‌তে যে বিরাট্ পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন! আমারই মধ্যে দুটো দিক্ আছে—এক, আমাতেই বদ্ধ; আর-এক

সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি, তখন আমরা মানব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট্ পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হ'য়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধ হ'য়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলেম, এটা অনুভব কর্‌লেম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন, সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি, দুঃখ, ক্ষতি, সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে, তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে এই অহং-এর খেলার মধ্যে বন্দী ছিলেম। এমনি ক'রে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলেম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখিনি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর, ইত্যাদি······

এটা হচ্ছে সেদিনের কথা, যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এলো বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হ'য়ে প্রবাহিত হবার জন্যে, অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান্ বিরাট্ সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট্ পুরুষ। সেই যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই যে ডাক পড়্‌ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল, এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার ক'রে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কি জানি কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল।......এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি 'মহামানব'। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেল্‌বারই এই ডাক।

—মানব-সত্য, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪০। মানুষের ধর্ম, ১০৫ পৃষ্ঠা ও পরে।

এই কবিতার সহিত তুলনীয়—নদীস্তুতি,—ঋগবেদ ১০।৭৫; রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' পুস্তকের মধ্যে 'নদী' কবিতা; টেনিসনের Brook, রবার্ট সাদির 'How the Water Comes Down at Ladore.'

প্রভাত-উৎসব

(১২৮৯ সালের পৌষ মাসে প্রকাশ)

অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-জীবনের সাধনা—সর্বানুভূতিই তাঁহার কাব্যের মূল সুর; ভাবব্যাপ্তি, বিশ্ববোধ ও বিশ্বের সহিত আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করাই কবিচিত্তের বিশেষত্ব। কবির চোখের সামনে জগতের যে আনন্দ ও সৌন্দর্যের মূর্তি সুন্দর ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই বিবরণ আমরা পাই 'প্রভাত-উৎসব' কবিতায়।

কবিজীবনের নবপ্রভাতের শুভক্ষণে কবির হৃদয়দুয়ার খোলা পাইয়া সমস্ত ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কার দূর হইয়া গেল, এবং বিশ্বপ্রেম কবির হৃদয় অধিকার করিল—জগৎব্রহ্মাণ্ড আজ তাঁহার পরমাত্মীয়, তিনি আজ বিশ্বসত্তায় নিমজ্জিত। মানুষ নিজের জন্য কাঁদে, পরের জন্য হাসে। কান্না মানবজীবনের আত্মপরায়ণতার পরিচায়ক; কান্না মানুষের অসহায় অবস্থার জ্ঞাপক। আর হাসি মনুষ্যহৃদয়ের সামাজিকতা ও পরপরায়ণতার সূচনা করে। সেইজন্য, মানুষ যখন নিজের স্বার্থ-হানি লইয়া কাঁদে, তখন তাহা সে গোপন করিতে প্রয়াস পায়; তাহার কান্নার মধ্যে একটি লজ্জা-সঙ্কোচ লুকানো আছে; তাহার কান্নার সময়ে যদি কেহ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে, তবে সে তাড়াতাড়ি অশ্রুজল মোচন করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। কবির প্রাণের ক্ষেত্রে যত সব নরনারী সমবেত হইয়াছে, তাহারা সকলে গলাগলি করিয়া হাসিতেছে,—অর্থাৎ সকলে স্বার্থ-পরতা বিস্মৃত হইয়া পরার্থপরতায়, প্রেমে, সৌহৃদ্যে নিমগ্ন হইয়াছে। শিশুরা পর্যন্ত কবিমানস হইতে বাদ পড়ে নাই, তিনি যে সবারই সমানবয়সী। তাঁহার অন্তরে

সখাসখীর প্রেম, ভাইবোনের প্রীতি, মাতা ও সন্তানের স্নেহ একত্র হইয়া উদয় হইয়াছে। ইহার জন্য তাঁহার প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রেমের আহ্বান শুনিয়া বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্বপ্রকৃতির সমস্তই আসিয়াছে, কেহই বাদ পড়ে নাই। এমন কি, যে জ্যোতিষ্কমণ্ডল রাত্রিতে পৃথিবীর নিদ্রাকালে নিদ্রিত প্রাণীদের মাথার উপরে নির্নিমেষ নয়নে জাগ্রত থাকে, তাহারাও তাঁহার মন হইতে বাদ পড়ে নাই।

একই সত্যস্বরূপ ভগবান্, বিশ্বনিখিলকে প্রাণরূপে শোভারূপে আনন্দরূপে মঙ্গলরূপে ধারণ করিয়া আছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—আমার মধ্যে যে সত্য ও সত্তা আছে বিশ্বের মধ্যেও তাহাই বিদ্যমান, এই কথা কবি অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য তিনি 'প্রভাতসঙ্গীতে'র মধ্যে 'স্রোত' নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ।
জগতে প্রাণে মিলি' গাহিছে এ কি গান।

এই বিশ্ববোধ যেই কবির প্রাণে উদয় হইল, অমনি কবির মনে এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় ভাবাবেশে উতলা হইয়া উঠিল। তিনি এই অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দকে চিনিতে না পারিয়া বলিতেছেন—কী জানি হ'ল এ কী! তিনি সকলকে এখন 'সখা' 'ভাই' বলিয়া আহ্বান করিতেছেন এবং সমস্ত প্রাণের মধ্যে একটুও ফাঁক কবি তাঁহার স্বার্থের জন্য না রাখিয়া সকলকে প্রাণময় জুড়িয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

জীবনপ্রভাতে সমস্তই মধুময় বলিয়া কবির মনে হইতেছে—যেমন একদিন বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ নঃ সন্তোষধীর্ মধু-নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌর্ অস্তু নঃ পিতা, মধুমান্ নো বনস্পতির্ মধুমাংস্তু সূর্যো মাধ্বীর্ গাবো ভবন্তু নঃ,—তেমনি এই কবি সমস্ত মধুময় দেখিতেছেন। তিনি বায়ুকে আহ্বান করিতেছেন তাঁহার প্রাণের হর্ষ ও উদার প্রেম জগতে সমীরিত করিয়া দিবার জন্য। বায়ু জগৎপ্রাণ, সে কবির প্রাণশক্তিকে জগতে প্রসারিত করিয়া দিবে, ইহাই কবির কামনা।

কবির প্রাণের ঐশ্বর্য এমন প্রচুর বোধ হইতেছে যে, তিনি পৃথিবী প্লাবিত করিয়াও উদ্বৃত্ত দ্বারা আকাশকে পর্যন্ত আচ্ছাদিত করিতে পারিবেন মনে করিতেছেন।

তিনি রবির হিরণ্ময় রথে আকাশপারাবার পার হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কোনও মহাজ্ঞানী বা মহারাজ যেন তাঁহাকে উপহাস

না করেন; তাঁহারা মনে না করেন যে, আমি মহাজ্ঞানী, আমি আমার মহাজ্ঞানের মধ্যে অসীম জগতের কূল পাইলাম না। আমি মহাসম্রাট্ সার্বভৌম, আমার রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না,—তথাপি আমি এই পৃথিবী নিঃশেষে জয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না; আর তুমি কোন্ সামান্ত মানব হইয়া পৃথিবী উত্তীর্ণ হইয়া আকাশ পর্যন্ত জয় করিতে—অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছ, এ তোমার কি বাতুলতা! কিন্তু তাঁহারা যদি একবার অনুধ্যান করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা কবির বৃথা অহঙ্কার নহে। তাঁহার অন্তর অনন্তে প্রসারিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব গগনস্পর্শী হইয়াছে এবং স্বয়ং রবি ও উষা কবিকে অভিষেক করিয়া ভূষিত করিতেছেন। কবি ব্যক্তি হিসাবে যদিও সামান্ত মানব হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার প্রাণের প্রসার অপরিমেয়, তিনি ধূলির ধূলি হইলেও নিজের মধ্যে বিশ্বের আভাস অনুভব করিয়াছেন—যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। তুলনীয়—

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা। —উৎসর্গ, প্রবাসী

অন্ধকার ঘরের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেলে যেমন আলোকধারা অন্ধকারকে প্লাবিত করিয়া ছড়াইয়া পড়ে, ঠিক তেমনই কবির রুদ্ধচিত্তের দুয়ার খোলা পাইয়া জগৎ আসিয়া সেখানে ভিড় করিয়াছে।—তাঁহার মনের উৎসবক্ষেত্রে সমস্ত জগৎ আসিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে; আজ তাঁহার হৃদয়ের সকল সীমা টুটিয়া গিয়াছে, সমস্ত জগৎ তাঁহার হৃদয়ে আসিয়াছে—নদ-নদী, বনপ্রান্তর, পশু-পক্ষী সকলেই আসিয়াছে—কেহই তাঁহার প্রেমের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে নাই—আকাশে যাহারা আলোক জোগায়—সেই চন্দ্র-সূর্য আসিয়াছে, ছোট ছোট তারকারাও আসিয়াছে। আজ যেন সমস্ত বিশ্ববস্তু নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া কবির হৃদয়প্রদেশে চির আবাস স্থাপন করিতে আসিয়াছে; আজ উষা নিজে তাহার আলোর মুকুট কবির মাথায় পরাইয়া দিয়াছে, রবি নিজের কিরণমালা দিয়া কবিকে মিতা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, কবি বিশ্বের সহিত আত্মীয়তার যোগ স্থাপন করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে, তা ইচ্ছা করো আর না করো। তুমি স্বার্থপর ভাবে বিদ্যা উপার্জন করিলে, সে বিদ্যার ও মানসিক উন্নতির লক্ষকোটি উত্তরাধিকারী। তুমি তো দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার

জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে। পরের জন্য উৎসৃষ্ট হওয়া মানুষ ও জড়ের সমান ধর্ম। কিন্তু মানুষ যখন স্বেচ্ছায় সচেতনে সেই মহাধর্মের অনুগমন করে, তখনই তাহার মহত্ত্ব, তখনই মানুষ জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তখনই মানুষ মহৎ সুখ লাভ করে। স্বার্থপরতা সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কিন্তু পারিবে কেন! যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইয়া অশান্তি ক্লান্তি অসুখ সৃষ্টি করে। কিন্তু যখনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করি, তখনি দেখি সুখের সীমা নাই। তখনি সহসা অনুভব করিতে থাকি সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র-সূর্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।"

ইহার সহিত তুলনীয়—

জগৎস্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছে ভাই,
চলেছে যেথা রবি-শশী চলো রে সেথা ভাই।

—প্রভাতসঙ্গীত, স্রোত

"Here is the crowd, whom I with freest heart
Offer to serve." —Robert Browning, *Sordello.*

প্রভাতসঙ্গীতের শেষ কবিতা 'সমাপনে'ও এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীত কবিতা সম্বন্ধে কবি নিজে লিখিয়াছেন যে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতা লেখার—

দু চারদিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর একটু স্পষ্ট ক'রে লেখা,—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'!
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি!

এই তো সমস্ত মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ, সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড় ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে তারা একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে দু-জন মুটের কথা বলেছি, তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখ্‌লেম, সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশী হয়েছিলেম। আরো খুশী হয়েছিলেম এই জন্যে যে যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখ্‌লেম, তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর ব'লেই দেখে এসেছি। যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখ্‌লেম, অমনি পরম-সৌন্দর্যকে অনুভব কর্‌লেম! মানব-সম্বন্ধের যে বিচিত্র রস-লীলা আনন্দ অনির্বচনীয়তা, তা দেখ্‌লেম সেইদিন।......সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশী গেয়েছি তা নয়। গান দু-দণ্ডের নয়; এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে

হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামালেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা ব'লে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।

—অনন্ত-জীবন

কিসের হরষ-কোলাহল
শুধাই তোদের, তোরা বল!
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর এক দিন।

এই যে বিরাট্ আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে, তা দেখিনি বহুদিন; সেদিন দেখ্‌লেম মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল।···

প্রভাতসঙ্গীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর বেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি মুখ ভুলে গেছে দুখ শোক
আজ আমি গান গাহিব না।

—সমাপন

এর থেকে বুঝ্‌তে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল···তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে।···সেদিন দেখেছিলেম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই।···স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা—তার মৃত্যু নেই।

—মানবসত্য, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪০ সাল

'প্রভাত-উৎসব' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার এক চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর!'—ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হ'য়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয়, তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়।

যেমন নবোদ্গতদন্ত শিশু মনে করেন সমস্ত বিশ্ব-সংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন। ...প্রভাতসঙ্গীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্যে ওটাতে আর কিছু বাছ-বিচার নেই।"

প্রতিধ্বনি

'প্রভাতসঙ্গীতে'র মধ্যে আর একটি কবিতা, চয়নিকা বা সঞ্চয়িতার মধ্যে স্থান না পাইলেও, বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে এবং কবিতা হিসাবেও সেটি উৎকৃষ্ট। সেটির নাম 'প্রতিধ্বনি'। এটির সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি পরম উল্লাসের সহিত 'প্রভাতসঙ্গীতে'র কবিতা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহার জ্যোতি-দাদারা দার্জিলিং পাহাড়ে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এবং তাঁহারা কবিকেও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে আহ্বান করেন। কবি আনন্দে স্বীকার করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে কলিকাতার ভিড়ের মধ্যে যে নূতন প্রেরণা তিনি পাইয়াছেন, তাহা হিমালয়ের উপরে আরও গভীর করিয়া তিনি পাইবেন। কিন্তু তিনি স্থানচ্যুত হইয়া সেই উৎসাহ হারাইলেন। প্রভাতসঙ্গীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তাহার দূর প্রতিধ্বনি-স্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে কবিতাটি কবি দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছে প্রতিধ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি,—
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি
বুঝি আর কারেও বাসি না।

বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সে কোন্ গানের ধ্বনি জাগিতেছে, প্রিয়মুখ হইতে বিশ্বের সুন্দর সামগ্রী হইতে প্রতিঘাত পাইয়া যাহার প্রতিধ্বনি আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। কোন বস্তুকে নয়, কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি, কেননা ইহা যে দেখা গেছে, একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই, আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।

এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এইজন্য তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল

হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোনো একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনি-রূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানে আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে।..... সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। —জীবনস্মৃতি

আমরা পূর্বাপর দেখিতে পাইব যে, রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে অসীমের অভি-ব্যক্তি এবং অসীমের মধ্যে সীমার বিকাশ উপলব্ধি করিয়াই প্রায় অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিই ‘জীবনস্মৃতি’ হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে—

আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা—সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।

প্রতিধ্বনি কবিতাটির তাৎপর্য অজিতকুমার চক্রবর্তী এইরূপ করিয়া বলিয়াছেন—

বস্তুজগতের অন্তরালে যে একটি অসীম অব্যক্ত গীতজগৎ আছে, যেখানে সমস্ত জগতের বিচিত্র ধ্বনি পরিপূর্ণ হইয়া অনাহত শব্দে নিরন্তর বাজিতেছে,—তাহার আভাস, তাহার প্রতিধ্বনি প্রত্যেকটি খণ্ড সৌন্দর্যে খণ্ড সুরে পাওয়া যায়—সেই জন্যই তাহারা প্রাণের মধ্যে এমন সুতীব্র একটি ব্যাকুলতাকে জাগায়। বস্তুত পাখীর গান পাখীরই নয়, নির্ঝরের কলশব্দ নির্ঝরেরই নয়, তাহা সেই মূলসঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি—এইজন্যই জগতের যে সকল সুর ধ্বনিত হইতেছে এবং যাহারা ধ্বনিত হইতেছে না, সকলে মিলিয়া আমাদের মনে একই সৌন্দর্যবেদনাকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমরা নানা প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই মূল সঙ্গীতকে শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি।

এই যে প্রতিধ্বনি তাহা কবির অন্তরে অনন্তের অনাহত সঙ্গীত অনুভবেরই প্রতিধ্বনি। কবি প্রতিধ্বনিকে ভালোবাসিয়াছেন; সে প্রতিধ্বনি তাঁহার কাছে সকল শব্দের মধ্য দিয়া আসিতেছে, এবং যেখানে জগতের সকল শব্দের সমাবেশ ও মিলন ঘটিতেছে সেই কেন্দ্রস্থলে কবি আসন পাতিয়া মূল-সুরটির

মর্ম গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। যেমন করিয়া শেলী Intellectual Beauty খুঁজিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—

"The awful shadow of some unseen Power
Floats, though unseen, among us, visiting
This various world with as constant wing
As summer winds that creep from flower to flower."

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আলোচনা' নামক পুস্তকের মধ্যে বলিয়াছেন—

শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধরো, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে। এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্যকে এত ভালোবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল; সৌন্দর্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলেই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য তাহা করে না—সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই।

কবি স্বয়ং অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—

যা কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিল্‌ছে, আবার ফিরেও আস্‌ছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনি-রূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হ'য়ে।

—মানবসত্য, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪০ সাল

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়

(১২৮৮ সালের চৈত্র মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়)

যখন পর্যন্ত সৃষ্টি প্রবর্তিত হয় নাই, তখন কেবল বিশ্বাত্মা বা কেবলাত্মা পরমেশ্বর বিদ্যমান ছিলেন। তখন দেশ ছিল না, কেবল জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য ছিল। ভগবানের নামে অকস্মাৎ আপনার সত্তার আনন্দ উৎপন্ন হইল এবং তখন পরমেশ্বর কালে অধিষ্ঠিত হইলেন। পূর্বে তিনি সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণের মমতায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন, এখন গুণক্ষোভ হওয়াতে তাঁহার মধ্যে সৃষ্টির কামনা জন্মলাভ করিল। তাহাতে প্রথমে উৎপন্ন হইল শব্দ, সেই শব্দ চারিদিকে প্রধাবিত হইল বলিয়া সেই স্রষ্টা চতুর্মুখ, এবং সেই শব্দ বিশ্বব্যাপক বলিয়া

স্রষ্টার নাম ব্রহ্মা। এই শব্দই আদি সৃষ্টি, সেই জন্য শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়। গ্রীক দার্শনিকদের মতেও প্রথমে কেবল মাত্র জ্ঞানাত্মা লোগস্ (Logos) বা বাক্ বিদ্যমান ছিলেন। ইহারই অনুরূপ বিশ্বাস বাইবেলের মধ্যে দেখা যায়—

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

In Him was life; and the life was the light of men.

And the light shineth in darkness : and the darkness comprehendeth it not.

—Saint John, 1—1, 4. 5.

শব্দের পরে আলোকের উদ্ভব হইল।

And God said, Let there be light : and there was light.

And God saw the light, that it was good : and God divided the light from darkness.

—Genesis, 1, 3. 4.

শব্দের উদ্ভবের পরে সৃষ্টিকর্তার অষ্ট দিঙ্নেত্রে জ্যোতি স্ফুরিত হইল, এবং বিশ্বের নির্ঝর ঝরিতে লাগিল।

যখন নূতন সৃষ্টির ও প্রাণের আনন্দ জগতে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল, তখন তাহাকে রক্ষা করিবার—পালন করিবার যে ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তার মনে উদয় হইল, সেই ইচ্ছামূর্তি হইলেন বিষ্ণু, যিনি সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া জগতের বিধৃতিশক্তি সঞ্চারিত করেন। তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করেন,—শব্দময় মঙ্গলজনক উদ্বোধক শঙ্খ, কালচক্র, পালনীশক্তি গদা, এবং সৃষ্টির সৌন্দর্যমূর্তি পদ্ম তাঁহার ভূষণ। তাঁহার পালনের ব্যবস্থায় নিয়ম ও ছন্দ আছে, এবং 'সূত্রে মণিগণা ইব' সমস্ত জগৎ এক অক্ষুণ্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। বিষ্ণুর সহচারিণী লক্ষ্মী শ্রী—ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য। সেইজন্য বিষ্ণু ভুবনসুন্দর এবং তাঁহার শক্তিও সুন্দরী হইয়া প্রতিভাত হন।

বর্তিয়া থাকার ক্লান্তি হইতে পরিত্রাণের জন্য চরাচর বিরাম চায়, অস্তিত্বের শ্রম হইতে বিরতি চায়। সেই বিরাম দিবার জন্য যে শক্তি জগতে ক্রিয়া করেন, তিনি হইলেন মহেশ্বর—মৃত্যুরূপী অথচ মৃত্যুঞ্জয়। সৃষ্টির পূর্বে ছিল কেবল অন্ধকার, সৃষ্টিধ্বংসের পরে প্রলয়ের অবসানে রহিল কেবল তেজ। যখন

সমস্ত শেষ হইয়া গেল, তখন আবার মহাদেব ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, আবার সেই সমাধি ভঙ্গ হইলে নূতন সৃষ্টি প্রবর্তিত হইবে।

এই কবিতাটিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একটি কবিত্বময় সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতে নানা দার্শনিক মতবাদ একত্র সন্নদ্ধ হইয়াছে।

ছবি ও গান

প্রভাতসঙ্গীতে কবির রচনার একটা পর্ব শেষ হইল। পরে যে আর একটি নূতন পর্ব আরম্ভ হইল, তাহার বিশেষত্ব হইতেছে চোখে-দেখা ও মনে-ভাবা সমস্ত ব্যাপারের ছবি আঁকিয়া যাওয়া। চোখে-দেখা বস্তুর যে ছবি কথা দিয়া আঁকা হয়, তাহাকেও ছবিই বলিতে হয়; আর মনের ভাবনার যে ছবি কথায় পরিব্যক্ত হয়, তাহাকে গান বলা যাইতে পারে। এইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথের চাক্ষুষ ও মানস-ছবির বইয়ের নাম রাখা হইয়াছিল 'ছবি ও গান'। এই সম্বন্ধে কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন যেন এক একটি স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত।...এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত।...নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তুলে, তেমনি কোন একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গানে ফুটিয়াছে।... সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল না।... অন্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানাসুরে ভরিয়া উঠে, তখনি আমরা সেই বোধের দ্বারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার লক্ষ তার নিত্য সুরে যেখানে বাঁধা নাই, এমন জায়গাই নাই—তখন যাহা চোখে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে, তাহাতেই আসর জমিয়া উঠে, দূরে যাইতে হয় না।

কিন্তু এই কাব্যরচনার কাল পর্যন্ত কবির সহিত প্রকৃতির পরিচয় শুধু বাহিরের—কবি প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্যের মাধুর্যে বিভোর।

এই 'ছবি ও গান' বইয়ের সব কবিতাই কবির ২২ বৎসরের বয়সের লেখা। ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবির বিবাহ হয়। ছবি ও গান পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হয় ঐ বৎসরের ফাল্গুন মাসে, ১৮০৫ শকে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, বিবাহের তিনমাস পরে। ইহার রচনার সূত্রপাত হয় কারোয়ারে (বম্বে প্রেসিডেন্সিতে) আশ্বিন মাস হইতে।

ছবি ও গান পুস্তক হইতে কেবল একটি মাত্র কবিতা চয়নিকায় ও সঞ্চয়িতায় স্থান পাইয়াছে, সেটির নাম 'রাহুর প্রেম'।

রাহুর প্রেম

(সম্ভবতঃ ১২৯০ সালে বিরচিত)

টম্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহার মধ্যে আবেগ ও কল্পনার প্রগাঢ়তা আছে।

রাহু যেমন তাহার শিকার রবি-শশীকে গ্রাস করে, অথচ আয়ত্ত করিতে পারে না, রাহু যেমন ছায়ারূপে নিরন্তর আলোকের পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনি বুভুক্ষিত প্রেম তাহার প্রণয়িনীকে গ্রাস করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিতে চায়। যে প্রেম আবেগময়, তাহা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ক্ষুধার্তের মত নিষ্ঠুর; তাহা প্রণয়াস্পদকে পদে পদে পীড়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিতে চায়, তাহা বিরাগ বা উপেক্ষাকে গ্রাহ্য করে না, উদাসীন হইয়া থাকিতে দিতে চায় না। এই ক্ষুধাকে আমরা বলিতে পারি—The Great Hunger.

এই কবিতাটি 'ছবি ও গান'-এর অন্যান্য কবিতার সঙ্গে খাপ খায় না, ইহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন লোকেন্দ্র পালিতকে লেখা এক চিঠিতে—"এর মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে, অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে।"

কেবলমাত্র এই কবিতাটি চয়নিকায় ও সঞ্চয়িতায় গৃহীত হইলেও ছবি ও গানের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট অনেকগুলি কবিতা আছে। প্রথম কবিতা **'কে'** একটি অতি সুন্দর সুললিত লিরিক্। **'সুখস্বপ্ন'** নামক কবিতাটিতেও চমৎকার ছবি—একটি তরুণী 'জানালার ধারে ব'সে আছে করতলে রাখি মাথা', আর তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া বিশ্বশোভা প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে; তাহাতে—

ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে।

'একাকিনী' কবিতাটি একটি একাকিনী মেয়ের মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়ার ছবি মাত্র, কিন্তু কবিত্বসুষমায় সুচিত্রিত।

কবির মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাই প্রদেশের জজ ছিলেন। তিনি যখন কর্ণাটের রাজধানী কারোয়ারে ছিলেন, তখন কবি সেই এলা-লতা ও চন্দন-তরুর দেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এক শুক্লা রজনীতে কবি একটি ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া কালানদী দিয়া উজান ভাটি বেড়াইয়া যখন বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন সেই শুক্লা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যে কবিচিত্ত নিমগ্ন। তখন সেই রাত্রে তিনি যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা **'পূর্ণিমায়'** নামে অভিহিত হইয়াছে। তখন কবির মনে হইয়াছিল—

কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্বাঙ্গে জোছনা লাগে,
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন!
অসীমে সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায়!
নিশীথের মাঝে শুধু মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়!

যে কবি পরবর্তীকালে 'ক্ষুধিত পাষাণ' নামক গল্প লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই **'পোড়ো বাড়ী'** কবিতা লিখিতে পারেন। একটি পোড়ো বাড়ী দেখিয়া কবির মনে নানা প্রশ্ন হইতেছে,—এই বাড়ীতে কত আনন্দ, কত প্রেমাভিনয় হইয়াছে, কিন্তু আজ তাহাদের অবসান হইয়া গিয়াছে।

'যোগী' নামক কবিতাটিও কারোয়ারের স্মৃতি বহন করিতেছে। সমুদ্র-তীরবর্তী পর্বত যেন ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় কবির মনে হইয়াছে; এবং ধূর্জটির জটাজাল হইতে যেমন সুরধুনীধারা নির্গলিত হয়, তেমনি এই যোগীর ললাট হইতে জ্যোৎস্নারও অরুণকিরণের ধারা প্রতিফলিত হইতেছে।

'আর্তস্বর' কবিতাটিতে শ্রাবণের বর্ষার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। ঝড়ের কবিতা লিখিয়া কবি পরে যশস্বী হইয়াছেন, এই কবিতাটি তাহারই অগ্রদূত এবং যোগ্য দূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

'মধ্যাহ্নে', 'নিশীথ-জগৎ' ও **'নিশীথচেতনা'** কবিতাত্রয়ে দিবস ও রাত্রির ছবি সুপরিস্ফুট।

এই 'ছবি ও গান' কাব্য লিখিবার সময়ে কবি সৌন্দর্যে ও ভাবে এমন বিহ্বল

হইয়াছিলেন যে, কবি একখানি চিঠিতে নিজেকে মাতাল ও পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কী মাতাল হ'য়ে লিখেছিলুম···আমি তখন দিনরাত পাগল হ'য়ে ছিলুম।···আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল···কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।······সত্য কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়্‌তে পড়্‌তে আমার মন যেমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, এমন আমার কোন পুরাণো লেখায় হয় না।—প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র; সবুজপত্র ১৩২৪, শ্রাবণ ২৩৬-২৪৯ পৃষ্ঠা, অথবা রবীন্দ্রজীবনী দ্রষ্টব্য।

এই ভাবটিকেই কবি পরে 'পাগল' কবিতায় ও 'পূরবী'র বহু কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন দেখিতে পাইব।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এখানি নাট্যকাব্য। ১২৯১ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটকখানি 'ছবি ও গান' কাব্যেরই সগোত্র—ইহার মধ্যে কবি কবিতায় বহু ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নাটকের নায়ক একজন সন্ন্যাসী। সে সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। অবশেষে একটি নিরাশ্রয়া অনাথা অস্পৃশ্যা বালিকা তাহাকে ভালোবাসিয়া সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল। তখন সেই সন্ন্যাসীর এই উপলব্ধি হইল যে, সীমার মধ্যেই অসীম আপনাকে প্রকাশ করে, প্রেমের বন্ধন স্বীকার করিলেই যথার্থ বন্ধনমুক্তি লাভ হয়। যে জগৎ তাহার নিকটে বিস্বাদ ও মোহবন্ধন বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাই সেই বালিকার প্রেমের আলোকে আনন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হইল।

নাটকের মধ্যে যে কাহিনী আছে, তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি প্রভাতসঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি।

এক সময়ে যে কবির সহিত প্রকৃতির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বেদনা পাইতেছিলেন, সেইটা কাটিয়া গিয়া পুনরায় বিশ্বের আনন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হইবার আত্মকাহিনীর এক অংশ এই নাটকের মধ্যে আছে।—অজিতকুমার চক্রবর্তী

কবি স্বয়ং তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ-ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই।···বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, সেখানে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি, কিন্তু যেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিতভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কি করিয়া? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমাসিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাসদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল! আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সেই পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটিকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কতকগুলি গদ্য-প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেইগুলি 'আলোচনা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল ৩রা বৈশাখ ১২৯২; অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৫ সালে। সেই পুস্তকের গোড়ার দিকের কতকগুলি প্রবন্ধে

কবি স্বয়ং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটির অন্তরের তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্ন্যাসীর কথা উদ্ধার করিয়াছেন—

আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া,
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু ?
* * *
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি'।

বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে এই নাটকের কথা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।

ঐ পুস্তকে কবি আরও লিখিয়াছেন—

আমি আত্মাকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

কড়ি ও কোমল

'ছবি ও গান' প্রকাশিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে ১২০৩ সালে কবির 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। 'ছবি ও গানে' কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, 'কড়ি ও কোমলে' হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়াছে,—এই দুই কাব্যের মধ্যে এই প্রভেদ। তাহা ভিন্ন, কবির কবিতা এই সময় হইতে অনেকটা সংযত আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন তাঁহার ভাষা ও ছন্দ আগের মতন আর এলোমেলো নাই, তাহা নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে, হৃদয়ভাবগুলিও স্পষ্ট ও বাক্যচিত্রগুলি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, নর-নারীর মিলনব্যগ্রতা, প্রেম ও বিরহ প্রভৃতি এখন কবিচিত্তকে ভাবিত করিয়া তুলিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবাল্যের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বজীবনের সহিত মিলনের জন্য আগ্রহ ও উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে।

'প্রভাতসঙ্গীত' যেমন কবিপ্রতিভার একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গিমা, এই 'কড়ি ও কোমল'ও তেমনি কবির একটি বিশেষ মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করিতেছে। 'কড়ি ও কোমলে' দেখি বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুই-ই কবিহৃদয়কে টানিতেছে—কবি নিজেই বলিতেছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। —বঙ্গভাষার লেখক

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।......বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন।......এবার বাস্তব সংসারের সহিত কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। —জীবনস্মৃতি

কবি এখন অনুভব করিতেছেন যে, জগতের সকল খণ্ড-সৌন্দর্য অসীম সৌন্দর্যকে আহ্বান করিতেছে; সৌন্দর্যস্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী, ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিঃশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন সুর বাহির হইতেছে, সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান-গান, সৌন্দর্যই তাঁহার দৈববাণী। "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা, আর প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।" সৌন্দর্য যেন স্বর্গের সামগ্রী, মর্ত্যে আসিয়া পড়িয়াছে—তা সে যেখানেই থাকুক, বিশ্বপ্রকৃতিতে বা জীবদেহে বা নারীশরীরে, সে সর্বত্র সমান সুন্দর ও পবিত্র। সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে, সৌন্দর্যই হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করে। শারীরিক সৌন্দর্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে নয়।

এইজন্য এই কাব্যে কবির যৌবনের ও মানবতার হৃদয়াবেগ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। এই কাব্যের কতকগুলি কবিতায়. যেমন নারীর শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণিত হইয়াছে, তেমনই স্বদেশপ্রেমের উন্মেষও এইখানে। শিশু সম্বন্ধে কবিতা-রচনায় যে কৃতিত্ব কবি পরজীবনে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও বীজ এইখানেই অঙ্কুরিত হইয়াছে দেখিতে পাই। 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমতার প্রথম উন্মেষ।

'কড়ি ও কোমলে' নারীদেহের সৌন্দর্য যে কবিতাগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলিকে ভোগ-লালসার উচ্ছ্বাস মনে করিয়া অনেকে নিন্দা করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ 'কড়ি ও কোমল'-এর প্যারডি করিয়া 'মিঠে কড়া' নামক ব্যঙ্গকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে কিরূপ ভিত্তিহীন তাহা তাঁহার কবিতাগুলি একটু নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলেই বুঝা যায়। 'চুম্বন' কবির কাছে ভালোবাসার অধরসঙ্গমে তীর্থযাত্রা; রমণীর 'স্তন' কবির নিকটে পবিত্র 'সুমেরু', 'দেবতা-বিহার-ভূমি', 'প্রেমের সঙ্গীত'—

হের গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির!

'পূর্ণ মিলন' নরনারীর দৈহিক মিলনে নাই, তাহা আশা করা দুরাশা মাত্র—

এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্ খানে!

'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে যে কবিতাগুলি হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস, সেগুলিকে মোহিতচন্দ্র সেন তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'যৌবন-স্বপ্ন' পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কবিতাগুলি নিরবচ্ছিন্ন যৌবনাবেগ নহে, ইহাদের মধ্যেও যুবা কবির ভোগস্পৃহা অত্যন্ত সংযত। কবি সকল রকম আসক্তির বন্ধন হইতেই মুক্তির জন্য অধীর, তাই কেবল নারীসৌন্দর্যের মোহ হইতে নয়, জাতীয়তা স্বাদেশিকতা ইত্যাদির সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কবির ভিতরে অত্যন্ত প্রবল। সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমকে উপলব্ধি করিবার ভাবটি এই কাব্যে সুস্পষ্ট হইয়া বিদ্যমান।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের অন্তর্নিহিত কথাটি যে কি, তাহা ইহার প্রথম কবিতা 'প্রাণ' এবং শেষ কবিতা 'শেষ কথা' মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়।

'কড়ি ও কোমল'-এর আর একটি বিশেষত্ব সনেট রচনায়। রবীন্দ্রনাথের সনেট সম্বন্ধে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কী সরস! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে
মুক্ত-বাতায়নে বসি' ক্ষুদ্র জুলিয়েট্
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে!

আধেক নগন-তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী ;
সলিলে কাঁপিছে শশী ; চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা ; কাঁপে উরু গুরুগুরু করি' !
নববলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর-পরশে,
লাজে বাধো-বাধো বাণী, রূপের আলসে
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !
পাঠ করি' সাধ যায়—আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে !

—পারিজাতগুচ্ছ

'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে 'কোথায়', 'শাস্তি', 'পাষাণী মা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় বিষাদভাব আছে ; তাহার কারণ এই সময়ে কবির স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর মৃত্যু ঘটে (১২৯১, ৮ই বৈশাখ, ২০এ মে, ১৮৮৪)।

রবীন্দ্রজীবনী-লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিক কথাই লিখিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথের জীবনে কখনো কোনো ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়না—সুখও নয় দুঃখও নয়...... সুতরাং নবীন জীবনের প্রথমে......এই যে মৃত্যুশোক পাইলেন তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। 'যোগিয়া' ও 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি'র মধ্যে ইহার আভাস পাই।

আশুতোষ চৌধুরী (পরে সার্) 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি ভাব-পরম্পরা অনুসারে সাজাইয়া প্রকাশ করেন। 'কড়ি ও কোমলে' প্রেমসঙ্গীত, নারীসৌন্দর্যের বর্ণনা, শিশুকবিতা, ব্রহ্মসঙ্গীত, স্বদেশ-সঙ্গীত সবই আছে। এই অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবি-মন সকল ভাবের, সকল রসের, সকল রূপের কবিতার ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রেম ও নারীসৌন্দর্য-বিষয়ক কবিতাগুলিকে এমন ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের ভাবধারা একটি অখণ্ডতা লাভ করে।

প্রাণ

আশুতোষ চৌধুরী মনে করিয়াছিলেন যে এই কবিতাটির মধ্যে সমগ্র 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের মর্মকথাটি পরিব্যক্ত হইয়াছে—তাই তিনি ইহাকে প্রথমে স্থাপন করেন।

কবি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্যের ও প্রেমের মধ্যে নিত্যবিরাজমান অক্ষয়

অব্যয় সচ্চিদানন্দ প্রেমময় বিশ্বাত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। ধরণীর ও মানবের প্রতি প্রীতিতে কবি উপলব্ধি করিতেছেন যে, মানবজীবন কত বড়, কত মহৎ ও কত সুন্দর! কবির কাছে মানবজীবন সুন্দর বিরাট্ অনন্ত-অর্থ-পূর্ণ। তুলনীয়—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং 'নৈবেদ্য' পুস্তকের 'মুক্তি' কবিতা—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!' আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কবি অনন্তের আবির্ভাব দেখিয়াছেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ও বিশ্বমানবের মধ্যে। বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানব দুই-ই সেইজন্য কবি-হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে। কবি প্রকৃতিকে যেমন ছাড়িতে চাহেন না, মানবকেও তেমনি জীবন হইতে বাদ দিতে পারেন না। ইহা একটা মস্ত বড় paradox যে বন্ধন যত বাড়িবে, ততই মানবের মুক্তি অধিক হইবে—বিশ্বসৌন্দর্যকে ও বিশ্বপ্রাণকে যতই ভালোবাসিতে পারা যায়, ততই প্রাণ প্রসারতা লাভ করে। তাই কবি বলিতেছেন—

ভগবান্ ভুবনসুন্দর, এই ভুবনে তাঁহারই প্রতিভাস যখন দেখা যায়, তখন ইহাকে সুন্দর লাগে। এই সুন্দর ভুবনে আমি মরিতে চাহি না, আমি এখানে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবপ্রেমে সকল সুন্দরের মূল উৎসকে অনুসন্ধান করিতে চাই। পিতামাতা ভাইবোন স্বামীস্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবের সচেতন জীবন্ত স্নেহপ্রীতিতে সুন্দরী ধরণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শ্রীমতী ধরণী আমার কাছে অমরালয় তুল্য। প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, মানবজীবনের মহত্ত্বে এই ধরণী মধুময়ী হইয়াছে। আমি মানবজীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের মালা গাঁথিয়া অমরত্ব লাভ করিতে বাঞ্ছা করি; কিন্তু সেই ইচ্ছা যদি সম্পূরণ না হয়, তবে আমি আমার সমসাময়িক লোকেদের মধ্যেই সাময়িক আনন্দ যদি বিতরণ করিতে পারি, তাহা হইলেও আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার গান যদি চিরন্তন নাই হয়, তবু তাহার মধ্যে কেহ যদি একটুও সুষমা ও আনন্দ উপলব্ধি করে, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে।

জাগতিক জীবন, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা যে অমৃতময়, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্য-সাধনায় ইহা বারংবার স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা একটি মহৎ সত্যের উদ্‌ঘাটন। তুলনীয়—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভুলোকে,
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া ॥

সৃষ্টিকর্তা ধরণীকে মর্ত্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। তাহাকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তোলেন মহাপ্রাণ মানবেরা। কবি যদি সেই মানবের দলে আসন নাই পান, তবু যদি তিনি ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক তৃপ্তি দান করিতে পারেন, তাহাতেই তাঁহার জীবনের সার্থকতা লাভ হইবে।

ইংরেজ কবিদের অধিকাংশই দুঃখবাদী,—যেমন শেলী, বায়রন ইত্যাদি। সেক্সপীয়রও ম্যাক্‌বেথ্, হ্যাম্‌লেট্ প্রভৃতির মুখ দিয়া জীবনের দুঃখের দিক্‌টাই প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল মেরেডিথ্ আমাদের কবির ন্যায় প্রবল আনন্দবাদী। তিনি পৃথিবীকে ও প্রাণকে ভালোবাসিয়াছেন। ব্রাউনিংও জগৎকে সুন্দর ও প্রেমপূর্ণ দেখিয়া গিয়াছেন। মেরেডিথ্ বলিয়াছেন যে, মানুষ যে পরলোকে স্বর্গ কামনা করে, তাহা ইহজীবনের সুখকেই দীর্ঘতর প্রসারিততর করিয়া পাইতে চায় বলিয়া—

O world, as God has made it! All is beauty,
And knowing this is love, and love is duty.

—Robert Browning, *The Guardian Angel.*

For love we Earth, then serve we all;
Her mystic secret then is ours:

—George Meredith.

এই 'প্রাণ' কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।......'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবন-নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন।......এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

—জীবনস্মৃতি

কাঙালিনী

(১২৯১ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত)

কাঙালিনী কবিতায় দরিদ্র অনাথের প্রতি কবি-হৃদয়ের অসাধারণ মমতা ও দয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ধনীরা আনন্দময়ী মা নাম দিয়া যে প্রতিমার পূজা করে, তাহা তাহাদেরই ঐশ্বর্য-অহংকারের পূজা। তাহাদের উৎসব ধনগর্বের আড়ম্বর। যদি বাস্তবিক তাহারা আনন্দময়ী মাতার পূজা করিত, তাহা হইলে তাহাদেরই দুয়ারে সমাগত কাঙালিনী মেয়ের মলিন মুখ তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে উৎসব পণ্ড এবং 'তবে মিছে মঙ্গল-কলস'।

যে দেশের সমাজ ছিন্ন ভিন্ন সংকীর্ণ, যেখানে মানুষ মানুষের কাছে অস্পৃশ্য, যেখানে পতিতপাবন দেবতার মন্দিরে পর্যন্ত মানুষের অবাধ অধিকার নাই, সেই দেশের ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা কবিকে ব্যথিত করিয়াছিল। মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ও জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার একটি ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা কবিকে আবাল্য উৎসুক করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পরিচয় তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে 'কড়ি ও কোমল' পুস্তকের পরিচয়ের প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট পাই। তিনি লিখিয়াছেন—

> আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে—
> হের ঐ ধনীর দুয়ারে, দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!

এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই!

'পুরাতন' ও 'নূতন'

'পুরাতন' ও 'নূতন' দুটি স্বতন্ত্র কবিতা। 'পুরাতন' কবিতায় কবি পুরাতন অতীতকে বলিতেছেন যে তুমি তো চলিয়াই গিয়াছ, তবে আর পশ্চাতে স্মরণের চিহ্ন কেন অত ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছ, তাহা ধূলায় পড়িয়া অযত্নে মলিন হইতেছে, তাহাদের আর কেহ আদর করে না, নূতনের আবির্ভাবে নববসন্তের বাতাসে সে-সমস্ত উড়িয়া হারাইয়া যাইতেছে।

ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি, অনন্তের পানে চাহি'
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

আর নূতনকে বলিতেছেন যে, ঘোর দুর্দিনে বজ্রবিদীর্ণ গিরিগহ্বরেও নূতনের রবিরশ্মি প্রবেশ করে, দীর্ণতা ও দীনতা নূতন তৃণজালে হরিৎশোভায় আচ্ছাদিত হইয়া যায়। নূতনের সুন্দর শোভন অনুচরেরা অনাহূত আসিয়া কাহাকেও ক্ষতির জন্য শোক করিবার অবসর দেয় না। তাহারা অশোক, তাহারা কান্নাকে হাসি ছুঁড়িয়া মারে। এখানে পুরাতনের কঙ্কাল টিকিতে পারে না, কারণ—

নহে নহে, সে কি হয়, সংসার জীবনময়,
নাহি সেথা মরণের স্থান।
আয় রে নূতন আয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়
তোর সুখ, তোর হাসি গান।

নূতনের অভ্যুদয় পুরানোর 'নাম তার যাক মুছে দিয়ে।'

কবি বারে বারে এমনই করিয়া পুরাতনকে বিদায় করিয়া নূতনকে আহ্বান করিয়াছেন। ইহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব।

পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান

(১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে 'বালক' মাসিক পত্রে প্রকাশিত)

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃবধূ সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বালকদের জন্য একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন—'বালক'। এই 'বালক' পত্রে শিশুদের জন্য কবিতা রচনা রবীন্দ্রনাথের এই যুগের একটি বিশেষ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম শিশু-কবিতা বাংলার বর্ষার আদি ছড়া 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' অবলম্বনে লিখিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে 'লোকসাহিত্য' নামক পুস্তকে ছেলেভুলানো ছড়া প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও ভুলিতে পারি নাই।...তখন এই চারিটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূত ছিল।...আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং

উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত।—এই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত। ইহার শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা শিশুচিত্তকে মাতাইয়া তুলে এবং তাহার চোখের সামনে নানা বর্ণের বিচিত্র আশ্চর্য ছবি উন্মুক্ত করিয়া ধরে।

রবীন্দ্রনাথ শিশু-ভুলানো কবিতা লিখিবার যে শক্তি পরবর্তী কালে 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' পুস্তকদ্বয়ে দেখাইয়াছেন, তাহার গোড়া-পত্তন এইখানে। এই কবিতাটি ছাড়াও 'কড়ি ও কোমলে' ছেলেভুলানো কবিতা আরও কয়েকটি আছে, সেগুলিও অতি সুন্দর—যথা, 'সাত ভাই চম্পা' (১২৯২ আষাঢ়), 'হাসিরাশি' (১২৯২ শ্রাবণ), 'পাখীর পালক', 'আশীর্বাদ'। 'সাত ভাই চম্পা' কবিতাটি প্রচলিত উপকথা অবলম্বন করিয়া লেখা—সাত ভাই চম্পার একটি বোন পারুল সংমার কুহকে ফুল হইয়া ফুটিয়াছিল—ইহা তাহারই শিশুতোষ কাহিনী।

মঙ্গল-গীতি

'কড়ি ও কোমল'-এর অনেকগুলি কবিতা কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছিল, কতকগুলি কবিতা চিঠির আকারেই ছিল। পরবর্তী সংস্করণে অনেকগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি 'শিশু' কাব্যে 'মঙ্গলগীত' নামে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মঙ্গল-গীতি কবিতাটি যে কোনও স্নেহপাত্রীকে সম্বোধন করিয়া লেখা, তাহা কবিতাটি পড়িলেই বুঝা যায়। মহর্ষি এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রতীরে বন্দোরা নামক স্থানে বায়ু-পরিবর্তন করিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে ইন্দিরা দেবীকে পত্র লিখিতেন।

কবি প্রশ্ন করিতেছেন যে, এই যে বিপুলা ধরণীর মধ্যে আমরা জীবন লাভ করিয়াছি, তাহা কি কেবল ক্ষণিকের খেলার জন্য। এই জগৎ কেবল স্বার্থপরতাকে পরিতৃপ্ত করিবার স্থান নহে; এখানে মানবের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি-লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; আমাদের প্রত্যেকের সাহায্য না পাইলে কাহারও অভাব মোচন হইতে পারে না; হৃদয়ের করুণার উৎসধারায় দুঃখীর অশ্রুজল ধুইয়া দিতে হইবে।

কাহারও নিষেধ বিদ্রূপ না শুনিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান ভুলিয়া উদার অনন্তকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যেখানে বিশ্বচরাচর যাত্রা করিয়া

চলিয়াছে, সেই পথ ছাড়িয়া নিজের স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকা চরম ব্যর্থতা। বিশ্বসঙ্গীতের তালে তালে, তাহাদের সকলের সঙ্গী হইয়া আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। কোথায়?—

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে,
যাত্রা করি ছাড়ি' হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি জ্যোতির্ময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি' সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি' নিজ দুঃখ শোক।

পরিপূর্ণ একটি জীবন লাভ করিলে সকলের মতের দ্বন্দ্ব বিরাম লাভ করিবে, গন্তব্য-পথ আপনি উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। পরদুঃখে যদি দু' ফোঁটা অশ্রু পড়ে, তবে তাহা আদি-কবি বাল্মীকির শোকের ন্যায় করুণ পবিত্র ও সুন্দর হইবে। বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক যেমন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটির বধজনিত শোক হইতে নির্গত হইয়াছিল, তেমনি তোমারও চক্ষু হইতে জগতের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু নির্গত হোক—

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর;
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

এই কবিতায় কবি তাঁহার স্নেহপাত্রীকে ক্ষুদ্র জীবন পরিহার করিয়া উদার মহৎ জীবন অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। পরিপূর্ণ সত্য লাভ করিতে পারিলেই সুন্দর হওয়া যায়, তখন তুচ্ছ দৈহিক সৌন্দর্য দেখিয়া কেহ বিচার করে না। এইজন্যই কবি কীট্‌স্ বলিয়াছেন—

'Beauty is truth, truth beauty'—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

—Keats, *Ode on a Grecian Urn.*

যৌবনস্বপ্ন

কবির এখন ভরা যৌবন। যৌবনে প্রাণের আবেগ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কবির অন্তর-মায়াপুরীর দ্বার যৌবনের সোনার কাঠির স্পর্শে খুলিয়া গিয়াছে, কবি সেখানে দেখিতেছেন কেবল বসন্তের ঐশ্বর্য মাধুর্য ও প্রাচুর্য। যৌবন-বসন্তের নেশায় কবিচিত্ত ভরপুর। বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি এখন কবির শিরায় শিরায় প্রবাহিত! কবির দেহের আর মনের চোখে যে মোহ-অঞ্জন লাগিয়াছে, যে স্বপ্নাবেশ আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বশোভা কল্পনার রঙে রঙীন ও আনন্দের সুরে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোরাজ্যে যে মহাসমারোহ অবারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আভা তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিচ্ছুরিত প্রতিফলিত দেখিতেছেন। সেই সব শোভার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

> পরাণ পুরে গেল, হরষে হলো ভোর,
> জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর!

কবির নিজের প্রাণের রঙ্ আজ বিশ্বশোভায় লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের মনের হর্ষ আজ তিনি বিশ্ববস্তুতে দেখিতেছেন, তাই কবি বলিতেছেন—

> আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।

যৌবনকালে রূপসী রমণীর স্পর্শে যেমন প্রাণে উন্মাদনা আনে, তেমনি সুখস্পর্শ বলিয়া মনে হইতেছে ফুলের স্পর্শ; দক্ষিণা বাতাসের নিঃশ্বাস কবির নিকটে যেন বিশ্বের সকল বিরহিণীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো বোধ হইতেছে। বসন্তের ফুলবনে গোলাপ ফুটিয়াছে, তাহা দেখিয়া কবির মনে পড়িতেছে রূপসীর অনুরাগরঞ্জিত লজ্জারক্ত কপোলের কথা। নিদ্রার মধ্যে তিনি যেন কাহার আবির্ভাব অনুভব করেন, উষার বাতাসে যেন কাহার অঞ্চলের মৃদু স্পর্শ অনুভব করেন, ভ্রমর-গুঞ্জন যেন শত সুন্দরীর নূপুর-নিক্কণের ন্যায় মনে হয়। যে বিশ্ব-সুন্দরী তাঁহাকে উন্মাদনায় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, সে কোন্ স্বর্গের সৌন্দর্য-ললামভূতা উর্বশী! বিশ্বশোভাময়ী উর্বশী যেন কবির সঙ্গে মিলনের আশায় আকাশে তাহার নীল চোখ মেলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

বিবসনা

"জীবনের প্রথম কথাই ভোগাকাঙ্ক্ষা; যাহার জীবন যতখানি সত্য, তাহার জীবনের ভোগবাসনাও ততখানি সত্য। যিনি কবি, তিনি সেই অতি সত্যকে সুন্দরভাবে সুপ্রকাশের পবিত্র সৌন্দর্যধারায় ধৌত করিয়া প্রকাশ করেন; অক্ষমের হাতে সেই বিষয় কুশ্রী হইয়া পড়ে।"

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

কবি ও যুবাপুরুষের মনে যে সৌন্দর্যবোধ প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তাহাতে রমণীরূপ সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়। নারীর বিকশিত যৌবনশ্রী হইতে তাহার অন্তরে প্রেমের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। কবি দেখিতেছেন যে বিশ্বশোভা সমস্তই অবারিত ও অনাবৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কেবল রমণীরূপই কৃত্রিম বসনে ভূষণে সমাচ্ছন্ন। কবি রমণীকে এই কৃত্রিমতা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সৌন্দর্যের আবরণে সুরবালিকার বেশ ধারণ করিতে বলিতেছেন। মানব-সমাজে বসনের প্রচলন হয় শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর তীক্ষ্ণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য; যখন একবার অঙ্গ ঢাকা পড়িল, তখন তাহা উদ্ঘাটন করা বা অনাবৃত করা লজ্জার কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু রমণী স্বভাবতঃই রমণীয়া, তাহাকে বসনে-ভূষণে কৃত্রিম আবরণে সজ্জিত করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। রমণী স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা, পর্দানশীন—সেই পর্দা কৃপণ পুরুষের তৈয়ারী কৃত্রিম বর্বর পর্দা নহে, রমণী নিজেকে সুসমাপ্ত-ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করিয়া তুলিয়াছে, সেই-সব পর্দা দ্বারা সে সর্বদা পরিবৃত থাকে। রূপসী যুবতীর তনুখানি বিকচ কমলের মতো ললিতলাবণ্যে ঢলঢল, তাহা বিশ্বশোভারই অঙ্গ ও অংশ হইয়া স্বাভাবিক সহজ সৌন্দর্যে প্রকাশ পাক, তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির প্রতিকৃতি হউক সে। মনে যদি কামনা জাগে, তবেই দেহকে লইয়া মনে জুগুপ্সা জাগে, এবং সেই জুগুপ্সা হইতে লজ্জার উৎপত্তি হয়। কিন্তু মন যদি নির্মল পবিত্র কামনাশূন্য হয়, তাহা হইলে তো বিবসনা-অবস্থায় লজ্জা হইতে পারে না; বিবসনা নিজের শুচিতার শুভ্রতায় ও লাজহীনা পবিত্রতায় প্রকাশিতা হইলে কাম লজ্জা পাইয়া আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইবে। (তুলনীয়—'বিজয়িনী' কবিতা এবং Lord Tennyson-এর Godiva.)

কবি রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—

যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হ'তে অক্ষম, তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন ব'লে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা

পেয়েছে, তারা জানে যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত—কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ কর্‌লেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

—ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ২রা আষাঢ়, ১২৯৯।

ঐ পত্রের মধ্যেই কবি লিখিয়াছেন—

মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব—এরা কেবল দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়ালই গাঁথ্‌ছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখ্‌তে পায়, এইজন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারী অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটা ঘ্যারাটোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি, সেই আশ্চর্য।

দেহের মিলন

এই কবিতাটি বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের প্রসিদ্ধ একটি পদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি' কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি' থির নাহি বান্ধে॥

রবীন্দ্রনাথের মানবীয় প্রেমে—এমন কি যাহাকে ইন্দ্রিয়জ প্রেম বলা যায় তাহাতেও—একটি উচ্চ অতীন্দ্রিয় ভাব প্রকাশ পায়। এই কবির কাছে কোনো বস্তুই সাধারণ বা সামান্য নহে, আর কোনো বস্তুই অপবিত্র বা অশুচি নহে। তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্যবোধ ভাবগত—শারীরিক বা ইন্দ্রিয়গত নহে। 'কড়ি ও কোমল'-এর এই সনেটগুলিতে কবিচিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতেই মুক্তি পাইবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে। যেমন আত্মাকে বাদ দিয়া দেহের মুক্তি নাই, তেমনি দেহকে ছাড়িয়াও আত্মার বিকাশ নাই। কবির নিকটে দেহ ও মন, দেহ ও আত্মা দুই-ই সত্য, এবং তাহারা পরস্পরের সাহায্যে একটি সুসঙ্গতি সৃষ্টি করিতেছে।

পূর্ণ মিলন

সৌন্দর্যের চিরসঙ্গী ভোগেচ্ছা। কিন্তু ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতার অতীত একটি অসীম মুক্ত মূর্তি সৌন্দর্যের আছে। সেই রূপটিকে দেখিতে পাইলেই ভোগের লালসা আপনি ক্ষয় হইয়া যায়। মানবদেহে যে একটি

প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য আছে, তাহার পরমবিস্ময়কর রহস্যময় প্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ হইলে দেহের মোহ দূর হইয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, নারীকে রক্ত-মাংস-অস্থিতে বিশ্লেষণ করিলে তাহাকে অতি তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে। তবু যে তাহাকে সুন্দর লাগে তাহার কারণ নারী পরমসুন্দরের বিকাশমন্দির। (তুলনীয়—'চিত্রা' কাব্যে 'বিজয়িনী' কবিতা।)

প্রেম যখন সমস্ত-কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত হইয়া একটি মাত্র দেহের কারাগারে বন্দী হয়, তখন প্রেমের ঘটে অমর্যাদা ও তাহার মৃত্যু হয়। প্রেমের সেই বন্ধন-দশা হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। ভোগের পাল ও নিবৃত্তির হাল এই উভয়ের সহযোগে সৌন্দর্যবোধের তরণীকে চালনা করা দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত সৌন্দর্যবোধের মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তি মিশিয়া প্রবল হইয়া থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। (তুলনীয়—'রাজা ও রাণী' নাটক এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক।) রাজা বিক্রম বা অর্জুন যতদিন কেবলমাত্র ভোগশক্তির মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন, ততদিন তাঁহারা তাঁহাদের প্রণয়িনীর প্রকৃত পরিচয় পাইবার অবকাশ পান নাই। ভোগপ্রবৃত্তি ভোগীর মনে এই বেদনা জাগ্রত করিয়া তুলে যে, ভোগাসক্তি সমস্ত ম্লান করিয়া দিতেছে, তাহার জন্য বৃহতের সঙ্গে যোগে বাধা উৎপন্ন হইতেছে। 'কড়ি ও কোমলে' কবি ভোগবাসনাকে একেবারে বিনাশ করিয়া, তাহার কারাগার হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। কবির সৌন্দর্য-সাধনায় ভোগ কখনই একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

প্রণয়ী মৃত্যুর মতন ক্ষুধাতুর মিলন চাহিতেছেন, যাহাতে সব কিছু নিঃশেষে দিতে হইবে। তিনি বলিতেছেন—তুমি আমার চোখের ঘুম ও ঘুমের স্বপন হরণ করো, তোমার দ্বারা আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত হইয়া হারাইয়া যাক্, আমার লজ্জা ও আবরণ পর্যন্ত তুমি হরণ করো—তোমার কাছে আমার কোন কিছুই যেন গোপন না থাকে, আমার বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু না থাকে, আমি যেন আমার সর্বস্ব তোমাতে সমর্পণ করিয়া নিঃশেষে তোমার হইয়া যাইতে পারি, তুমি আমার জীবন ও মরণ পর্যন্ত অধিকার করিয়া লও। তোমার সহিত এমন নিবিড় অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ-মিলন হোক, যেন সমস্ত বিশ্ব তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সেখানে আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত তোমার সত্তায় মগ্ন হইয়া যাক, সেখানে এক তুমি ছাড়া আর যেন কেহ না থাকে। সেই বিজন বিশ্বে তোমার চিন্তা মোহ স্মৃতি

এমন সর্বাবরক হোক যেন শ্মশান। দৈহিক মিলন হইবামাত্রই অবসাদে মিলনের অবসান ঘটে। তাই কবি ঐরূপ মিলনকে শ্মশানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যদি আমাদের প্রকৃত পূর্ণ-মিলন ঘটে, তবে আমরা উভয়ে এক অথচ অসীম সুন্দরতা লাভ করিব। কিন্তু পার্থিব মিলন কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না; যাহা সসীম ও সম্পূর্ণ তাহারই নাম তো ঈশ্বর। তাই কবি বলিতেছেন—

একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।

ইংরেজ কবি রসেটিও বলিয়াছেন যে প্রেমই পরমেশ্বর, এবং প্রেমের মিলন পরমেশ্বরের অসীমতার বুকেই মিলন।

‘মোহ’ ও ‘মরীচিকা’

এই দুইটি সনেটে কবি বলিতেছেন যে, দৈহিক ভোগ-লালসার মোহ ক্ষণস্থায়ী, ‘এ মায়া ক’দিন থাকে, এ মায়া মিলায়’ এবং যৌবনের ‘সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ-অনল’ শীঘ্রই চোখের জলে নির্বাপিত হইয়া যায়। অতএব ‘আকাশ-কুসুমবনে স্বপন-চয়ন’ করিয়া কোনো লাভ নাই, কেবলমাত্র নিজেদের ভোগায়তনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকায় জীবনের ব্যর্থতাই ঘটে। অতএব—

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখে-দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি-কান্না ভাগ করি’ ধরি’ হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি’ ভয়ে কাঁপে প্রাণ।

চিরদিন

(সম্ভবত ১২৯৩ সালে রচিত)

এইটি ঠিক কবিতা নহে, ইহা পদ্যে লিখিত দার্শনিক তত্ত্ব। ‘কড়ি ও কোমলে’ এত ভালো ভালো সনেট ও উৎকৃষ্ট কবিতা থাকিতে কেন যে এই ‘চিরদিন’ চয়নিকার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি না। কবি স্বয়ং

যে সঞ্চয়িতা করিয়াছেন তাহাতে এই কবিতাটি গৃহীত হয় নাই, লেখা মন্দ নহে বলিয়া নহে, ইহা কবিতা নহে বলিয়াই। ইহার তত্ত্বকথাটি এই—

১

জগতে যাহা কিছু অস্তিত্ব তাহা খণ্ড কালের ও খণ্ড দেশের মধ্যে; দেশ-কালের সহিত খণ্ডিত করিয়া দেখা হয় বলিয়াই বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। কিন্তু চিরকালের মধ্যে কেবল নাস্তি, কারণ সেখানে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই সম্মিলিত হইয়া এক মহাকাল হইয়া আছে, সেখানে বস্তু-সত্তা অখণ্ডতার মধ্যে নিমজ্জিত। যাহা সম্ভাব্য, যাহা জায়মান (becoming) তাহাই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ, finite; অনন্তের (Infinity) বা চিরদিনের মধ্যে তো কোন কিছুর হওয়া (becoming) নাই, সেখানে সমস্ত কিছুই হইয়া আছে (is)! সেই অনন্ত চিরদিনকে আমরা বৈদান্তিকের ভাষায় ব্রহ্ম নাম দিতে পারি—যিনি মায়াতীত নিগুর্ণ নিখিলধারার সত্তা মাত্র।

সেই অসীম অনন্তের মধ্যে দেশ নাই কাল নাই, সেখানে রাত্রি বা দিন পরিচ্ছিন্ন নহে বলিয়া চন্দ্র সূর্য তারা কিছু নাই; তাহার মধ্যে উদ্ভব নাই, বিনাশ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, সেখানে পথ ও গৃহের পার্থক্য নাই, কাজেই পথিক বা গৃহস্থও নাই। সেখানে জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একাঙ্গ হইয়া আছে, কাজেই সেখানে নবীন পল্লবের সহিত শুষ্ক পত্রের অঙ্গাঙ্গী ভাব। সেখানে উত্থান নাই, পতন নাই, সীমা নাই, তল নাই, গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব। সেই যে অনন্ত দেশকালের অসীমতা, তাহার মধ্যে সমস্ত কিছুর সম্ভাবনা নিহিত আছে বলিয়া তাহা জনপূর্ণ, আবার সেখানে কিছুই আকার ধরিয়া স্বতন্ত্র হয় নাই বলিয়া, সেই স্থান সুবিজন; বৌদ্ধদের মহাশূন্যের ন্যায় সেই অসীমতা অন্ধকারে বিলীন, কিন্তু সেই অন্ধকারের গর্ভে আলোকের সম্ভাবনা গুপ্ত হইয়া আছে বলিয়া সেই অন্ধকার জ্যোতির্বিদ্ধ প্রভাস্বর স্বয়ংপ্রকাশ। সমস্ত দেশ বা আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া কেবল বিদ্যমান আছেন চিরদিন—

যদা তমস্ তৎ ন দিবা রাত্রিঃ
ন সন্ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ। —শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

যখন কেবল তমোভূত অন্ধকার, যখন পর্যন্ত প্রকৃতি প্রবর্তিত হয় নাই, তখন না ছিল দিবা আর না ছিল রাত্রি, তখন অস্তিও ছিল না, নাস্তিও ছিল না, অর্থাৎ মূর্ত অমূর্ত কিছুই নাই, তখন কেবলাত্মা শিব মাত্র ছিলেন।

২

সেই চিরদিন, সমস্ত সৃষ্টির সম্ভাবনার আধার বলিয়া সকলের প্রতীক্ষা ও অপেক্ষা তাহার মধ্যে বিরাজ করে, প্রলয়ের পরে আবার নূতন সৃষ্টির আগমনের জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। সেই চিরদিন অনাগত ভবিষ্যতের কুক্ষি হইতে আগন্তুকের মত সমস্ত সৃষ্টির পদধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্যই কান পাতিয়া বসিয়া থাকে, সে তো চির-বিরহী, সে পায় নাই কিছুই; কিন্তু পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহার অনন্ত। কাজেই তাহার অতৃপ্তির সীমা নাই, এবং তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসে জগতের সম্ভাবনা যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। চিরদিন হইতেছে তমোভূত নিরাশ্রয়। সেখানে কেহ নাই, কাজেই সে একান্ত একাকী নিঃসঙ্গ। তাহার কানে সৃষ্টির সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য কিছুই পৌঁছে না। চিরদিনের কাছে কোনো শব্দ নাই, অথচ অসংখ্য শত সহস্র শব্দের সম্ভাবনা তাহার জঠরে ভ্রূণ অবস্থায় প্রকাশের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার মধ্যে সহস্র কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাবনা গুপ্ত রহিয়াছে, অথচ সে একাকী; তাহার মধ্যে তখনও একটিও জগতের জন্ম হয় নাই বলিয়া, তাহার সেই বাসলোক বিজন। সেই চিরদিনের বাসলোক তাহার চিরদিনের নহে, সে সৃষ্টি-উন্মুখ হইয়া থাকে—যেমন প্রবাসী গৃহে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া উৎসুক হইয়া দিন গণনা করে। চিরদিনের খণ্ডের প্রতি কোনো মমতা নাই, খণ্ডের প্রতি মমতা হয় খণ্ডকালের। চিরকাল নির্মম। চিরদিন খণ্ডকালের মমতা ক্রমাগত মুছিয়া মুছিয়া দেয়। আমার সন্তানের মৃত্যুতে যে শোক, তাহা কেবল আমার বা আমার সমকালবর্তী আমার আত্মীয়দের,—সেই শোক আমার পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষ কাহাকেও ব্যথিত করে নাই বা করিবে না, আমার সন্তানের বিয়োগে আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ কোন ক্লেশ অনুভব করেন নাই, অথবা আমার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র ব্যথা অনুভব করিবেন না,—সুতরাং আমার যে শোক তাহা ক্ষণকালের, তাহার সহিত চিরদিনের কোন সম্পর্ক নাই। যে বিরাট ভূমা শোনেও না দেখেও না, তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদের হাসি-কান্না বৃথা মাথা কুটিয়া মরে, কিন্তু—বৃক্ষ ইব ভুবি স্তব্ধস্তিষ্ঠত্যেকঃ।

রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—অনন্তের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে।

৩

এই তৃতীয় কলিতে মায়াবাদী শঙ্করাচার্যের সহিত অস্তিত্ববাদী কবির লড়াই। কা তব কান্তা কস্ তে পুত্রঃ বলিয়া শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন যে, কেহ কোথাও নাই; তেমনি কবি তাহার পাল্টা জবাব দিয়া বলিতেছেন— ইহারা সকলেই আছে অনন্তের অঙ্গরূপে। খণ্ড আভাসই অনন্তকে অসীমকে নির্দেশ করে। সকল সীমাকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াই তো অসীম—অসীম তো সকল সীমার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই সীমাকে ত্যাগ বা বর্জন করিয়া নহে, বরং সকল সীমাকে গ্রহণ করিয়াই অ-সীমা অসীম হয়। সেইজন্য বিচ্ছিন্ন ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ সঙ্গীত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে; প্রত্যেক ক্রিয়া ও আকার ক্রমাগত তদপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিবার উচ্চাশা পোষণ করিয়া থাকে।

তাই কবি মায়াবাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, সকলই কি মায়া, এবং সকল সৃষ্টির মূলে কি কোনো বিশ্বচৈতন্যময় পুরুষ বিদ্যমান নাই, যিনি বিশ্বের সুখ-দুঃখে—সীমাবদ্ধ বস্তুর হর্ষ-বিষাদে—বিচলিত হন? এই বিশ্বচরাচর যাঁহার বাঁশী, এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক বস্তু যে বাঁশীর ছিদ্র, এবং সেই প্রাণস্বরূপের আহ্বান-গীতি যে সেই ছিদ্রপথে নিরন্তর উদ্গীরিত হইতেছে এবং সকলে যে সেই বাঁশীর স্বর অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে কি আমাদের শূন্যের দিকেই বৃথা অভিসার? কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

> বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,
> এ জীবন নিশার স্বপন।
>
> —জীবনস্বপ্ন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বসংসার যদি মায়া বা স্বপ্ন হয়, তবে তাহা কাহার মায়া, কাহার স্বপ্ন? সচেতন সহৃদয়তা কি কোথাও নাই? সমস্তই নিরাশ্রয়—ইহা হইতেই পারে না। এই যে দেখি ঘাস প্রাণপণ চেষ্টায় চোরকাঁটারূপে উদ্গত হইয়া বীজ ফলাইতেছে, সেই ঘাসের বীজ আর-একটু উন্নত হইয়া খেঁড়ি কাওন চীনা প্রভৃতি শস্য হইয়া নিকৃষ্ট হইলেও খাদ্য-রূপে পরিণত হইতেছে, তাহার পরে সেই-সব ঘাস ধান হইয়া উঠিতেছে; ধান কাশ শর নল খাগ্ড়া রূপ ধরিয়া ধরিয়া ক্রমে বাঁশ হইয়া উঠিতেছে; বাঁশ ক্রমে শর্করাবহুল মধুর রস ইক্ষুতে পরিণত হইতেছে, এবং এইরূপে রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া করিয়া বস্তু প্রাণের প্রেরণার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। ইহার মূলে কি বিশ্বপ্রাণশক্তির স্নেহ-মমতা কিছু

নাই? যেখানে কেবল দেওয়া, লওয়া নাই, অথবা কেবলই লওয়া, দেওয়া নাই, সেখানে তো আবির্ভূত হয় মরুভূমি। রবীন্দ্রনাথ এই ঋণশোধের কথাটি তাঁহার 'শারদোৎসব' নাটকে বিশদ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

৪

বস্তু-জগতের অন্তরালে একটি অসীম অব্যক্ত জগৎ আছে। সেখানে সমস্ত জগতের বিচিত্রতার প্রতিভাস পূর্ণতায় দেদীপ্যমান। আবার সেই পূর্ণতারই প্রতিধ্বনি ও প্রতিভাস সমস্ত খণ্ড সুরে ও খণ্ডসৌন্দর্যে পাওয়া যায়। পাখীর গান, নির্ঝরের শব্দ সেই মূল সঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি। সেইজন্য খণ্ডসৌন্দর্য মূল অখণ্ডসৌন্দর্যকে পাইবার বেদনা অন্তরে জাগাইয়া দেয়। খণ্ড-সঙ্গীতের সুসঙ্গতিতে—হার্মনীতে—এক বিপুল সঙ্গীত সৃষ্ট হয়। (তুলনীয়—প্রভাত-সঙ্গীতে 'প্রতিধ্বনি' কবিতা)।

যেখানে খণ্ডসৌন্দর্য সেইখানেই তাহার মধ্যে অসীম অব্যক্ত জগতের আভাস পাওয়া যায়,—প্রাণ মহাপ্রাণকে, প্রেম পরমপ্রেমকে অনুসন্ধান করে। এইরূপে জগৎ নিরন্তর দান করিতেছে এবং তাহার প্রতিদান চাহিতেছে। অসীমের নিকট হইতে সীমা যত কিছু পাইতেছে, তাহার ঋণ শোধের জন্যই সীমা ক্রমাগত অসীমকে লাভ করিবার তপস্যা করে। সীমা ক্রমাগত ত্যাগ করিয়া, দান করিয়া নিজের প্রাপ্তির পরিচয় দেয়; ত্যাগের মধ্যেই প্রাপ্তির পরিচয় নিহিত থাকে, যে যতটুকু দান করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে তাহার ধনশালিতার পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপে সীমা ক্রমাগত অসীমের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং অসীম ক্রমাগত সীমার বন্ধনের ভিতর ধরা দিতেছে, এইরূপ প্রীতির আদান-প্রদানে উভয়ে সার্থক হইতেছে। এই যে পৃথিবীর নব নব রূপ-পরিগ্রহ তাহা সে কোথায় পায় এবং কাহার পরিতোষের জন্য তাহার এই বিচিত্র আয়োজন? প্রেমের প্রতিদানে প্রেম, প্রাণের প্রতিদানে প্রাণ, ক্ষুদ্রতার প্রতিদানে ভূমা যে পাওয়া যায়, তাহা কি সেই নির্গুণ, নির্বিকল্প মহাশূন্যতার মধ্যে সম্ভব? ইহা কখনই সত্য নহে যে এক মহামন মহাপ্রাণ সমস্ত সীমার অন্তরালে বসিয়া নাই।

শুধু গতি, শুধু কর্ম, শুধু শব্দ শেষ কথা নয়; শুধু জগৎও চরম অনুভূতি নয়। গতিকে পূর্ণতা প্রদান করে যেমন স্থিতি, কর্মকে পূর্ণতা প্রদান করে যেমন বিশ্রাম, এবং শব্দকে পূর্ণতা প্রদান করে যেমন নীরবতা; অথবা স্থিতিই

যেমন গতির স্বাভাবিক পরিণতি ; সেইরূপ জগৎকে পূর্ণতা প্রদান করে 'চিরদিন' বা সত্য ; অন্য কথায় বলা যায়, সত্যই জগতের স্বাভাবিক পরিণতি—জগতের অন্তরালে এই সত্য চির-বিরাজমান।

জগৎ ও সত্য—পরস্পর-বিরুদ্ধধর্মী ; জগৎ দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত, সান্ত এবং অনিত্য, আর সত্য দেশ-কালাতীত, অপরিমেয়, অনন্ত এবং নিত্য। তথাপি জগতের সহিত সত্যের নিত্যকালের সম্বন্ধ রহিয়াছে। জগৎ ভাষা, সত্য ভাব ; জগৎ সত্যের বহির্বিকাশ, এবং সত্য জগতের অন্তর্ভাব। সুতরাং ইহারা উভয়ে পরস্পরের অপরিহার্য অঙ্গ—একটির অভাবে অপরটি অপূর্ণ অর্থহীন।

জগৎ মিথ্যা নয়,—ইহা সত্যেরই অপূর্ণ অভিব্যক্তি। সত্য আপনাকে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জগৎকে দিয়া পূর্ণতার সাধনা করাইয়া লয়। তাই ক্ষণিক জগৎ অমরতা চায়, জড় জগৎ চেতনা চায়, দুঃখময় জগৎ অফুরন্ত ও পূর্ণ আনন্দ চায়। সত্যই জগতের পূর্ণ আদর্শ, তাই সে সত্যের সহিত যুক্ত হইতে চায়, সত্যময় হইয়া যাইতে চায়।

নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যায় এবং অবশেষে উহাতে আত্মবিসর্জন করিয়া পূর্ণতা লাভ করে, জগৎও সেইরূপ সত্যের দিকে ছুটিয়া চলে এবং পরিশেষে উহারই মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া পূর্ণ হইয়া যায়।

কবির হৃদয়ে জগতের এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ; তিনি নিজে এই রসের আস্বাদন করিয়াছেন এবং সকলকে ইহার স্বাদ গ্রহণ করাইবার জন্য কবিতার ভিতর দিয়া সেই রস বিতরণ করিয়াছেন।

এই কবিতার সহিত মানসী পুস্তকের 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'শূন্য গৃহে' কবিতা দুইটি তুলনীয়।

শেষ কথা

মানুষের মনে অনন্ত অনুসন্ধিৎসা আছে। সে যে অনন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়াছে, সেই সীমাকে সে নিরন্তর উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার চেষ্টা করে সকল ক্ষেত্রে। এইজন্য সে অবিরত সীমার শেষ দেখিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু এক সীমা শেষ হইলে অপর সীমা তাহাকে আহ্বান করে। এইরূপে তাহার অগ্রগমনের কোনো শেষ নাই, কারণ—'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বল্‌বে ?' এবং 'শেষের মধ্যে অশেষ আছে।' সেই অশেষকেই মানুষ জানিয়া

বলিয়া ফুরাইতে চায়, কিন্তু অফুরানকে কখনো ফুরানো যায় না, তাই তাহার শেষ কথাও আর কখনো বলা হয় না। এই শেষ কথা বলিবার ব্যগ্রতায় ইংরেজ কবি রবার্ট্ ব্রাউনিং একদিন আকুল আগ্রহে বলিতে চাহিয়াছিলেন—

One Word More!

কবি অনন্তেরই কথার ভাণ্ডারী ও ভাষার কাণ্ডারী, তিনি যতই কথা বলেন ততই তাহা সীমাহীনের সীমা পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া চলে। এবং শেষ কথা যদি কখনও তিনি বলিতে পারেন তবেই তাঁহার বাণী সার্থক হইবে, নতুবা নহে। এই বেদনাই কবিকে উতলা করিয়া ক্রমাগত কথা বলায়।

গান

'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে কতকগুলি বড় কবিতা ও সনেট ছাড়া কতকগুলি চমৎকার সুন্দর গান আছে। সেগুলি লিরিক্ কবিতা হিসাবেও অতি সুন্দর। সেগুলি গীতধর্মী বলিয়া চয়নিকা ও সঞ্চয়িতার সংগ্রহের মধ্যে স্থান পায় নাই। যাঁহারা কেবল মাত্র ঐ দুই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন তাঁহারা কৃপার পাত্র, তাঁহারা অনেকে উত্তম কবিতার রসগ্রহণে বঞ্চিত থাকিয়া যান।

মায়ার খেলা

ইহা গীতিনাট্য। ইহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। কবি এই বই সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

> বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুতঃ মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।

১২৯৯ সালে সাধনা পত্রিকায় 'মায়ার খেলা'র গানের স্বরলিপি ছাপা হয়। পরে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সমগ্র পুস্তকের গানের স্বরলিপি ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশ করেন।

এই নাট্যের বিষয় হইতেছে—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে ?
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে।

পুরুষ যাহাকে দেখিয়া একদিন মনে করিল যে—'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত', তাহাকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া সেই বসন্তের মোহে মায়ার খেলায় ভ্রান্ত হইয়া খুঁজিতে চলিল—'কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে' !

কবির কৈশোরের কাব্য কবিকাহিনী ও ভগ্ন-হৃদয়ের মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত দেখিয়াছি, সেই তত্ত্বটিই এখানেও দেখিতে পাই,—নিকটে কামনার ধন থাকিতেও মানুষ ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে দূরে খুঁজিতে যায়, পরে কোথাও না পাইয়া সে যখন ফিরিয়া আসে, তখন সেই নিকটকেও হারায় ও আক্ষেপ করে।

(তুলনীয়—পরশ-পাথর)

পুরুষ যখন বলে—

দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।

তখন তাহার কামনার ধন 'মরমে মরিয়া বলিতে নারিল হায়'—

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো !

তখন লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া যায়, আর মায়াকুমারীরা গাহিয়া উঠে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

এই নাট্যকাব্যের সহিত পূর্বরচিত ও প্রথম রচিত গদ্য ও নাটক 'নলিনী'র উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'কড়ি ও কোমলে'র যৌবন-সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ ও 'মানসী'র মানসসুন্দরীর জন্য অন্বেষণ-জনিত দুঃখবাদ—এই দুই-এর মাঝে যখন কবির মন দোল খাইতেছে—তখনই মায়ার খেলা রচিত হয়।

—রবীন্দ্রজীবনী

মানসী

রবীন্দ্রনাথের যখন পূর্ণ যৌবন সেই সময়ের লেখা কবিতাগুলি একত্র হইয়া মানসী নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪ সালের বৈশাখ হইতে ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত যে-সকল কবিতা লেখা হইয়াছিল, সেইগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরেজী ১৮৮৭ হইতে ১৮৯০ সাল। ১৮৯০ সালের আগস্ট মাসে, অর্থাৎ বাংলা ১২৯৭ সালের ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাতে যাত্রা করেন এবং নভেম্বর বা কার্ত্তিক মাসেই ফিরিয়া আসেন; মোট আড়াই মাস বিলাতের পথে যাতায়াতে ও বিলাত-বাসে অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে লিখিত চারিটি কবিতা এই মানসী পুস্তকে আছে। অপর কবিতাগুলির অধিকাংশই গাজীপুরে লেখা। পুস্তক প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ।

এই সময়ে রবীন্দ্র-প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে কবির চেতনা জাগিয়াছে, এবং দৃঢ়তার সহিত আপনার কবি-কল্পনাকে তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইজন্য অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই মানসীকে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ বলিয়া (১৩২৬ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রে) নির্দেশ করিয়াছিলেন।

মানসীতে কবির প্রকাশ-সামর্থ্য সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার চিন্তাশক্তি সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তিনি দেশের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয় নিপুণতার সহিত ও মমতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, কবি আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়াছেন। এই সময় হইতে কবি তাঁহার রচনার তারিখ নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই পুস্তক সম্বন্ধে কাজী আব্দুল ওদুদ লিখিয়াছেন—

মানসীতে কবি দক্ষ স্রষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। ভাব ছন্দ প্রকাশ-ভঙ্গিমা সমস্তেরই উপর পর্যাপ্ত অধিকারের জন্যে এই মানসীর সময় থেকে যত কবিতা তিনি লিখেছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু প্রশংসাযোগ্য আছে। জগতের অতি অল্প কবি সম্বন্ধেই এত বড় কথা বলা যেতে পারে।...তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুভূতি সন্ধানপরতা আর প্রকাশ-ভঙ্গিমার গুণে সাধারণ লেখকের স্তরে তিনি প্রায় কখনো নেমে পড়েন নি; এটি যেন তাঁর প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব।

মানসীতে ছন্দের রাজা রবীন্দ্রনাথ ছন্দের উপর তাঁহার অধিকার কায়েমি ভাবে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। ইউরোপীয় ছন্দের অনুরূপ নানা ধরণের নব নব ছন্দ তিনি সৃষ্টি করিলেন, মাইকেল ও হেমচন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া কবিতায় স্ট্যাঞ্জা-বিভাগ অবলম্বন করিলেন। এতদিন পর্যন্ত বাংলার কবিরা অক্ষর গণিয়া কবিতা রচনা করিতেছিলেন; গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম মানসীর মধ্যেকার কবিতার মাত্রা বা সিলেব্‌ল গণিয়া কানে শুনিয়া তালবোধের দ্বারা কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন। এইটি বাংলা ছন্দে তাঁহার একটি বিশেষ দান। এখন হইতে কবি যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বরকে দুই মাত্রা ধরিয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন।

মানসীর কবিতাগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি—প্রথম, প্রেমের কবিতা; দ্বিতীয়, দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতা; তৃতীয়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা ও অমোঘ নিয়তির সম্বন্ধে কবিতা।

তাঁহার প্রেমের কবিতায় এখন একটি শান্ত সমাহিত ভাব আসিয়াছে, কড়ি ও কোমলের সেই উদ্দাম উচ্ছ্বাস অনেকখানি সংযত হইয়া আসিয়াছে, অথচ যৌবনের আনন্দ-আবেগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কড়ি ও কোমলের কবিতার মধ্যে দেহের সৌন্দর্য যেমন করিয়া কবিকে বিহ্বল করিয়াছিল এবং সেই মোহবিহ্বলতা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য তিনি যেমন ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন, মানসীর প্রেমের কবিতার মধ্যে তাহা আর দেখা যায় না। কবি-চিত্ত যেন একটি সহস্রতন্ত্রী বীণা, তাহাতে যেমন সোনার তার আছে তেমনি তাহাতে লোহার তারও আছে; সেই লোহার তারও যদি না বাজিত তাহা হইলে বীণার সঙ্গীত অসম্পূর্ণ হইত; আবার সেই লোহার তারই যদি কেবল বাজিত অথবা প্রধান হইয়া বাজিত, তাহা হইলেও সঙ্গীত বেসুরা হইত। কবির প্রেমের কবিতায় সেইজন্য দৈহিক সৌন্দর্য একেবারে বাদ যায় নাই, আবার দেহই প্রধান হইয়া থাকে নাই। দেহে মনে মিশিয়া সৌন্দর্য যে সম্পূর্ণ অনির্বচনীয়তা লাভ করে তাহারই বন্দনা কবি গাহিয়াছেন। মানসীর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেই নরনারীর পরস্পর আকর্ষণের সুসঙ্গতি হইয়াছে,—একদিকে মানবীয় ভাবে কবিতাগুলি চিত্তাকর্ষক, আর অন্যদিকে সংযত শালীনতায় তাহারা হৃদয়প্রসাদন।

দেশের অবস্থার দিকে, সমাজের অবস্থার দিকে, দেশের লোকেদের মানসিক দুর্গতির দিকে কবি এই প্রথম দৃষ্টিপাত করিলেন। যে কবি দেশের বাণী

যিনি দেশের লোকের আত্মচৈতন্য জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের দুর্গতি দীনতা সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি দেশের মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা যোগাইয়াছেন, যিনি স্বদেশের গৌরব উপলব্ধি করাইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টি প্রথম এই মানসীতেই দেশের ত্রুটি ও দেশবাসীর চরিত্রের গলদ দেখিতে আরম্ভ করিল। এখনও তিনি গভীর দরদী হইতে পারেন নাই, লঘু বিদ্রূপের দ্বারা তিনি দেশের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন মাত্র।

মানসীর প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির মধ্যে একটা ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব আছে, আর আছে গভীর নিগূঢ় রহস্যময় চিত্রপরম্পরা। শব্দশিল্পী কবি কথা দিয়া ছবির পরে ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন প্রায় সকল কবিতাতেই। মানসীতেই প্রথম প্রকৃতির মমতাহীন নিষ্ঠুর দিক্‌টি কবির কাছে ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতি যে শুধু স্নেহময়ী মাতা নহেন, ধ্বংসকারিণী রাক্ষসীও বটে,—এ তত্ত্ব কবি মানসীতেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন—তিনি বুঝিতেছেন যে যিনি শিব তিনিই রুদ্র, তিনি বুঝিতেছেন জগতের সহিত মানবের সম্বন্ধ পারস্পরিক।

মানসীর প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিচ প্রেমের জীবনের খুব গভীরতার পরিচয় আছে, যে প্রেম 'জীবন-মরণময় সুগম্ভীর কথা' বলিবার জন্য ব্যাকুল; যে প্রেমের 'ধ্যান'-নেত্রে 'যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে তুমি-আমি একাকার', যে প্রেম আপনাকে জন্ম-জন্মান্তরে অনন্ত বলিয়া জানে,—তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়, তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে না, এমন একটা ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারম্বার প্রকাশ পাইয়াছে।

—অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশভঙ্গীর দুটি রূপ—রহস্যময় বংশীবাদকের রূপ আর সমাহিতচিত্ত দ্রষ্টা ঋষির রূপ। মানসীতে বংশীবাদক কবির সঙ্গীতের সুরই প্রধান হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

উপহার

মানসীর প্রথম কবিতা 'উপহার' অনেক পরের লেখা, ৩০-এ বৈশাখ ১৮৯০ সালের তারিখ দেওয়া আছে। কবি বলিতেছেন যে—

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত।

জগতের বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিয়া কবি বলিতেছেন—

এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী-প্রতিমা।

বিশ্বের বিচিত্র স্পর্শানুভবের ফলে কবির মনে যে ভাবময়ী বাণী রূপ গ্রহণ করে সেই হইল তাঁহার মানসী। অসীম ক্রমাগত সীমার ভিতর দিয়া কবির চিত্ত স্পর্শ করে, এবং কবিও সেই সীমার দ্বারা অসীমকে পরিব্যক্ত করিয়া চলেন। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।'

ভুলভাঙা

(১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে রচিত)

প্রণয় ক্ষীণবেগ হইয়া আসিয়াছে, এখন আর আগের মতন মাদকতা নাই। এককালে প্রণয় ফুলের মালার মতন সুন্দর তাজা ছিল, এখন সেই মালার ফুল শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কেবল সেই ফুল গাঁথিবার ডোর স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট আছে। হৃদয়ে প্রেম নাই, মনে আর মাদকতা নাই, কাজেই আগের মতো চোখে আর নেশা লাগে না, প্রেমের অঞ্জন মুছিয়া গিয়াছে বলিয়া ধরণীর শোভা আর চিত্ত মোহিত করে না। মনে আনন্দ-আবেগ নাই বলিয়া নিসর্গশোভার মধ্যে আগেকার সেই আনন্দ-সমারোহ ও প্রাচুর্য আর অনুভব করি না। তুলনীয়—

There was a time when meadow, grove and stream,
The earth and every common sight,
To me did seem
Apparell'd in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.
It is not now as it has been of yore;......
Turn wheresoever I may,
By night or day,
The things which I have seen I now see no more:

* * * * *

That there hath pass'd away a glory from the earth!

—Wordsworth, *Ode on The Intimation of Immortality of the Soul.*

প্রণয়ের আহ্বানে একদিন যেই ধরা দিলাম, অমনি সুলভ হইয়া যাওয়াতে প্রণয়ের সেই আগ্রহ আবেগ বন্ধ হইয়া গেল এবং এখন গলার মালা চরণের শিকল ও গলার ফাঁসি হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রেম গিয়াছে, কেবল লোক-দেখানো প্রাণহীন আদর মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহাতে লজ্জা ছাড়া গৌরব নাই। যেখানে প্রেম নাই, কেবল মামুলি সম্পর্ক-রক্ষা, তাহা তো পীড়াদায়ক অপমান! তথাপি, আমি যে না বুঝিয়া তোমার কাছে আসি, ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সন্দেহ নাই এবং মনের মধ্যে প্রণয়ের আবেগ না থাকাতে আমার সঙ্গ তোমাকে ক্লান্ত করিতেছে। আগে আগ্রহের আবেগে রাত্রিতে নিদ্রা আসিত না, আর এখন আমি আসিয়াছি বলিয়াই ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। অতএব আর আমি তোমাকে পীড়া দিব না, আমিও অপমান বহন করিব না, তুমি ঘুমাও, আমি বিদায় হইলাম। আগ্রহহীন প্রেমস্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া জীবনযাপন বিড়ম্বনা।

'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন'

(জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৭ এবং ৯ই ভাদ্র, ১৮৮৯)

এই দুটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ পয়ার ছন্দকে একটি নূতনতর রূপ ও মিষ্টতা দান করিয়াছেন। পয়ারের নিয়ম হইতেছে যে, প্রত্যেক চরণে চৌদ্দ অক্ষর থাকে, এবং প্রত্যেক আট অক্ষরের পরে যতি থাকে; অর্থাৎ পয়ারের চরণের তাল ভাগ হইতেছে ৮ আর ৬। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি কবিতায় প্রত্যেক চরণে চৌদ্দ অক্ষর রাখিয়া তাল ভাগ করিয়াছেন তিন চার, চার তিন হিসাবে, এবং দুই প্রান্তের তিনের মধ্যবর্তী চারের পরে মিল রাখিয়াছেন।

যথা—

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।

অথবা—

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙ্গা দ্বার খুলিয়া।

কবি তাঁহার মানসী বা মানসসুন্দরীর সহিত মিলনের সৌভাগ্য লাভ করেন, কিন্তু সে সৌভাগ্য ক্ষণিক-মিলনের। তাহার পরেই বিরহ; কিন্তু বিরহেও কবি আনন্দ উপভোগ করেন, মিলনের উদ্দাম চঞ্চলতা দূর হওয়াতে কবি 'বিচ্ছেদের শান্তি' অনুভব করেন, কারণ তখন তিনি তাঁহার মানস-প্রেয়সীকে বলিতে পারেন—

সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরম্ ইহ বিরহো ন সঙ্গমস্ তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব যদ্ একা, ত্রিভুবনম্ অপি তন্ময়ং তদ্ বিরহে॥

বিরহ তাহার সনে অথবা মিলন,—
এ দুয়ের মধ্যে ভাল বিরহ-ঘটন;
যে প্রিয়তমার সনে হইল মিলন,
সে মূর্তি একটি মাত্র করি দরশন;
কিন্তু হ'লে তার সনে বিরহ-ঘটন,
সকলি সে-রূপময় হেরি ত্রিভুবন!

[তারাকুমার কবিরত্নের অনুবাদ]

নিষ্ফল কামনা

(১৩ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ সাল ; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

এই কবিতাটি সম্বন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ লিখিয়াছেন—

"এ-সমস্তের মুকুটমণি হচ্ছে নিষ্ফল কামনা। এর ছন্দ যতি ভাবাবেগের বিপুলতা চিন্তার অতলস্পর্শতা প্রকাশ-ভঙ্গিমার অব্যর্থতা—সমস্তের মিলনে সৃষ্টি যে অপরূপ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে কি কথায় তার যোগ্য প্রশংসা হ'তে পারে! ৭৯ লাইনের কবিতা এটি, অথচ কোথাও এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু দীনতা প্রকাশ পায় নি!—এই কবিতাটিকে আমরা কত উঁচুতে স্থান দিই, তা শুধু এই কথাতেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে এ রকম আর দুটি কবিতার সাক্ষাৎ আমরা পাই—চিত্রার 'উর্বশী', আর বলাকার 'বলাকা' কবিতাটি। এগুলো কাব্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একথা বল্‌লে অতি সামান্যই বলা হয়। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে আরো আছে। অনুভূতির আগ্নেয়োচ্ছ্বাস-মুখে কি গগনস্পর্শী সৃষ্টির অধিকার বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন এসব তারই প্রমাণ।"

এই কবিতাটির আর-একটি বিশেষত্ব এটি অমিত্রাক্ষর অসমচ্ছন্দে লিখিত। যে অসমচ্ছন্দ বলাকার কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়া এখন বহু কবির উপজীব্য হইয়াছে, সেই অসমচ্ছন্দের গোড়াপত্তন এইখানে। এই হিসাবেও এই কবিতাটির বহুমূল্যতা আছে।

এই কবিতার অন্তর্নিহিত কথাটি হইতেছে এই—সৌন্দর্যের সহিত ভোগ-প্রবৃত্তির আবেগের মিশ্রণে মোহ উৎপন্ন হয়; কিন্তু বাসনা-বিবশ মনে বেদনা জাগে, মনে হয়—বাসনা সব ম্লান করিয়া দিতেছে,—তাহার জন্য বৃহতের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—অতএব প্রেমের দ্বারা ভোগ-প্রবৃত্তিকে জয় ও দমন করিতে হইবে। কবি ক্রমশঃ অনুভব করিতেছেন যে, বাসনা দগ্ধ না করিলে যথার্থ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। এই জন্যই শিব পার্বতীকে পাইবার পূর্বে কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন।

আবার প্রেমই সব নয়, সমস্ত পরিপূর্ণতার সে একটি অঙ্গ মাত্র; বাসনা বিহীন প্রেম অসম্পূর্ণ। অতএব ভোগকে পরিবর্জন করিলে সেই পরিপূর্ণতার অসমাপ্তি ঘটিবে।

প্রেম ও কাম এই দুইয়ের সমন্বয়ের একমাত্র উপায় হইতেছে ভোগক্ষুব্ধ যৌবনকে অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতির মধ্যে নিমজ্জিত করিতে হইবে; যাহাকে বৈষ্ণব দার্শনিক বলিয়াছেন তটস্থ ভাব, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

কবি সৌন্দর্যের উপাসক, সেইজন্য সৌন্দর্য-সম্ভোগে তিনি তৃপ্ত। কিন্তু এই ভোগের ভিতরে আকণ্ঠ নিমজ্জনে তিনি যেন স্বস্তি পাইতেছেন না; কেমন একটা অনির্দিষ্ট ব্যথায় কবি-চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে, এবং তাঁহার কবি-চিত্ত ব্যথায় মথিত হইয়া ভোগ হইতে মুক্তি কামনা করিতেছে। কবিতাটিতে কবি-হৃদয়ের ভাবদ্বন্দ্ব হর্ষে ব্যথায় জড়িত হইয়া জটিল হইয়া পরিব্যক্ত হইয়াছে।

সৌন্দর্যের উপাসক কবির নিকট কিন্তু প্রকৃতি-রহস্য ও সৃষ্টি-রহস্য অর্ধ-উন্মুক্ত অর্ধ-অবগুন্ঠিত। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টার বিফলতার জন্য কবির দুঃখ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

যৌবনের প্রণয় কবির জীবনে এক নূতন আস্বাদ আনিয়া দিয়াছিল। অনভ্যস্ত সুরাপায়ীর ক্ষণিকের উল্লাস ও পরমুহূর্তের অবসাদ, ক্ষণে হাতে স্বর্গ পাওয়া ও ক্ষণে গভীর নিরাশা ও জীবনে বৈরাগ্য পর্যায়ক্রমে যুব-চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে, কিন্তু এই-সকলের মধ্যেও কবি-হৃদয় তাঁহার প্রেমাস্পদের সম্মুখে নিত্য নত হইয়া আছে। কারণ মানব-হৃদয়ের প্রেম এক অনন্ত সম্পদ্, এক অগাধ রহস্য। যে এই প্রেমের কাছে আপনাকে বিকাইয়া দেয়, সে প্রেমাস্পদকে অনন্ত বলিয়াই অনুভব করে। কবি নিজেই অন্য স্থানে বলিয়াছেন যে—'জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা।' —(পঞ্চভূত, মনুষ্য)

কবি-চিত্ত যাহাকে ভালোবাসিয়াছে, সেই প্রেমাস্পদের আকারের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া কবি তাহার তো নাগাল বা শেষ পাইতেছেন না, তিনি তাহার মনের ও আত্মার দর্পণ চোখ দুটির দিকে চাহিয়া—

খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!

তিনি প্রণয়িনীর আত্মার রহস্য-শিখার আলোকে প্রণয়িনীকে সম্পূর্ণ চিনিয়া লইতে চাহিতেছেন। কবি বলেন, 'তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যতদূর আমি ধাই', কোথাও তো তোমার অন্ত পাই না। কারণ, তুমি তো অনন্ত—

তোমারে কোথায় পাবো,
তাই এ ক্রন্দন!

মানুষের কেবল আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!

সেই অনন্তকে পাইতে হইলে অনন্ত প্রেম আবশ্যক; মানবের বক্ষে অনন্ত অভাব, তাহা মোচন করিতে হইলে তো অনন্ত প্রেম বিনা চলে না।

আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাইতে
জীবনের অনন্ত অভাব?

যে নিজে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, যাহার নিজেরই অনন্ত অভাব,

সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে?

মানব মানবের কামনা-লালসা-নিবৃত্তির পাত্র নহে, সে কাহারও একান্ত নিজস্বও নহে। সে—

বিশ্ব-জগতের তরে, বিশ্বপতি তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি';
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?

মানুষ কেবল ভালোবাসিতে পারে। প্রিয়জনের মনের হৃদয়ের আত্মার

যেটুকু পরিচয় সে আভাসে পায়, তাহার বেশী সে চাহিলেও পাইবে না। অতএব—

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের!

যাহা দুর্লভ তাহাকে পাইবার বাসনা পোষণ করিলে নিষ্ফলতার দুঃখ-ভোগ অনিবার্য, আবার বাসনা-বিসর্জনের মধ্যেও দুঃখ আছে। তবু—

নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে।

প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণ না পাওয়া গেলেও তাহার প্রতি প্রেমের আকর্ষণ হ্রাস হইয়া যাইবার কোনো আশঙ্কা নাই, কারণ সম্পূর্ণ পাওয়া হইয়া গেলে তো আর কোন মোহ থাকে না, অসম্পূর্ণ পাওয়াতেই তো আগ্রহ সজীব থাকে। এই জন্যই—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদঃ
লক্ষান্তরে ভানুর্ জলেষু পদ্মঃ।
ইন্দুর্ দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধুঃ—
যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরম্॥

যে যাহার হৃদয়বল্লভ সে যতদূরেই থাকুক তাহাকে দূরস্থ মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মেঘদূত' নামক প্রবন্ধে এবং লিপিকার 'মেঘদূত' ও পুনশ্চের 'মেঘদূত' গদ্য-কবিতায়ও এই কথাই বলিয়াছেন। মানুষের আত্মা মন হৃদয় অনন্ত-প্রসারী, তাহার একাংশের মাত্র পরিচয় মানুষ পাইতে পারে, এবং পরিচয় সম্পূর্ণ পাইয়া মানুষকে মানুষ ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না বলিয়াই তাহার প্রতি অনুরাগের আকর্ষণও অফুরান হয়। আকার সীমা মাত্র নহে, তাহা অসীমকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিবার উপায় মাত্র। তুলনীয়—

"Some think, Creation's meant to show him forth,
I say, it's meant to hide it all it can."

—Robert Browning.

Mrs. Browning-এর *Inclusions* কবিতাটিও ইহার সহিত তুলনীয়।

সংশয়ের আবেগ

(১৫-ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭)

প্রেমাস্পদকে ভালোবাসিয়া ভালোবাসার প্রতিদান পাইয়াছি কি না, এই সংশয়ে মানুষ পীড়িত হয়। সংশয়ের দ্বিধার মধ্যে থাকা অত্যন্ত ক্লেশকর। অতএব হে প্রিয়, তুমি ঠিক করিয়া জানাইয়া দাও যে তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না।

ভালো বাসো কি না বাসো বুঝিতে পারি না।

যদি ভালোবাসা নাই থাকে, তবে কেবল মিথ্যা আশায় মরীচিকার পিছনে ফিরিয়া কি লাভ! বরং অবহেলা করো, আঘাত করিয়া ভুল ভাঙিয়া দাও, তথাপি সংশয়-ডোরে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়ো না, কারণ,—

জীবনের কাজ আছে, প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

বিচ্ছেদের শান্তি

(১৪-ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭)

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন যে, সংশয়ে দ্বিধান্বিত হইয়া থাকার চেয়ে একেবারে নিঃসংশয়ে যদি জানা যায় যে, ভালোবাসা পাইবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে অনেকটা শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। এক প্রেম নষ্ট হইলে আবার নূতন প্রেম পাওয়া যাইতে পারে, জগতে কেহই কাহারও জীবনে অপরিহার্য নহে।

এই কবিতার সুর কবির পরবর্তী বহু কবিতায় বাজিয়াছে। শাজাহানের ন্যায় প্রেমিককে তিনি বলিয়াছেন—

কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার। —শাজাহান

এবং 'ক্ষণিকা'র মধ্যে তিনি রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—

যাবই আমি যাবই ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই,
তোমায় যদি না পাই তবু
আর কারে তো পাবই।

তবু

(১৫-ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭)

এটি একটি সনেট, মুক্তার ন্যায় নিটোল, সমুজ্জ্বল এবং মহামূল্য। যদিও কবি জোর করিয়া বলিয়াছেন যে, 'সেই ভালো, তবে তুমি যাও',—সংশয় রাখার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দাও যে আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না এবং সেই আঘাতে চেতনার বেদনা জাগাও; তবু তাঁহার অন্তর হাহাকার করিয়া বলিতেছে—'তবু মনে রেখো'। যাহাকে একদিন ভালোবাসিয়াছি যাহার ভালোবাসা পাইয়াছিলামও হয় তো, সেই ভালোবাসা হ্রাস হইয়া গেলেও, একেবারে না থাকিলেও, প্রাণ কাতর হইয়া প্রার্থনা করে—তবু মনে রেখো। প্রেমাস্পদের মনের কোণেও আমার একটু স্থান আর থাকিবে না, এই সম্ভাবনা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

'নিষ্ফল প্রয়াস' ও 'হৃদয়ের ধন'

(১৮-ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭)

এই দুইটি সনেট। এই দুইটিতেই 'নিষ্ফল কামনা' কবিতার সুর বাজিয়াছে। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতে আমরা কবির যে বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়াছি, এই দুইটি সনেটেও সেই ভাব পাওয়া যায়। কবি রূপসীর রূপ দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, তাহার নিজের রূপে সে কি মুগ্ধ হইয়াছে? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে তো তাহার সৌন্দর্য সর্বজনমনোহর নহে; তবে পুরুষ আমরা কেন মুগ্ধ হই? এই সৌন্দর্যের মধ্যে তাহা হইলে তাহার আত্মগত মোহনতার ধর্ম নাই। অতএব—

রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস!

অনেক নিষ্ফল প্রয়াসের পরে ইহা জানা যায় যে—

নাই, নাই—কিছু নাই,—শুধু অন্বেষণ!
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

নারীর উক্তি

(২১-এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ ; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

নারী বলিতেছে যে, ভালোবাসাতেই দাম্পত্যের সার্থকতা ; প্রেমহীন সামাজিক সম্পর্কমাত্র তো ব্যভিচারেরই রূপান্তর। সুলভতায় প্রেমের সর্বনাশ ঘটে ; দুর্লভতায় প্রেম নবীভূত ও আগ্রহান্বিত থাকে। কোনো কামনার বস্তু হাতে পাইয়া কোনো সুখ নাই, আয়ত্ত হইলেই তাহার জন্য আর কামনা থাকে না ; বস্তুকে পাওয়ার জন্য উদ্যমেই এবং পাইবার আশাতেই সব সুখ, বস্তুর সকল মূল্য। এই কবিতাটির মূল মর্মকথাটি একটি কলিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে—

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও-হাসি এতই মধু,
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ?

নারী পুরুষের নিকটে কত আদর পাইতে পারে, নারীর জন্য পুরুষের যে কত আগ্রহ ব্যাকুলতা হইতে পারে, তাহা তো সে তাহার প্রণয়ীর প্রেম দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, নতুবা তাহার তো অন্য কোনো অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন সে তাহার প্রণয়ীর পূর্বাপর ব্যবহারের তারতম্য দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার প্রতি উহার প্রণয় আর আগের মতন তেমন আগ্রহময় নাই।

প্রেম সুলভতায় হ্রস্ববেগ হইয়া যায় ; ফরাসী ঔপন্যাসিক গ্যতিয়ের নভেলে মাদ্‌মোয়াজেল্ দ্য মোপ্যাঁ তাহার প্রণয়ীর সহিত মাত্র এক রাত্রির জন্য মিলিত হইয়া চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছিল, পাছে তাহার সুলভতায় তাহার প্রণয়ীর প্রণয়ের আবেগ হ্রাস হইয়া যায় এবং তাহাকে পাইবার জন্য এমন সন্ধানতৎপর আগ্রহ না থাকে। ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক ভিক্তর হিউগো যে রমণীকে ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহাকে বিবাহ করেন নাই এবং তাহাকে নিজের কাছ হইতে বরাবর বহু দূরে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পুত্রের বয়স একুশ বৎসর হইলে তবে তাহার জননীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

প্রেমের হ্রাস ও অমর্যাদা রমণী সহ্য করিতে পারে না, কারণ—

"Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence."

—Byron, *Don Juan*, Canto I.

তুলনীয়—

"Love is not love
Which alters when it alteration finds."

—Shakespeare.

"Why do you gaze with such accusing eyes
Upon me, Dear? Is it so very strange
That hearts, like all things underneath God's skies,
Should sometimes feel influence of change?"

—Ella Wheeler Wilcox, *Change.*

"Hand touches hand,
Eye to eye beckons,
But who shall guess
Another's loneliness?
Though hand grasp hand,
Though the eye quickens,
Still lone as night
Remain thy spirit and mine,
Past touch and sight."

—John Freeman, *Nearness.*
(Georgian Poetry, 1918-1919).

পুরুষের উক্তি

(২৩-এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪ ; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

নারীর অভিযোগের উত্তরে পুরুষ বলিতেছে—সমস্ত জগতের চিরন্তন লীলা-অভিনয় হইতেছে অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার অভিব্যক্তি মাত্র। অপূর্ণতা পলে পলে আপনাকে পূর্ণতার অভিমুখে টানিয়া লইয়া চলে। এই অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলার অভিনয়ের মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব। মানুষও অসম্পূর্ণ, কিন্তু তাহার অন্তরে পূর্ণতার একখানি আদর্শ গোষ্পদ-সলিলে অনন্ত আকাশের মতো প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে। সৃষ্টির অনাদি কাল হইতে মানব-আত্মা চলিয়াছে পূর্ণতার অভিসারে। অনন্ত মানব-জীবনের অপূর্ব লীলা কেবল এই চলার অভিনয় মাত্র।

অপূর্ণতা যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন শেষ হয় তাহার সকল লীলা, সকল চলা। তখন সে নির্বাণে লয় হইয়া যায়। ফুলের কুঁড়িটি দৈনন্দিন কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহার জীবনের শেষ পর্যায়ে ফলে আসিয়া পরিণতি লাভ করে। ফল ঝরিয়া পড়ে তাহার পরিণতি শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া। এইভাবে ফলেই ফুলের পরিণতি—ফলেই ফুলের নির্বাণপ্রাপ্তি। কিন্তু এই পরিণতি-লাভের পূর্বাবস্থা পর্যন্তই জীবনের চলন্ত লীলা। এই লীলা চির-অসম্পূর্ণ অথচ চির-সুন্দর, সত্য-মিথ্যায় আলো-ছায়ায় বিচিত্র। মানুষ যখন এই জীবনের চিরন্তন অভিসারের পথে চলিতে থাকে, তখন খেয়ালের ঝোঁকে সে মাঝে মাঝে ভুল করিয়া ফেলে। যে আদর্শের দিকে সে ছুটিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে হৃদয়ের মোহে ও আবেগে তাহার মনে হয় সে যেন তাহার অন্তরের আদর্শকে পাইয়াছে বাস্তবের ভিতরে, জাগতিক বস্তুর ভিতরে। কিন্তু তাহা তো পাওয়া একেবারে অসম্ভব। জগৎ গমনশীল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে জগৎ, এবং যাহা গমনশীল তাহা তো তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে নাই বলিয়াই অসম্পূর্ণ। জগতের কোনো বস্তু সম্পূর্ণ নহে, সম্পূর্ণ হইতেও পারে না। তাই মানুষ যখন আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে টানিয়া আনে, ideal-কে real করিতে প্রয়াস পায়, তখনই ideal নষ্ট হইয়া যায়।

●

মানব-হৃদয়ের প্রেমাস্পদের ছবিখানিও পরিপূর্ণ, বিশ্বের সৌন্দর্যের সকল সারসম্ভূত, 'মানস-স্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিণী স্বপ্ন-সঙ্গিনী অপূর্ব-শোভনা উর্বশী'-রই একখানি প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু 'বিশ্বের প্রেয়সী' মানস-সুন্দরী এই উর্বশী যে 'অবন্ধনা', বাতাসের তুল্য 'দুরাপণা', 'দুষ্প্রাপ্যা', তাহাকে তো সীমার ভিতর ধরিয়া রাখা যায় না। এই উর্বশীই দার্শনিকের পরমব্রহ্ম, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্; কবির মানস-সুন্দরী; তাপসের তপস্যার ধন; সত্যান্বেষীর চরম সত্য। এই অনন্ত-সুন্দরীকে বাস্তবের সীমার ভিতরে টানিয়া আনিলে তাহার অপূর্ব সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহার গরিমা লুপ্ত হয়, অ-সাধারণ তখন অতি-সাধারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই মানুষ যখন মানুষকে ভালোবাসে, পুরুষ যখন নারীকে ভালোবাসে, তখন সে খেয়ালের বশে মোহের আবেশে ভুল করিয়া বসে। হৃদয়ের পবিত্র উচ্চ আদর্শকে বাস্তবের ক্ষুদ্রতার ভিতরে টানিয়া আনিলে, তাহাকে বিশ্রী পঙ্গু খর্ব করা হয়। তখনই হৃদয়ে ব্যথা লাগে, ভুল ভাঙিয়া যায়, ভালোবাসার মোহ কাটিয়া যায়। তাই পুরুষ যখন তাহার প্রেমপাত্রী নারীকে

আপনার বাহু-বন্ধনের ভিতর একেবারে স্থূল বাস্তবরূপে পায়, তখনই তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়া বলে—"ছি ছি! এ যে অতি সাধারণ, অতি কুশ্রী, আমি তো ইহাকে চাহি নাই।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রেমের প্রতিক্রিয়া বিরাগ আরম্ভ হয়। যাহাকে সে একদিন তাহার সকল অন্তর দিয়া ভালোবাসিয়াছিল, যাহার পলকের দর্শন পাইলে সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত, এখন তাহাকে সে অনায়াসে অবহেলা করিয়া যায়, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও তাহার যেন এখন লজ্জা বোধ হয়—

নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়ি আছে,
দেবতারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করেছি খেলনা।

তখন কাঁদিয়া প্রেয়সীকে বলিতে হয়—

কেন তুমি মূর্তি হ'য়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণায়!

—ওগো আমার প্রেয়সী, কেন তুমি এত সহজে সাধারণ হইয়া আমার কাছে ধরা দিলে! কেন তুমি চিরকাল কেবলমাত্র আমার ধ্যানের ও ধারণার বস্তু হইয়া রহিলে না! আমার অন্তরে তোমার যে আদর্শ ছবিখানি ছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ, অপূর্ব সুন্দর; আর আজ যেই তুমি আসিয়া ধরা দিলে, তখন দেখি তুমি অতি সাধারণ, আমারই মতন ভিক্ষুক, অসম্পূর্ণ, imperfect!

তাই কবি শেষকালে বলিতেছেন যে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসিয়া শান্তি পায় না, কারণ মানুষ অসম্পূর্ণ, তাহার অন্তর চায় অনন্তকে অসীম-সুন্দরকে চরম সত্যকে, পরম শিবকে!

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে?

—কড়ি ও কোমল, পূর্ণ মিলন।

অনন্ত জগতের অনন্ত লীলা-অভিনয়ের গোপন রহস্যটি হইতেছে idealism। সৃষ্টির আদিকাল হইতে সমস্ত জগৎ চলিয়াছে একটি আদর্শকে লাভ করিতে, imperfection চলিয়াছে পলে পলে perfection-এর দিকে ছুটিয়া। সৃষ্টির অন্তরের পরিপূর্ণ এই যে আদর্শখানি—ইহাই হইতেছে পূর্ণব্রহ্ম, The Absolute God—সত্যং শিবং সুন্দরম্।

কবির হৃদয় চায় প্রেমাস্পদকে অনন্ত-রূপে দেখিতে; প্রেমাস্পদ আদর্শ-রূপে অনায়ত্ত চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-রূপে চিরদিন জীবনকে আকর্ষণ করিবে, যেন

তাহার রূপের রহস্য ও মনোহারিত্ব কখনো ফুরাইয়া না যায়। প্রেমাস্পদকে সীমার মধ্যে আনিলে, তাহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলে, সে আর তখন প্রাণকে নিত্য নিরন্তর নব নব আকর্ষণে টানিতে পারে না, তাই কবি আক্ষেপ করিয়াছেন।

ধরার মূর্তিমতী নারীকে কবি হৃদয়ের অনন্ত পূজা দিতে পারিতেছেন না, তাই তাঁহার চিত্ত ক্ষোভে বিমথিত হইতেছে।

পুরুষ তাহার প্রণয়িনীকে বলিতেছে—পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারাভরা সমস্ত অনন্ত আকাশ (space) জুড়িয়া সৌন্দর্য-সাগর উদ্বেল হইয়া বহিয়া চলিয়াছে, আর তাহার কেন্দ্র-রূপে তোমারই সৌন্দর্যের আবির্ভাব একদিন আমি অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই—

> সৌন্দর্য-সম্পদ-মাঝে বসি'
> কে জানিত কাঁদিছে বাসনা?
> ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই,
> ভিখারিণী হলো যদি কমল-আসনা?

এই কথাটিই হইল এই কবিতার মূল সুর।

ব্যক্ত প্রেম

(১২-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

এই কবিতাটিকে কোনও কুলত্যাগিনী প্রণয়িপরিত্যক্তা প্রেমিকার বিলাপ বলা যাইতে পারে। সে নারী পুরুষের ভোগ-লিপ্সার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে,—সে পুরুষের কাছে নিজের প্রেম ব্যক্ত করিয়া জানাইয়াছিল বলিয়া তাহার কাছে সে সুলভ বিবেচিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই সেই পুরুষ তাহাকে এখন অবহেলা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে। সেই রমণী বলিতেছে—আমি তো সহস্র রমণীর মধ্যে একজন ছিলাম সংসারের কাজে লিপ্ত, কেন তুমি আমাকে সেই সহস্রের মধ্য হইতে বাছিয়া স্বতন্ত্র করিয়া আমার অভ্যস্ত সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে? যে প্রেম ব্যক্ত হয় না, যাহা অন্তরের অন্তস্তলে লুক্কায়িত থাকে, তাহার সম্বন্ধে লোকে কিছুই জানিতে পারে না, লোকে কিছু আভাস পাইলেও তাহার প্রশংসাই করে, বলে—নিষ্কাম প্রেম, অহেতুক প্রেম, Platonic love এবং আরো কত কি। কিন্তু যেই সেই প্রেম পরিব্যক্ত হইয়া

যায়, অমনি সকলে তাহার নামে কলঙ্ক রটনা করিতে থাকে। তুমি আমার নারী-হৃদয়ের আবরণ উন্মোচন করিয়া আমার প্রেমকে দেখিয়া লইলে, যে ভালোবাসা হৃদয়ের অন্তরালে লজ্জায় সঙ্কোচে কুণ্ঠায় কাতর হইয়া লুকাইয়া ছিল তাহার গোপনতার আশ্রয়টুকু তুমি নষ্ট করিয়া দিলে। আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া এখন তুমি সকল লোকের ধিক্কারদৃষ্টির সম্মুখে রাজপথে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ। আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হইয়া তোমার ভালোবাসার আচ্ছাদন দিয়া আমার অনাবৃত ভালোবাসাকে আবৃত ও গোপন করিয়া রাখিবে, কিন্তু আজ তুমি আমাকে একেবারে নগ্ন করিয়া সকলের সম্মুখে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছ। তোমার দু'দণ্ডের ভুল ভাঙিয়া গেল বলিয়া তুমি বিমুখ হইতেছ, কিন্তু সেই ভুলের পরিণাম একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? একটি অসহায়া রমণীর সর্বনাশ করিতেছ। আমি তোমাকে ভালো-বাসিয়াছিলাম; তোমার ভালোবাসা যদি নাই পাইতাম ও আমার ভালোবাসা যদি ব্যক্ত হইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমার কেবল এই দুঃখই পাইতে হইত যে, তোমার ভালোবাসা আমি পাই নাই। কিন্তু এখন তোমার ভালোবাসা পাইয়া হারাইতে বসিয়াছি, তাহার উপর আবার কলঙ্কের লজ্জা ভোগ করিতে হইবে।

তুলনীয়—

"I think that the bitterest sorrow or pain
Of love unrequited, or cold death's woe,
Is sweet compared to that hour when we know
That some grand passion is on the wane."

—Ella Wheeler Wilcox, *Desolation.*

গুপ্ত প্রেম

(১৩-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

এই কবিতায় কুরূপার প্রণয়াবেগের ও রূপহীনতার লজ্জার দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে। কবি কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের প্রথম অর্ধে বলিয়াছেন যে—আকৃতি-বিশেষে আদরঃ পদং করোতি—আকৃতির বিশেষত্ব দেখিয়া আদর তাহাকে আশ্রয় করে। বেচারী কুরূপা মনোহর আকৃতি পায়

নাই, তথাপি সে তো মানুষ। তাহার বাহ্য আকৃতি কদাকার হইলেও, তাহার তো হৃদয় আছে, সে তো ভালোবাসা চাহিতে পারে ও ভালোবাসা দিতেও পারে। যে যাহাকে ভালোবাসে, সে তাহার প্রেমের দ্বারাই তাহার প্রেমাস্পদকে সুন্দর দেখে। এমনও তো দেখা যায় যে যাহাকে কেহ লক্ষ্যও করে না, তাহার জন্যও হয়তো একজন লোক পাগল হইয়া উঠে। হৃদয়-তলে যাহার প্রেমের আঁখি ফুটিয়া উঠে, সে সেই প্রেমের রঙে সব-কিছুকে সুন্দর দেখে। এইজন্য ইংরেজ কবি রসেটী বলিয়াছেন যে—কামনার ধন হইতেছে মানবের আত্মা, মন হৃদয়, তাহার দেহমাত্র নহে। কারণ, মনের হৃদয়ের আত্মার সৌন্দর্যই মানবের দেহকে সুন্দর করিয়া তুলে। দেহ তো নশ্বর, প্রাণের আধার বা খোলস মাত্র। তথাপি প্রেম কেন দেহের কাঙাল হয়? প্রত্যেক দেহেরই একটি নিজস্ব গঠন আছে, তাহার মতন জগতের আর কিছু অন্য দ্বিতীয় নাই; সেইটি যাহার নয়নে ধরা পড়ে সেই ঐ দেহটির জন্য ব্যগ্র হয়।

তুলনীয়—

"রূপ তো হাতের লেখা, প্রেম সে রচনা;
রূপহীনা নহে প্রেমহীনা।
লেখার এ দোষে শুধু স্পর্শিবে না কাব্য-মধু!
প্রেম ব্যর্থ হবে রূপ বিনা!"

—রূপ ও প্রেম, বেণু ও বীণা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অপেক্ষা

(১৪-ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮)

প্রেমিক তাহার প্রণয়িনীর মিলনের অপেক্ষায় ক্ষণ গণিতেছে এবং মনে মনে ভাবিতেছে সে এতক্ষণ কি করিতেছে! অপেক্ষায় অপেক্ষায়—

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে, মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা আকাশ-শেষে যেতেছে দেখা
নিদ্রালস আঁখির 'পরে ভুরুর মতো কালো।

কিন্তু এত অপেক্ষার পরে যখন দেখা হইবে, তখন কি আর তাহার সহিত কথা বলিবার শক্তি থাকিবে? সুখের আকুলতায় কথা হারাইয়া যাইবে। সন্ধ্যার অন্ধকার দুজনকে ঘিরিয়া সকলের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবে, এবং তাহাদের—

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে আলোর ব্যবধান।

কারণ,

অন্ধকারে নিকট করে, আলোতে করে দূর।

তখন—

প্রণয়-তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

মানসিক অভিসার

(২১-এ বৈশাখ, ১৮৮৮)

প্রেমিক যখন নিজের প্রেয়সীর কথা চিন্তা করিতেছে, তখন সে কল্পনা করিতেছে যে, এখন আমি যেমন তাহাকে ভাবিতেছি, সেও তেমনি আমাকে ভাবিতেছে, এবং তাহার উৎকণ্ঠিত মিলন-পিয়াসী হৃদয়-মন আমারই বাতায়ন দিয়া আমারই নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং পুষ্প-পরিমলের মধ্যে তাহারই হৃদয়ের আকুলতা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

ত্যজি' তার তনুখানি কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে!

সুরদাসের প্রার্থনা বা আঁখির অপরাধ

(২৩-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

এ কবিতাটি প্রথমে 'সুরদাসের প্রার্থনা' নামে ছাপা হইয়াছিল। পরে কবির প্রথম গ্রন্থাবলীতে ও পরে তিনের সংস্করণ চয়নিকার মধ্যে 'আঁখির অপরাধ' নামে এই কবিতাটি ছাপা হইয়াছিল। বর্তমানে সঞ্চয়িতায় কবিতাটির পূর্ব নামই বজায় রাখা হইয়াছে।

সুরদাস বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত সাধক-কবি ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুলের কোনো নিশ্চয় পাওয়া যায় না। তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি কবি চান্দ বরদাইর কুলে জাত রামচন্দ্রের পুত্র এবং হরিচন্দ্রের পৌত্র। হরিচন্দ্র ছিলেন আগ্রা-বাসী, এবং রামচন্দ্র ছিলেন গোপাচল-বাসী। রামচন্দ্রের সাত পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় জন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন, কেবল সুরদাস অন্ধ ছিলেন বলিয়া রক্ষা পান। কেহ বলেন, সুরদাস জন্মান্ধ

ছিলেন ; আবার কেহ-বা বলেন, তিনি পরে অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখায় আছে—

"হউ কহী, 'প্রভু! ভগতি চাহত,
সত্রু-নাশ সুভাই॥
দুসরউ না রূপ দেখউ,
দেখি রাধা-শ্যাম।'
সুনত করুণাসিন্ধু ভাখি—
'এবম্ অস্তু' সুধাম॥"

—আমি কহিলাম, 'হে প্রভু, আমি তোমার নিকট ভক্তি চাহিতেছি, এবং শত্রুনাশ-রূপ শুভ প্রার্থনা করিতেছি। আমি যেন আর অপর কোনো রূপ নয়নে না দেখি, কেবল দেখি রাধা-শ্যামের মনোহর রূপ।' ইহা শুনিয়া করুণাসিন্ধু বলিলেন—'সুন্দরবাণী—তাহাই হোক'।

তিনি অন্যত্র আবার লিখিয়াছেন যে—কৃষ্ণের দর্শন পাইলাম, তাহার পরে আমার কাছে সমস্ত সংসার অন্ধকার হইয়া গেল।

ইহা হইতে নিশ্চয় কিছুই বুঝা যায় না। হয় তো তিনি রূপকার্থে নিজেকে অন্ধ বলিতেন, অথবা তাঁহার অন্ধতার কারণ ভক্তিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত দুইটি পদ হইতেই ইহা মনে হয় যে, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন না। তিনি ভগবানের নিকটে শত্রুনাশ অর্থাৎ মানসিক রিপুনাশ অথবা তাঁহাদের বংশের শত্রু মুসলমানের নাশ প্রার্থনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের রূপ-দর্শনের প্রার্থনাও করেন। সেই রূপ-দর্শনের পরে তাঁহার দৃষ্টি তাঁহাতেই নিবিষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহার আর পার্থিব বিষয়-দর্শনের স্পৃহা বা শক্তি রহিল না।

'ভক্তমাল' এবং 'চৌরাসী বৈষ্ণবোঁকী বার্তা' পুস্তকের মতে সুরদাসের আসল নাম ছিল সুরজচন্দ্। ভক্তমালের মতে ইনি জন্মান্ধ। রীবাঁর রাজা রঘুনাথ বা রঘুরাজ সিংহের 'রামরসিকাবলী' পুস্তকে সুরদাসের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—জনমহি তে হৈঁ নৈন-বিহীনা—জন্ম হইতেই তিনি নয়ন-বিহীন ছিলেন। কিন্তু সুরদাসের গানে রূপ রং আলোক প্রভৃতি শোভার এমন বর্ণনা আছে যে, চোখে না দেখিয়া জন্মান্ধ কবির পক্ষে তেমন বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থে আছে যে, এক দিন কবি কূপের মধ্যে পড়িয়া যান, এবং কৃষ্ণ তাঁহার ভক্তকে বিপন্ন দেখিয়া হাত ধরিয়া কূপ হইতে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের করস্পর্শ অনুভব করিয়াই তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন, এবং কবি

কৃষ্ণকে চাপিয়া ধরিতে যান। কৃষ্ণ কবির হাত ছিনাইয়া পলায়ন করেন। তখন সুরদাস বলেন—

কর ছুটকাঈ জাতু হউ, দুরবল জানী মোহি।
হিরদই-সউ জউ জাহুগে, মরদ বখানউ তোহি॥

—তুমি আমার হাত ছিনাইয়া চলিয়া যাইতেছ, আমাকে দুর্বল জানিয়াছ বলিয়া। কিন্তু যদি তুমি আমার হৃদয় হইতে যাইতে পারো, তবে তোমাকে বীরপুরুষ মানিয়া প্রশংসা করিতে পারি।

ইহা বিল্বমঙ্গলের উক্তির অনুরূপ—

হস্তম্ উৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিম্‌ অদ্‌ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

সুরদাসের আসল নাম ছিল সুরজচন্দ্, পরে তিনি সুরদাস নাম গ্রহণ করেন। যাঁহার চক্ষুর দীপ্তি-সূর্য অস্ত গিয়াছে—তিনি 'সুরদাস'। কিন্তু সুরদাস নিজের নামের অপর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন—আমার সব রূপ কৃষ্ণ-রূপ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, আমি এখন কেবল তাঁহার বাঁশীর সুর শুনিয়া চলিতেছি, তাই আমি সুরদাস।

সুরদাসের অপর নাম সুরজদাস বা সুরশ্যাম। তাঁহার গুরুর নাম বিঠ্‌ঠলদাস। কেহ কেহ বলেন তিনি বিঠ্‌ঠলদাসের পিতা বল্লভাচার্যের শিষ্য।

সুরদাসের পিতা রামচন্দ্র বা রামদাস আকবর বাদ্‌শাহের সভায় একজন গায়ক ছিলেন। তাঁহারা সারস্বত ব্রাহ্মণ।

কিংবদন্তী আছে যে সুরদাসের জন্ম হয় ইংরেজী ১৪৮৭ সালে এবং মৃত্যু হয় ১৫৬৩ সালে। আবার কেহ বলেন যে, জন্ম হয় ১৫৯৭ সালে ও মৃত্যু হয় ১৬৭৭ সালে—৮০ বৎসর বয়সে। দিল্লীর নিকটে সোহি তাঁহার জন্মস্থান, এবং পরসোলি মৃত্যুস্থান।

'এক কিংবদংতী হৈ কি সুরদাস জব অংধ ন থে, তব এক জুবতী-কো দেখ কর্ উস্ পর্ আসক্ত হো গয়ে থে। মগর্ পীছে প্রকৃতিস্থ হো-কর্ য়হ দোষ নেত্র-কো সমঝ, তুরংত দো সুইয়াঁসে অপনে অপনে দোনো নেত্র ফোড়্ ডালে।'—হিন্দী নবরত্ন।

দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণ্ণা নামে নদী।
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী!
তোমার রমণী আনি' আমারে দেখাহ।

আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া।
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা।
এতেক বিচারি' যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি' দেহ মোরে।
অনুরাগ-চক্ষু যার, কি করে নয়নে।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিয়া চক্ষু হৈল ভেঁই,
কৃষ্ণরূপ পানের পিয়ালা।"

—ভক্তমাল

স্থরদাস বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সম্বন্ধে প্রচলিত ঐ কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখিয়াছেন, এবং সেইজন্য এই কবিতার নাম 'স্থরদাসের প্রার্থনা' বা 'আঁখির অপরাধ'।

কবি সৌন্দর্যের উপাসক। সকল সৌন্দর্যের সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়ে নির্মিত ললামভূত সৌন্দর্য হইতেছে নারীর। কবির হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে, সৌন্দর্য-পূজার প্রথম হোমশিখা প্রদীপ্ত করেন নারী। কবির কবিত্বকে বিকশিত করিয়া তুলেন নারী। কিন্তু কবির প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা মূর্তির সীমায় কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না; তাঁহার চিত্ত মূর্ত ও অমূর্ত সৌন্দর্যসম্ভোগের দ্বন্দ্বে ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে থাকে। এখনও কবির মানস-সুন্দরী উর্বশী তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত হন নাই; তাই কামনার কলুষ মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে এবং তাহাতে কবিচিত্ত ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। কবি প্রার্থনা করিতেছেন যে ইন্দ্রিয়াসক্তি খর্ব হউক এবং বড় হউক মন। প্রেম বিশ্ববস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটি মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুণ্ন, সঙ্কীর্ণ হইতে চলিয়াছে; এই নিষ্ফলতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতায়। কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সুরদাস-স্থানীয় করিয়া বিশ্বসৌন্দর্যকে সম্বোধন করিতেছেন। মূর্ত সসীম সৌন্দর্য ছাড়িয়া তাহার অতীত Absolute Beauty ও Purity-কে পাইবার জন্য কবির আকুল আকাঙ্ক্ষা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

"পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী!"—কারণ তোমার চিত্তে তো কামনার কলুষ স্পর্শ করে নাই। আর আমি কামনার স্পর্শে পঙ্কিল। তুমি তোমার অনাবৃত সৌন্দর্য লইয়া—

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে,
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।
*　　*　　*
দাঁড়াও যেথানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে।' —গান

তুমি ভীষণ মধুর, কারণ তুমি সতীধর্মের বর্মে আবৃত স্থন্দরী। তুমি 'আছ কাছে তবু আছ অতি দূর'—তোমার সংযম ও শালীনতা একটি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান আমাদের মধ্যে রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমি তোমার প্রতি কামনা-কলুষিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তোমার চিত্তকে ম্লান করিতে পারে নাই, যেমন স্বচ্ছ দর্পণের উপর নিঃশ্বাস-বাষ্প পড়িয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে আচ্ছন্ন মাত্র করে, তাহাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে না; যেমন করিয়া ধরার কুয়াশা আকাশের নির্মলা জ্যোতির্ময়ী উষার কান্তি ক্ষণিকের জন্য আবৃত করিলেও তাহার নিজস্ব জ্যোতি ও নির্মলতা কিছুমাত্র হ্রাস করিতে পারে না। আমার লুব্ধ নয়ন হইতে তোমার পবিত্রতাকে আড়াল করিবার জন্যই কি তোমার লজ্জার উদ্‌ভব হইয়াছিল, যেমন করিয়া লেডী গডিভাকে তাঁহার পবিত্রতা কবচের মতন হইয়া লুব্ধ দৃষ্টির কলুষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল? আমার দেহের দৃষ্টি লোপ করিলে কি হইবে, আমার এই পাপদৃষ্টি যে আমার মানস-নেত্রে জন্মিয়াছে, সেখান হইতে ইহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইবে। আমার এই দৃষ্টি তো সৌন্দর্য-সম্ভোগের জন্য লুব্ধ; তুমি ভুবনস্থন্দর, অতএব 'তোমার লাগিয়া তিয়াস যাহার সে আঁখি তোমার হোক'। সৌন্দর্য ভুবনমোহিনী মায়ার খেলায় আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। নানা রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে তাহার মায়া আমার চিত্তকে আবিষ্ট করিতেছে। কিন্তু এই খণ্ড সৌন্দর্য যতই সম্ভোগ করি, ততই ইহার লালসা বাড়িয়া চলে। সমগ্রকে না পাইলে তো এই খণ্ডের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিবে না। যিনি অসীম অনন্ত, যিনি হরি—যিনি নিঃশেষে প্রাণ মন হরণ করিয়া লইতে সক্ষম, সেই হরিকে না পাইলে তো তৃষ্ণার শেষ নাই—তাই বিদ্যাপতির রাধা কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—'কৈসে গমায়ব হরি বিনু দিন-রতিয়া!' আর আমাদের কবিও স্থরদাসকে দিয়া বলাইয়াছেন—

হরি-হীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল অকূল লবণ-নীরে!

যেমন করিয়া Ancient Mariner কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিল—

"Water, water, everywhere
Nor any drop to drink."

—*Coleridge*

তেমনই দশা হইয়াছে আমার এই খণ্ডসৌন্দর্যের মধ্যে।

কবিচিত্ত আর্তনাদ করিয়া বলিতেছে—আর মূর্তি নয়, আর ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি নয়, আকারের অতীত যে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য আছে তাহারই আস্বাদ পাইতে চাই—'পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতি-স্রোতে!' অতএব—'হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি'। আঁখির ধর্ম রূপ-গ্রহণ, অতএব—"আঁখি গেলে মোর সীমা চ'লে যাবে, একাকী অসীম ভরা, আমারি আঁধারে মিলাবে গগন, মিলাবে সকল ধরা।"

কিন্তু সৌন্দর্যসম্ভোগ হইতে বঞ্চিত জীবনের চিরশূন্যতার মাঝখানে কি কবি একা? তাহা তো নহে; সেই শূন্যতার মাঝখানে মূর্তিহীন প্রেমাস্পদের অনন্তরূপ ফুটিয়া উঠিবে এবং সেই অমূর্ত রূপকে ঘিরিয়া পরমসৌন্দর্যময় নূতন জগৎ সৃষ্ট হইবে; এবং সেই পরমসৌন্দর্য কবির জীবনমরণহরণকারী অনন্ত-স্বরূপ হরি-রূপে প্রতিভাত হইবেন—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি।

একবার এই আঁখির জগৎ মুছিয়া গেলে সমস্ত সৌন্দর্য তাহার নবীন নির্মলতায় ফুটিয়া উঠিবে এবং তখন ভোগবাসনার বেদনা বিদূরিত হইবে, এই আশ্বাস কবির মনকে সান্ত্বনা দিতেছে।

তুলনীয়—

"Godiva, wife to that grim Earl, who ruled
In Coventry, for when he laid a tax
Upon his town.........................,
................She told him of their tears.

* * *

He answered, Ride you naked thro' the town,
And I repeal it................................ .

* * *

Then she rode forth, clothed on with chastity,

* * *

And one low churl, compact of thankless earth.

* * *

Boring a little auger-hole in fear,
Peeped—but his eyes, before they had their will,
Were shrivelled into darkness in his head,
And dropt before him."

—Tennyson, *Lady Godiva.*

ধ্যান

(২৬-এ শ্রাবণ, ১২৯৬ সাল ; ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গান এমন আছে যে-গুলি দোরোখা —যাহার মুখ দুই দিকে ফিরিয়া আছে, তাহার অর্থ মানবীয় প্রেমিক পক্ষে অথবা ভাগবত পক্ষে হইতে পারে। ইহার কারণ কবি নিজেই তাঁহার বৈষ্ণব কবিতা নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে ;—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !

দেবতা ও প্রিয়ের মধ্যে ব্যবধান এই কবির কাছে অত্যল্প, কারণ মানুষের মধ্যে অনন্তকে উপলব্ধি করাকেই তিনি বলিয়াছেন প্রেম। যে ব্যক্তির মধ্যে অনন্তের আভাস যতখানি বেশী পাওয়া যায়, সে ততখানি বেশী প্রিয় হয়। The God in Man এবং The Man in God যত কাছাকাছি অগ্রসর হইয়া যায়, জীবন ততই পূর্ণতার আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করে।

কবি তাঁহার প্রিয়কে—সেই প্রিয় মানবী বা দেবী যিনিই হউন—বলিতেছেন যে আমি নিত্য-নিরন্তর তোমাকে স্মরণ করি, আমার সেই ধ্যানের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কিছুর স্থান হয় না, আমার মন তোমাময় হইয়া একেবারে বিশ্ববিহীন বিজন হইয়া থাকে। তুমি অনন্ত রহস্যময়ী, আমিও অনন্ত প্রেমময়। আমার সমস্ত প্রাণ-মন-অস্তিত্ব একটি কেন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেই কেন্দ্র তুমি। আকাশও অনন্ত, আর তাহার তলায় সমুদ্রও দিগন্তবিস্তৃত বলিয়া মনে হয় যেন অনন্ত ; অথচ দিগন্ত-রেখায় আকাশ ও সমুদ্র সম্মিলিত হইয়া সীমাবদ্ধ

হইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তেমনি আমার প্রেমবাসনা সমুদ্রের মতো সুদূর-বিস্তীর্ণ হইলেও সীমাবদ্ধ, সুতরাং চঞ্চল; আর তুমি অসীম সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত বলিয়া প্রশান্ত। তথাপি আমাদের মিলন অনিবার ঘটিতেছে। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর!'

'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'

(২-রা ভাদ্র, ১২৯৬ সাল; ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)

বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্বত্রয় হইতেছে যে—ভগবান্ নিত্য, জীব নিত্য এবং সেই উভয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রেম, তাহাও নিত্য। অতএব প্রেম জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত সাধনার ধন। ইংরেজ কবি রসেটী বলেন যে—প্রেম ভগবানের সমান অসীম অনাদি, কারণ ভগবান্ হইতেছেন প্রেমময়! তাঁহার এক কণা প্রেম দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রেমিক-প্রেমিকার রূপ গ্রহণ করে। আত্মার ধর্ম হইতেছে প্রেম-সাধনা। আত্মা যদি অনাদি হয়, তবে তাহার ধর্ম প্রেমও অনাদি হইতে বাধ্য। তাই আমাদের কবিও বলিতেছেন যে, প্রত্যেক প্রেমিক তাহার প্রেমিকাকে নিত্যকাল ভালোবাসিয়া আসিতেছে, জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদের সেই অনাদি পুরাতন প্রেমেরই কেবল পুনরভিনয় হইতেছে মাত্র। যেখানে যত প্রেমিক-প্রেমিকা আছেন—শিব-দুর্গা, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, যুসুফ-জুলেখা, শিরী-ফর্হাদ্, লয়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট্, দান্তে-বিয়াত্রিচে ইত্যাদি—তাঁহারা সকলে আমাদেরই প্রেমের প্রতিনিধি ও প্রতিরূপ মাত্র। জন্ম-জন্মান্তরের যে প্রেম তাহা মনের ভাবে স্থির হইয়া থাকে, এবং কর্মফলের নিয়তির মতো সঙ্গে সঙ্গে চলে—ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি—শকুন্তলা নাটকে কবি কালিদাসও বলিয়া গিয়াছেন। তাই প্রেমিকাকে দেখিবামাত্র আমার মনে হয়—

> যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে,
> তাই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে!
>
> —প্রবাহিণী

> আজ মনে হয় সকলের মাঝে
> তোমারেই ভালোবেসেছি,
> জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে
> শুধু তুমি আমি এসেছি!

* * *

তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে!

কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে,
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

* * *

এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি;
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

* * *

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথো নি কি মোর জীবনে?

* * *

হে চিরপুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া!
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া!

—উৎসর্গ

'কল্পনা' পুস্তকের 'স্বপ্ন' কবিতা এবং 'চিত্রা' পুস্তকের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতা ইহার সহিত তুলনীয়। ইংরেজী কাব্যেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—

"For love, and beauty, and delight
There is no death, nor change—"

—Shelley—*Sensitive Plant.*

"In other words I loved you, long ago:
Love that hath no beginning, hath no end—"

—Alfred Noyes—*The Progress of Love.*

আমার সুখ

(১১ই কার্ত্তিক, ১২৯৭ সাল ; ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রেমিকের প্রাণ-ভরা প্রেমের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। ভালোবাসিয়া যে সুখ, কেবলমাত্র ভালোবাসা পাইয়া সেই পরিমাণ সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না। মানুষের হৃদয় অপরিমেয়, তাহার গভীরতা অগাধ; যতই কাহাকেও ভালোবাসা যায়, যতই তাহাকে চেনা যায়, যতই তাহার প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, ততই তাহার অসীম রহস্য উপলব্ধি করা যায় এবং সে যে অসীমেরই এক অংশ তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব যে ভালোবাসে তাহার যে আনন্দ, তাহা কেবল ভালোবাসা পাইয়া হয় না। এইজন্য বৈষ্ণবেরা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কি প্রকার, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় লাভ করিয়া শ্রীরাধা কেমন মধুরিমা আস্বাদন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য যাহা রাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কেমন, এই তিনটি একত্র করিয়া জানিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (চৈতন্যচরিতামৃত)

‘শূন্য গৃহে’ এবং ‘জীবন-মধ্যাহ্ন’

(এই দুইটি কবিতার প্রথমটি লেখা ১১ই বৈশাখ এবং দ্বিতীয়টি ১৪ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

এই দুইটি কবিতাই কড়ি ও কোমলের ‘চিরদিন’ কবিতার সঙ্গী সমধর্মী কবিতা। মানুষের মনে এমন প্রেম-আশা-সুখ-দুঃখময় বিচিত্রতা আছে, কিন্তু প্রেমময় সুখদুঃখ-বিধাতা কি কেহ নাই যিনি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের ভাব অনুভব করেন? জগতের কেন্দ্রে তাহার বিধাতা কি কেবল নিয়ম মাত্র, তাহার প্রাণ হৃদয় স্নেহ মমতা বা দয়া বলিয়া কি কিছু নাই?

> সমস্ত মানব-প্রাণ বেদনায় কম্পমান ;
> নিয়মের লৌহ-বক্ষে বাজিবে না ব্যথা ?

কিন্তু তিনি জীবন-মধ্যাহ্নে অনুভব করিতেছেন যে একজন নিখিল-নির্ভর অনন্ত এই দেশ-কালকে আচ্ছন্ন করিয়া বিদ্যমান আছেন, তিনি অপ্রকাশ হইলেও চির-স্বপ্রকাশ, তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুর্‌ আততম্‌—সেই সর্বব্যাপীর পরম প্রতিষ্ঠা জ্ঞানীরা **স্থানে** অবস্থিত সাকার

বস্তুকে দেখিতে পাওয়ার মতো সর্বদা দেখিতে পান। 'নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান' 'নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র' প্রভৃতি শোভাময় নিসর্গ-সামগ্রী—

জগতের মর্ম হ'তে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

এবং নিজের এই ক্ষুদ্র জীবনের সহিত মহাজগৎ-জীবনের যোগ অনুভব করিয়া কবির—

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ-মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিঃশ্বাস লাগি' জীবন-কুহরে
মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি বাজে।

এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি, নিখিল-ব্যাপ্তি এবং সর্বত্র সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দানুভব হইতেছে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের মূলকথা। কবি 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগের চেয়ে এখন অনেক শান্ত সমাহিত হইয়াছেন।

পত্র

মানসীর মধ্যে তিনখানি পত্র আছে। 'পত্র' এবং 'শ্রাবণের পত্র' কবির বন্ধু ঔপন্যাসিক ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লেখা হইয়াছিল যথাক্রমে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ ও শ্রাবণ (২৭-এ জুলাই) মাসে (ছিন্ন-পত্র দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় পত্র কাহাকেও লেখা হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না, উহা পত্র নাও হইতে পারে, উহা কেবল পত্রের প্রত্যাশায় লেখা কবিতা হইতেও পারে। 'পত্রের প্রত্যাশা' লেখা হইয়াছিল ২৩-এ বৈশাখ ১২৯৫ সালে, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম দুইটি পত্রের মধ্যে একটু অনাবিল লঘু রঙ্গরস আছে, সুন্দর শব্দচিত্র আছে, আর আছে অনর্গল মিলের বাহাদুরী। প্রত্যেক তিন চরণে একই রকম মিল রাখিয়া অবলীলাক্রমে কবিতা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কোথাও

তাহার গতিচ্ছন্দ একটুও বাধা পায় নাই। মিলের বাহাদুরীর শ্রেষ্ঠ নমুনা পাওয়া যায় শ্রাবণের পত্রে; কবি এইখানে রঙের মাত্রা একটু চড়াইয়া এক চরণের শেষে একটি শব্দের অর্ধেক মাত্র রাখিয়া চমৎকার মিল ঘটাইয়া গিয়াছেন—

শ্রাবণে ডিপুটি-পনা
এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা; এ যে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।

'পত্রের প্রত্যাশা' কবিতাটির মধ্যে বিরহ-ব্যাকুল হৃদয়ের একটু ব্যথা আছে। যাহাকে ভালোবাসা যায়, তাহার পত্র পাইবার প্রত্যাশায় থাকিয়া পত্র না পাইলে মন যে কেমন করে, তাহারই একটি সুন্দর চিত্র এই কবিতাটি।

'মানসী' কাব্যে দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতা

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কবির সচেতন-লক্ষ্য 'মানসী'র মধ্যে প্রথম দেখা যায়। তিনি দেশের ত্রুটি অসঙ্গতি ও অন্যায়কে বিদ্রূপ করিয়া সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন। কবির বাড়ীর মধ্যে স্বদেশপ্রেমের হাওয়া বহিত; রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তখন দেশকে উন্নত ও স্বাধীন করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন এবং বালক-কবি তাহার অংশীদার ছিলেন। ইহার বিবরণ কবির 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে আছে। সেই আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়া কবির মন দেশের দুর্গতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল।

নববঙ্গের উদ্বোধক রাজা রামমোহন রায় কবির পিতামহের বন্ধু ছিলেন; কবির পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর দেশের সংস্কার অগ্রাহ্য করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন; কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশের বহু শতাব্দীর সংস্কার হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া রাজা রামমোহন রায়ের পুনঃপ্রবর্তিত উপনিষদের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া উপবীত ত্যাগ করেন। তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার দৃষ্টান্ত নিজেদের পরিবারের মধ্যেই এবং নিজেদের জীবনেই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিবারে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রথম দেখা দেয়। তাঁহাদেরই

বাড়ীর উৎসাহে ও সাহায্যে এদেশের অনেক লোকই দেশীয় শিক্ষা ও বাণিজ্য উজ্জীবিত ও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কেবল মাত্র কথা না বলিয়া, কেবল মাত্র বক্তৃতা না করিয়া, কর্মের ভিতর দিয়া দেশের অভাব ও দুর্গতি-মোচনের চেষ্টা তাঁহাদেরই বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই-সকল কারণে কবির মন সংস্কার-বিমুক্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া প্রবল দেশানুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি দেশের মূঢ়তা নিশ্চেষ্টতা ও ভীরুতা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সেইজন্য যুবক-কবি দেশের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রূপ করিতে গিয়া কবি নিজেকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই, এবং বিদ্রূপ করিতে করিতে নিজে ব্যথিত কাতর হইয়া উঠিয়াছেন।

কবি 'দেশের উন্নতি' কবিতায় (১৯-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮) বলিয়াছেন—

দূর হোক এ বিড়ম্বনা, বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনা-ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
সরম-তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।

এই সময় হইতেই কবির মনে বিশ্বজনীনতার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়—প্রত্যেক অবস্থার কাব্যের মধ্যে এই বিশ্বযাত্রার জন্য কবির আকুল ক্রন্দন রহিয়াছে—

জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
* * *
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

সবাই বড় হইলে তবে স্বদেশ বড় হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত সিদ্ধ হবে তবে।
সত্য-পথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে
দলিত হ'য়ে রবে।

'পরিত্যক্ত' কবিতায় (২৮-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮) কবি তাঁহার পূর্ববর্তী দেশপ্রেমিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমাদের উৎসাহবাণী শুনিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া আমি—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে কহিলাম জোড়করে—
এই লহ মাতঃ, এ চিরজীবন সঁপিনু তোমারি তরে।

কবিকে দেশ-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিতে দেখিয়া, যাঁহারা নিজেরাই পথনির্দেশ করিয়াছিলেন তাঁহারাই এখন বিদ্রূপ বিরোধিতা করিতেছেন, কবি সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কবি একবার যাহা কর্তব্য ও সত্য বলিয়া জানিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছেন, তাহা লাভ না করা পর্যন্ত তো তিনি ফিরিতে পারিবেন না, তিনি একাই সাধনায় অগ্রসর হইবেন—

ধ্রুবতারা পানে রাখিয়া নয়ন চলিয়াছি পথ ধরি',
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা তাহাই পালন করি'।

'বঙ্গবীর' (২১-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮), 'নব-বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' (২৩-এ আষাঢ়, ১২৯৫ ; ১৮৮৮)—কবিতা দুইটি নিছক ব্যঙ্গ। বঙ্গবীর দুর্বল শরীরে সাবু মাত্র আহার করিয়া রাজ্যের যত বড় বড় কেতাব পড়িতেছে এবং ইতিহাস মুখস্থ করিয়া নিজেদের অতীতের গৌরবে স্ফীত হইতেছে—এই কর্মহীন নিষ্ফল আস্ফালনকে কবি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

নব-বঙ্গদম্পতির জীবনের অসামঞ্জস্যকে কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন—এ সম্বন্ধে তিনি পরে ১২৯৭ সালে লিখিত তাঁহার 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—

অনতিদূরে একটি ছোট বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গরুর গলার দড়িটি ধ'রে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলা দেশের নব-দম্পতির চিত্র মনে পড়্‌ল। মস্ত একটা চষমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্র্যাজুয়েট-পুঙ্গব, এবং তার দড়িটি ধ'রে ছোট একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলক-পরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চ'রে বেড়াচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

'ধর্মপ্রচার' কবিতায় (৩২-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮) কবি দেশের লোকের পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতাকে এবং ভীরুতাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং তাহার পার্শ্বে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকের চরিত্রের মহনীয়তা এবং যিশুখ্রীষ্টের আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

দেশ সম্বন্ধীয় সমস্ত কবিতার মধ্যে 'দুরন্ত আশা' কবিতাটি শ্রেষ্ঠ। এটি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮ সালে লেখা। দুঃসাধ্য ব্রত-যাপনের আকাঙ্ক্ষায়, দুঃখ-বরণের অসীম আনন্দলাভের জন্য এবং মানব-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য, কবি এই কবিতায় ক্ষুদ্রত্ব ও সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চাহিতেছেন। তিনি এই কবিতায় বলিতেছেন যে—কূপমণ্ডুকত্ব পরিহার করিয়া ব্যাপ্ত বিশ্বের অধিবাসী হইতে হইবে ; সর্বত্যাগী শঙ্করকে জীবনের আদর্শ করিয়া জীবনের ক্ষুদ্র কর্ম আত্মত্যাগের দ্বারা ও পরহিতৈষণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা 'জাতীয় সঙ্গীতে'র মধ্যে যে উদ্দীপনার বাণী বঙ্গবাসীকে শুনাইয়াছিলেন—

> যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
> গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
> বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
> স্বকার্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তাহারই অনুরূপ উদ্দীপনা এই কবিতার মধ্যে কবিত্বময় ভাষার ভিতর দিয়া সঞ্চারিত করা হইয়াছে। কবি ব্যঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন—আমরা অন্নপায়ী স্তন্যপায়ী বঙ্গবাসী, আমরা এমন নির্জীব অলস প্রকৃতির যে, অন্ন চিবাইয়া খাইবারও যেন শক্তি নাই ও ইচ্ছা নাই, আমরা অন্ন পান করি, এবং এখনও আমরা কিছুতেই সাবালক হইয়া উঠিতে পারিলাম না, আমরা সকলে যেন মায়ের খোকা হইয়া তাঁহার অঞ্চলের নিধি হইয়াই রহিয়াছি। এই নিরীহ নির্জীব অবস্থা অপেক্ষা কবির কাছে শ্লাঘ্য বলিয়া মনে হয়—

> ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।

মরুভূমির ঝড় যেমন অবাধে প্রবাহিত হয়,—সেখানে একটি গাছও নাই তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে, তেমনি উদ্দাম গতিবান্ প্রাণ পাইলে জীবন লাভ সার্থক হইত। সকল মন ও সকল দেহ যদি জীবনাবেগে পূর্ণ হইত, তাহা হইলে বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা, তাহাকে প্রাণের সঙ্গী করিয়া বিপদ্ বরণ করিয়া জীবনের

সজীবত্ব ও পৌরুষ প্রমাণ করিতে পারা যাইত। এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া কবির ইচ্ছা করিতেছে যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি এক চুমুক মদ্যের মতো পান করিয়া ফেলেন। মদ্য যেমন মনে ও দেহে উৎসাহ ও উদ্যম সঞ্চার করিয়া দেয়, সেই রকম এই বিশ্বযোগে তাঁহার দেহ-মন সজীব হইয়া উঠিবে এই আশা কবিকে প্রলুব্ধ প্রবুদ্ধ করিতেছে। কেবল খবরের কাগজে দম্ভভরা আস্ফালন কবির ভালো লাগে না, তিনি চাহেন কর্ম-দ্বারা পৌরুষের জ্বলন্ত পরিচয়। বঙ্গবাসী কুকুরের মত প্রভুর পদাঘাত খাইয়াও সেই পদ লেহন করে, অপমানকারীকে তোষামোদে তুষ্ট করিতে চায়, একটু আদর বা আস্কারা পাইলেই কুকুরের মতো লেজ নাড়িতে থাকে, তাহাতে তাহার সর্বশরীরই সোহাগে আদরে দুলিতে থাকে। যাহারা মুখের অন্ন কাড়িয়া নিজেরা গ্রাস করিতেছে, তাহাদেরই উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট কিছু প্রসাদ পাইলেই সে কৃতার্থ বোধ করে। বাঙ্গালী ঘরের কোণে বসিয়া কেবল পূর্বপুরুষের কীর্তির গর্ব করিতে থাকে, কিন্তু পূর্বজগণের কীর্তি নিজেরা পুনর্বার অর্জন করিবে এমন চেষ্টা ও উদ্যম নাই; আর্যামির আস্ফালন আছে, কিন্তু প্রকৃত আর্যত্ব নাই। কবি আড়ম্বর দেখিতে চাহেন না, কর্মের অনুষ্ঠান দেখিতে চাহেন; বৃথা দম্ভ দেখিতে চাহেন না, প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করা দেখিতে চাহেন। কবি স্বাবলম্বী হইবার পক্ষপাতী, কিন্তু কৃপার দ্বারে ভিক্ষুকবৃত্তির বিরোধী। দেশবাসীর হীনতা নিশ্চেষ্টতা ও দুর্গতি দেখিয়া যে ব্যথা কবি নিজের প্রাণে অনুভব করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার বাক্য কটু ও রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই সঙ্কীর্ণ নিরুদ্যম জীবনের গণ্ডি হইতে নিস্তার পাইবার দুরন্ত আশায় বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ভিতর একটি সুগভীর ধিক্কার, গ্লানি, চিত্তদৈন্য ও ক্ষোভ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যঙ্গ কবিতাগুলি কবি-চিত্তের বেদনায় অভিষিক্ত। এ সম্বন্ধে কবি পরে পত্রে ও জীবনস্মৃতিতে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন—

এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজকাল ব'সে ব'সে আওড়াই—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা! ইচ্ছা করে দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর-মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসঙ্কোচ এবং প্রশস্ত যেন হয়—প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশ খিটিমিটি না ঘটে। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম,

একেবারে দিগ্‌বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বহিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম। —ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ৩১-এ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯২।

নিশ্চেষ্টতায় মানুষ আপনার পূর্ণ পরিচয় পায় না; সে বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে একটা অবসাদে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবা-বিমুখ যে স্বদেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনো মতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে, বড়-একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত; আমার প্রাণ বলিত—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' —জীবনস্মৃতি

কবি যে বিশ্বকে মদের মতন এক চুমুকে পান করিয়া লইতে চাহেন তাহার সম্বন্ধেও তিনি লিখিয়াছেন—

আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় ক'রে ধরেছে—সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান ক'রে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে। —ছিন্নপত্র

আমাদের কবি আরব মরুভূমির বেদুয়িনের মতো নির্বাধ জীবন কামনা করিয়াছেন। আর একজন কবিও মরুভূমিতে বাস কামনা করিয়াছিলেন প্রণয়-মিলনে কোনো অরসিকের আনাগোনায় কোনো বাধা উপস্থিত না হয় বলিয়া—

"Oh! that the desert were my dwelling place,
With one fair spirit for my minister,
That I might all forget the human race,
And, hating no one, love but only her!"

Byron, *Childe Harold.*

এই কবিতায় কবি ক্ষুদ্রতা-মুক্ত হইয়া বৃহৎ ক্ষেত্রে আপনার সুখ-দুঃখের এবং পরিপূর্ণ জীবনের বিরাট্ প্রকাশ দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সহিত 'চিত্রা' কাব্যের 'নগরসঙ্গীত' কবিতাটি তুলনীয়।

এই সমস্ত কবিতা সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়া গিয়াছেন—

আমাদের দেশের চারিদিকের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র চিন্তা ক্ষুদ্র পরিবেষ্টন ক্ষুদ্র কাজকর্ম কবিকে তখন বড়ই আঘাত দিতেছিল। নিজেরও কেবল অনুভূতিময় জীবনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া

থাকিবার জন্য একটা আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রাম চলিতেছিল—খুব একটা বড় ক্ষেত্রে আপনার সুখদুঃখের বিরাট্ প্রকাশ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—'দুরন্ত আশা' কবিতাটি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ভৈরবী গান

(২৯-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

রবীন্দ্রনাথ মানসীতে যে-সমস্ত স্বদেশ-বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন তাহার সবগুলিই বিদ্রূপাত্মক নহে। 'ভৈরবী গান' কবিতায় কবি বলিতেছেন যে—তিনি আর উদাস-করা বিষণ্ণ সুরের গান শুনিতে চাহেন না। তাঁহার পথিক-পরাণ যাইতে যাইতেও পিছন ফিরিতে চায় এই করুণ সুরের মোহে। সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করিতে বড় আরাম, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ; কিন্তু প্রখর তপন-দহন সহিয়া আর রাক্ষসী তিমির-রজনীর ভিতর দিয়া কবিকে যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে—

> কত মানবের গুরু মহৎ-জনের
> চরণ চিহ্ন ধরিয়া!

কারণ তাঁহার প্রাণ-শক্তি সামান্য হইলেও তাঁহার মনে জগতের দুর্গতি ও দুঃখ হরণ করিবার ব্যাকুলতা জাগিয়াছে—

> কাঁদে শিশির-বিন্দু জগতের তৃষা
> হরিতে!

অতএব কবি সঙ্কল্প করিতেছেন—

> সদা সহিয়া চলিব প্রখর দহন,
> নিঠুর আঘাত চরণে!
> যাব আজীবন-কাল পাষাণ-কঠিন
> সরণে!
> যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
> সুখ আছে সেই মরণে!

বধূ

(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ ; ১৮৭৮ সাল)

বাংলার নারীদিগের প্রতি কবির অপরিসীম সহানুভূতি এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। যে কবি বঙ্গনারীর কল্যাণীমূর্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—'সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে !'—যে কবি বঙ্গবধূকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

> বুক-ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
> মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান, চোখে আসে জল ভ'রে—

সেই কবি-হৃদয়ের দরদ দিয়া এই 'বধূ' কবিতাটি লিখিত।

এই কবিতায় কবি পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না নগরবাসিনী একটি বধূর মনের পল্লী-স্মৃতির বেদনাটিকে অতি সুললিত ভাষায় ও বিষাদময় ছন্দে করুণ ভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পল্লীসৌন্দর্যের এবং আত্মীয়তার ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরের মেয়েকে বন্দী করার এবং নির্মম কঠোর সমালোচনা করার প্রতিবাদ এই কবিতা। একদিকে পল্লীপ্রকৃতির মমতা ও অন্যদিকে নাগরিক জীবনের রূঢ়তা দেখাইয়া, পল্লী ও নগরের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া, কবি পল্লীর সহজ অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রাম হইতে সদ্যঃসমাগতা বধূর মনে পড়িতেছে যেন তাহার সখীরা সেই তাহার পূর্বের দিনের মতনই তাহাকে ডাকিতেছে—'বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল।' সেই পুরাতন স্মৃতি মনে জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বধূর মনে পল্লীর দৃশ্য ছবির মতন ভাসিয়া উঠিতেছে। তাহার সহিত এই নগরের কী বিষমতা !—'হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া !' এখানকার সব বাড়ীঘর যেমন পাষাণ-নির্মিত, এখানকার লোকগুলাও তেমনি মমতাহীন শুষ্ক। চারিদিকে কেবল বন্দীশালার দেওয়াল আর নিষেধ। একটু ছাদে উঠিলে অমনি আশপাশের বাড়ী হইতে কৌতূহলী চোখ তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হয়, আর এদিকে বাড়ীর লোকেরা পর্দার আব্রু নষ্ট হইল মনে করিয়া রুখিয়া আসে। বধূ বেচারী মনে করে, এখানে যেন—

> ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
> পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সকলেই বধূর রূপ লইয়া সমালোচনা করে, তাহার সৌন্দর্যের বিচার করে, কিন্তু সে যে হৃদয়-সংযুক্ত জীব এই মমত্ববোধ কাহারও মনে উদয় হয় না। সে যেন একগাছি ফুলের মালা, সকলে কেবল তাহাতে কত পরিমাণ ফুল আছে আর তাহার গ্রন্থন-নৈপুণ্যই বা কেমন, তাহা বিচার করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে চায়। কিন্তু ফুলের মধ্যে যে সুতুর্লভ সুষমা সৌরভ এবং আন্তরিক অনির্বচনীয়তা আছে তাহাই তো অমূল্য, তাহা তো কোনো মানদণ্ডে মাপা যায় না, তাহা অনুভবের দরদের সামগ্রী। সেই ফুলের মালায় থাকুক না ফুলের পরিমাণ অল্প বা গ্রন্থন-পারিপাট্যের অভাব, কিন্তু ফুলের অন্তরে যে সৌন্দর্য ও সার্থকতা নিহিত আছে কে তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে পারে?

এই নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় বধূর মনে পড়িতেছে তাহার মাকে, যিনি এতকাল তাহাকে স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া এত-বড়টি করিয়া আজ পরের বাড়ীতে বিদায় দিয়াছেন। সে এই অপরিচিত দরদশূন্য পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া হাহাকার করিতেছে। অবশেষে বেচারী হতাশ হইয়া নিজের জীবনের অবসান কামনা করিতেছে—

কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্।

এই উপসংহারটি বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। একটি নববিবাহিতা বধূর মন আনন্দে মশগুল হইয়া থাকিবার কথা; সেই বধূ একে নববিবাহিতা তায় সে বালিকা, তাহার মরণ-কামনা মনে বড় আঘাত করে।

এই বধূর পল্লীজীবনের পুরাতন স্মৃতির সহিত তুলনীয়—

"At the corner of Wood Street, when daylight appears,
There's a thrush that sings loud—it has sung for three years,
* * *
'Tis a note of enchantment; what ails her? She sees
A mountain ascending, a vision of trees;
* * *
Green pastures she views in the midst of the dale
Down which she so often has tripped with her pail;
And a single small cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling on earth that she loves."

'মানসী' কাব্যে প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কবি রবীন্দ্রনাথকে মানুষ ও প্রকৃতি তুল্য-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। মানুষের প্রেম সুখ দুঃখ আশা নিরাশা সফলতা বিফলতা কবিকে যেমন স্পর্শ করিয়াছে, প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যও তেমনি স্পর্শ করিয়াছে। ঋতুতে ঋতুতে পৃথিবীর যে নব নব রূপ প্রকাশ পায়, তাহা কবির চিত্তকে নব নব ভাবে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথকে সব চেয়ে মুগ্ধ করিয়াছে বর্ষা ঋতু। কবি কালিদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী তিনি, সেই হেতু মেঘদূতের কবির বর্ষাপ্রীতি আমাদের কবিও উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করিয়াছেন। 'মানসী'র মধ্যে যতগুলি প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা আছে, তাহার অধিকাংশই এই বর্ষাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত।

প্রকৃতি-সম্বন্ধে এই কয়টি কবিতা 'মানসী'র মধ্যে আছে—প্রকৃতির প্রতি, নিষ্ঠুর সৃষ্টি, বর্ষার দিনে, একাল ও সেকাল, আকাঙ্ক্ষা, মেঘদূত, সিন্ধুতরঙ্গ, কুহুধ্বনি। অহল্যার প্রতি কবিতাটিকেও এই প্রকৃতি-পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

এই কবিতাগুলির মধ্যে বর্ষার দিনে, একাল ও সেকাল, আকাঙ্ক্ষা, মেঘদূত, এবং সিন্ধুতরঙ্গ বর্ষার দিনেরই কবিতা। কুহুধ্বনি বসন্তের কবিতা। অহল্যার প্রতি সমগ্র পৃথিবীর কবিতা।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ঋতুর সৌন্দর্যকে নানা রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শারদোৎসব নাটিকা শরতের, রাজা ও ফাল্গুনী নাটক বসন্তের সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করিয়াই লিখিত। যদিও বর্ষা কোনো নাটকে রূপ পায় নাই, তথাপি তিনি বর্ষা-সম্বন্ধে যত কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন, এত বোধ হয় আর কোনো ঋতু-সম্বন্ধে করেন নাই।

প্রকৃতির রূপের মধ্যে মাধুর্য ও ভৈরব ভাব দুই-ই আছে, এবং দুই ভাবই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি যে প্রশ্ন কড়ি ও কোমলের 'চিরদিন' কবিতার মধ্যে উত্থাপন করিয়াছিলেন—পার্থিব সমস্ত বিচিত্রতার অন্তরালে যে শক্তি বিদ্যমান আছেন, তিনি কি কেবল নিষ্ঠুর জড়শক্তি, না তাঁহার মধ্যেও মায়া মমতা ও অপরের জন্য বেদনাবোধ আছে—তাহা এখনও কবিচিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে।

প্রকৃতির প্রতি

(১৫ই বৈশাখ, ১২৯৫ ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

কবি প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে একটি কোমল মানব-প্রাণ ভুলাইবার জন্য তোর কত-মতো আয়োজন, কিন্তু তুই মনচোর হইয়াও তোর মনে কোনো মায়া-মমতা নাই। প্রকৃতি মনের মধ্যে কত সুখ-দুঃখ রচনা করে, কিন্তু তাহাকে কাহারও সুখ-দুঃখ স্পর্শ মাত্র করে না। তথাপি মানুষ তাহার দ্বারা প্রলুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহার কারণ, প্রকৃতির মধ্যে অসীম রহস্য রহিয়াছে, মানুষ প্রাণ-মন লইয়া তাহার রহস্য-সমুদ্রে ডুব দিয়াও তাহার গভীরতার উদ্দেশ পায় না। এই না-পাওয়ার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহার যত আকর্ষণ। তাই কবি প্রকৃতিকে বলিতেছেন—

আদি অন্ত নাহি পাই, তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি।
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি!
যত তুই দূরে যাস তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি তত ভালোবাসি!

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

(১৩ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

এই কবিতাটির মধ্যে একটি মহাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত প্রকৃতির কেবল নিয়মানুগতা ও অন্ধতার সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিতেছেন। এই কবিতার মধ্যে ছন্দের ও ভাষার একটি গাম্ভীর্য বিষয়ানুগত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে কবি-মানসের একটি নিগূঢ় ছাপ পড়িয়াছে। এই কবিতাটি 'মানসী'র মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা।

কবি বলিতেছেন—প্রকৃতির যে সৃষ্টিলীলা, তাহার মধ্যে যেন কোনো নিয়ম নাই, একটা অন্ধ শক্তি সমস্ত কিছুকে পরিচালনা করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ একটা সৃজনের বন্যা শূন্যপথে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার প্রচণ্ড ভয়ানক স্রোতে বিশ্বচরাচর অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে। এই—

সৃষ্টিস্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির!

তাহার পিছন ফিরিয়া তাকাইবার ও কাহারও সুখদুঃখ লক্ষ্য করিবার অবসর নাই এবং তাহার এই উদাসীনতা সম্বন্ধে বিলাপ করিয়াও কোন লাভ নাই, সে বিলাপ সেই মহাশক্তিমান্ সত্যের দরবারে পৌঁছে না—

সত্য আছে স্তব্ধ ছবি যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক কল্পনা!

সিন্ধুতরঙ্গ

এই কবিতাটি বিশেষ একটি উপলক্ষ্যে লেখা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ ১২৯৪ সালের আষাঢ় মাসের ঘটনা। তখনও পুরী যাইবার রেলপথ নির্মিত হয় নাই—তখন পুরী যাইবার উপায় ছিল হয় হাঁটাপথে, নয় জলপথে স্টিমারে। ঐ সময়ে সার জন লরেন্স্ নামে একখানি যাত্রী-জাহাজ ৮০০ যাত্রী লইয়া পুরীতে জগন্নাথের রথ-যাত্রা দেখাইতে গিয়াছিল, ফিরিবার পথে তাহা ঝড়ে পড়ে, এবং শেষে জলমগ্ন হইয়া যায়। সেই ৮০০ যাত্রীর অতি অল্প কয়েকজন মাত্র বাঁচিয়াছিল। ঐ দারুণ দুর্বিপাক কবিকে কেমন উতলা চঞ্চল করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এই কবিতায়। কবিতাটিতে সমুদ্রে ঝড়ের একটি চমৎকার গম্ভীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং এ কবিতার মধ্যেও নিষ্ঠুর বধির প্রকৃতির খামখেয়ালির দিকে কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—

নাই সুর নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে' ওই কি উঠেছে নেচে'
প্রকাণ্ড মরণ?

এবং ভগবানের নিকট আট শত নরনারীর কাতর প্রার্থনা যখন বিফল হইতে দেখা গেল, তখন হতাশ দুঃখিত হইয়া কবি মনে করিতেছেন—

নাই তুমি ভগবান্, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস!

কিন্তু এই নিষ্ঠুর জড়প্রকৃতির কোলে প্রেমস্নেহময় মানবহৃদয় তবে কে সৃষ্টি করিল ?

পাশাপাশি একঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
* * *
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূত-খেলা অনিবার
ভাঙ্গাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়-পরাজয় !

পৃথিবীতে প্রেম-স্নেহ ও জড়ের নিষ্ঠুরতার সংগ্রাম অনিবার চলিয়াছে, ইহা কি দুই দেবতার বিধান ? এখনও কবি স্থির ভাবে উপলব্ধি করেন নাই যে একই দেবতার দুই রূপ আছে, মধুর ও রুদ্র। পরে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কবি বহু কবিতা ও নাটিকা রচনা করিয়াছেন।

বর্ষার দিনে

(৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ ; ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ : বোম্বাই প্রদেশের খিরকি শহরে লেখা)

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন যে—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ৫ম অঙ্ক।

রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী প্রাণীও পর্যুৎসুক হইয়া উঠে, তখন সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া বুদ্ধিপূর্বক না হইলেও কোনো জন্মজন্মান্তরের সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করে, কারণ জন্মজন্মান্তরের সৌহার্দ্য চিত্তের ভাবের মধ্যে স্থির হইয়া বিরাজ করে।

নূতন ঋতুর আবির্ভাবে ধরণীর চারিদিকে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া মানুষের মন সচেতন হইয়া উঠে এবং সেই নবসৌন্দর্যের মাধুর্যে আবিষ্ট

হইয়া যায়। বর্ষা যেন বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গূঢ় কোন্ বেদনার কান্না। সেই অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ দেখিয়া আর আকাশ-ঘেরা কালো মেঘের গভীর মায়া মনে লাগিয়া মন উদাস আকুল হইয়া উঠে। তাই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন যে—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।

—মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৩য় শ্লোক।

সুখী ব্যক্তিরও মেঘ দেখিয়া অন্যবিধ-চিত্তবৃত্তি হয়, অর্থাৎ আন্‌মনা হইয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে বর্ষা আসিলে সকল কাজের ছুটি হইয়া যাইত, বিদ্যার্থীর পাঠ বন্ধ হইত, সন্ন্যাসীর প্রব্রজ্যা বন্ধ হইত, প্রবাসী গৃহের দিকে রওনা হইত। এই গৃহে আগমনের মধ্যে দুই পক্ষের আগ্রহ ঔৎসুক্যে ঘনায়মান হইত—এক দিকে যাহারা ঘরে আছে তাহারা প্রবাসীর আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া দিন যাপন করিত, আর অন্য দিকে যাহারা প্রবাসী পথিক তাহারা বহুকাল পরে গৃহে ফিরিয়া প্রিয়মিলনের জন্য পর্যুৎসুক হইয়া পথ চলিত। এই ভাবটি ভারতের নরনারীর মনের সঙ্গে নিবিড় হইয়া মিলিয়া গিয়াছিল, বর্ষা তাহাদের নিকট বিরহ-দশা-মোচনের অগ্রদূতী-রূপে আবির্ভূতা হইত। এইজন্য বর্ষার আগমনে নরনারী বিরহে আকুল হইয়া প্রিয়মিলনের জন্য উৎসুক হইত।

বর্ষায় বিরহ জাগে—তখন প্রাণের আকুতি প্রণয়-প্রতিবেদনে পরিব্যক্ত হইতে চায়। এইজন্য মহাকবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি পর্যন্ত সকল প্রাচীন কবির কাব্যে বর্ষার একটি বিরহিণী-রূপ বর্ণিত হইয়াছে। সে-সব গান পথ-চাহিয়া-থাকা আন্‌মনা অবস্থারই গান। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল-স্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য-শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ-কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ় স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশ-বিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কি কি সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো;—ফুলফোটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক।—বিচিত্র প্রবন্ধ (অথবা সঙ্কলন), কেকা-ধ্বনি।

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়ালো, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ।

ঋতু-উৎসব, শেষ বর্ষণ।

"দুর্দান্ত বৃষ্টি। বৃষ্টির দিনে, যাকে ভালোবাসি তার দুই হাত চেপে ধরে বল্‌তে ইচ্ছে করে—জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ এই কথাটি বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মর্রীয়া হ'য়ে উঠল…হু হু ক'রে কী যে হেঁকে বল্‌ছে তার ঠিক নেই, তারি ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট জগৎ আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে।……ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। এর পরে যখন কেউ আস্‌বে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডব-নৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসব নীরবে চ'লে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল, তবে কোনো দিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বল্‌বার দৈবশক্তি আর জোটে না। যে দিন সেই বাণী আসে, সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখীর মতো। কতদিন থেকে, কত দূর থেকে আস্‌ছে, সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। স্পর্শ কর্‌ল আজ সেই কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল। আজ কা'কে এমন ক'রে বল্‌তে চাই…সত্য সত্য, এত সত্য আর কিছু নয়।"

—শেষের কবিতা

জীবনের শেষ কথা—কবি ব্রাউনিং যাহাকে বলিয়াছেন "One Word More"—অন্তরের সেই গূঢ়তম কথাটি সব সময়ে বলা যায় না—একবার মাত্র বিশেষ দিন-ক্ষণ পাইলে বলা যায়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ দ্বারা চঞ্চল সংসার, নর-নারীর কর্মকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ সংসার নিগূঢ় ভাব-জীবনের এতই বিসংবাদী যে, সেই অন্তরতম কথাটি সেখানে প্রকাশ করার ক্ষেত্র পাওয়া যায় না, বিশেষ দিন-ক্ষণ পাইলে তাহা একবার মাত্র হয়তো কোনো প্রকারে পরিব্যক্ত করা যাইতে পারে। এই জন্য র‍্যাফেল সারাজীবন প্রিয়াকে আদর্শ করিয়া ছবি আঁকিয়াও প্রিয়ার নিকটে সেই অন্তরতম কথাটি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, তখন তিনি একটি কবিতা লিখিয়া প্রিয়ার কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন; আবার মহাকবি দান্তে মহাকাব্যে প্রেয়সীর বন্দনা গান করিয়াও শেষ কথাটি বলিয়া ফুরাইতে পারেন নাই, তখন তিনি প্রিয়ার প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া সেই গূঢ় কথাটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন;—ইঁহারা দুইজনে নিজের নিজের প্রতিদিনকার অভ্যস্ত ব্যবহারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতনতর উপায়ে

একবার মানব-জীবনের 'জীবন-মরণ-ময় সুগম্ভীর কথা' ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রেমিক প্রেয়সীকে একান্ত নির্জনে সমস্ত জগতের কোলাহল ও রূঢ় দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিয়া পাইতে চাহে, তাহার কাছে সমাজ সংসার তখন সব অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। কেহ যদি কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলে যে—ওগো আমি তোমায় ভালোবাসি, তবে তাহা বক্তার নিজের কানেই অসঙ্গতির সুর ধ্বনিত করিয়া তুলে। কিন্তু যখন দুটি মাত্র হৃদয় পরস্পর সন্নিহিত হয় এবং সেখানে আর কাহারও অনধিকার প্রবেশ থাকে না, তখন 'দুকথা' কানে কানে বলা যাইলেও যাইতে পারে—

ও-মুখ মনোরম
শ্রবণে রাখি' মম
দু-কথা বলো যদি—
'প্রিয় বা প্রিয়তম',
তাতে তো কণা মধু ফুরাবে না।

—গান

যে কথা জীবনে অপরিব্যক্ত থাকিয়া যাইতেছে, যে কথা জগতের কোলাহলে হারাইয়া যাইবে, তাহা যেন আজ এই ঘনবর্ষার যবনিকার অন্তরালে বসিয়া কানে কানে বলা যায়।

এই কথা কবি অনেকদিন পূর্বে একখানি চিঠিতে পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, দেখিতে পাই—

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্‌স্‌ আছে তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ-দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব, সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ—অনেকগুলো মানুষ ভারি ক্ষুদ্র ও খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি ব'সে থাক্‌বার যোগ্য। আর কতকগুলো মানুষে একত্র থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটেছুঁটে অত্যন্ত খাটো ক'রে রেখে দেয়—একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায়—তা হ'লে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়—যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত ক'রে দুই অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারি নে।

—ছিন্নপত্র

আকাঙ্ক্ষা

(২০-এ বৈশাখ, ১২৯৫ সাল ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

যখন নববর্ষার আগমনে 'আর্দ্র তীব্র পূর্ব-বায়ু বহিতেছে বেগে', তখন 'মনে জাগিতেছে সদা—আজি সে কোথায় ?' কতদিন সে তো আমার কাছে ছিল, তবু তো তাকে আমার অন্তরতম গূঢ় কথাটি বলিবার অবসর পাই নাই—

কতকাল ছিল কাছে, বলিনি তো কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।

*　　*　　*

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।

হৃদয়ের সেই কথাটি জীবনের শেষ চরমতম কথা—'জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা।' তাহাকে যদি 'আত্মার আঁধারে' বিজনে বসাইয়া সেই কথা শুনাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দুজনেই শুনিতে পাইতাম—

দুটি প্রাণতন্ত্রী হ'তে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন-পানে !

একাল ও সেকাল

(২১-এ বৈশাখ, ১২৯৫ সাল ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"। ইহা দেখিয়া একালের কবির মনে পড়িতেছে সেকালের বর্ষার বিচিত্র সব ছবি। চিরন্তনী নারীর প্রতিনিধি রাধা বর্ষার সমাগমে প্রিয়-সমাগমের জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বিরহব্যথা সহ্য করিয়া থাকিতে না পারিয়া দিবাতেই অভিসারে চলিয়াছেন, সেই কাহিনী মনে পড়িতেছে। যে-সব প্রবাসী প্রিয়মিলনোৎসুক হইয়া গৃহের পথে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, সেই-সব পথিকের বিরহবিধুরা বধূরা শূন্য পথের দিকে কাতর দৃষ্টি পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, কবির কল্পনা-নেত্রে সেই ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষের নারী বিরহে কাতরা হইয়া কেশ-বেশের আর যত্ন করে না, সে বর্ষার আগমনে উন্মনা হইয়া বীণা লইয়া প্রিয়ের নামাঙ্কিত

গান গাহিতেছে। কবি বলিতেছেন,—সেই বৃন্দাবন বা অলকাপুরী অতীত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা চিরন্তন হইয়া মানবের মনে বিরাজ করিতেছে, এবং ঋতু-পর্যায়ে সেখানে প্রতিবৎসর 'উঠে বিরহের গাথা বনে-উপবনে'। বিরহী-চিত্তের মধ্যে মিলনের বাঁশী এখনো তেমনি বাজে, বিরহ-মূর্তি ধরিয়া 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে'!

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী বহু পুরাতন হইয়াও নিত্য নবীন, কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষদম্পতীর বিরহ-ব্যথা বহু প্রাচীন হইয়াও চিরনবীন। এই দুই প্রেমিকযুগল আত্মভোলা প্রণয়-নিবেদন ও বিরহব্যথার প্রতীক-স্বরূপ। তাই তাঁহাদের কাহিনী কখনো পুরাতন হয় না, এবং নবীন প্রেমিক-প্রেমিকারাও তাহাদের অন্তর-বেদনা নিজের নিজের অন্তরে আজও অনুভব করিয়া থাকে।

কবি রবীন্দ্রনাথ বর্তমানের সঙ্কীর্ণ ভূমিতে দাঁড়াইয়া দুই হাতে অতীত ও ভবিষ্যৎকে ধারণ করিয়া মিলন ঘটাইয়াছেন বহু কবিতায়। তাঁহার মানসলোকে বর্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ একটি মালার ন্যায় গ্রথিত হইয়াছে।

মেঘদূত

(৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সালে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে লেখা)

আষাঢ়ের প্রথম দিবসের বর্ষণের সহিত মেঘদূত কাব্য একেবারে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। নববর্ষার প্রথম দিবসে বর্ষণ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে মহাকবি কালিদাসের অমর বর্ষাকাব্য মেঘদূতের কথা উদয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

•আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যখনি আসে, তখনই নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।...মেঘদূতের মেঘ প্রতি বৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়...মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্ব-গাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

—বিচিত্র প্রবন্ধ [অথবা সঙ্কলন], নববর্ষা

মহাকবি কালিদাসের অনবদ্য কাব্য মেঘদূত রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—ইহার পরিচয় আমরা পুনঃ পুনঃ পাইয়াছি। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যে অনেকগুলি প্রবন্ধে বর্ষার কথা ও প্রসঙ্গক্রমে মেঘদূতের কথা আছে, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র মধ্যে মেঘদূতের সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে, 'লিপিকা'র মধ্যে মেঘদূত রচনা আছে, এবং 'পুনশ্চ' নামক গদ্যকাব্যের মধ্যেও 'বিচ্ছেদ' নামক রচনাটির মধ্যে এই মেঘদূত-কথাই আছে। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র মধ্যেও মেঘদূতের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবির উপর মেঘদূত কাব্যের প্রভাব কত নিবিড় ও গভীর।

মেঘদূতের চিত্র-পরম্পরা এবং তাহার ভাষা ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কবির মনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে যে, তিনি যেন কালিদাসের ভাবে ভাবিত হইয়া গিয়াছেন মনে হয়। এই কবিতাটি লিখিতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন—সমগ্র মেঘদূতের কাহিনীটির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাব্যের অবস্থা চিত্র বর্ণনা ও এমন কি ভাষা পর্যন্ত নিজের কবিতার অন্তর্গত করিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। পরের ঐশ্বর্যসম্ভার সঞ্চয়ন করিতে করিতে তাহাকে নিজের কবিত্বে পরিণত করিয়া তোলা অসাধারণ নিপুণতারই পরিচায়ক। এই হিসাবে এই কবিতাটি অতি সুন্দর। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কবি কালিদাসের কালের একটি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা এমন সুকৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহাতে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কালিদাসের বচনের প্রতিধ্বনি অনুধাবন করিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইবেন।

নববর্ষার আগমনে কবির মনে পড়িয়াছে মেঘদূতের বিরহ-ব্যথিত যক্ষের কাহিনী আর তাহার মেঘদূতের পথের ছবি ও শোভা। সে কাব্য এমনই বর্ষার দিনে কত কত বিরহী পাঠ করিয়া দুঃখের মধ্যেও আনন্দ অনুভব করিয়াছে। কবি সেই-সকলের কথা মনে করিতেছেন ভারতের পূর্বশেষে বঙ্গদেশে বসিয়া, যে দেশে আর-এক কবি জয়দেব তাঁহার সুললিত কাব্য গীতগোবিন্দের আরম্ভ করিয়াছিলেন নববর্ষার মেঘ-মেদুর ছবি আঁকিয়া। কবি আকাশে প্লবমান মেঘ দেখিতে দেখিতে তাহার সহিত কল্পনায় কালিদাসের বর্ণিত সকল দেশের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। আবার কল্পনা হারাইয়া যায়! কবি তখন চিন্তা করিতেছেন—

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?

কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে,
জগতের নদী-গিরি সকলের শেষে !

ইহার উত্তর কবি নিজেই দিয়াছেন তাঁহার পূর্বোল্লিখিত মেঘদূত রচনাগুলির মধ্যে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা তাহা সন্ধান করিয়া দেখিলে সুখী হইবেন।

কুহুধ্বনি

কেকাধ্বনি যেমন সমগ্র বর্ষার অন্তরের রূপটিকে প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি কুহুধ্বনি বসন্তের সমস্ত রূপকে বাণী দেয়। এই কুহুরব কোন আদিম কাল হইতে কত কত কবি-ভাবুকের মন মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, আজও তাহা পুরাতন হইল না, কারণ—

সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্মগান

কুহুধ্বনি শুনিলেই কবির মনে হয়—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে—
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'।

আজ এই কুহুরব শুনিতে শুনিতে কবির মনে পড়িতেছে কত যুগযুগান্তরের পুরাতন কথা, কারণ এই কুহুতান তো অনাদি কাল হইতে মানবের কানে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। কবি অনুমান করিতেছেন—

প্রচ্ছায় তমসা-তীরে শিশু কুশ-লব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,
ঘন সহকার-শাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্ত সনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,

তখন সে কুহু-ভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর।
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানব-প্রাণ মোর মাঝে বর্তমান,
দেশ কাল করি' অভিভব।
অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয়-মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহু-মন্ত্র বলে জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরাণ।

মানসীর মধ্যে এই কবিতাটি একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা, এই কবিতায় কবির গাজিপুর-বাসের সময়কার পশ্চিম-প্রদেশে গ্রীষ্মকালের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস কালের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতীতচারী হইয়াছে—অতীতের মাঝে বিচরণ করিয়াছে। কুহুধ্বনি শুনিয়া কবিচিত্ত প্রাচীন যুগের এবং নিত্যকালের রসলোকের পানে ধাবিত হইয়াছে।

অহল্যার প্রতি

(১২-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সালে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে লেখা)

এই কবিতাটি অহল্যার উদ্ধার-প্রাপ্তির পরে অহল্যাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। কবি অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এতকাল পাষাণী হইয়া পাষাণ-রূপে থাকিয়া তুমি কেমন ভাবে কাল যাপন করিলে? তুমি তো পাষাণ হইয়া পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলে, কিন্তু সর্বংসহা বসুন্ধরার মাতৃস্নেহ অনুভব করিতে পারিতে কি? তোমার মধ্যে তখন কি কোনো চেতনা ছিল? পান্থের পদধ্বনি, প্রাণীদিগের মিলন-কলহ-ক্রন্দন তোমার কর্ণে প্রবেশ করিত কি? বসন্ত-সমীর কি কখনও তোমার অঙ্গ পুলকিত করিত? নিদ্রায় কাতর হইয়া জীবগণ যখন রাত্রিতে ধরিত্রী-অঙ্কে গা ঢালিয়া দিত, সেই জীব-স্পর্শ-সুখ তুমি কি কখনও অনুভব করিতে? যে বসুন্ধরার উৎপাদিকাশক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ধনধান্য উৎপাদন করিতেছে, যে বসুন্ধরার বক্ষে জীবগণ নিয়তই মৃত্যুর পরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, সেই বসুন্ধরা মাতৃস্নেহে তোমাকে নিজ-বক্ষে ধারণ করিয়া

তোমার সকল পাপ-তাপ-গ্লানি বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। তাই আজ তুমি মুক্ত, তুমি আজ পুনর্জীবন-প্রাপ্ত, ধরণীর সদ্যোজাত সুন্দর সরল শুভ্র কুমারী-রূপে আবির্ভূত।

এই কবিতাটির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট ছায়াপাত হইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে কবি জড়বিশ্বকে প্রাণময় চেতনাময় রূপে অনুভব করিতেছেন। কবির দৃষ্টিতে এই পৃথিবী নির্জীব বা চেতনাহীন নহেন। তিনি সমুদয় সৃষ্ট জীবের স্নেহময়ী জননী। জীবের সুখ-দুঃখে তিনি অচঞ্চল বা উদাসীন থাকেন না। প্রকৃতির সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ গূঢ় ও গভীর, বহুকালকার। 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি আরো অনেকগুলি কবিতার মধ্যেও আমরা এই ভাব দেখিতে পাইব। কবি অনুভব করেন—পৃথিবী সন্তান-স্নেহ-ব্যাকুলা, তাঁহার স্নেহ-মমতা বিপুল। জড়ের মধ্যেও যে বিশ্বচৈতন্য বিরাজ করিতেছেন, তিনি কবির নিকটে দেখা দিয়াছেন।

নিষ্ফল উপহার

(২৭-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল ; ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)

যে কবিতার মধ্যে একটি কাহিনী থাকে তাহাকে গাথা বা ইংরেজীতে ব্যালাড্ বলে। এই ব্যালাড্ যেন গদ্য ছোটগল্পের কবিতা-সংস্করণ। যে কবি উত্তরকালে ছোটগল্প লেখার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, এবং যিনি গাথা রচনা করিয়া 'কথা' ও 'কাহিনী' নামক পুস্তক দুখানির দ্বারা বহু লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধারণ ক্ষমতার অঙ্কুর দেখা যায় এই 'মানসী'র মধ্যে 'নিষ্ফল উপহার' কবিতায়। ইহা ঠিক ঐতিহাসিক তথ্য কিনা বলা যায় না, কিন্তু ইহা যে কবিত্বের সত্য তাহা নিশ্চয়। গুরু শিষ্যদের ভাগবত-কথা শুনাইতে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে এক বিষয়ী শিষ্য একজোড়া হীরক-বলয় উপহার দিল। গুরু অন্যমনস্কভাবে তাহা লইয়া আঙুলে ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং একটি বলয় তাঁহার অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। শিষ্য হাহাকার করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় পড়িয়াছে, দেখাইয়া দিলে আমি উহা উঠাইবার চেষ্টা করিতে পারি। গুরু দ্বিতীয় বলয়টি জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ঐখানে পড়িয়াছে।

ইহার পর কবি আর বলিলেন না যে কি হইল। এইখানে ছোটগল্পের অপূর্ব আর্ট তাঁহার লেখনীর মুখে নির্বাক্ সংযমে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ে নির্লিপ্ত ভগবদ্‌ভক্ত গুরুকে বুঝিতে না পারিয়া বিষয়ী শিষ্য যে রত্নবলয় উপহার দিয়াছিল, তাহা গুরুর কাছে নিষ্ফল ও গুরু তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়াতে বিষয়াসক্ত শিষ্যের কাছেও নিষ্ফল হইয়া গেল।

রাজা ও রাণী

(২৫-এ শ্রাবণ, ১২৯৬ সালে প্রকাশিত)

ইহা একখানি নাট্যকাব্য। ইহার নায়ক জলন্ধর-রাজ্যের রাজা বিক্রমদেব যৌবনের একান্ত ভোগপ্রধান অন্ধ আবেগে নবপরিণীতা সুন্দরী রাণী সুমিত্রাকে ভালোবাসিয়াছিলেন, এবং সেই ভোগাসক্তির মোহে তিনি কর্তব্য ও কল্যাণের ক্ষেত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন। রাজার বয়স্য ব্রাহ্মণ দেবদত্ত রহস্যের দ্বারা রাজাকে স্বীয় কর্তব্যে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই, তখন তিনি রাণীর শরণাপন্ন হইলেন। রাণী সুমিত্রা রাজা বিক্রমদেবের কল্যাণচেতনা জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনিও কৃতকার্য হইলেন না। রাজা বিক্রমদেব রাণীতে ছাড়া আর কিছুতে মনোনিবেশ করিতে চাহেন না। তখন রাজাকে সচেতন করিবার জন্য রাণী রাজাকে ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন।

রাজকার্যে রাজার অবহেলার সুযোগ লইয়া রাণীরই আত্মীয়গণ,—বিদেশী কাশ্মীরী কর্মচারীরা রাজ্যে প্রজাদের উপর নানা উপদ্রব করিতেছিল, তাহাদের অর্থ শোষণ করিয়া তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা ইহার কোনো প্রতিকার এতদিন করেন নাই। এখন রাণী সুমিত্রা কাশ্মীরে গিয়া নিজের পিতৃভূমির কলঙ্ক স্খালন করিবার জন্য ভ্রাতা কুমারসেনের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জলন্ধর-রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন,—তিনি অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের দণ্ড দিবেন।

রাজা রাণীকে হারাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া ছিলেন। এখন একজন বাহিরের লোক তাঁহার রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সংস্কার করিতে আসিয়াছেন দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া

উঠিলেন। বিক্রমদেবের কাশ্মীরী কর্মচারীরাও এই সুযোগ পাইয়া রাজাকে বুঝাইল যে, তাহারা যদি বাস্তবিক কিছু অন্যায় করিয়া থাকে তবে তাহাদিগকে রাজাই শাস্তি দিবেন, অপরে কেন ইহাতে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিতে আসে, ইহা তো রাজারই প্রতি অপমান। ক্রুদ্ধ রাজা কুমারসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।

কুমারসেন ভগিনীপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। কাজেই তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিক্রমদেব কুমারসেনকে অনুসরণ করিয়া কাশ্মীরে গিয়া রাজ্য অবরোধ করিলেন। ইহাতে স্বদেশরক্ষার জন্য কুমারসেন তাঁহার খুল্লতাত চন্দ্রসেনের নিকট সৈন্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু চন্দ্রসেন তাঁহার পত্নী রেবতীর কুপরামর্শে কুমারকে কোনো সৈন্য-সাহায্য দিলেন না। তখন কুমারসেনকে পলায়ন করিতে হইল। কুমারসেনের সহিত তাঁহার ভগিনী সুমিত্রাও বনে আশ্রয় লইলেন। অতঃপর বিক্রমদেব কাশ্মীর অধিকার করিয়া বসিলেন এবং কুমারকে ধরিয়া দিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের প্রজারা কুমারসেনকে ভালবাসিত, তাই তাহারা কেহই কুমারের সন্ধান বিদেশী বিজেতাকে দিল না। তখন প্রজাদের উপর ও কুমারসেনের প্রতিপালক ভৃত্য বৃদ্ধ শঙ্করের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন হইতে লাগিল। এই সময়ে কুমার তাঁহার ভগিনী সুমিত্রাকে বলিলেন যে এমন কাপুরুষের মতো লুকাইয়া থাকা কেবল যে তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে তাহা নহে, দেশের প্রজাদেরও ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইতেছে। তখন রাণী সুমিত্রা বলিলেন—'এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।'

ভগিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া কুমার আনন্দিত হইলেন এবং নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিয়া—কাশ্মীরের অতিথি ও কাশ্মীররাজের জামাতা বিক্রমদেবকে নিজের ছিন্নমুণ্ড উপহার দিয়া সকল বিরোধের অবসান করিতে চাহিলেন। রাজকুমারের ছিন্নমুণ্ড যে-সে লইয়া যাইতে পারে না। তাই কুমার অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার প্রিয় ভগিনী কাশ্মীরের রাজকুমারী বিক্রমদেবের প্রণয়িনী সুমিত্রা স্বয়ং ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া গিয়া রাজাকে উপহার দিবেন।

এদিকে কুমারসেনের সহিত ত্রিচূড়ের রাজকুমারী ইলার বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। ইলা সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া কুমারকে ভালোবাসিতেন। কিন্তু কুমার পলাতক শুনিয়া ইলার পিতা বিক্রমদেবকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

বিক্রমদেব ইলার নিকটে আসিয়া কুমারের প্রতি তাহার একান্ত অনুরাগের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং ইলার প্রেম-তন্ময়তা দেখিয়া তাঁহার মনের উগ্রতা তিরোহিত হইল, তিনি কুমারের সন্ধান করিয়া ইলার সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

একদিকে যখন রাজা বিক্রমদেবের চিত্তে এইভাবে পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তখন অন্যদিকে কুমারসেন প্রজাদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত—প্রজাসত্য পালনের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কুমারের অন্তিম ইচ্ছানুসারে রাণী সুমিত্রা প্রিয় ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড লইয়া রাজাকে উপহার দিলেন এবং সেই শোকাবেগ সহিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইলা প্রিয়তমের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

বিজেতা বিক্রমদেবের কাছে কুমার ধরা দিতে আসিতেছেন,—এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভৃত্য শঙ্কর অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে কুমার বীরের ন্যায় মৃত্যুর মহিমায় সকল বন্ধন ও অপমান উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তখন আনন্দে ও গর্বে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল।

ইহাই হইল রাজা ও রাণীর মোটামুটি অতিসংক্ষিপ্ত নাট্যবস্তু। এই নাটকে কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে,—প্রেম একান্ত ভোগপ্রধান বা একদেশদর্শী হইয়া উঠিলে তাহা সমস্ত আশ্রয়কে বিনাশ করে। প্রেম যদি নিজের সঙ্কীর্ণ ভোগের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মঙ্গলকর্মের বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া না যায়, তবে তাহা বিফল ও পঙ্গু হইয়া ক্লেশেরই কারণ হয়; এবং অবশেষে নিদারুণ দুঃখের কঠোর আঘাতে সেই সর্বগ্রাসী ভীষণ ভোগপ্রধান একদেশদর্শী প্রেমের নাগপাশ ছিন্ন হইয়া যায়।

রাজা হইতেছেন অন্ধ আবেগ, আর রাণী হইতেছেন নিঃস্বার্থ ত্যাগ। অন্ধ আবেগ প্রথমে প্রেম-রূপে ও পরে প্রতিহিংসা-রূপে রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল। রাণী রাজাকে প্রেমের অন্ধতা হইতে বাঁচাইলেন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া এবং প্রতিহিংসার অন্ধতা হইতে বাঁচাইলেন নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া—রাণী দুইবারই নিজেকে কঠিন কঠোর আঘাত করিয়া রাজাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিলেন।

এই নাটকে কয়েকটি চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে—রাজা বিক্রমদেব, রাণী সুমিত্রা, রাজার সখা দেবদত্ত, কুমারসেন ও তাঁহার ভৃত্য শঙ্কর, এবং কুটিল ব্রাহ্মণ ত্রিবেদী। ইলা একটি ক্ষুদ্র শুভ্র যূথিকার মতো কোমল সুন্দর। কুমারের প্রতি তাহার প্রেম মধুময়।

এই নাটকের মধ্যে আমাদের দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার একটু ইঙ্গিতও যেন আছে। জলন্ধরের যত সব কর্মচারী বিদেশী, তাহারা সব রাণীর আত্মীয় (যখন এই নাটক লেখা হয় তখন ইংলণ্ডে কুইন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল)—তাহারা প্রজাপীড়ক ও অর্থশোষক হইয়া কর্তব্য পালন করিতেছিল না। সেই অন্যায়ের প্রতিকার তখনই হইল, যখন স্বয়ং রাণীর কর্ণে বিপন্ন প্রজাদের আর্তনাদ গিয়া পৌছিল। রাণীর ন্যায়পরায়ণতা নিজের সুখ-সুবিধা সমস্ত বলি দিয়া অন্যায়ের প্রতিকারে উদ্যত হইল।

এই নাটকের কথাবস্তু অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে কবি অন্য একটি নাটক রচনা করিয়াছেন 'তপতী'। ইহা ১৩৩৩ সালে প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হয়, পরে আরও পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া ১৩৩৮ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা হয়। ইহার ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

রাজা ও রাণী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হ'লো! এইটেই রাজা ও রাণীর মুল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে, তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভার-গ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিম দৃশ্যে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধ'রে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে।......এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত ক'রে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছি এ নাটক আগাগোড়া নতুন ক'রে না লিখলে এর সদ্‌গতি হ'তে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্য-মতো দায়িত্ব শোধ করেছি।

কবি নিজের লেখা সম্বন্ধে নির্মম সমালোচক, তাঁহার নিজের নব নব সৃজনের প্রতিভা তাঁহার পুরাতন কিছুকেই তেমন সুজনরে দেখিতে পারে না। তাঁহার নিজের রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আদর্শ এত উচ্চ যে যাহা তিনি রচনা করেন তাহাই তাঁহার মনঃপূত হয় না। এ সম্বন্ধে পরে তিনি রঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ কর্‌ব মোচন !
আমায় হয়তো কর্‌তে হবে
আমার লেখা সমালোচন !
তত দিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে,
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এম্‌নি কটু বল্‌ব তাকে।
যে বইখানি পড়্‌বে হাতে
দগ্ধ কর্‌ব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হবো আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন !

—ক্ষণিকা, কর্মফল

এই নাটকখানির সম্বন্ধে কবির সহিত আমার একবার কথা হইয়াছিল। আমি এই নাটকের প্রশংসা করিতেছিলাম। তাহাতে কবি বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঃ! ওটা আবার নাটক নাকি! একটা মেলো-ড্রামা, কাটা-মুণ্ডু নিয়ে বাড়াবাড়ি কাণ্ড!

নাটকখানি কবির অল্প বয়সের লেখা, তাই ইহাতে চমৎকার লাগাইবার একটা প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু এই নাটক Tragedy of Blood হইলেও ইহাতে প্রকৃত নাটকীয় কলাকৌশলও যথেষ্ট আছে। ইহার প্রধান চরিত্রের সব কয়টিই বেশ জীবন্ত ও নিজের নিজের বিশেষত্বে মনোহর। ইহাতে নিপুণ শিল্পীর স্বজনদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই নাটকখানি নাট্য হিসাবে যেমন, কাব্য হিসাবেও তেমনি সুন্দর। ইলা ও তাহার সখীদের কয়েকটি গান অতি মনোরম।

তপতী নাটকখানি এক রকম স্বতন্ত্র নূতন নাটক হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পুরাতন 'রাজা ও রাণী' নাটকের অনেক চরিত্র বাদ পড়িয়াছে বা বদল হইয়াছে, আবার অনেকগুলি নূতন চরিত্র ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহার গানগুলিও নূতন এবং নাটকের অবসানও নূতন ধরণের গম্ভীর বিয়োগান্তক। আর উভয় নাটকের প্রধান পার্থক্য এই যে 'রাজা ও রাণী' ছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত,

আর 'তপতী' গদ্যে রচিত। 'তপতী'র রাণী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় তাঁহার মানবীয়তা হারাইয়া প্রায় দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। উভয় নাটকের পার্থক্যের পরিচয় কবি নিজেই তপতীর ভূমিকায় যাহা দিয়াছেন, তাহা আগে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিসর্জন

বিসর্জন একখানি নাট্য-কাব্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নাটকগুলির মধ্যে এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কবির সৃজনীশক্তি, হৃদয়ের উদারতা ও সত্যনিষ্ঠা আকার ধারণ করিয়াছে। বিসর্জন নাটকের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহার প্রথম সংস্করণটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বিসর্জন নাটকের বিশ্লেষণ ও আলোচনা আমি প্রধানত ঐ সংস্করণ অনুযায়ীই করিয়াছি।

বিসর্জন নাটকের গল্পাংশ কবির স্বরচিত রাজর্ষি উপন্যাস হইতে লওয়া। এই রাজর্ষি লেখার ইতিহাস কবি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন—

……দুই-একদিনের জন্য দেওঘরে যাই। কলিকাতা ফিরিবার সময় রাত্রে গাড়িতে ভিড় ছিল; ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না,—ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না, তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প লিখিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তাহার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম। —জীবনস্মৃতি

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণের মধ্যে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, মহারাণী গুণবতী ও যুবরাজ নক্ষত্ররায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ছত্রমাণিক্য-নামে ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার ও গোবিন্দমাণিক্যের স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ ঐতিহাসিক ঘটনা।……

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথম আঠারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্প বিসর্জনে ব্যবহার করা হইয়াছে। ৩২, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ পরিচ্ছেদ হইতে নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহের কথাও লওয়া হইয়াছে। রাজর্ষির অন্যান্য অংশের সহিত বিসর্জনের কোনো সম্পর্ক নাই।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্ররায়, রঘুপতি, জয়সিংহ, হাসি ও তাতা—এই কয়জনের কথা রাজর্ষি-উপন্যাসে আছে। গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাঁদপাল বিসর্জনের মধ্যে কবির নূতন সৃষ্টি। রাজর্ষি-উপন্যাসে হাসি ও তাতার কাকা কেদারেশ্বরের কথা আছে; বিসর্জনের প্রথম সংস্করণেও কেদারেশ্বরের কথা ছিল, পরে বাদ যায়।……বিসর্জনের প্রথম সংস্করণে অপর্ণার অন্ধ পিতার কথা ছিল, পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেওয়া হইয়াছে।……

বিসর্জনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা ১২৯৭ সালে—ইংরেজী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩০৩ সালের সংগৃহীত সংস্করণে ইহার অনেকখানি বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য—বর্তমান সংস্করণে ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য—নূতন যোগ করা হয়।…শেষ দৃশ্যের শেষ অংশটি পরে লেখা, সম্ভবতঃ ১৩১০ সালে……।—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; বিসর্জন নাটকের পরিচয় (১৩৩৩ সালের বিশ্বভারতী সংস্করণ)।

এই নাটকখানি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। নাটকখানি সম্বন্ধে টম্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন—

"Sacrifice is the greatest drama in Bengali literature...All these dramas are vehicles of thought rather than expressions of action; and they show the poet's mind powerfully working on the subject of such things in popular Hinduism as its bloody ritual of sacrifice. The dramas show also how the poet was emancipating himself from the tangles of the solely artistic aim of life. Sacrifice shows how greatly we slander Eternal Truth, when—

> The wrong that pains our souls below
> We dare to throne above.
>
> —Whittier.

Like Malini it teaches that love and not orthodoxy worships God, and it burns like a slow deep fire against bigotry. In all the plays, it is the woman who brings truth near, and often the woman who is a mere child.

Sacrifice and Malini and Karna-Kunti-Sambad undoubtedly placed him securely for all time into the small class of very great dramatists."

রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকে দেখাইয়াছেন যে, প্রথা প্রেমকে বিনাশ করিতে চাহিলে প্রেম প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অপর্ণা এতটুকু মেয়ে, কিন্তু তাহার শক্তি অপরিমেয়—সে জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া যাইতে ডাকিতেছে, রঘুপতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, রাজাকে সত্যদৃষ্টি দিয়া

সত্যপথে তাঁহাকে অটল দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। রঘুপতির ভয় গোবিন্দ-মাণিক্যকে নহে, রাজার সৈন্য-সামন্তকেও নহে, তাঁহার ভয় ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে। যতক্ষণ প্রথা মিথ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীকে, ভাই ভাইকে, প্রজা রাজাকে, পিতা (রঘুপতি) পুত্রকে (জয়সিংহকে) পর্যন্ত ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু ছোট্ট একটু প্রাণের প্রীতি ও করুণার স্পর্শে রাজার যেই সত্যদর্শন ঘটিল, অমনি মিথ্যা প্রথা ভূমিসাৎ হইয়া গেল, এবং সকলে সত্যের অমৃতস্পর্শ লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেল।—প্রেম ও মনুষ্যত্ব সকলকে সমস্ত মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে অব্যাহতি দিল। একটি জীবন্ত প্রাণশক্তি জড়ত্বের উপরে জয়ী হইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে। যেমন ছোট একটি বটের চারা প্রকাণ্ড পাথরের মন্দিরের শুষ্কতাকে এবং একটু ঘাসের পাতা মরুভূমির বিরাট্ বন্ধ্যাত্বকে জয় করিতে উদ্যত হয়, তেমনি সামান্য বালিকা অপর্ণার করুণা যুগ-যুগান্তরের জড় প্রথাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

মানুষের চিরন্তন মনোবৃত্তি প্রেম মায়া মমতা দরদ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কতকগুলা বিধি-নিষেধ ও আচারের শুষ্ক শাসন মাত্র মানিয়া চলিলে জয়সিংহের মত মহাপ্রাণকে বিসর্জন দিতে হয়। জয়সিংহের অপঘাত মৃত্যুতে রঘুপতির দারুণ মর্মদাহ এই কথাই প্রকাশ করিয়াছে। বিসর্জন নাটকে আছে —মানব-প্রণীত আচার-বিধির নৃশংসতার বিরুদ্ধে মানব-চিত্তের বেদনার্ত প্রতিবাদ। তাই অন্ধসংস্কারে জড়িত জয়সিংহ রঘুপতির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াও 'রাজরক্ত চাই' বাক্য দেবীর বাণী বলিয়া ভুল করিয়াছিল। মানুষ সংস্কার-বদ্ধ হইয়া থাকিলে পদে পদে ভুল করে—হৃদয়ের ও মনুষ্যত্বের চিরন্তন সত্যকে দেখিতে পায় না। বিধি আচার যত পুরাতনই হোক তাহার স্থান মনুষ্যত্বের ও হৃদয়-ধর্মের অনেক নীচে।

প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ বর্ণিত হইয়াছে বিসর্জনে, আর যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ দেখানো হইয়াছে কবির পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবী'তে।

রঘুপতি ত্রিপুরা-রাজ্যের চিরাগত 'বৃদ্ধ প্রথা'—ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে চিরাগত বলিদানের প্রথা রজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই প্রথা বজায় রাখিবার জন্য রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে ও প্রজাদিগকে বিদ্রোহী ও উত্তেজিত করিতে, এবং রাজা ও রাণীর মধ্যেও বিরোধ ঘটাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু রঘুপতির উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের লোভ বা স্বার্থপরতার

ক্ষুদ্রতার লেশ মাত্র নাই, এইজন্য তিনি পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেন। এই যে বিরোধ—ইহা কেবল মতের বিরোধ, ইহার মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির লেশমাত্র উদ্দেশ্য নাই। যদিও রঘুপতি রাজাকে গুপ্তহত্যা করাইতে বা প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, তিনি যে প্রথাকে সত্য ও ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছিলেন তাহারই সমর্থনের জন্য তিনি ঐ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইজন্য রঘুপতি রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার চরিত্রসৃষ্টি।

কিন্তু বিসর্জনের জয়সিংহ কবির একটি উৎকৃষ্টতর ও সুন্দরতর চরিত্রসৃষ্টি। গুরুর প্রতি এবং গুরুর বাক্যের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু তাঁহার মনের উপর বিবেকের প্রভাব গুরুভক্তির চেয়েও প্রবলতর; রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কণ্ঠে তাঁহার বিবেকই তাঁহাকে বলিল—

> অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
> পূজা। —২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

এবং তিনি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গুরুকে বলিলেন—

> ছি ছি, ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
> রক্তপিপাসিনী! —তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

জয়সিংহের মনের মধ্যে এই গুরুভক্তি ও বিবেকের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে আত্ম-বিসর্জন করিয়া—নিজের রক্ত দিয়া—রাজ্যের বিদ্বেষানল নির্বাপিত করিতে প্রেরণা দিল। জয়সিংহের এই আত্মবিসর্জন অতীব অপূর্ব ও গৌরবমণ্ডিত।

ইংরেজ কবি শেলী যেমন Spirit of Universal Love দ্বারা জগতের সকল অমঙ্গল ও পাপ দূর করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি প্রেমের দ্বারা সকল অকল্যাণ মোচন করিতে চাহিয়াছেন। সেই ভাবের প্রতীক হইতেছে অপর্ণা; অপর্ণা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মানুষ যখন প্রথা ও শাস্ত্রের কাছে আপনার বুদ্ধি ও বিবেককে বলি দিয়া পাপের ও নৃশংসতার লীলায় সমাজকে ছারখার করিতে উদ্যত হয়, তখনই প্রেমাবতার অপর্ণার আবির্ভাব আবশ্যক হয় —যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অনেকের মনে প্রেমের বীজ গুপ্ত সুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অঙ্কুরিত ও প্রকাশিত হইতে অপরের প্রেমের বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণার কথায় নিজের অন্তরের সেই সুপ্ত প্রেমের প্রথম পরিচয় পাইলেন। জয়সিংহ গুরুভক্তির মোহে আচ্ছন্ন হইয়া ছিলেন, তাই তিনি সাহস করিয়া প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে

পারিতেছিলেন না ; কিন্তু অপর্ণা-রূপিণী প্রেম-বৃত্তি সর্বগ্রাসিনী—আজ হোক কাল হোক প্রেমের কাছে সকলকেই পরাজয় ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। রঘুপতি পুরাতন প্রথার পাষাণ-ভিত্তি, তাঁহার

কঠিন ললাট
পাষাণ-সোপান যেন দেবী-মন্দিরের। —২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য

প্রেমের বীজ সেই পাষাণের মধ্যেও পড়িয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটিতেছিল। যখন তাঁহার প্রাণপ্রতিম পালিত-পুত্র জয়সিংহ আপন রক্ত দিয়া প্রথার পাষাণ-ভিত্তি সিক্ত শিথিল-মূল এবং সরস করিয়া দিল, তখন সেই পাষাণের অন্তরেও প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ ও অনুকূল অবস্থা লাভ করিল। রঘুপতি তখন বুঝিতে পারিলেন যে জীবন্ত প্রেম-প্রতিমা অপর্ণার তুলনায় পাষাণী কালী-প্রতিমা কত তুচ্ছ—

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী ! —৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য

এখন রঘুপতি অপর্ণাকেই মা বলিয়া অবলম্বন করিলেন। অপর্ণা সমস্ত নাটকের মধ্যে বিস্ময়জনক কিছুই করে নাই, তবু কবির কলাকৌশলে সে-ই সমস্ত ঘটনার মূল ও কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমেই—নাটকের প্রারম্ভে আমরা দেখি অপর্ণা বেগে প্রবেশ করিয়াই পূজায় আসীন রাজার নিকটে নিবেদন করিল—"বিচার প্রার্থনা করি।" এইখানে কবি সুকৌশলে সমস্ত নাটকের মূল দ্বন্দ্বটিকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা দেব-মন্দিরে পূজায় আসীন ; ইহাতে প্রথমেই রাজাকে ধার্মিক-রূপে দেখানো হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন অপর্ণার ছাগশিশু কে কাড়িয়া লইয়াছে ? অপর্ণা উত্তর দিল—

রাজ-ভৃত্য তব।
রাজ-মন্দিরের পূজা। বলির লাগিয়া
নিয়ে গেছে।

এই অভিযোগ রাজার কাছে রাজারই বিরুদ্ধে। অপর্ণার সরলতা তাহাকে নির্ভীক তেজস্বিনী করিয়াছিল।

এমন সময়ে জয়সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই বালিকার মনে বেদনা দিয়া তাহার ছাগশিশু কাড়িয়া আনা হইয়াছে,—

এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে ?

জয়সিংহ দেবতার প্রতি একান্ত বিশ্বাসশালী, আবার অপর দিকে দয়ার্দ্র-হৃদয় উদার-স্বভাব। তিনি বালিকার বেদনা ও মহারাজের আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন—

মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।

ইহাকে নাটকীয় গূঢ় ইঙ্গিত বলা যাইতে পারে (Dramatic Irony)। জয়সিংহের এই কথার মধ্যে নাটকের আগামী ঘটনার আভাসই দেওয়া হইয়াছে।

অপর্ণা ও জয়সিংহ প্রস্থান করিলেন। রাজা হাসি ও তাহার ভাই তাতার জন্য পূজার আসনে বসিয়াই উৎসুক হইতেছিলেন। ইহার দ্বারা কবি একটি নাটকীয় ইঙ্গিত পাঠকদিগকে পূর্বাহ্ণে জানাইয়া রাখিলেন যে, হাসি ও তাতা সম্বন্ধে রাজার দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।

হাসি ও তাতা আসিল। তাহারা রাজার সহিত যাইতে যাইতে দেবীর মন্দির-সোপানে রক্তের দাগ দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এত রক্ত কেন ?

ইহার একটু আগেই অপর্ণা আসিয়া তাহার ছাগশিশু-হরণের অভিযোগ করিয়া রাজার চিত্ত করুণায় দ্রব করিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার হাসির প্রশ্নে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মনের কন্দরে কন্দরে হাসির সেই প্রশ্নই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—এত রক্ত কেন ?

জয়সিংহ ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন যে অপর্ণার ছাগ আর পাওয়া যাইবে না, 'মা তাহারে নিয়েছেন।' এই কথা শুনিয়া অপর্ণা তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—

মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা। রাক্ষসী নিয়েছে তারে !

অপর্ণা-রূপে আবির্ভূতা মূর্তিমতী করুণা সত্যধর্মের হিংসাহীনতা প্রচার করিল ; সে স্পষ্ট বাক্যে বলিয়া দিল যে মাতার ধর্ম মমতা, করুণা ; আর রাক্ষসীর ধর্ম হিংসা ; অতএব যে রক্তলোলুপ, সে রাক্ষসী নয় তো কি !

জয়সিংহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথচ সরল বিশ্বাসী, তাই তিনি অপর্ণার মুখে ঐ কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ও-কথা এনো না মুখে।

রাজা এই দুই জনের দুই ভাবের মধ্যে দ্বিধান্বিত হইয়া কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তিনি বলিলেন—

বৎসে, আমি বাক্যহীন।

রাজার ও অপর্ণার কথা শুনিয়া জয়সিংহও দ্বিধান্বিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে সংস্কার ও বুদ্ধির, সংস্কার ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল—

করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর!

জয়সিংহের ব্যথিত চিত্তের পরিচয় পাইয়া অপর্ণার মনে তাঁহার প্রতি প্রণয়-সঞ্চার হইতেছে। আজন্ম-স্বাধীনা অপর্ণা মেয়ে হইয়াও জয়সিংহকে সেই মন্দিরের নিষ্ঠুর আবেষ্টন ছাড়িয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইতে অসঙ্কোচে আহ্বান করিল।

জয়সিংহ অপর্ণার এই করুণ প্রীতির আহ্বান শুনিয়া নূতন এক অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাইলেন। তাঁহার অন্ধভক্তি অপর্ণার প্রেমের স্পর্শে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
করুণা-কাতর কণ্ঠে। ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি'।

—১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য

জয়সিংহ দেবী-প্রতিমাকে গিরিনন্দিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, প্রতিমা পাষাণে নির্মিত এবং তাঁহার হৃদয়কে অপর্ণার প্রেমধারা পাষাণতনয়া নির্ঝর-ধারার ন্যায় অভিষিক্ত করিয়াছে বলিয়া। জয়সিংহ অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

জয়সিংহ অপর্ণাকে শোভনা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, কারণ তাঁহার মনে হইল অপর্ণা বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ সৌন্দর্যে শোভাময়ী। জয়সিংহের মনে

সত্যধর্ম জানিবার জন্য ব্যগ্র বাসনা জাগ্রত হইয়াছে, তিনি পাষাণ-প্রতিমায় আর চিত্তের আশ্রয় পাইতেছেন না! সেইজন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় আশ্রয় আছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন গোবিন্দমাণিক্য—যেথা আছে প্রেম! জয়সিংহ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন—কোথা আছে প্রেম? জয়সিংহ তো প্রেমের সহিত এখন পর্যন্ত পরিচিত হন নাই, তাই তাঁহার মনে অপরিচয়ের দ্বিধা জাগিতেছে।

জয়ংসিংহ অপর্ণাকে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন।

অপর্ণা ও জয়সিংহ চলিয়া যাইতেই হাসি বলিয়া উঠিল—"এইবার সব মুছে গেছে!" মন্দিরে পাষাণ-প্রতিমার পরিবর্তে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইবামাত্র হিংসার চিহ্ন রক্তের সব দাগ মুছিয়া গেল।

প্রথম অঙ্কের এই প্রথম দৃশ্যটি সমস্ত নাটকীয় ঘটনার উপক্রমণিকা মাত্র। এখানে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি ভাবী সংগ্রামের নিমিত্ত বলসঞ্চয় করিল, ইহা যুদ্ধের উদ্‌যোগপর্ব। রঘুপতির নিষ্ঠুর-শক্তি রাণীকে সমগ্রভাবে এবং অপর্ণার দেবী-শক্তি কারুণ্য-শক্তি রাজাকে সমগ্রভাবে এবং উভয়ের বিভিন্নধর্মী শক্তি জয়সিংহকে আংশিকভাবে অধিকার করিয়া বলসঞ্চয়ের দ্বারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রঘুপতির প্রভাবে ও প্ররোচনায় রাণী বলি দিতে ও রাজা অপর্ণার প্রভাবে বলি নিষেধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইহার ফলে গৃহবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইল। একদিকে রঘুপতি ও রাণী, অপর দিকে অপর্ণা ও রাজা, এবং ইঁহাদের উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে দ্বিধান্বিত হইয়া রহিলেন জয়সিংহ।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মহারাণী গুণবতী দেবী-মন্দিরে পূজা করিতে করিতে একাকিনী চিন্তা করিতেছেন—'মার কাছে কী করেছি দোষ?' প্রথমেই তিনি দেবীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া নিজের মাতৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। তিনি রাজরাণী স্বামী-সোহাগিনী, কিন্তু সন্তানহীনা। নিঃসন্তান অবস্থার ক্ষোভ তাঁহাকে পীড়া দেয়। তিনি বলিতেছেন যে, যে ভিখারিণী পেটের দায়ে পেটের সন্তানকে বিক্রয় করে, অথবা যে পাপিষ্ঠা কুলটা লজ্জার দায়ে সন্তান হত্যা করে, তুমি তাহাদেরও সন্তান দাও, কেবল আমাকেই বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! সতীধর্মত্যাগিনী নারীও সন্তানবতী হয় বলিয়া তাহার উপর নিঃসন্তানা সাধ্বী মহারাণীর কোপ প্রকাশ পাইয়াছে. তাহাকে পাপিষ্ঠা বলাতে। ভিখারিণী ও পাপিষ্ঠার সঙ্গে রাণী নিজের অবস্থার

তুলনায় সমালোচনা করিতেছেন। তিনি চাহেন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার কোলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে উপহার দিবে—"অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!" কিন্তু সেই সুখ তাঁহার ভাগ্যে এখনো জুটে নাই। তাই তিনি কুমার-জননী দেবীকে প্রার্থনার ছলে ভর্ৎসনা করিতেছেন—

> কুমার-জননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
> করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হ'তে ?

যিনি নিজে কুমারের জননী, যিনি মাতৃত্বের আনন্দ নিজে আস্বাদন করিয়া জানিয়াছেন, তিনি কেন মহারাণীকে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা রাণীর ধারণার অতীত। মহারাণীর একটি মাত্র অভাব; সেই অভাব-পূরণের সুখ তাঁহার কাছে স্বর্গতুল্য প্রতিভাত হইতেছে, তিনি মাতৃস্বর্গের সুখ পাইতে ব্যাকুল।

দেবীর পূজক রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাণীর মনের চিন্তা কথায় পরিব্যক্ত হইয়া গেল, তিনি রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তো চিরদিন মার পূজা করিয়া আসিতেছি, আমার স্বামীও মহাদেব-সম নিষ্পাপ, তবে কোন্ দোষে সেই মহামায়া আমাকে নিঃসন্তান-শ্মশান-চারিণী করিলেন? রাণীর নিকটে নিঃসন্তান অবস্থা শ্মশানের তুল্য মনে হইতেছে। রাণী দেবীকে মহামায়া বলিয়া নির্দেশ করিলেন—তাঁহার লীলা ও উদ্দেশ্য দুর্জ্ঞেয় বলিয়া। রঘুপতি দেবীর পূজক, সুতরাং দেবী-মহিমার মর্মজ্ঞ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব এবং তিনি বিশ্বমাতার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতেও সমর্থ হইতে পারেন; এইজন্য রাণী তাঁহার কাছে নিজের মনের ক্ষোভ ও খেদ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি রাণী, তাঁহার বিহ্বলতা কোন কারণেই শোভা পায় না, সেইহেতু তাঁহার অভিযোগ খুব সংযত ও মহিমান্বিত।

রাণী গুণবতী দেবীকে মহামায়া বলিয়াছিলেন। রঘুপতিও সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—মায়ের মহিমা কে বুঝিতে পারে, তিনি ইচ্ছাময়ী, তিনি পাষাণ-তনয়া, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে দয়া মমতা কিছু নাই, এবং তিনি খেয়ালী।

গুণবতী বলিলেন—

> করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন,
> বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ' মহিষ,
> তিন শত ছাগ!

রাণী স্বার্থান্ধ হইয়া দেবীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি যদি একটি শিশু পান, তাহা হইলে সেই শিশুর প্রাণের বিনিময়ে তিনি প্রতি বৎসর চারিশত পশু-শিশুর প্রাণ বধ করিবেন! এইখানে স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইল, রাণীর ও রাজার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের সূত্রপাত হইল। রাণী যে কী অন্যায় অসঙ্গত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন তাহা তিনি নিজের স্বার্থপরতার মোহে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন হাসি ও তাতা আসিতেছে। অমনি তাঁহার মন তাহাদের প্রতি ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল, কারণ রাজা তাহাদের ভালোবাসেন; সেই ভালোবাসা রাণীর গর্ভজ সন্তান পাইবার পূর্বে তাহারা বেদখল করিয়া লইতেছে বলিয়া রাণীর হিংসা। রাণী স্বার্থপর, তিনি নিজে মাতৃত্বের আস্বাদ পাইতে চাহেন, কিন্তু মাতৃহীনকে মাতার স্নেহমমতা দিতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহার মনে পরের ছেলের প্রতি হিংসার উদ্রেক হইতেই তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন—

> পরের ছেলেরে হিংসা ক'রে অকল্যাণ
> হবে, লাগিবে পুত্রহীনারে মাতৃশাপ।

রাণী নিজের স্বার্থহানির ভয়েই হিংসা সংবরণ করিতে চাহিতেছেন—নিজের স্বাভাবিক নারীপ্রবৃত্তির বশবর্তিনী হইয়া নহে। তিনি হাসি ও তাতাকে আদর করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তখনই দেখিলেন যে রাজা আসিতেছেন, অমনি তাহাদের প্রতি রাজার স্নেহ উদ্রেকের ভয়ে রাণীর চেষ্টাকৃত আদর দূর হইয়া গেল, তিনি তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। রাজাকে তিনি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে রাজা তাঁহার রাজপুত্রের প্রাপ্য অপরকে বিতরণ করিয়া অনুচিত কার্য করিতেছেন। কিন্তু রাজা বলিলেন—

> স্নেহ পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে যত দান
> করো। স্রোতস্বিনী হ'য়ে ওঠে, যত ঝরে
> নির্ঝরের ধারা।

রাজা রাণীকে বুঝাইতে চাহিলেন যে—স্বার্থপরতা ও স্নেহ বিরুদ্ধধর্মী—এক সঙ্কীর্ণ, অপর উদার। কোনো বাক্যকে নানাবিধ উপমা দ্বারা সমর্থন করিয়া তাহার যথার্থতা সুস্পষ্ট করিয়া তোলাতে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে তিনি সেই ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা প্রস্থান করিলেন। রাণী দেবী-প্রতিমার নিকটে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিলেন—

মহামায়া, কত রক্ত কত প্রাণ চাস্
আমারে করিতে দান সেই প্রাণটুকু!

অপরের প্রাণহানি করিয়া রাণী নিজের কোলে একটু প্রাণকণিকা পাইতে চাহেন। এই অসঙ্গতি তাঁহার স্বার্থান্ধ মন কিছুতেই অনুভব করিতে পারিতেছিল না।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মন্দিরে জয়সিংহ ও অপর্ণা আলাপ করিতেছেন। জয়সিংহ বলিতেছেন—তুমি আমার কাছে আরো কিছুদিন থাকো, "তোমাদের দুঃখ দূর ক'রে ধন্য হই।" জয়সিংহের এই দুঃখ দূর করার প্রস্তাব অপর্ণার ভালো লাগিল না, সে তো দয়া অনেকের দ্বারে পাইয়াছে, সেই দয়া সে জয়সিংহের কাছে চায় না, তাই সে বলিল, "আরো দয়া আবশ্যক কি বা?" জয়সিংহ বলিয়া ফেলিলেন, "জানো তো বালিকা, অতিথি দেবতা সম।" এই বালিকা-সম্বোধন অপর্ণার কানে ও প্রাণে বাজিল, সে বলিয়া উঠিল—

বালিকা! বালিকা তরে অতিথি-সম্মান!
কাঙাল বালিকা, ভিক্ষা ভালো, ভিক্ষা ভালো!

সে যে যুবতী হইয়াছে, জয়সিংহের সাক্ষাৎ যে তাহার প্রাণে প্রেম জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, এই সংবাদ তো তাহার আর অগোচরে নাই, কিন্তু অন্ধ জয়সিংহ যদি তাহা দেখিয়াও না দেখেন, বুঝিয়াও না বুঝিতে চান, তবে তাঁহার কাছে দয়া পাওয়ার চেয়ে অন্যত্র ভিক্ষা ঢের শ্লাঘ্য। অপর্ণা চায় জয়সিংহের প্রেম, প্রেমের প্রতিদানে প্রেম, সে অনুগ্রহ চাহে না। অপর্ণা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে!

সে এই বিপুলা ও বহুজনসমাকীর্ণা পৃথিবীতে একাকিনী, কেহ তাহাকে এখনো সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত তো হইল না।

ইহার পরেই জনতার প্রবেশ। তাহারা রক্তপাতের আনন্দে উন্মত্ত, তাহারা ধর্মের প্রথাকেই জানে, তাহারা হিতাহিত ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে পারে না।

জয়সিংহ জ্বরঘোরে অচেতন হাসিকে কোলে করিয়া সেই মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজাও হাসিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিলেন এবং

রাজবৈদ্যকে ডাকিয়া আনিতে জয়সিংহকে পাঠাইলেন। হাসি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল—'রক্ত! রক্ত!' তাহা শুনিয়া রাজা করুণ কণ্ঠে বলিলেন—

এখনো কি মোছে নি, মা, করুণ হৃদয়
হ'তে সেই শোণিতের দাগ!

হাসি রক্তের প্রলাপ বকিতে বকিতে মরিয়া গেল। তাহার এই করুণ বিলাপ শুনিয়া রাজা ব্যথিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

আমি এই রক্ত-স্রোত
বন্ধ ক'রে দিব!

রাজশক্তির দম্ভে রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমি রাজা, আমি এই রক্তপাত বন্ধ করিয়া দিব। এমন সময়ে অনুচরেরা রাণীর পূজা লইয়া আসিল। রাজা সেই পূজা ফিরাইয়া দিলেন। রাজা গোবিন্দমাণিক্য নিজের রাজশক্তিকে অবলম্বন করিয়া সত্যধর্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না যে, দেবতাকে রাজশক্তির বা অন্য-কোন বাহ্য শক্তির অধীন করিলে পিশাচ-শক্তিকেই জাগ্রত করা হয়। সত্যের তো বাহ্য বল নাই, তাহার সম্বল আন্তর বল, আত্মিক শক্তি। এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—রাজসভা, প্রাতঃকাল। সেখানে সেনাপতি নয়নরায় ও দেওয়ান চাঁদপাল তুচ্ছ বিদ্রূপ করিতে করিতে কলহ করিবার উপক্রম করিতেছেন,—নয়নরায়ের পদ আগে, না চাঁদপালের পদ আগে, ইহা লইয়া উভয়ের তর্ক। চাঁদপাল বলিলেন—

সর্ব-অগ্রে তুমি পাবে স্থান
হেন দেশে করো গিয়ে বাস, চুকে যাবে
গণ্ডগোল,· · · ·

এই কথার মধ্য দিয়া কবি এখানে আগন্তুক ভবিষ্যৎ ঘটনার একটি ছায়াপাত করিয়াছেন, নয়নরায়কে যে শীঘ্রই রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইতে হইবে এবং সেনাপতির পদ চাঁদপাল পাইবেন, সে ঘটনার সূচনা এইখানে হইয়া রহিল। মন্ত্রী উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া নয়নরায়কে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহার উত্তরে নয়নরায়ও মন্ত্রীকে শ্লেষবাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করিলেন,—

জেনো মন্ত্রী, অতিরিক্ত সূক্ষ্মবুদ্ধি যার
তারি নিত্য অকারণ অসন্তোষ! বুদ্ধি

তার বিশ্বচরাচর বিঁধিতে ব্যাকুল।
আমার তো সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই! শুধু আছে
ভক্তের হৃদয়—আর সৈন্যের কৃপাণ!

এই কথার মধ্যে নয়নরায়ের চরিত্র স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত—দেবতা ও রাজার উভয়েরই। তিনি বিশ্বাসী সেনা ও বীর।*

রাজা আসিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ও আসিলেন।† সকলে গাত্রোত্থান করিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিল, জয় ঘোষণা করিল। কিন্তু রঘুপতি দাম্ভিক, তিনি রাজাকে আশীর্বাদ না করিয়াই একেবারে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

রাজার ভাণ্ডারে এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

তিনি রাজার কাছে প্রার্থনা করিতে আসেন নাই, রাজার ভাণ্ডারে যেন তাঁহারই ন্যাস গচ্ছিত আছে, তাহা তিনি নিজের অধিকারে গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।

রাজা বলি নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই রাজসভায় আসিয়াছিলেন, রঘুপতির প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ রাজাকে সেই সুযোগ দিল, তিনি বলি-নিষেধের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজার এই নূতন নিয়মে সকলে অবাক্ হইয়া গেল। সেনাপতি নয়নরায় সরল দৃঢ়প্রকৃতি সত্যপ্রিয় নির্ভীক তেজস্বী বিশ্বাসী রাজভক্ত। তিনিই সর্বপ্রথম রাজাজ্ঞার অযৌক্তিকতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'বলি নিষেধ!' মন্ত্রী তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন,—'নিষেধ!' নক্ষত্ররায় চপলচিত্ত, আত্মনির্ভরতাহীন, পরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র, তিনি বলিলেন,—'তাইতো। বলি নিষেধ!' রঘুপতি রাজাদেশ শুনিয়া এমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন যে তিনি সকলের শেষে কথা কহিলেন। তিনি যেন নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন রাজা ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবার কে? তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'এ কি স্বপ্নে শুনি?' রাজা কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না, তিনি যাহা সত্য ও উচিত বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহার বাক্য সংযত দৃঢ় এবং সংক্ষিপ্ত। রাজা বলিলেন,—এই আদেশ স্বপ্ন নহে, দেবী স্বয়ং বালিকার মূর্তি ধরিয়া আসিয়া তাঁহার সত্যদৃষ্টি

* পরবর্তী সংস্করণে প্রথম সংস্করণের ২-য় অঙ্কের ১-ম দৃশ্যের এই প্রথমাংশ বর্জিত হইয়াছে।

† পরবর্তী সংস্করণের ১-ম অঙ্কের ২-য় দৃশ্য আরম্ভ।

উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন। রঘুপতি বলিলেন, 'শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।' গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন,—'সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ!' রঘুপতির অহঙ্কারে আঘাত লাগিল, তিনি বলিলেন—আমি দেবীর পূজক, ব্রাহ্মণ, আমি শুনিলাম না দেবীর আদেশ, আর তুমি শুনিতে পাইলে! ইহা কেবল ভ্রান্তি নয়, অহঙ্কারও!

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে পাষণ্ড, নাস্তিক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে বিচলিত না হইয়া ধীর অটল স্বরে আদেশ প্রচার করিলেন—

যে করিবে জীব-হত্যা জীব-জননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন দণ্ড!

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্বলের শেষ সম্বল অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন—উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও।

চাঁদপাল ছুটিয়া আসিয়া রঘুপতিকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে ভণ্ড প্রতারক, সে চাটুকার, সে মনে এক বাহিরে আর; সে ক্রূর, সে বাহিরে দেখাইল যেন সে রাজার মঙ্গলের জন্য সকল সভাসদ্ অপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত।

সত্যদ্রষ্টা রাজা ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতকেও ভয় করিলেন না, তিনি ধীর বাক্যে রঘুপতিকে বিদায় দিলেন।

রঘুপতি যাইতে যাইতে রাজার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া গেলেন—

হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব! আমি আছি
মায়ের সেবক।

রঘুপতি চলিয়া গেলে সরল বিশ্বাসে ভক্তিমান্ সাহসী সেনাপতি নয়নরায় রাজার নিকটে প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

কোন্ অধিকারে, প্রভু, জননীর বলি……

রাজা তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। মন্ত্রী রাজাকে তাঁহার আদেশ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা অটল, তিনি বলিলেন—

বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

সকলে বিস্মিত বিহ্বল হইয়া গেলেন, দেবীর নিকটে বলিদান পাপ! মন্ত্রী কথা কহিলেন—

পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধ'রে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতা-চরণ-তলে বৃদ্ধ হ'য়ে এলো,
সে কি পাপ হ'তে পারে?

এই কথায় রাজা চিন্তিত হইয়া নিরুত্তর হইলেন। ইহাই তো সকল কুসংস্কারের প্রধান যুক্তি! যাহা এত কাল টিকিয়া আছে, আমাদের বাপ-পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখনো মন্দ হইতে পারে?

এমন সময়ে ধ্রুব আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—দিদি কোথা?*

রাজা ধ্রুবকে দেখিয়া ও মৃতা হাসিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পণ ধ্রুব করিলেন এবং পুনরায় বলি-বন্ধের আদেশ দিলেন। রাজা ধ্রুবকে লইয়া রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজার অনুপস্থিতিতে সকলে রাজার কার্যের সমালোচনা করিতে লাগিল। কেবল ধূর্ত চাঁদপাল বলিল—

ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

চাঁদপাল ভীরু সত্য, কিন্তু তাহার দুষ্টবুদ্ধি প্রচুর এবং সে প্রকাশ্যে নিজেকে রাজভক্ত বলিয়া প্রচার করিলেও সে বাস্তবিক রাজভক্ত নহে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মন্দিরে জয়সিংহ একাকী দেবী-প্রতিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—দেবীর কাছে থাকিয়াও তাঁহার কেন একাকী বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহাকে কে যেন বাহির হইতে ডাকিতেছে মনে হইতেছে। অমনি তিনি অপর্ণার গান শুনিতে পাইলেন—

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জানো কি একেলা কারে বলে? অপর্ণা উত্তর দিল—

জানি! যবে ব'সে আছি ভরা মনে,
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

* পরবর্তী সংস্করণে ধ্রুবের প্রবেশ এখানে নাই।

জয়সিংহ এই উক্তি পূরণ করিয়া দিলেন—

সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা !

অপর্ণা জয়সিংহকে বলিল—

যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।

আর আমিও—

এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

দয়ার দানে মানুষকে খর্ব হীন করে, আর প্রেমের দানে তাহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলে। দয়ার দানে নিজের দৈন্য উৎকট হইয়া উঠে, আর প্রেমের দানে নিজের দৈন্য ঢাকা পড়িয়া যায়। তাই জয়সিংহ বলিলেন—

যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে !
যেমন আকাশ হ'তে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।

এমন সময়ে জয়সিংহের গুরুদেব রঘুপতি আসিতেছেন দেখা গেল। তাঁহার ভয়ে অপর্ণা পলায়ন করিল, কারণ রঘুপতির—

কঠিন ললাট
পাষাণ-সোপান যেন দেবী-মন্দিরের !

অপর্ণা পলায়ন করিল। কিন্তু জয়সিংহ অপর্ণার কথারই জের টানিয়া নিজ মনে বলিলেন, 'কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর'।

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া রাজসভা হইতে আসিয়াছেন। জয়সিংহের সহিত তিনি কথা কহিলেন না, জয়সিংহের সেবা গ্রহণে আগ্রহ দেখাইলেন না, সকল কথাতেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জয়সিংহের প্রতি স্নেহে তাঁহার মন কোমল হইয়া আসিল এবং তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার মন ক্ষুব্ধ হইয়া আছে বলিয়া তিনি জয়সিংহের প্রতি রূঢ়

আচরণ করিয়াছেন। জয়সিংহ রঘুপতিকে তাঁহার ক্ষোভের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুপতি উত্তরে বলিলেন,—রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন।

অতঃপর রঘুপতি জয়সিংহকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, যে-হেতু জয়সিংহের কাছে গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জয়সিংহ ইহাতে বলিলেন—

প্রভু, পিতৃকোলে বসি'
মুগ্ধ শিশু আকাশে বাড়ায় দুটি হাত
পূর্ণচন্দ্র পানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য !

গোবিন্দমাণিক্যের মহৎ চরিত্র জয়সিংহের নিকটে আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি তিনি রাজার আদেশ শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যতদিন প্রাণ
আছে, অসম্পূর্ণ নাহি র'বে জননীর পূজা।

এখানে আগামী ঘটনার পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছে,—জয়সিংহ যে নিজের প্রাণ দিয়া এই দেবী-প্রতিমার শেষ পূজা করিয়া যাইবেন তাহার আভাস কবি জয়সিংহের কথার ভিতর দিয়া দিয়াছেন।*

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য—অন্তঃপুর। মহারাণী গুণবতীকে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে রাণীর পূজা মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। রাণী জানিতে চাহিলেন, কাহার এত বড় স্পর্ধা যে রাণীর পূজা মন্দির হইতে ফিরাইয়া দিতে সাহস করে! পরিচারিকা ভয়ে রাজার নাম বলিতে পারিল না। তখন মহারাণী রঘুপতিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। এমন সময় গোবিন্দমাণিক্য আসিলেন। রাণী কুপিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে সেই দুঃসাহসী যে তাঁহার পূজা ফিরাইয়া দিয়াছে?

রাজা বলিলেন যে, তিনি জানেন কে সেই অপরাধী। তবে তিনি তাহার অপরাধের জন্য রাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

* পরবর্তী সংস্করণে ইহা ১-ম অঙ্কের ৩-য় দৃশ্য।

† পরবর্তী সংস্করণে ইহা ১-ম অঙ্কের ৪-র্থ দৃশ্য।

রাণী উষ্ণ হইয়া বলিলেন—

দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা। দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব।

রাজা নম্রভাবে স্বীকার করিলেন যে সেই অপরাধী তিনি নিজে।

রাণী অপরাধীকে দণ্ড দিবেন বলিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পরে জানিতে পারিলেন যে সেই অপরাধী কে। তখন নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জিদ ও স্বামীর প্রতি অভিমান তাঁহাকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। রাণী রাজার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বলিলেন— আমি দেবীর কাছে পূজা দিব মানৎ করিয়া রাখিয়াছি, অতএব আমি যেমন করিয়া পারি যথাবিধানে তাঁহার পূজা দিব। রাজা মনে করিলেন, রাণীর কোপ ও অভিমান কালক্রমে উপশমিত হইয়া যাইবে। তিনি রাণীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে রঘুপতি রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।* রাণী তাঁহাকে দেখিয়াই ক্ষুব্ধ স্বরে অভিযোগ করিলেন—"ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে জননীর দ্বার হতে।"

রঘুপতি রাণীর কথা সংশোধন করিয়া বলিলেন—

মহারাণী, মার পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার!

রঘুপতি রাণীকে ভয় দেখাইবার জন্য অভিসম্পাত দিলেন যে বলি নিষিদ্ধ করার ফলে রাজমহিমা—

হয়ে যাবে ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

রাণী ব্রহ্মশাপের ভয়ে স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া রঘুপতিকে মিনতি করিয়া বলিলেন—রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু! রাণী অভিমান ও জিদের বশে স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী হইতে চাহিয়াও এখন স্বামীর অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল, কারণ তিনি তো স্বভাবত সাধ্বী ও স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী।

* পরবর্তী সংস্করণে এই দৃশ্য ৩-য় দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রঘুপতি রাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণের শাপের ভয় মিথ্যা, কলির ব্রাহ্মণের কি আর ব্রহ্মতেজ আছে ?

ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনারে
আপনি দংশিছে, আহত বৃশ্চিক সম !

তিনি তাঁহার উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের ব্রহ্মণ্যতেজের অক্ষমতা ও নিষ্ফলতাকে ধিক্‌কার দিতে উদ্যত হইলেন। কবির 'রাজা ও রাণী' নাটকেও রাজার বয়স্য দেবদত্ত নিজের পৈতা সম্বন্ধে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন—

"স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস !"

—১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।

ব্রাহ্মণকে পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত দেখিয়া রাণী সন্ত্রস্তা হইলেন, স্বামীর অমঙ্গলে তাঁহারও তো অমঙ্গল হইবে ! তিনি সেইদিকে রঘুপতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রিয় স্বামীকে রক্ষা করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে,—আমি তো নির্দোষ, আমাকে আপনি রক্ষা করুন। তখন রঘুপতি বলিলেন—'তবে ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।' তিনি বলিতে চাহিলেন যে, দেবীর মন্দিরে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, সেখানে রাজার কোনো অধিকার নাই,—ব্রাহ্মণের বিধানের উপর রাজার কোনো প্রভুত্ব খাটে না।

রাণী অঙ্গীকার করিলেন—তিনি সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না, দেবী-পূজার ব্যাঘাত ঘটিতে দিবেন না। ইহাতে রঘুপতি সন্তুষ্ট হইয়াও হইতে পারিলেন না, তিনি ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সহিত রাণীকে বলিলেন—

দেবতা কৃতার্থ
হ'ল তোমারি আদেশ-বলে, ফিরে পেল
ব্রাহ্মণ আপন তেজ ! ধন্য তোমরাই,
এ যুগে, যতদিন নাহি জাগে কল্কি-
অবতার !

রঘুপতি প্রস্থান করিলে রাজা আসিলেন। রাজা রাণীকে ভালোবাসেন, রাণীর অপ্রসন্নতা তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল, তাই তিনি রাণীকে প্রসন্ন করিয়া তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। তাছাড়া, তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন যে কিছুক্ষণের বিচ্ছেদ ও চিন্তায় রাণীর চিত্ত প্রশান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া

থাকিবে। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে ইতিমধ্যে রঘুপতি আসিয়া রাণীর মন তাঁহার প্রতি অধিক বিরূপ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

রাণী বিরাগ-ভরে রাজাকে বলিলেন—তুমি এখান হইতে যাও, তোমার পশ্চাতে দেবতার ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফিরিতেছে, এখানে সেই অভিশাপ আনিয়ো না।

রাজা মধুর শান্ত বচনে বলিলেন—

প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর! সতীর হৃদয় হ'তে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ!

কিন্তু রাণী কিছুতেই নম্র হইলেন না। তখন রাজা প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রাণী মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিয়া রাণীর প্রার্থনা পূরণ করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে রাজা অটল, তখন রাণীই পরাজয় স্বীকার করিয়া রাজার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাণীকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি সত্যে ও প্রেমে তুল্যভাবে বিশ্বাসপরায়ণ। রাণীকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে—'অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর পূজা।'

রাণী রাজার সহিত যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইয়া মিনতি করিয়া 'ভিক্ষা' চাহিলেন,—'চিরাগত প্রথা' রাজা রক্ষা করুন, প্রেমের খাতিরে রাজা যদি তাঁহার কর্তব্যের ত্রুটিও করেন, তবু দেবতা তাহা ক্ষমা করিবেন।

রাজা 'চিররক্ত-পানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা' কিছুতেই পালন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাণী অভিমানে বিমুখ হইয়া মুখ ঢাকিয়া রাজাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে রাজা বলিলেন—'কর্তব্য কঠিন হয় তোমরা ফিরালে মুখ।' নারীর সাহায্য ও সমর্থন হৃদয়কে শক্তি দান করে, সেই নারী যদি বিমুখ হয়, তবে পুরুষের পক্ষে কর্তব্য পালন করা কঠিন হইয়া উঠে।

রাজা প্রস্থান করিলেন। রাণী মনে করিলেন যে, তিনি 'পুত্রহীনা' বলিয়া রাজা তাঁহাকে অবহেলা করিয়া যাইতে পারিলেন। তাঁহার একটি পুত্র থাকিলে রাজা এমন করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প

করিলেন তিনি অপমানিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া থাকিবেন না, তিনি হইবেন 'উর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।'

পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল—'ব্রাহ্মণ অতিথি যত গেছে চলি' রাজগৃহ ছেড়ে।' রাণী নিষ্ঠুর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

শুনে সুখ!
হ'ল।.........
দেব-বিপ্র-হীন রাজগৃহে রাজদর্প
কত দিন থাকে দেখা যাবে! দেখা যাবে!

রাজার পরাভবে এখন তাঁহার আনন্দ বোধ হইতেছে, তিনি নিজের জিদের জয় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য—জয়সিংহ স্বগত চিন্তা করিতেছিলেন, অপর্ণা, কাছে ছিল। জয়সিংহ ভাবিতেছিলেন—

তিনটি দেবতা ছিল! এক গেল, শুধু
দুটি আছে বাকি!

জয়সিংহের মনের আরাধ্য আদর্শ ছিলেন তিনজন—দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর পাষাণ-মূর্তি, তাঁহার পালক-পিতা ও গুরু রঘুপতি এবং মহৎ-চরিত্র রাজা গোবিন্দ-মাণিক্য। এই তিনের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের বিসর্জন হইয়া গেল,—তিনি দেবতা ও ধর্মের শত্রু। কিন্তু সেই বিসর্জনে তো তাঁহার মন প্রসন্ন হইতেছে না। জয়সিংহকে চিন্তিত দেখিয়া অপর্ণা তাঁহার চিন্তার ভাগ লইতে চাহিল। কিন্তু জয়সিংহ নিজের মনের দ্বিধান্বিত অবস্থার বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না, তিনি অপর্ণাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে অপর্ণা ব্যথিতা হইল, তাহার অভিমানও হইল, সে চিন্তা করিতে লাগিল--

তবে আমি কেহ নই হেথা! মোর নাই
কোনো কাজ! শুধু আমি ভিখারিণী মেয়ে—
নেবো স্নেহ, দেবো না কিছুই!—বুঝিব না,
কাঁদিব না, ভালবাসিব না! শুধু রবো
নিশ্চিন্তে নীরবে! যেথা যাই শুধু দয়া!
গৃহ আর নেই, শুধু দীর্ঘ রাজপথ।
তবে ভিক্ষা ভালো, ভিক্ষা ভালো! জয়সিংহ,
আমি তব তরুলতা নহি! আমি নারী!

অপর্ণার অন্তরে নারীত্বের মহিমা ও প্রেম জাগ্রত হইয়াছে, সে জয়সিংহকে

ভালোবাসিয়াছে, সে তাঁহার উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাই তাহার আবার সেই গান মনে পড়িল—'আমি একেলা চলেছি এ ভবে!'*

রাণী তিন শত পাঁঠা ও এক শত এক মহিষ বলি দিয়া দেবীর পূজা দিবেন শুনিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে একদল লোক আসিয়াছিল, তাহারা হতাশ হইয়া ত্রিপুরার লোকেদের টিট্‌কারী দিতে দিতে চলিয়া গেল।†

রঘুপতি সেনাপতি নয়নরায়কে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাকে অনেক প্ররোচনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেনাপতি রাজভক্ত, তিনি বিশ্বাসহন্তা হইতে স্বীকার করিলেন না। রঘুপতি নিজের ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য অপরকে অধর্ম করিতে, রাজভৃত্যকে বিশ্বাসঘাতক হইতে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন অধর্মের দ্বারা ধর্ম রক্ষা করিবেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, যেখানে সত্য শাশ্বত ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় সেখানে অধর্মই প্রবল হইয়া উঠে। রঘুপতি সেনাপতিকে বিদ্রোহী করিতে না পারিয়া প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রজাদের দ্বারা মন্দির-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রঘুপতি বলি দিয়া দেবীর পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দমাণিক্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সেনাপতি নয়নরায়কে আদেশ করিলেন সৈন্য লইয়া মন্দির রক্ষা করিতে। রঘুপতি রাজাকে ভয় করেন না, তিনি রাজার মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিলেন—

আজ নহে মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর একদিন।

রাজা রঘুপতির কথার ও ভয়প্রদর্শনের কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝিতেছিলেন যে মন্দিরের পূজারী রঘুপতি যাহা উচিত বলিয়া মনে করেন তাহা ভ্রান্ত, সেই ভ্রান্তি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। অতএব তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়াতে রাজার উপর তাঁহার রাগ হওয়া স্বাভাবিক।

সেনাপতি নয়নরায় রাজার আদেশ পালন করিতে অক্ষম এই কথা রাজাকে বিনীত ভাবে জানাইলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, ধর্মের সঙ্গে রাজ-শক্তির কোন সম্পর্ক নাই, ধর্ম মনোজগতের ব্যাপার, আধ্যাত্মিক ব্যাপার;

* পরবর্তী সংস্করণে জয়সিংহের স্বগত চিন্তা ও পরে অপর্ণার প্রবেশ এবং জয়সিংহের সহিত কথোপকথনের এই অংশটুকু বর্জিত হইয়াছে।

† পরবর্তী সংস্করণে এইখানে দৃশ্যের আরম্ভ। ইহা সেখানে ১-ম অঙ্কের ৫-ম দৃশ্য।

তাহার সঙ্গে বাহু বা দৈহিক বলের কোনো সম্পর্ক থাকিতে পারে না। রাজা সেনাপতিকে বলিলেন—কার্যের সমস্ত দায়িত্ব আদেশদাতা প্রভুর,—নির্বিচারে আদেশপালক ভৃত্যের নহে। কিন্তু সেনাপতি বলিলেন—এই কথায় হৃদয় সায় দিতে চায় না। আমি ভৃত্য হইলেও আমি মানুষ,—আমার একটা স্বাধীন সত্তা আছে, বুদ্ধি ও ধর্মাধর্মবোধ আছে, আমি কিছুতেই দেবদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী হইতে পারিব না। তখন রাজা নয়নরায়কে সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া চাঁদপালকে সেই পদ দিলেন। নয়নরায় চাঁদপালকে অস্ত্র দিতে অস্বীকার করিলেন, তিনি রাজার হাতে অস্ত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

বিশ্বাসী ভৃত্য নয়নরায়কে হারাইয়া রাজা দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন এই কথা বলিয়া যে—'ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে।'

জয়সিংহ রাজার পায়ে পড়িয়া তাঁহার বলি নিষেধের আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দর্পিত রঘুপতি নিজের পুত্রতুল্য জয়সিংহকে রাজার পদানত দেখিয়া জয়সিংহকে ধিক্কার দিলেন, এবং জয়সিংহকে রাজার সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। রঘুপতি রাজাকে খর্ব ও অবনত করিতে চাহেন, সুতরাং রাজার কাছে জয়সিংহের অবনতি তাঁহার অসহ্য। রাজা রঘুপতির অহঙ্কার দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তিনি স্মরণ করিলেন না যে তিনিও রাজশক্তির অহঙ্কারকেই আশ্রয় করিয়া বলি বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বৃহৎ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় আত্মিক বল, দৈহিক বল নহে—ইহা রাজা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং এই দৈহিক বলপ্রয়োগের মধ্যেও যে একটি অন্যায্যতা আছে তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য*—অন্তঃপুরে গুণবতী খেদ করিতেছেন যে তাঁহার পূজা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার জন্য তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—

* এ দৃশ্য পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে।

ধিক্! নারী-জন্ম দীর্ঘ-অপমান শুধু!
সোহাগ যে সেও অপমান, বিরাগ যে
সেও অপমান!

রাণী নিজের প্রতিজ্ঞা-পূরণের পথে বাধা পাইয়া হিতাহিতবোধশূন্য হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বলির মানৎ রক্ষা না হওয়াতে রাণী নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন, এবং সেই অপমানবোধ তাঁহার রাণীত্বের ও পত্নীত্বের গর্বকে আঘাত করিয়াছে বলিয়া তিনি চাঁদপালকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—'নির্বাসিত ক'রে দাও এ রাজারে।' চাঁদপাল বলিল—

শুনে রাখিলাম তব হৃদয়ের
অভিলাষ, ভৃত্য আমি তব অনুগত।

কিন্তু উচ্চস্বরে সে ঘোষণা করিতে লাগিল—সে মহারাজের আদেশ-পালক বিশ্বাসী ভৃত্য।

রাণী রাজভ্রাতা যুবরাজ নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকেও আদেশ করিলেন—'তুমি রাজা হও ত্রিপুরার।' কিন্তু নক্ষত্ররায় বুদ্ধিহীন নিরুদ্যম প্রকৃতির। তিনি রাণীর কথার গূঢ় তাৎপর্য কিছুই না বুঝিয়া রাণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাঁচিলেন।

নাটকে সাধারণতঃ পাঁচটি অঙ্ক থাকে; তাহার প্রথম দুই অঙ্কে ঘটনার সূচনা ও দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত দেখানো হয়। তৃতীয় অঙ্কে ঘটনা জটিল ও সমস্যা সঙ্গীন হইয়া উঠে; এবং পরের দুই অঙ্কে সেই সমস্যা শেষ মীমাংসার দিকে অগ্রসর হয়। যদি সেই মীমাংসা সুখকর হয়, তবে সেই নাটক হয় কমেডি বা মিলনান্তক, আর দুঃখময় বিচ্ছেদ-বিয়োগ-সঙ্কুল হইলে সেই নাটক হয় ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক। এই তৃতীয় অঙ্কে বিসর্জন নাটকের পরিণামের সূচনা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য*—মন্দিরে রঘুপতি, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়। রঘুপতি নিজের সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নক্ষত্ররায়কে কপট প্রতারণায় প্রলুব্ধ করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিলেন—

কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

* পরবর্তী সংস্করণে ইহা ২-য় অঙ্কের ১-ম দৃশ্য।

নক্ষত্ররায় বলিলেন যে তিনি রাজা হইলে রঘুপতিকে মন্ত্রী করিয়া দিবেন। রঘুপতি গর্জন করিয়া উঠিলেন—

মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

রঘুপতি সামান্য বৈষয়িক লাভের জন্য এই চেষ্টা করিতেছেন না, তিনি স্বার্থান্বেষী নীচ লোভী নহেন। নক্ষত্ররায় একটু অল্পবুদ্ধি, তিনি জানিতে চাহিলেন যে তিনি কবে রাজা হইবেন? রঘুপতি তাঁহাকে বলিলেন—আগে রাজরক্ত আনিতে হইবে,—দেবী রাজরক্ত চান। নক্ষত্ররায় অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিলেন—রাজরক্ত পাব কোথা? এইবার রঘুপতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে বাড়ীতেই তো রাজা আছেন গোবিন্দমাণিক্য, তাঁহারই রক্ত দেবী চাহেন। এই রাজদ্রোহিতার ও ভ্রাতৃদ্রোহিতার পরামর্শ শুনিয়া জয়সিংহ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া রঘুপতি তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া নক্ষত্ররায়কে বলিতে লাগিলেন—গোপনে রাজাকে বধ করিয়া তপ্ত রাজরক্ত দেবীর চরণে আনিয়া দিতে হইবে। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের নির্বুদ্ধিতাকে ভয় করেন, তাই বলিলেন যে গোপনে কাজ করিতে হইবে। রঘুপতি, বলিলেন—'রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে!' রঘুপতি রাজহত্যার একটা দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া নিরুদ্যম নক্ষত্ররায়কে কর্মে তৎপর করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি হত্যার পক্ষে অনুকূল সময়ও বটে ইহাও জানাইয়া দিলেন। রঘুপতি স্বকার্য উদ্ধারের জন্য নক্ষত্রকে দেবীর আদেশ, রাজ্যলোভ, ধর্মভয়, ও অবশেষে তাঁহারও প্রাণের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে কর্মে প্রোৎসাহিত করিতে চাহিলেন.—তিনি বলিলেন যে যদি নক্ষত্র রাজাকে হত্যা করিতে না পারেন, তবে তাঁহারই রক্ত দেবী লইবেন; নক্ষত্রও তো রাজপুত্র বটে! দুর্বলচিত্ত নক্ষত্রকে রঘুপতি বিশ্বাস করিতে ও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই, তাই নানা উপায়ে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

নক্ষত্র রঘুপতির কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—

সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাজত্বে?
রাজরক্ত থাক রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

নক্ষত্ররায় নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কায় ও রাজাকে বধ করিবার অনিচ্ছায়

এইরূপ উক্তি করিলেন। তিনি স্বভাবত স্থূলবুদ্ধি হইলেও ভ্রাতার প্রতি স্নেহশীল এবং কোনো কাজ চেষ্টা করিয়া করিবার মতো উদ্যম তাঁহার মধ্যে ছিল না। সেইজন্য অল্পবুদ্ধি অস্থিরমতি নক্ষত্রকে রঘুপতি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে চাহিলেন যে রাজার হত্যাকার্য সম্পাদন নক্ষত্রকেই করিতে হইবে এবং—'যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ!' নক্ষত্র বিদায় হইয়া গেলেন।

রঘুপতি লোকচরিত্রজ্ঞ ও চতুর, তিনি একই কার্যসিদ্ধির জন্য তিনজন বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তরে তিন প্রকার ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন—সন্তানহীনা রাণীকে সন্তানলাভের লোভ, ধর্মে আস্থাবান্ নয়নরায়কে ধর্মরক্ষার কর্তব্য, এবং নক্ষত্রকে রাজ্যলোভ দেখাইয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া জয়সিংহ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি কতক আত্মগত ও কতক গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

এ কি কথা শুনিলাম! দয়াময়ি, এ কি
কথা! তোর আজ্ঞা? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী! গুরুদেব, হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার?

জয়সিংহের প্রত্যেকটি কথা কবি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্য প্রণিধানযোগ্য। জয়সিংহ দেবীকে 'দয়াময়ী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কারণ দেবীর দয়াতে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি যদি দয়াময়ী,—তবে চারিদিকে এমন নিষ্ঠুর আয়োজন চলিতেছে কেন? তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তোর আজ্ঞা ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা? দেবতা তো ধর্মরক্ষক, তিনি কেমন করিয়া এমন আদেশ দিতে পারেন? তিনি বিশ্বের জননী হইয়া কেমন করিয়া এই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিবেন? এই ঘৃণ্য আজ্ঞা দেবীর হওয়া তো দূরে থাক, জয়সিংহের গুরুরও যদি হয়, তবু তো তাহা ধর্মবিরোধী কার্য! সরল উদারহৃদয় জয়সিংহ এই ব্যাপারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

রঘুপতি জয়সিংহের প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়া নিজের আচরণ সমর্থনের জন্য বলিলেন,—'আর কি উপায় আছে বলো?' তিনি অধর্মকে ধর্মরক্ষার উপায় বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

জয়সিংহ এতদিন গুরুর কাছে ধর্মাধর্ম বলিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আজ নষ্ট হইয়া যাইতে বসিল। রঘুপতি জয়সিংহের মনের দ্বিধা দেখিয়া কুযুক্তি ও বাক্‌চাতুরী বিস্তার করিয়া জয়সিংহের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহের নষ্টপ্রায় গুরুভক্তি, গুরুর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য রঘুপতির এই প্রয়াস। তিনি বলিলেন যে এই জগৎ মহা-হত্যাশালা,—স্বয়ং বিধাতা প্রতি পলে কত কোটি জীব ধ্বংস করিতেছেন!

ইহা শুনিয়া জয়সিংহ স্নেহের অনুযোগ করিয়া দেবী-প্রতিমাকে বলিলেন—

তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী!

তিনি নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন, 'কিন্তু রাজরক্ত?' রাজরক্তের কথা মনে হইতেই জয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন—'ভক্তি-পিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো রক্তপিপাসিনী!' তখন রঘুপতি জয়সিংহকে বলিলেন—'বন্ধ হোক্ বলিদান তবে!' জয়সিংহ উভয়সঙ্কটে পড়িয়া গেলেন, একদিকে দেবীর পূজায় বলিদান চিরাগত প্রথা ও অপর দিকে রাজার নিষেধ ও বাধা; একদিকে 'সরল ভক্তির বিধি' ও অপর দিকে শাস্ত্রবিধি ও গুরুর আদেশ। রঘুপতির কাছে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে সত্যই কি দেবী রাজরক্ত চাহেন, তবে তিনিই সেই রাজরক্ত দিবেন। কিন্তু রাজরক্ত আনিতে যাওয়ার মধ্যে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা আছে,—তাই জয়সিংহের উপর রঘুপতির মমতা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল, তিনি জয়সিংহকে বিপদের মুখে যাইতে দিতে চাহেন না, দেবীপূজায় বলি দিবার পথ পরিষ্কার করিবার জন্যও নহে। তিনি জয়সিংহের অমঙ্গল-আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া বলিলেন—'তোরে আমি নারিব হারাতে।'

জয়সিংহ কিন্তু নিজের প্রাণ দিয়াও সত্যধর্ম ও গুরুভক্তির সমন্বয় করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রঘুপতি তাঁহার কথাকে আমল না দিয়া বলিলেন,—'সে কথা কল্য হবে স্থির।' তিনি মনে করিলেন যে সময় অতিবাহিত হইলে জয়সিংহের সঙ্কল্প শিথিল হইতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে তিনি যুক্তিতর্ক দ্বারা জয়সিংহকে নিরস্ত করিবারও সময় পাইবেন।

তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য—মন্দিরের সম্মুখপথ, জয়সিংহ একাকী চিন্তামগ্ন।* জয়সিংহের অন্তরে স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি, সত্যধর্মের আদর্শ, গুরুভক্তি এবং শাস্ত্রবিশ্বাসের মধ্যে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। জয়সিংহ স্বভাবত উদারহৃদয় ও দয়ার্দ্রচিত্ত; কিন্তু তিনি আবাল্য মন্দিরের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকাতে বৃহৎ উদার বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য। এজন্য তাঁহার মানবতা ও চিত্তবৃত্তি সম্যক্ স্ফূর্তি পায় নাই; কিন্তু এখন প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শে ও অপর্ণার প্রেমের স্পর্শে তাঁহার অন্তরে হিতাহিত চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহা তাঁহাকে বাহিরের মুক্ত ক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ অন্ধভক্তি এবং নির্বিচার বিশ্বাসের গণ্ডি হইতে মুক্তি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। তিনি একবার গুরুর বাক্য সত্য বলিয়া মানিতে চাহিতেছেন, দেবীপূজার বাধা অপসারণের জন্য রাজহত্যা ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে বলিয়া মনকে বুঝাইতে চাহিতেছেন; কিন্তু জগতের চারিদিকে যে বিশ্বাস ও আনন্দের দৃশ্য দেদীপ্যমান দেখিতেছেন তাহাতে সেই অন্ধ নির্ভরতা ভাঙিয়া যাইতেছে। বিশ্বচ্ছন্দে যোগ দিবার জন্য তাঁহার নির্বাসিত চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার চিত্ত যেন আর্তনাদ করিয়া বলিতেছে—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে!
খ'সে যাবার ভেসে যাবার ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে!

সেইজন্য জয়সিংহ গান ধরিলেন—

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে!

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসী যেমন বুঝিয়াছিল যে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,—

তেমনি জয়সিংহ বুঝিতেছেন যে মানব-সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র পাষাণ-প্রতিমার পাষাণ-মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকাতে জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা নাই। জগতের সবই যদি মিথ্যা ও বৃহৎ বঞ্চনা হইত, তাহা হইলে ধরণী বেদনায় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যদিও জয়সিংহ মুখে ঠিক ইহার উল্টা কথাটাই অপর্ণাকে বলিলেন, 'তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে সুখী

* ইহা পরবর্তী সংস্করণের ২-য় অঙ্কের ৩-য় দৃশ্য।

হও',—তথাপি তিনি অপর্ণার প্রেমের প্রভাবে আবিষ্ট হইতেছেন, অবশেষে তিনি অপর্ণাকে বলিলেন—

আয় সখি,
চিরদিন চ'লে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে—শূন্য আকাশের
পথে দুই মেঘখণ্ড সম।

যখন জয়সিংহ মন্দিরের আবেষ্টনকে মিথ্যা বঞ্চনা বলিয়া অনুভব করিতেছেন, যখন প্রেমকেই একমাত্র সত্য বলিয়া অনুমান করিতেছেন, তখন রঘুপতি আসিয়া জয়সিংহকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু জয়সিংহ গুরুকে বলিলেন, 'তোমারে চিনিনে আমি'। বৃহৎ সত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে জয়সিংহের সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে অপরিচয় ও বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা-রূপী রঘুপতির ডাকে জয়সিংহের চিত্ত এখন আর সাড়া দিতে চায় না। তিনি গুরুর মুখের উপর বলিয়া দিলেন যে, তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া তাঁহার ভিখারিণী সখীর সহিত সরল পথে চলিয়া যাইবেন। অতএব 'কী কাজ শাস্ত্রের বিধি, কী কাজ গুরুতে!' জয়সিংহ সঙ্কীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—মুক্তিটাই স্বপ্ন, আর মন্দিরের আবেষ্টনই সত্য,—নিষ্ঠুর সত্য! তিনি গুরুকে ছুরিকা দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি গুরুর আদেশ ভুলেন নাই। দ্বিধান্বিত জয়সিংহ চিরাগত প্রথার ও সংস্কারের মোহমুক্ত হইতে পারিলেন না। অচলায়তনের প্রাচীর তো শীঘ্র ভাঙে না। ক্ষণিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে তিনি কতখানি বদ্ধ। জয়সিংহ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাঁহার আর কি আদেশ আছে? গুরু বলিলেন,—ঐ বালিকাকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দাও। রঘুপতি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, অপর্ণা বহির্জগতের দূতী-রূপে আসিয়া জয়সিংহকে বৃহৎ উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। জয়সিংহ গুরুর সমক্ষে স্বীকার করিলেন—

আমারি মতন
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ, নিষ্পাপ, সুন্দর, সরল, শুভ্র,
সুকোমল, বেদনা-কাতর; দূর ক'রে
দিতে হ'বে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!

জয়সিংহ অপর্ণাকে চলিয়া যাইতে, মরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।—

মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু!

অপর্ণা সংসারে যদি দয়া মায়া স্নেহ প্রেম—এ সকলের কিছুই না পায়, তবে সেই এক সত্য মৃত্যুকে সে লাভ করিবেই, মৃত্যু তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

অপর্ণা জয়সিংহকে আহ্বান করিল—চলো দুইজনে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাই! কিন্তু জয়সিংহ তো যাইতে পারিবেন না,—

দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে!

তিনি গুরুর কাছে যে শপথ করিয়াছেন সেই অঙ্গীকারে তিনি বদ্ধ, তিনি নিজের বাক্যের কারাগারে বন্দী।

অপর্ণা জয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে না। জয়সিংহ তাহাকে বলিলেন,—'এই নারী-অভিমান তোর?' কিন্তু অপর্ণা এখন তাহার প্রতি জয়সিংহের উদাসীনতার কারণ বুঝিতে পারিয়াছে, এখন আর তাহার অভিমান নাই—

অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

অপর্ণা যাইতে অস্বীকার করিল। তখন জয়সিংহ বলিলেন—তুই না গেলে আমি চলিয়া যাইব, অথবা তোর মুখদর্শন করিব না। তখন ব্যথিতা অপর্ণা রঘুপতির ব্রাহ্মণত্বে ধিক্কার দিয়া অভিশাপ দিয়া গেল—

আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে—
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে!

অপর্ণা ক্ষুদ্রা নারী হইলেও সে প্রেমের শক্তিতে মহীয়সী; প্রেমস্বরূপিণী অপর্ণা আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন, সে জানে যে প্রেম বিশ্ববিজয়ী। তাই সে স্পর্ধার সহিত বলিয়া গেল যে বিশ্বপ্রেম ও অন্ধ সংস্কারের দ্বন্দ্বে প্রেমের জয় অনিবার্য।

রঘুপতি অপর্ণার বিরহে জয়সিংহকে কাতর দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রঘুপতি কুসংস্কার-বশে কঠোর-প্রকৃতি হইলেও একেবারে স্নেহশূন্য নহেন, তাঁহার সমস্ত প্রাণমন অধিকার করিয়া জয়সিংহের প্রতি স্নেহ বিরাজ করিতেছে। তিনি চাহেন যে তিনি যেমন জয়সিংহকে সর্বাতিরিক্ত স্নেহ করেন, জয়সিংহও তেমনি নিরবচ্ছিন্ন তাঁহারই থাকেন, আর কাহারও প্রতি যেন তাঁহার মন আকৃষ্ট না হয়। রঘুপতি কৃপণের ধনের ন্যায়, কাঙালের সম্বলের ন্যায় জয়সিংহকে নিজের স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু যুবক জয়সিংহ এখন কেবল পিতার স্নেহ পাইয়া পরিতৃপ্ত বোধ করিতেছেন না, রমণীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি গুরুর স্নেহ-প্রকাশের কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছেন না—

> থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
> কথা আর! কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
> স্নেহ-প্রেম তরু-লতা-পত্র-পুষ্প-সম
> ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
> শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ! নিম্নে
> শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ থাকে চির-
> রাত্রিদিন, অনন্ত-হৃদয়ভার-সম!

রঘুপতি বুঝিতে পারিলেন না কেন তিনি জয়সিংহের মন আর পাইতেছেন না!

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণে জনতা বলি-বন্ধের কারণ আলোচনা করিতেছে।* একজন বলিল, রাজাকে নিশ্চয় মুসলমানের ভূতে পাইয়াছে, কারণ মুসলমানেরা মূর্তিপূজার বিরোধী। যেখানে যত অমঙ্গল অসুবিধা ঘটিতেছে, কুসংস্কারান্ধ লোকেরা তাহার একই কারণ অনুমান করিতেছে—ভাবিতেছে যে, রাজার দ্বারা বলি-নিষেধই রাজ্যের সকল অমঙ্গলের মূল কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসন্তোষ সম্মিলিত হইলেই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহারই পূর্বসূচনা জনতার জল্পনায় পাওয়া যাইতেছে। প্রজাদের মনে রাজার প্রতি বিরাগ ও অবজ্ঞার সহিত ভয়ও মিশ্রিত হইয়া আছে।

জনতা চলিয়া গেল। রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহাকে

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ২-য় অঙ্কের ৪-র্থ দৃশ্য।

দেখিয়া প্রজারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার মুখদর্শন করিতে চাহে না। এমন কি রাণী বিমুখ হইয়াছেন, পুত্রতুল্য প্রিয় জয়সিংহও তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরায়! সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, রাজার সঙ্গী আছে একমাত্র যাহা ধ্রুব, যাহা সত্য, যাহা সহজ সরল, যাহা মহৎ। এই ভাবটিকে বুঝাইবার জন্য রাজার সঙ্গে কেবলমাত্র ধ্রুবকে কবি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা একটি চমৎকার নাটকীয় কৌশল। রাজা সকলের বিমুখতা সহ্য করিতে প্রস্তুত,

কিন্তু প্রেম ক্ষুব্ধ হ'য়ে
সম্মুখে দাঁড়ায় যবে, সে বড় দুঃসহ
বাধা।

রাজার সঙ্গে ছিল ধ্রুব, সত্যের প্রতীক। কিন্তু সে প্রবঞ্চক ও মিথ্যার প্রতিমূর্তি চাঁদপালকে আসিতে দেখিয়া পলায়ন করিল, চাঁদপালকে সে বড় ভয় করে। চাঁদপাল আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে সে স্বকর্ণে শুনিয়াছে রঘুপতি ও যুবরাজ নক্ষত্ররায় মিলিয়া রাজাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিয়াছেন, এবং নক্ষত্র দেবতার কাছে রাজরক্ত আনিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—

দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।

রাজা চাঁদপালকে বিদায় দিয়া দেবী-প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
... ... হিংসা নহে,
বিভীষিকা নহে, শুধু ভক্তি, শুধু প্রেম!

রাজা পত্নীর বিরূপতা, ভ্রাতার বিপক্ষতা, প্রজার অসন্তোষ দেখিয়া মনে করিতেছেন যে, তিনিই সকল অনর্থ ও অশান্তির মূল। নিঃস্নেহ জীবন-ধারণে কোনো আনন্দ নাই; অতএব তাঁহার মৃত্যুতে যদি সকল উপদ্রবের শান্তি হয় তো তাহাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু—

রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভাইয়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া!

জগতে যেখানে যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হোক না কেন, তাহার আঘাত বিশ্বপ্রাণে গিয়া লাগে; একস্থানের রাজদ্রোহিতায় সকল দেশের প্রজাদের অকল্যাণ হয়, এক ভাইয়ের অপকর্ম্মের দ্বারা জগতের সকল ভ্রাতৃত্ব নিপীড়িত হয়। কিন্তু এই হত্যার দ্বারা দেবতার নামে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে,—

মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার।

সকল অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব রাজার প্রাণ দিলে যদি সত্যধর্ম স্ব-রূপে প্রকাশিত হয় তবে তাহাও শ্লাঘ্য। সত্যপ্রচারকের আত্মদানেই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে যুগে যুগে।

এমন সময়ে জয়সিংহ আসিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?' জয়সিংহ গুরুর আদেশ ধ্রুবসত্য ও কল্যাণময় বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না, তাই তিনি দ্বিধান্বিত চিত্তে দেবীর সমর্থন প্রার্থনা করিলেন। তিনি রাজাকে একাকী পাইয়াও হ্যামলেটের মতন বধ করিতে পারিলেন না, তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ প্রার্থনা করিলেন। রঘুপতি দেবী-প্রতিমার অন্তরাল হইতে দেবীর প্রত্যাদেশ বলিয়া নিজের ইচ্ছা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সত্যদর্শী রাজা গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতির মিথ্যা প্রবঞ্চনা জয়সিংহের নিকটে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। জয়সিংহ আর দ্বিধার মধ্যে ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে পারিতেছিলেন না, তিনি যাহা হয় একটা কিছু করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে বাঁচেন, যে অবিশ্বাস-দৈত্য তাঁহাকে কূল হইতে অকূলে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহাকে তিনি বধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, যে অবিশ্বাস-দৈত্য তাঁহাকে অন্যায়-অনুষ্ঠানে দ্বিধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মনুষ্যত্বেরই কল্যাণময়ী শক্তির বিকাশ। ভ্রান্ত ও শ্রান্ত জয়সিংহ গুরুর প্রবঞ্চনা জানিয়াও আর দ্বিধার মধ্যে আন্দোলিত হইতে চাহেন না, তাই তিনি বলিলেন, 'গুরু হোক, কিংবা দেবী হোক, একই কথা!' এই বলিয়া তিনি ছুরিকা উন্মোচন করিলেন; কিন্তু তিনি তো অমানুষ নহেন, তিনি অন্যায় রক্তপাত করিতে পারিলেন না, তিনি কাতর কণ্ঠে দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর

পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে'
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো।

জয়সিংহের মনুষ্যত্ব ও শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার আবাল্য-পোষিত সংস্কারের উপর জয়ী হইয়া উঠিল। এমন সময়ে অপর্ণা আসিয়া জয়সিংহকে মন্দির ছাড়িয়া তাহার সহিত চলিয়া যাইতে আহ্বান করিল। অমনি আবার জয়সিংহের মনে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

জয়সিংহ ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিল। রঘুপতি আসিয়া জয়সিংহকে ভর্ৎসনা করিলেন—

সব ভেঙে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হ'তে। লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ ক'রে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হ'তে বড়!

'রাজা ও রাণী' নাটকের রাজ-বয়স্য দেবদত্ত ত্রিবেদীর ব্রহ্মশাপ লাভ করিয়া রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরে শুনেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না।' এখানে রঘুপতি নিজের অজ্ঞাতসারে সেই প্রকার বিদ্রূপাত্মক কথাই বলিয়া ফেলিলেন—রঘুপতির ব্রহ্মশাপে তো রাজা মরিবেন না, তাই জয়সিংহকে দিয়া সেই ব্রহ্মশাপ ফলাইবার চেষ্টা! রঘুপতি কিন্তু একটি সত্য কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে জয়সিংহ আপন বুদ্ধিকে সকল হইতে বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়াই গুরুর অন্যায় আদেশ অথবা দেবীর নামে মিথ্যা আদেশ হইতে এবং সংস্কারের অন্ধতা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্বলচিত্ত জয়সিংহ আবার গুরুর বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং নিজের সঙ্কল্পিত কর্তব্য-পালনে অক্ষমতার জন্য গুরুর নিকটে প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করিলেন। তিনি নিজের প্রাণদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রঘুপতি তো জয়সিংহের প্রাণ চাহেন না, তিনি তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড দিবেন বলিয়া দেবীর চরণ স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইলেন,—তাঁহাকে দিয়া বলাইলেন—

আমি এনে দিব রাজরক্ত,
শ্রাবণের শেষ রাত্রে, দেবীর চরণে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—রঘুপতি জনতাকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে প্ররোচনা দিতেছেন।* তিনি দেবী প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সেই বিমুখী প্রতিমাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, রাজার অনাচারে দেবী বিমুখী হইয়াছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পরের বুদ্ধিতে চালিত, সাধারণ লোকদিগকে রঘুপতি ভয় দেখাইয়া রাজবিদ্রোহী করিবার সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু জয়সিংহের মনে সন্দেহ উঁকি মারিতেছিল যে ইহার মধ্যে দৈবীশক্তি অপেক্ষা মানবীয় ধূর্ততা অধিক প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু জয়সিংহ তাঁহার গুরু রঘুপতির সহিত কোন কথা আলোচনা করিবার অবসর পাইলেন না। জয়সিংহকে লইয়া রঘুপতি মন্দির হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজা আসিলেন। রাজার নিকটে সকল লোক দেবীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবেদন করিল। রাজা প্রজাদিগকে, বিশেষ করিয়া নারীদিগকে, মাতৃত্বের পবিত্র স্নেহমধুর সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন এবং সেই মাতৃত্ব-ভাবের সহিত পাষাণপ্রতিমার রাক্ষসীভাবের তুলনা করিয়া বলিলেন যে, যদিও বিশ্বমাতার চক্ষুর সম্মুখে বহু হত্যা ও অন্যায় সঙ্ঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে, তথাপি বিশ্বজননীর মাতৃভাব চিরন্তন হইয়া বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রজারা মূর্খ, তাহারা যুক্তিতর্ক বুঝে না, দার্শনিকতা বুঝে না; তাহারা চিরাগত প্রথা সংস্কার ও বাহ্য স্থূল ব্যাপার দ্বারা নিজেদের মত গঠন করে। রাজার যুক্তিতর্কে প্রজাদের মনের সন্দেহ ঘুচিল না। কিন্তু যখন অপর্ণা প্রতিমার মুখ মন্দিরের দ্বারের দিকে ফিরাইয়া দিল, তখন দেবতার প্রসন্নতা অনুমান করিয়া তাহারা তুষ্ট হইল। জনসাধারণ চাক্ষুষ প্রত্যয়কেই বড় বলিয়া মনে করে। রাজা বুদ্ধির মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোককে তাহার অনুপযুক্ত দেখিয়া অপর্ণা স্থূল চাক্ষুষ উপায়ে তাহাদের প্রত্যয় প্রত্যানয়ন করিল। সকলে জয়জয়কার দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল।

জয়সিংহ মোহমুক্ত হইয়াও আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন না। রঘুপতির সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা সম্বন্ধে তাঁহার সংশয়

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য।

উপস্থিত হইয়াছে, তিনি আর গুরুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, অথচ তাঁহার মনে এমন বল নাই যে স্পষ্ট করিয়া গুরুকে ইহার জন্য দোষী করেন অথবা গুরুকে পরিত্যাগ করেন। তাই তিনি গুরুর মুখ হইতে শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য বলো প্রভু, তোমারি এ কাজ?' রঘুপতি প্রজাদের কাছে যে মিথ্যা আচরণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ জয়সিংহের কাছে তাহা টিকিবে না বুঝিয়া তিনি সত্য কথা অকপটে স্বীকার করিলেন! তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, জয়সিংহের মনে গুরুর আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয়ের উদয় হইয়াছে; ইহা জয়সিংহের প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। পাছে জয়সিংহ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যান, রঘুপতির মনে এই ভয় অনেক দিন হইতে জাগিতেছিল। তাই তিনি অপর্ণাকে ভয় করেন, রাজার প্রতি জয়সিংহের শ্রদ্ধাকে ভয় করেন। রঘুপতি কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া জয়সিংহকে স্তোক দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তিনি যে প্রজাদের প্রতারণা করিবার জন্য প্রতিমার মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, সাধারণ মূর্খ লোকে 'চোখে চাহে দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়!' 'মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই!' গুরুর কুতর্কজালে আচ্ছন্ন হইয়া জয়সিংহ আবার সংশয়ে নিমগ্ন হইলেন, গুরু তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন,—কোথাও কোনো সত্য নাই, সমস্তই মিথ্যার মায়া, সেই মহামিথ্যারই নাম মহামায়া!

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য*—প্রাসাদকক্ষে চাঁদপাল আসিয়া রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে সংবাদ দিয়া গেল যে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে। চাঁদপাল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং রাজার বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য রাজাকে মাঝে মাঝে এক-একটা বিপদের সংবাদ দিয়া সাবধান করে।

রাণী আসিলেন। রাজা যখন বাহিরের বিদ্বেষের পরিচয়ে ব্যথিত, তখন তিনি রাণীর প্রেমের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু রাণী তাঁহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া গেলেন।

নক্ষত্ররায় আসিলেন। ধ্রুব বালক, খেলাচ্ছলে সেখানে আসিয়া রাজার মুকুট চাহিল। রাজা তাহার মাথায় সেটি পরাইয়া দিলেন। ধ্রুব তখন

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্য।

নক্ষত্ররায়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকা, তুমি রাজা হবে? এই যে মুকুট!' ধ্রুবের এই কথার মধ্য দিয়া কবি নাটকীয় ঘটনার পূর্বাভাস দিয়াছেন। ধ্রুবের কথা শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে রঘুপতির প্রলোভনের কথা উদয় হইল। তিনি রাজা হইতে উৎসুক, কিন্তু রাজাকে হত্যা করিবার মতন উৎসাহ তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি ধ্রুবের কথা শুনিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহার রাজা হইবার জন্য যে রাজরক্ত চাই,—তাহা কেমন করিয়া কে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে?

রাজা ইতিপূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে নক্ষত্র তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রঘুপতির সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন। এখন নক্ষত্ররায়কে উন্মনা দেখিয়া ভাইকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি রাজাকে হত্যা করিবার অবসর খুঁজিতেছেন। রাজা ভাইকে কাতর স্বরে মধুর ভর্ৎসনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

এই বন্ধ ক'রে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম!

নক্ষত্র চিরকালই ভ্রাতৃবৎসল, তাহার উপর ভ্রাতার উদার আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণ নক্ষত্রকে একেবারে অভিভূত করিয়া জয় করিল; তিনি ভ্রাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং ক্ষমা লাভ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা। রক্ষ মোরে
তার কাছ হ'তে।

দুর্বলপ্রকৃতি নক্ষত্ররায় রঘুপতির দুষ্ট প্রভাব হইতে ভ্রাতার দৃঢ়তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা ভাইকে অভয় দিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, অন্তঃপুরের কক্ষ*—রাণী গুণবতী একাকিনী চিন্তামগ্না, তিনি ভাবিতেছেন—

শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভাময়-আভাময়, তাপ নাহি
তাহে, হীরকের দীপ্তি-সম। ধিক্ থাক
শোভা! এ রোষ বজ্রের মতো হ'ত যদি,

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য।

পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হ'ত রাজ-অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'ত রাণীর মহিমা!

রাণী ভাবিতেছেন যে পুরুষ নারীর রোষের শোভা দেখিয়া আনন্দ বোধ করে, কিন্তু সেই রোষে জ্বালা ও আঘাত না থাকাতে তাহারা যাতনায় অধীর হইয়া নারীর অধীন হয় না। রাণী আপনার রাণী-মহিমার অভাব অনুভব করিয়া অধীর হইয়াছেন। এমন সময়ে দেখিলেন ধ্রুব রাজার কাছে যাইতেছে। রাণী যখন কল্পনায় নিজেকে স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ, তখন তিনি ধ্রুবকে রাজার কাছে যাইতে দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, রাজা সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিজের ক্ষুব্ধ চিত্তকে বিনোদিত করিবার জন্য এই সরল শিশুর সাহচর্যই আশ্রয় করিয়াছেন। সে শিশু তো কোনো স্বার্থবুদ্ধির বা সংস্কারের বশীভূত নহে, সে কেবল অনাবিল প্রীতির বশ। কিন্তু রাণী মনে করিলেন যে, ঐ অনাথ বালক অজাত রাজপুত্রের প্রাপ্য পিতৃস্নেহ উচ্ছিষ্ট করিয়া রাখিতেছে। তিনি ঈর্ষায় কাতর হইয়া আবার দেবীর কাছে একটি শিশু পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাণী দেখিলেন—সেইদিকে নক্ষত্র আসিতেছেন। রাণী নক্ষত্রকে আহ্বান করিতেই নক্ষত্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—'আমি রাজা নাহি হবো!' চারিদিকে সকলে তাঁহাকে রাজা হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে, অথচ তিনি তাহার উপযুক্ত আয়োজন করিতে অক্ষম এবং রাজাও তাঁহার এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিয়া বসিয়া আছেন, এইজন্য নক্ষত্ররায় আগেই রাজা হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। নক্ষত্র রাণীর সঙ্গে কথা বলেন, আর কেবলই সেই রাজা হইতে অনিচ্ছার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁহার মনে রাজা হইবার ইচ্ছা আছে অথচ উদ্যম নাই, এই জন্য দ্বিধা পদে পদে। রাণী নক্ষত্রকে ধ্রুবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নক্ষত্রকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ধ্রুব রাজমুকুট মাথায় পরিয়া খেলা করে, কোন্ দিন সেই মুকুট সে-ই অধিকার করিয়া বসিবে, যুবরাজ ফাঁকিতে পড়িবেন। অতএব নক্ষত্রের উচিত তাঁহার পথের ঐ ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণ কণ্টকটিকে উৎপাটন করিয়া অপসারণ করা। দুর্বলপ্রকৃতি ও অল্পবুদ্ধি নক্ষত্র রাণীর কথা মুখস্থ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য—মন্দিরের সোপানে জয়সিংহ বসিয়া চিন্তা

করিতেছেন।* এতদিন পর্যন্ত দেবীপ্রতিমাকে সত্য জানিয়া তিনি যে নির্ভর পাইয়াছিলেন, এখন রঘুপতির বাক্যে ও ব্যবহারে সেই প্রতিমা অসার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়াতে দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হারাইয়া তিনি একান্ত নিরাশ্রয় ও অবলম্বন-রহিত বোধ করিতেছেন। তাঁহার মনে এই খেদও উদিত হইয়াছে যে এই মনুষ্যজীবনের দুর্লভ ঐকান্তিক ভক্তি শ্রদ্ধা তিনি ঐ ক্ষুদ্র জড়স্তূপ মিথ্যার পদে দান করিয়া নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়াছেন। এমন সময়ে অপর্ণা আসিয়া উপস্থিত। বাহ্য জগৎ বৃহৎ উদার সত্য ও প্রেম লইয়া বারংবার অপর্ণার রূপে জয়সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে প্রমুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। জয়সিংহ এখন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে তারতম্য অনুভব করিতেছেন, তিনি দুঃখসন্তপ্ত স্বরে বলিলেন—'অপর্ণা, দেবী নাই।' অপর্ণা জয়সিংহকে বলিল—'জয়সিংহ, তবে চ'লে এসো, এ মন্দির ছেড়ে!' অর্থাৎ, যদি তুমি সত্যই বুঝিয়া থাকো যে এই মন্দিরের মধ্যে দেবী বন্দী হইয়া নাই, তবে আর এখানে আবদ্ধ হইয়া থাকার তো কোনো তাৎপর্য ও অর্থ নাই। অপর্ণা জয়সিংহের পরিবর্তনে ও মোহভঙ্গে সুখী হইয়া তাঁহাকে এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়া অন্ধভক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করিল।

কিন্তু জয়সিংহ যদিও মিথ্যার মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তথাপি কৃতজ্ঞতার ঋণ হইতে তো এত সহজে মুক্ত হইতে পারেন না, তাই তিনি বলিলেন—

যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাবো।

অপর্ণা জয়সিংহের কাছে প্রেমের ও সত্যের বার্তা বহন করিয়া বারংবার আহ্বান করিতেছে, তাহার আকর্ষণ বড় শোভন ও বড় লোভন। কিন্তু তাঁহার শপথ-করা কর্তব্য তো এখনো সম্পাদন করা হয় নাই! সেই কর্তব্যকেই তিনি সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের উপর সেই কর্তব্য প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তিনি এখন আর স্বাধীন নহেন।

জয়সিংহের এই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান শুনিয়া অপর্ণা আজ কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিল—

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্কের

শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে। আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ।

প্রেম অশুভঙ্করী। জয়সিংহের অস্পষ্ট কথায় অপর্ণার মনে একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য—নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নিদ্রিত ধ্রুবকে চুরি করিয়া মন্দিরে হত্যা করিতে আনিয়াছেন।* রাণীর প্ররোচনায় নক্ষত্র যুবরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া ধ্রুবকে হত্যা করিতে উদ্যত, আর রঘুপতি রাজার প্রিয়পাত্র বালককে হত্যা করিয়া রাজাকে কষ্ট দিতে পারিবেন এই আশায় হত্যাকর্মে প্রবৃত্ত। কিন্তু যাঁহারা পাপকর্মে নূতন ব্রতী তাঁহাদের সেই কর্মে তৎপরতা হয় না। রঘুপতি এই শিশুকে দেখিয়া তাঁহার পালক-পুত্র জয়সিংহের শৈশব মনে করিতেছেন, সেই শিশু-জয়সিংহের প্রতি মমতার স্মৃতি আজ এই শিশুর প্রতিও তাঁহাকে মমত্বশালী করিয়া তুলিতেছে। তিনি বলিলেন—

কেঁদে কেঁদে ঘুমায়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন।.........
ওরে দেখে
তার সেই শিশু-মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

এই শিশুর ক্রন্দন রঘুপতির কঠিন চিত্তকে আর্দ্র করিয়াছে। তাই তিনি প্রথমেই শিশুর ক্রন্দনের কথাই উল্লেখ করিলেন। জয়সিংহের প্রতি স্নেহ রঘুপতির মনে সমাবস্থ শিশুর প্রতি স্নেহ উদ্রেক করিয়া দিতেছে।

কিন্তু নক্ষত্ররায়ের ধরা পড়িয়া যাইবার জন্য ভয় হইতেছে, তিনি সত্বর হত্যা-কার্য সমাধা করিতে ব্যগ্র হইয়া রঘুপতিকে তাগাদা দিতে লাগিলেন। যাহারা পাপকার্যে অভ্যস্ত নহে, তাহারা পাপকর্মের সম্মুখীন হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে; তখন কৃত্রিম উত্তেজনার দ্বারা হিতাহিত-বিবেচনা আচ্ছন্ন করিতে হয়। সেইজন্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন—'এসো পান করি কারণ-সলিল, এসো পান করি আনন্দ-সলিল।' অতঃপর তিনি নিজে মদ্যপান করিলেন।

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৩য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য।

নক্ষত্র মদ্যপানে ও হত্যাসাধনে উভয় কর্মেই দ্বিধান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন—'আমি বলি, আজ থাক, কাল পূজা হবে।'

নক্ষত্রকে নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ দেখিয়া রঘুপতি আনন্দ-সলিল পান করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন এবং নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পান করিতেছিলেন। মদ্যপানে তাঁহার চেতনা আচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু নক্ষত্র মদ্য পান না করাতে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় ছিল, এবং ভয়ে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি তীক্ষ্ণও হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কাহার পদধ্বনি শুনিয়া ও আলোক দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং রঘুপতিকে সাবধান করিলেন।

রঘুপতি সচেতন হইয়া দেখিলেন রাজা উপস্থিত হইয়াছেন। তখন আর কালক্ষেপের সময় নাই, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গ উত্তোলন করিলেন। রাজা ও প্রহরিগণ সত্বর আসিয়া রঘুপতিকে ও নক্ষত্ররায়কে বন্দী করিলেন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—বিচারসভা।* রাজা রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি অপরাধ স্বীকার করিবেন কি না! রাজার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য,—অপরাধ স্বীকার করিলে রঘুপতিকে তিনি লঘুদণ্ড দিবেন। কিন্তু রঘুপতি সে চরিত্রের লোক নহেন,—তিনি ভগ্ন হন, কিন্তু নত হন না। তিনি অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং দেবতার নামে নিজের কর্ম সমর্থন করিয়া বলিলেন—

অপরাধ করিয়াছি বটে! দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হ'য়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি শুধু উপলক্ষ!

রাজা তো পূর্বেই প্রচার করিয়াছিলেন যে যে-ব্যক্তি দেবতার কাছে বলি দিবার চেষ্টা করিবে, তাহার প্রতি নির্বাসন-দণ্ড হইবে। রঘুপতির প্রতি রাজা সেই দণ্ড দিলেন।

তখন রঘুপতি রাজার কাছে নতজানু হইয়া শ্রাবণের শেষ রাত্রি পর্যন্ত অবসর প্রার্থনা করিলেন এবং তাহার পরে শরতের প্রথম প্রত্যুষে ভাদ্রের প্রথমেই অগস্ত্যযাত্রা করিয়া দেশ ছাড়িয়া যাইবেন, আর কখনো এদিকে মুখ ফিরাইবেন না।

রাজার রক্ত দিতে প্রতিশ্রুত জয়সিংহের প্রতিজ্ঞা-পালনের আর দুই দিন

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৪র্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্য।

মাত্র বাকি ছিল, তাই গর্বিত ব্রাহ্মণ রঘুপতি অ-ব্রাহ্মণ নরপতির সম্মুখে নতজানু হইলেন। রাজার মৃত্যু-দর্শনের শুভ দিন না দেখিয়া রঘুপতি দূরে যাইতে অক্ষম। আর, রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে হয়তো আর নির্বাসনে যাইতে না হইতেও পারে। রাজা রঘুপতির প্রার্থনা-অনুসারে তাঁহাকে দুইদিন সময় দিলেন। তখন রঘুপতি ব্যঙ্গের স্বরে রাজাকে বলিলেন—

> মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
> মহিমা-সাগর তুমি কৃপা-অবতার!
> ধূলির অধম আমি দীন অভাজন।

নক্ষত্রকে রাজা দোষ স্বীকার করিতে আদেশ করিলেন। নক্ষত্র রাজার পদতলে পতিত হইয়া দোষ স্বীকার করিলেন, কিন্তু ক্ষমা চাহিতে সাহস করিলেন না। রাজা জানিতেন যে, নক্ষত্র নিজের প্রেরণায় এই কাজে উদ্যত হন নাই, তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার প্ররোচনায় তিনি এই গর্হিত কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নক্ষত্র গুণবতীর নাম প্রকাশ করিলেন না। গুণবতীর নাম প্রকাশ করিলে রাজা ব্যথা পাইবেন, রাজা রাজকর্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া গুণবতীকে দণ্ড দিবেন এবং সেই দণ্ড দিয়া রাজা নিজে দণ্ডিত হইবেন এবং রাণীর অপমানে নিজে অপমানিত হইবেন,—এইসব ভাবিয়া নক্ষত্র রাণীর কুমন্ত্রণার কথা প্রকাশ করিলেন না, সব দোষ নিজের উপরে লইলেন। ইহার দ্বারা কবি নক্ষত্রের ভ্রাতৃস্নেহ এবং তাঁহার স্বাভাবিক সততা নাটকীয় কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার বিচার-সভার সকলে নক্ষত্রকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা ন্যায়নিষ্ঠ, তিনি বলিলেন—

> ক্ষমা কি আমার
> কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
> বন্দী হ'তে বেশী বন্দী। এক অপরাধে
> দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর,
> এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার,...

রাজা নক্ষত্ররায়কে আদেশ দিলেন যে, ত্রিপুররাজ্যের বাহিরে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে রাজার তীর্থস্নানের জন্য যে রাজগৃহ আছে, সেইখানে নক্ষত্র নির্বাসনের আট বৎসর যাপন করিবেন। ভ্রাতৃস্নেহ রাজদণ্ডকে কোমল করিয়া দিল, রাজা রঘুপতির ন্যায় নক্ষত্রকে নিরুদ্দেশ বিশ্ববক্ষে বিসর্জন দিতে পারিলেন না।

রাজা সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া নক্ষত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। সিংহাসনে কেবল ন্যায় অধিষ্ঠিত, সেখানে স্নেহ মমতা দয়ার স্থান নাই বলিয়া রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন।

রাজা রাজসভা হইতে সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন, ভ্রাতৃবিচ্ছেদের শোক একাকী বিরলে অনুভব করিবেন বলিয়া। এমন সময়ে রাজার পদচ্যুত পূর্বতন সেনাপতি নয়নরায় দ্রুত প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন যে, চাঁদপাল প্রজা-বিদ্রোহের সুযোগ পাইয়া মোগলের সৈন্যের সাহায্য লইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাজা চাঁদপালের নামে এই অপবাদ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, নয়নরায় পূর্ব-বৈরিতা স্মরণ করিয়া চাঁদপালের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন। নয়নরায় রাজার এই অবিশ্বাসে মর্মাহত হইয়া বলিলেন—

অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।

নয়নরায় রাজার বলি-নিষেধের বিধান সমর্থন করিতে পারেন নাই বলিয়া রাজা তাঁহাকে শত্রু ভাবিতেছেন,—রাজার এই অবিশ্বাস নয়নরায়কে আঘাত করিল।

রাজা আবার নয়নরায়ের কাছে চাঁদপালের বিশ্বাসঘাতকতার বার্তা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কোন্ ছিদ্রপথে এইসব অনর্থ উৎপাত হইতেছে। সেই ছিদ্রপথ যে রাজারই রাজশক্তির দম্ভ, তাহা তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অন্যায়ের প্রতিরোধ প্রেমের দ্বারা না করিয়া বলের দ্বারা করিতে গিয়া বিরোধের বিপক্ষে বিরোধ জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। রাজা নয়নরায়কে আবার সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দির-প্রাঙ্গণে জয়সিংহ ও রঘুপতি কথা কহিতেছেন।* রঘুপতি ব্রাহ্মণ হইয়া অ-ব্রাহ্মণ রাজার কাছে নতজানু হইয়া দয়া ভিক্ষা করিয়াছেন, সেই অপমান তাঁহাকে পীড়া দিতেছে। তিনি জয়সিংহকে বলিতেছেন যে তিনি আর জয়সিংহের গুরু নহেন, তিনি গুরুর আদেশ করিতেছেন না, কেবল তিনি ভিক্ষা চাহিতেছেন। আশৈশব জয়সিংহকে যে তিনি পালন করিয়াছেন তাহার কৃতজ্ঞতা চাহিতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জয়সিংহ গুরুকে গুপ্তঘাতক পাপাচারী দেখিয়া তাঁহার প্রতি আর

* ইহা পরবর্তী সংস্করণে ৪র্থ অঙ্কের ২য় দৃশ্য।

ভক্তিশ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তাই তিনি জয়সিংহের কৃতজ্ঞতার কাছে অনুনয় করিতেছেন। জয়সিংহের কাছে তিনি যে ভিক্ষা করিতেছেন, তাহাও তাঁহাকে পীড়া দিতেছে—

কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে!

জয়সিংহ গুরু ও পিতার কাতর অনুনয়ে ব্যথিত হইয়া বলিলেন যে দেবী যখন রাজরক্ত চাহিতেছেন, তখন তিনি তাহা আনিয়া দিবেনই। ইহাতেও রঘুপতি হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। কারণ, জয়সিংহ দেবীর আদেশ পালন করিবেন, গুরুর আদেশ নহে। দেবী জয়সিংহের কি করিয়াছেন, আর তিনি কি না করিয়াছেন? তাছাড়া, জয়সিংহের এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা তাঁহার বুকে যতখানি বাজিয়াছে, দেবীর বুকে কি ততখানি বাজিয়াছে!

পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য*—প্রাসাদকক্ষ; রাজা সেখানে উপস্থিত, নয়নরায়ের প্রবেশ—নয়নরায় আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তিনি বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এমন সময়ে জয়সিংহ আসিলেন। রাজা মনে করিলেন যে জয়সিংহ ক্ষত্রিয় যুবা, তিনি বোধ হয় যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যই আসিয়াছেন। কিন্তু জয়সিংহ রাজার কাছে বিদায় চাহিলেন। তিনি কোথায় যাইবেন তাহা বলিলেন না, এবং রাজাকেও সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিলেন। রাজা জয়সিংহকে 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন,—কারণ, রাজা নিজে যুদ্ধে যাইতেছেন, ফিরিয়া আসিবেন কি না কে জানে! জয়সিংহও রাজাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া কোলাকুলি করিলেন ও প্রস্থান করিলেন।

এমন সময়ে একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল যে নক্ষত্ররায়কে নির্বাসনের পথ হইতে মোগলেরা কাড়িয়া লইয়াছে এবং তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপদে বরণ করিয়া সৈন্য লইয়া ত্রিপুরারাজ্য দখল করিতে আসিতেছে। নয়নরায় সেনাপতি—তিনি যুদ্ধ করিতে চাহেন; কিন্তু রাজা ভাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক,—তিনি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ও অনর্থক লোকক্ষয় নিবারণের জন্য যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ। রাজা গোবিন্দমাণিক্য এখানে ভ্রাতৃদ্রোহের আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া

* পরবর্তী সংস্করণে ৪র্থ অঙ্কের ৩য় দৃশ্য।

ভুল করিলেন—নক্ষত্ররায় যে মোগলের দাস ও ক্রীড়নক হইয়া স্বদেশকে পরপদানত করিবেন এবং তাহাতে স্বদেশের যে অমঙ্গলই হইবে, ইহা রাজা ভাবিয়া দেখিলেন না। বিচক্ষণ রাজার ইহা মনে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু ভ্রাতৃদ্রোহের আঘাতে তাঁহার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। হয়তো বা তিনি তাঁহার রাজ্যের নানা বিক্ষোভে ক্লান্ত হইয়া রাজার গুরু-কর্তব্যভার হইতে নিষ্কৃতিলাভের এই সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন! রাজা মাথা হইতে মুকুট উন্মোচন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন—এইবার আর কোনো ক্ষমতা তাঁহার রহিল না, অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবার বা নিষেধ করিবার ক্ষমতা এই মুকুট ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য ; মন্দিরের সম্মুখ। রাত্রিকাল, ঝড়বৃষ্টি হইতেছে।*

শ্রাবণের শেষ রাত্রি। রঘুপতি রাজরক্তের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। তিনি জয়সিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অপর্ণা আসিল। রঘুপতি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। রঘুপতির সন্দেহ যে শেষ পর্যন্ত জয়সিংহ হয়তো রাজহত্যা করিতে সম্মত হইবেন না, তাই তিনি দেবীর কাছে বর চাহিতেছেন যে দেবীর ভক্তবৎসলা নামে যেন কোনো কলঙ্ক স্পর্শ না করে। দেবীকে ভক্তবৎসলা সম্বোধন করার মধ্যেও dramatic irony আছে। দেবী যে ভক্তির বশ, হিংসার সমর্থনকারিণী নহেন, এই কথাই রঘুপতি নিজের অজ্ঞাতসারে প্রচার করিলেন। রঘুপতি দেবীকে ভয়ঙ্করী আবার অভয়া, সর্বজয়ী ও সিদ্ধিদাত্রী নামে অভিহিত করিতেছেন ; রাজার ছিন্ন-মুণ্ড দেখিবার আশায় দেবীকে সম্বোধন করিতেছেন—

> জয় নৃমুণ্ডমালিনী!
> পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

সে শক্তি রাজশক্তির উপরও জয়ী হইতে পারে!

জয়সিংহ দ্রুত-পদে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তে রাজরক্তের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া রঘুপতি উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—রাজরক্ত কই ?

জয়সিংহ বলিলেন—রাজরক্ত তাঁহার ধমনীতেই আছে, তাঁহারা রাজপুত, তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন, তিনি নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেবীর রক্তপিপাসা ও গুরুর আদেশ মিটাইয়া দিবেন।

* পরবর্তী সংস্করণে ৫-ম অঙ্কের ১-ম দৃশ্য।

রাজরক্ত আছে এই
দেহে! এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে যেন শেষ মিটে
যায় তোর অনন্ত পিপাসা!

এই উক্তি করিয়া জয়সিংহ আপন বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন।

জয়সিংহ গুরুর আদেশ ও নরহত্যার প্রতি ঘৃণার সমন্বয় করিলেন আত্মদানে। গোবিন্দমাণিক্যের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুর নিকটে কৃতজ্ঞতার সমন্বয় করিলেন আপনাকে বলি দিয়া। ইহার দ্বারা গুরুর আদেশ-পালন ও নিজের মনুষ্যত্ব-রক্ষা দুইই হইল।

জয়সিংহকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া রঘুপতির স্নেহসন্তপ্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, জয়সিংহের মহৎ আত্মত্যাগে আঘাত পাইয়া রঘুপতির মনুষ্যত্ব উন্মেষ লাভ করিল। অপরের ক্ষতি মানুষের চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে না, কিন্তু সেই ক্ষতি যখন তাহার নিজের হয়, তখন সে বুঝিতে পারে যে সেই সামান্য ক্ষতি অপরের কাছে কেমন অসামান্য মনে হইতে পারে! রক্ত-দর্শনে হাসির ও ধ্রুবের ভীতি দেখিয়া ও ছাগশিশুর জন্য অপর্ণার ক্রন্দন দেখিয়া রাজার চেতনা হইয়াছিল; কিন্তু রঘুপতির চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য জয়সিংহের ন্যায় একটি মহাপ্রাণ বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। রঘুপতি দেবতা ও ব্রাহ্মণত্ব সব বিসর্জন দিয়াও এখন জয়সিংহকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অপর্ণা জয়সিংহের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে পুনরায় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আজ এই প্রথম রঘুপতি কোমল মিষ্ট স্নেহপূর্ণ স্বরে আহ্বান করিলেন—

আয় মা অমৃতময়ি! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে… … …
তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

অপর্ণা জয়সিংহের প্রিয়, তাহার প্রেমের সঞ্জীবনী-শক্তির দ্বারা সে জয়সিংহকে পুনর্জীবন দান করুক—এই আশায় রঘুপতি অপর্ণাকে 'অমৃতময়ী'

বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাহার কণ্ঠের আহ্বানকে মৃতসঞ্জীবনী সুধার সহিত তুলনা করিলেন। অপর্ণা যদি জয়সিংহকে জীবিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহাই রঘুপতির কাছে যথেষ্ট, তিনি তাহাকে নিজের কাছে যদি নাও রাখিতে পারেন, তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ আছে। অপর্ণা জয়সিংহকে মৃত দেখিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

রঘুপতি পাষাণপ্রতিমার পায়ের উপর মাথা কুটিয়া কুটিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'ফিরে দে। ফিরে দে!' কিন্তু পাষাণীর কোনো সাড়া না পাইয়া তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে এই প্রতিমা পাষাণ মাত্র, জড় পাষাণের স্তূপ, মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির!

রঘুপতি এতদিনের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া দেবীপ্রতিমাকে গোমতী নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা পাষাণমন্দির হইতে ও মনোমন্দির হইতে দেবতার বিসর্জন! বলিষ্ঠ হৃদয়ের ভক্তি যখন সচেতন হইয়া উঠিল, তখন রঘুপতি ঐ পাষাণস্তূপকে আর স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহা নিজের অতীত মূঢ়তার ধিক্‌কারে প্রতিহিংসার আকার ধারণ করিল।

গুণবতী পূজা লইয়া মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন দেবী নাই। তিনি মনে করিলেন, দেবী বুঝি উপযুক্ত পূজার অভাবে কুপিত হইয়া মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা দেবী?' ইহার উত্তরে রঘুপতি বলিলেন—

> দেবী বলো তারে?
> পুণ্য রক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
> ফেটে ম'রে গেছে।

দেবীপ্রতিমা যতদিন ছাগরক্ত পান করিতেছিল, ততদিন তাহা রঘুপতির কাছে সত্য দেবীর ভক্তি পাইতেছিল। সেই দেবীপ্রতিমার কাছে তিনি রাজাকে বলি দিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেই প্রতিমা রঘুপতির প্রিয় জয়সিংহের রক্তপান করায় রঘুপতি তাহাকে রাক্ষসী বলিয়া মনে করিতেছেন। রাণী গুণবতী রঘুপতির কথা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া কাতর হইয়া বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেবী নাই?' যখন রঘুপতি বারংবার সেই একই উত্তর দিলেন, তখন রাণী রঘুপতির নাস্তিকতার দৃঢ়তা দেখিয়া প্রত্যয় করিলেন যে 'দেবী নাই'। এতদিন রঘুপতির কথাতেই তিনি স্বামীর বিরোধী হইয়া দেবীর উপর নির্ভর করিতেছিলেন, এখন সেই রঘুপতি

যখন তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে দেবী নাই, তখন তিনি মিথ্যার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিলেন। রাণী ও রাজার মধ্যে যে পাষাণী-প্রতিমা প্রাচীর হইয়া উঠিয়া ব্যবধান রচনা করিয়াছিল, উহা অপসৃত হইবামাত্র রাণী রাজার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অপর্ণা মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া রঘুপতিকে 'পিতা' বলিয়া আহ্বান করিল। অপর্ণা নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিল যে, আজ রঘুপতি কী দারুণ আঘাতে ব্যথিত হইয়াছেন! সেইজন্য রঘুপতির প্রতি আজ তাহার রমণীহৃদয়ের অনুকম্পার আর অবধি নাই। রঘুপতি অপর্ণার কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন শুনিয়া পুনরায় স্নেহের আস্বাদ পাইলেন এবং মনে করিলেন জয়সিংহই অপর্ণার কণ্ঠে এই স্নেহসম্বোধন রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জয়সিংহকে রঘুপতি ও অপর্ণা উভয়েই ভালবাসিতেন এবং জয়সিংহও রঘুপতিকে ও অপর্ণাকে ভালবাসিতেন। এইজন্য রঘুপতি ও অপর্ণা উভয়ে উভয়ের সমব্যথী হইতে পারিলেন এক জয়সিংহের প্রতি প্রেমের সূত্রে। অপর্ণা রঘুপতিকে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আহ্বান করিল।

রাজা ফুল লইয়া দেবীকে শেষ পূজা দিতে আসিলেন এবং দেবীপ্রতিমার তিরোধান ও মন্দিরে রক্তধারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রঘুপতি রাজাকে বলিলেন—

এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ মন্দিরে!

যে মন্দিরে নিরীহ পশুহিংসা হইয়াছে, যেখানে ধর্মের নামে কত অধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে কত পাপের ষড়যন্ত্র হইয়াছে, সেই মন্দির আজ এতদিন পরে রঘুপতির কাছে পাপপূর্ণ কণ্টকময় বলিয়া বোধ হইয়াছে। আর জয়সিংহ পশুহিংসা রাজহত্যা গুপ্তহত্যা প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যে আত্মদান করিলেন, সেই রক্ত পুণ্যময় মনে হইতেছে। জয়সিংহের দেবতুল্য চরিত্রের এই পুণ্যাবদানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া রাজা দেবীপূজার জন্য আনীত ফুল দেবতুল্য জয়সিংহকেই দান করিলেন—

ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

রাণী গুণবতী আসিয়া এইবার রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা!

গুণবতী এতদিনের কুসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া এখন প্রেমের আশ্রয়ে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজা বলিলেন—

> গেছে পাপ! দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
> আমার দেবীর মাঝে।

পাপ কুসংস্কার হিংসা দ্বেষ মুছিয়া গেল। প্রকৃত যিনি দেবী তিনি তো প্রেমময়ী, তিনিই আজ মহারাণীর গভীর প্রেমের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

রঘুপতিও অনুভব করিলেন—

> পাষাণ ভাঙিয়া গেল—জননী আমার
> এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
> জননী অমৃতময়ী?

নিষ্ঠুরতার দ্বারা দেবতার পূজা হয় না, দেবতা দয়াময়ী প্রেমময়ী; প্রেমে ও দয়াতেই তাঁহার সত্য আবির্ভাব—এই কথা আজ রঘুপতি উপলব্ধি করিয়াছেন। রঘুপতি আজ বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃত ও পূর্ণ মনুষ্যত্বই দেবত্ব। তিনি এতদিন হিংসার মধ্যে দেবীর মিথ্যা সন্ধান করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছিলেন; আজ প্রেমের মধ্যে প্রকৃত দেবীর সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইলেন।

অপর্ণা পুনরায় রঘুপতিকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিল—'পিতা চ'লে এসো!' সে রঘুপতিকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিল চলিয়া আসিতে—মিথ্যা হইতে, হিংসা হইতে, সংস্কার হইতে, প্রেমের ও সত্যের সুবৃহৎ ক্ষেত্রে।

এইখানে বিসর্জন সম্পূর্ণ হইল—মিথ্যা দেবীপ্রতিমার বিসর্জন হইল, জয়সিংহের ন্যায় মহাপ্রাণের বিসর্জন হইল, রঘুপতির ন্যায় বলিষ্ঠ উন্নত হৃদয় হইতে কুসংস্কার ও হিংসার বিসর্জন হইল, রাণীর ভ্রমের বিসর্জন হইল, রাজা ও রাণীর মধ্যেকার বিদ্রোহের বিসর্জন হইল।

বৌঠাকুরাণীর হাটের বসন্ত রায়ের চরিত্রে কবি যে অহিংসা ও বৈষ্ণব ভাব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহাই যেন স্পষ্টতর হইয়া বিসর্জন নাটকে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

> 'মানসী'-যুগের কবিতা ও নাট্যগুলির মধ্যে……সংশয়-বিষাদের ছায়াময় সঞ্চরণ। সমস্ত লেখার মধ্যেই একটা বেদনার সুর মাখা…নাট্যগুলির মধ্যেও একটি গভীর করুণ সুর ধরা পড়ে।
>
> —রবীন্দ্রজীবনী।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটকের তাৎপর্য নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন*—

"বিসর্জন—এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন ক'রে হয়েছে? আমরা দেখ্‌তে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা-বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার ক'রে দিয়েছিল।

সুতরাং প্রতিমা-বিসর্জন এই নাটকের শেষ কথা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ, তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব কর্‌তে পার্‌ল যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝ্‌তে পার্‌ল যে সে যা হারাল তা কত মূল্যবান্। ছাগশিশুর পক্ষে প্রাণ কত সত্য জিনিস সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল, কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝ্‌তে সময় লেগেছিল—সে প্রিয়জনকে নিদারুণভাবে হারিয়ে তারপর অনুভব কর্‌তে পার্‌ল যে প্রাণের মূল্য কত বেশী, তাকে আঘাত কর্‌লে তার মধ্যে কত বেদনা।

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী কর্‌তে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মান্‌তে হয়েছিল—তার চৈতন্য হলো, বোঝ্‌বার বাধা দূর হলো, প্রেম জয়যুক্ত হলো।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রাণী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয়নি ব'লে সন্তান লাভ কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বল্‌লেন—আমাকে দয়া ক'রে সন্তান দাও। আমার সব আছে—দাস দাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই, কিন্তু আমার তপ্ত বক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আরেকটি প্রাণকে অনুভব কর্‌বার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী হবে। এই বক্ষ বাহু—তা কতখানি ভালোবাসা পেতে চায়। শিশু তো একটুকু প্রাণের কণিকা, কিন্তু তাকে স্নেহ কর্‌বার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে আমি তার প্রতি আমার সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা অর্পণ কর্‌ব।

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশী! একদিকে রাণী মানত কর্‌ছেন যে বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন, অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালোবাসাটুকু ভোগ কর্‌তে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ, অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝেছেন। সুতরাং রাণীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তিনি জান্‌ছেন যে ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হ'তে পারে যে তার জন্য লোকে

* সমালোচনাটি পরবর্তী পরিবর্তিত বিসর্জন নাটককে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ করে; আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেনি।

তারপর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বল্‌লে—তুমি যদি একদিক্ দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হ'য়ে প্রাণকে পালন কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে চাও? বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণহত্যায় খুশী হন?—যদি তিনি তা বোঝেন, তবে কেমন ক'রে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে কর্‌ছ?—মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কি ক'রে বিশ্বে প্রকাশ পায়, অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটা ব'লে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় কর্‌তে রাজি আছেন,—অথচ চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্যদল তা বোঝেনি,—তাই দুই দলে বিরোধ বাধ্‌ল। গুণবতী ও রঘুপতি একদিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্যদিকে।

জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মতো ভক্তি কর্‌ত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। তাই যেখানে ভালোবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না—এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরী হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনের প্রথমে তার পূর্ববিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হ'তে সুরু হলো। গোবিন্দমাণিক্য এই পশুবলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে—যখন তার বিচার কর্‌বার শক্তি জন্মায়নি তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হলো—রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের জড়তা। এই অভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় ক'রে দিয়েছিল, অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পার্‌ছিল যে কত বড় অন্যায়কে সে সমর্থন ক'রে এসেছে।

অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল ক'রে দিলে। যে জীবকে অপর্ণা কোলে ক'রে পালন করেছে তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়্‌ছে, এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠ্‌ল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বল্‌ল—'এ কি তোমার মায়া? এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, আর তুমি বিশ্বজননী হ'য়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই?' জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সে এই প্রথম আঘাত পেল, তারপর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্ধিত আকার ধারণ কর্‌ল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুই দিক্ হ'তে আকর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। একদিকে অপর্ণা তাকে মন্দির ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ছে, অপরদিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় ধ'রে রাখ্‌তে চায়।

রঘুপতির দয়ামায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন ক'রে এসেছে এবং এমনি ভাবে শক্তিলাভ ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছে। সে দেবীর সেবক ব'লে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে। সে জয়সিংহকে তার পক্ষে আন্‌তে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাঁধ্‌তে চায়।

কিন্তু অপর্ণা আরেক বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বল্‌লে—'এই নির্দয় পূজার মধ্যে তুমি বাস কোরো না, তুমি মন্দির ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এস।'—জয়সিংহের মনে তখন বিরোধ বেধে গেল। একদল লোক বাহ্যশক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন ক'রে রাখ্‌তে চায়—অন্যদল বল্‌ছে প্রেমই সব চেয়ে বড় জিনিস। জয়সিংহ সেই দোটানার মাঝখানে পড়্‌ল এবং কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা ক'রে বা'র করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

রঘুপতি পণ্ডিত বৃদ্ধ সম্মানিত ও শক্তিশালী। আর অপর্ণা বালিকা ভিখারিণী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্বল ব'লে মনে হয়, কিন্তু কার্যত তারই জয় হ'ল। অথচ রঘুপতি শক্তিশালী—তার দিকে শাস্ত্রমত দেশাচার লোকমত সব রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে বিশ্বমাতার মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্য-সামন্ত অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই—কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হ'তে থাকে।

—শান্তিনিকেতন, ১৩২৯ কার্ত্তিক।

বিসর্জন নাটকের প্রথম সংস্করণে—অপর্ণার অন্ধ পিতা, হাসি ও তাতা (ধ্রুব), কেদারেশ্বর (হাসি ও তাহার খুল্লতাত) এই কয়টি চরিত্র ছিল। হাসি ও তাতা ঐ সংস্করণে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের আনন্দের উৎস। তাহারা—

প্রতিদিন প্রাতে আসে—যেন তারা মোর
সুপ্তচিত্ত-বাতায়নে দুটি কিরণের
রেখা,—প্রভাতের প্রথম সংবাদ নিয়ে
আসে, বৈকুণ্ঠের দুটি শুভ্র দূতশিশু!

উহাদের অদর্শনে রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। বিসর্জন নাটকের পরবর্তী সংস্করণে—অপর্ণার অন্ধ পিতা, হাসি ও কেদারেশ্বরের চরিত্র বর্জিত হইয়াছে। ধ্রুব চরিত্রটি রাজার পালিত বালক রূপে নাটকে রক্ষিত হইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা

ইহা নাট্যকাব্য। এই নাটকখানি প্রকাশিত হইলে অনেকে ইহাকে অশ্লীল ও লালসার চিত্রে পূর্ণ বলিয়া অত্যন্ত কঠোর নিন্দা করিয়াছিলেন, আবার অনেকে ইহার মধ্যে যে ভোগবাসনার আভাস আছে, তাহার পরিণতি বিচার করিয়া এবং উদ্দেশ্য দেখিয়া ঐ বর্ণনা দোষাবহ বিবেচনা করেন নাই। উপন্যাস ও নাটকে ভালোর সহিত মন্দের সংগ্রাম দেখানো হয়, লালসার সহিত সংযমের সংগ্রাম অঙ্কন করা হয় এবং সেই সংগ্রামের অবসান যদি ভালোর ও সংযমের জয়ে এবং মন্দ ও লালসার দমনে পর্যবসিত হয়, তবে তাহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া সমালোচক নিন্দা করেন না, অন্ততঃ করা উচিত নয়। আমাদের কবির এই নাটকের মধ্যেও নর-নারীর আকর্ষণ ও মোহের চিত্র আছে, কিন্তু তাহা দেখানো হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে ভোগবাসনার পরিতৃপ্তিতে মানুষ অন্তরের তৃপ্তি পায় না, সে তদতিরিক্ত আরও অন্য কিছু চায়; নর-নারীর মিলনের মধ্যে দৈহিক মিলন বাদ দেওয়া যায় না; কিন্তু যাহার মন আছে, হৃদয় আছে, আত্মার ক্ষুধা আছে, সে কখনো কেবলমাত্র দেহ লইয়াই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। সে দেহাতিরিক্ত মিলন চায়, সে মনের হৃদয়ের ও আত্মার পরিচয় পাইয়া আপনার প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণভাবে জানিয়া লইতে চায়। এই নাটিকার মধ্যে ইহাই কবি অতি অসাধারণ নিপুণতা ও কবিত্বের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

নর-নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহার মূলে যৌনপ্রবৃত্তি ও সম্ভোগ-লালসা যে প্রধান এবং সেই সম্ভোগের মধ্যে যে একটি অত্যন্ত নিবিড় আনন্দ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি ইহা স্বীকার করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, সত্য বটে সম্ভোগের মধ্যে আনন্দ আছে; কিন্তু তাহাই দাম্পত্য-জীবনের সবখানি নহে। কেবল দেহ-মাত্রে পর্যবসিত যে মিলন, তাহা অল্প দিনেই অতৃপ্তি ও অবসাদ আনয়ন করে। তখন চিত্ত চায় অন্তরের এবং আত্মার পরিচয় পাইয়া প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় তাহার দেহ মন চিত্ত অন্তর ও আত্মা লইয়া। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে নাটকে বহুবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। দেহ উত্তীর্ণ হইয়া মনোলোকে যে মিলন তাহাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন।

এই নাটিকার আখ্যানবস্তু মহাভারতের অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎ ও মিলন-ব্যাপার। কিন্তু ইহাতে মহাভারতকারের আখ্যান অপেক্ষা নূতন কল্পনাও কবি আশ্রয় করিয়াছেন। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার একমাত্র সন্তান, সেইজন্য পুত্রহীন রাজা কন্যাকে দিয়াই পুত্রের অভাব মোচন করিবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং চিত্রাঙ্গদাকে বাল্যকাল হইতে পুরুষের উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা দিতেছিলেন। এজন্য চিত্রাঙ্গদা বেশে ভূষায় ব্যবহারে পুরুষের অনুরূপ জীবন যাপন করিতেছিলেন, তিনি যে রমণী এই বোধ পর্যন্ত তাঁহার মনে কখনো উদয় হইবার অবসর পাইত না। তিনি আবাল্য বীরকর্ম করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, এইজন্য কাহারও বীরত্বের খ্যাতি শুনিলে তাঁহার ঈর্ষা হইত, সেই বীর অপেক্ষা তিনি কিসে কম এই কথা মনে হইত। কিন্তু অর্জুনের খ্যাতি এমন অসাধারণ ছিল যে বীরত্ব-স্পর্ধিতা চিত্রাঙ্গদা মনে মনে বিস্ময় মানিতেন, আবার অর্জুনের সহিত একবার যুদ্ধ করিয়া তাঁহার খ্যাতি কতখানি পরীক্ষাসহ তাহা যাচাই করিয়া দেখিয়া লইবারও প্রবল বাসনা তাঁহার মনের মধ্যে প্রায়ই উদয় হইত।

আজন্মের বিস্ময় আমার।
বাল্য-দুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য ;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।

কিন্তু অর্জুনকে প্রথমদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার সব স্পর্ধা এক নিমেষে তিরোহিত হইয়া গেল।—

শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে এতদিন
ভুলেছিনু যাহা ; সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল-মূর্তি হেরি',
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

একজন পুরুষের মতন পুরুষকে—পৌরুষসম্পন্ন বীরপুরুষকে দেখিয়া বীরনারী চিত্রাঙ্গদা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং সেই দিনই তাঁহার মনে তাঁহার

নারীভাব আজন্মের সমস্ত পুরুষালির শিক্ষা-দীক্ষা-আচরণকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহা নারীর যৌবনের ধর্ম। নারীর যৌবনাবেগ তাহাকে পুরুষ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলে ; সে কথা যৌবনাবেগরূপী মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলিয়াছিলেন—

সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে ! আমিই চেতন ক'রে দিই
একদিন জীবনের শুভপুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পুরুষবেশ পরিত্যাগ করিলেন, এবং অনভ্যস্ত হস্তে রমণীর বেশভূষা ধারণ করিলেন, সেই প্রসাধন সুশোভন হইল না নিশ্চয়ই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের নায়িকা অরক্ষণীয়া জ্ঞানদা যেমন করিয়া দুর্লভ বরের ও বরপক্ষীয়দের মন ভুলাইবার জন্য নিজেই সাজিতে গিয়া সং সাজিয়াছিল, চিত্রাঙ্গদাও বোধ হয় তেমনি একটা কিছু অদ্ভুত বেশ করিয়া অর্জুনকে ভুলাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফল হইল—অর্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এই প্রত্যাখ্যান চিত্রাঙ্গদার মনে বাজিল। তিনি বুঝিলেন যে—কালিদাস যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অতি সত্য—আকৃতি-বিশেষে আদরঃ পদং করোতি (মালবিকাগ্নিমিত্রম্)। কবি রবীন্দ্রনাথও ইহার পূর্বে মানসী কাব্যের 'গুপ্তপ্রেম' নামক কবিতায় কুরূপার প্রেমের বিড়ম্বনার কথা বলিয়াছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁহার 'বেণু ও বীণা' কাব্যের বহু কবিতায় এবং 'কুহু ও কেকা' কাব্যে 'মদন-মহোৎসব' নামক কবিতার মধ্যে বলিয়াছেন—

চোখের দাবী মিট্‌লে পরে তখন খোঁজে মন,
তাই তো প্রভু ! সবায় আগে রূপের আকিঞ্চন !

নারীর অশিক্ষিত-পটুতার সঙ্গে সাধনা মিলাইয়া চিত্রাঙ্গদা পুরুষ-ভুলানো বেশ-ভূষা ও হাব-ভাব আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ইহাকে কবি অতিপ্রাকৃত করিয়া কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে কুরূপা চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের আরাধনা করিয়া এক বৎসরের জন্য সুরূপ লাভ করিল। কিন্তু এই রূপকের অন্তরালে যে বাস্তবতা আছে, তাহা রূপক ভেদ করিয়াও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। মদন নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

আমি সেই মনসিজ,
নিখিলের নর-নারী-হিয়া টেনে আনি
বেদনা-বন্ধনে।

এবং মদনসখা বসন্ত নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন!

যখন মানুষের যৌবনকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহার মনে যে ভাবের ও আবেগের উৎপত্তি হয় তাহাই তো মনসি-জ, সেই আবেগের আগ্রহেই তো নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়।

সুরূপা চিত্রাঙ্গদা ত্রিভুবনবিজয়ী অর্জুনকে জয় করিলেন, অর্জুন তাঁহার রূপযৌবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। অর্জুনের শৌর্যবীর্য সিংহের ন্যায় যেন সৌন্দর্যময়ী সিংহবাহিনীর চরণ-তলে আত্মদান করিল।

চিত্রাঙ্গদা বীরনারী, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র তাঁহার বীরত্বের মাহাত্ম্যেই তিনি অর্জুনকে মুগ্ধ করিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি পরে শিখিলেন যে, পুরুষ প্রথমে নারীর কোমলতা ও রূপ চাহে; পরে সে অন্য গুণাবলীর দিকে মনোযোগ দিতে পারে। সেইজন্য চিত্রাঙ্গদা বীরের নিকটে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া যৌবনের ক্ষণিক সৌন্দর্যকেই সারথি করিয়া অর্জুন-বিজয়ে যাত্রা করিলেন। ইহার কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

যখন প্রথম
তা'রে দেখিলাম, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত পশিল হৃদয়ে। বড়
ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!

দৈহিক রূপ সত্বর মনোহরণ করে, অন্তরের ঐশ্বর্য দেখাইয়া অনুরাগ আকর্ষণ করিতে বিলম্ব হয়—

আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মাজন্মান্তের ব্রত।

পরিণামে তাঁহার দয়িত তাঁহার সৌন্দর্যের ছদ্মবেশকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার হৃদয়-মাধুর্যের পরিচয় পাইবেন, এইজন্য চিত্রাঙ্গদার নব-নারীজন্মের

সৌন্দর্য-সাধনা। কিন্তু মানুষের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিবার, তাহা অন্তর দিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। প্রেম দেহের জন্য নয়, অন্তরের জন্য। চিত্রাঙ্গদার যে রূপ-যৌবন দেখিয়া অর্জুন ভুলিলেন, তাহা অপেক্ষা চিত্রাঙ্গদার অন্তরের রূপ যে বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এ ধারণা চিত্রাঙ্গদার ছিল। তাই তাঁহার দেহ তাঁহার অন্তরের সপত্নী হইয়া উঠিল—

হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী!

কিন্তু অর্জুন চিত্রাঙ্গদার বাহ্য সৌন্দর্যের ভিতর হইতে তাঁহার আন্তর সৌন্দর্যেরও আভাস পাইতেছিলেন। অর্জুনের বীরচিত্ত চিত্রাঙ্গদার দৈহিক সৌন্দর্যে বন্দী হইয়া প্রেয়সীর পূর্ণনারীত্বের উদার মানসক্ষেত্রে মুক্তিলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতে লাগিল। পুরুষ চায় নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য, স্ত্রী চায় পুরুষের শৌর্যবীর্য; কিন্তু নারীর লজ্জা ও কোমলতার সঙ্গে তেজ বুদ্ধি জ্ঞান না থাকিলে পুরুষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না,— পুরুষ চায় সহধর্মিণী একক্রিয়াসঙ্গিনী। রূপ ক্ষণস্থায়ী, বাহ্য সম্পদ। বীরহৃদয় তদতিরিক্ত আরও কিছু চায়। যদিও অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, "খ্যাতি মিথ্যা, বীর্য মিথ্যা,"

এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।

কিন্তু এই দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা চিত্রাঙ্গদার আন্তর সৌন্দর্য যে আরও সুন্দর, তাহার আভাস তিনি ততই পাইয়াছেন যত চিত্রাঙ্গদাকে নিকটে পাইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তখন চিত্রাঙ্গদার পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য অর্জুনের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। তাই তিনি চিত্রাঙ্গদাকে বলিতেছেন—

তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণ-চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা।

চিত্রাঙ্গদার রূপকে অর্জুন ক্রমশই চিত্রাঙ্গদার অন্তরের সুদৃশ্য যবনিকা বলিয়া

বুঝিতে পারিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার এই যে ঈষৎ পরিচয় তিনি পান, তাহাতেই তিনি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করেন।

এই যে সঙ্গীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্তসমীরে
এ যৌবন-যমুনার পরপার হ'তে,
এই মোর বহুভাগ্য।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদার যৌবনকে যে যমুনার সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুপ্রাসের জন্যই নহে; এই যমুনার তীরে একদিন রাধা-কৃষ্ণের একাগ্র প্রেমলীলা হইয়াছিল এবং শাজাহানের প্রেয়সী-প্রেমের প্রতীক তাজমহল এই যমুনা-তীরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি চিত্রাঙ্গদার যৌবন অতিক্রম করিয়া তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্যের আভাস পাইতেছেন।

অর্জুন চিত্রাঙ্গদার পরিচয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কেবল মাত্র ভোগের পাত্রী করিয়া রাখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না, তিনি চিত্রাঙ্গদাকে সহধর্মিণী-রূপে নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাহাতে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলিলেন—

গৃহে নিয়ে যাবে! বলো না গৃহের কথা!
গৃহ চির-বরষের; নিত্য যাহা থাকে তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো।

ভোগ ক্ষণিকের, প্রেম নিত্য। ভোগের সহিত গার্হস্থ্যধর্মের সামঞ্জস্য হয় না। যাহা ভোগের লালসায় আরম্ভ, তাহাকে সেই ভোগের মধ্যেই শেষ করিয়া চুকাইয়া দেওয়া ভালো, তাহার জন্য আর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের পরিচয় লাভের ব্যগ্রতা ভুলাইবার জন্য যখন বলিলেন—

বাহুবন্ধে
এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চির-পরাজয়ে।

তখন অর্জুন তাহাতে ভুলিলেন না, তাঁহার মন ভোগকে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমকে মঙ্গলের ভিত্তিতে স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল—

ওই শোনো
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিসুখ উঠিল বাজিয়া।

এখন চিত্রাঙ্গদারও আর নিজের ছদ্মবেশে অর্জুনকে প্রতারণা করিয়া

ভুলাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, তিনি আপনার পরিচয় ব্যক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইলেন—

আপনারে
করিব প্রকাশ ; ভাল যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চ'লে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব।

অর্জুনের আগ্রহ দেখিয়া চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মধ্যে—

দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে ; কত দৈন্য আছে ; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা।

অর্জুন সেই দোষে-গুণে-জড়িত সম্পূর্ণ মানুষটিকেই পাইতে চাহেন। যামিনীর নর্ম-সহচরীকে তিনি দিবসের কর্ম-সহচরী-রূপেই পাইতে চাহেন। তখন চিত্রাঙ্গদা আপনার পরিচয় দিলেন,—আমি সেই নারী যাহাকে একদিন তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে।

প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।

* * *

আমি চিত্রাঙ্গদা!
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী!
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে-দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

নারী দেবী নহে, সেও সংসারাসক্ত ভোগলোলুপ জীব; আবার সে কেবল ভোগবিলাসিনী সেবাদাসীও নহে। প্রত্যেক নারীর অন্তরে তাহার পিপাসু আত্মা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে পুণ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতে চায়। আবার—

> ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ,
> তখন প্রকাশ পায় ফল।

নারীর সৌন্দর্য ও রূপবিলাস আবশ্যক পুরুষের মন আকর্ষণ করিবার জন্য, কিন্তু সেই কাজ পূর্ণ হইলে নারীর নারীত্বের পূর্ণ সার্থকতা হয় তাহার মাতৃত্বে। ফুলের সৌন্দর্য লুপ্ত হইয়া যেমন তাহার ফলে পরিণতি ঘটে, তেমনি চিত্রাঙ্গদার দেহের যৌবন ও বাহ্য সৌন্দর্য লোপ পাইলে তিনি বীরমাতা-রূপে পরিণতি লাভ করিয়া নারীমহিমা সার্থক ও পূর্ণ করিলেন।

চিত্রাঙ্গদার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া অর্জুন বলিলেন, "প্রিয়ে আজ ধন্য আমি!" কবি ভারবি বলিয়াছেন যে—'বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুষু'—প্রেমেই গুণ বাস করে, বস্তুর মধ্যে নহে। সেই কথা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের প্রণয়-ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়া গেল।

'চিত্রাঙ্গদা' বাহ্যতঃ পৌরাণিক নাট্যকাব্য হইলেও ইহা গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। ইহাই রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যের আদি। ঘটনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পাত্রপাত্রী নাটকীয় রীতিতে কথাবার্তা বলিলেও ইহার অন্তরালে আছে একটি ভাবতত্ত্ব, নায়ক-নায়িকাগুলি সেই ভাব-তত্ত্বের প্রতীক মাত্র। অর্জুন হইতেছেন একজন আদর্শ শাশ্বত পুরুষ, আর চিত্রাঙ্গদা হইতেছেন একজন আদর্শ চিরন্তনী নারী। নর-নারীর মিলনাকাঙ্ক্ষা ও প্রণয়াদর্শ কেমন হওয়া উচিত বলিয়া কবি মনে করেন, তাহাই ইহাতে তিনি কবিত্ব-কল্পনা-রূপক মিলাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দৈহিক সৌন্দর্য ও যৌবন তো ক্ষণস্থায়ী, তাহাকে অবলম্বন করিয়া নর-নারীর মিলন হইলেও, তদতিরিক্ত স্থায়ী কোনও গুণের বন্ধন না থাকিলে কখনো মিলন সুন্দর ও মঙ্গলকর হয় না।

কবি কীট্‌স্ তাঁহার এণ্ডিমিয়ন কাব্যে দেখাইয়াছেন যে এণ্ডিমিয়ন Moon Goddess বা চন্দ্রদেবীর প্রেমে প্রমত্ত হইয়া বিশ্বভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, মানব-আত্মা দুরায়ত্ত আদর্শের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে। বহু দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের পরে এণ্ডিমিয়নের সহিত যখন ভারত-নারীর (Indian Maid) সাক্ষাৎ ও প্রণয় হইল, তখন তিনি সেই ভারত-নারীর মধ্যেই তাঁহার কল্পনার মানসী প্রেয়সী চন্দ্রদেবীকে দেখিতে পাইলেন।

ইহার দ্বারা কবি কীট্‌স্‌ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে আদর্শকে পাইতে হইলে বিশেষ একটি রূপের কাছেই আগে ধরা দিতে হয়। বিশেষের মধ্যেই অবিশেষ আছেন, রূপের মধ্যেই রূপাতীতের লীলা। প্রকৃত সুখ সেই অবিশেষ সৌন্দর্যের বা রূপাতীতের সহিত মিলনেই পাওয়া যায়, বিশেষ রূপের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে প্রকৃত সুখের স্থান-সঙ্কুলান হয় না।

অর্জুন দৈহিক সম্ভোগের আনন্দ-উল্লাসের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ভোগাতীত দেহাতীত নির্বিশেষ অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের আস্বাদ পাইবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যাহা শাশ্বত সুন্দর তাহাই শাশ্বত কল্যাণ, তাহাই শাশ্বত সত্য।

Beauty is truth, truth Beauty. A thing of beauty is a joy for ever.

—Keats.

মানব-জীবনের যাহা সত্য, প্রেমের যাহা নিত্য সত্য-স্বরূপ, তাহা কবি কেবলমাত্র ভাব-তত্ত্বরূপে প্রকাশ না করিয়া সেই তত্ত্বকে মানব-জীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন। সেইজন্য এই ভাব-তত্ত্বটিকে কেবলমাত্র একটি গীতিকবিতার মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া তিনি ইহাকে নাটকীয় রূপ দিয়াছেন।

এই নাটিকার মধ্যে নাট্যকলা থাকিলেও তাহা গীতধর্মী, ইহা কাব্য। ইহা অতিপ্রাকৃতের আবরণে রোম্যান্সের লক্ষণাক্রান্ত। ইহা কবিত্বময় কল্পনা-কুশল সুললিত বাক্যের মনোরম মালা, ইহা মধুর কান্ত অসামান্য নাট্যকাব্য।

সোনার তরী

য়র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন,—

১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাস হইতে ১৩০০ সালে ত্যহিক জীবনযাত্রা অমৃতময়।
যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, সেইগুলি একত্র নার মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত
সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং প্রথম কবিতার নাম হ জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া,
হইয়াছে 'সোনার তরী'। সোনার তরীতে কবি-প্রা পাওয়া যায়,—একথা রবীন্দ্রনাথ
মধ্যাহ্ন-দীপ্তি বিচ্ছুরিত। সোনার তরীর প্রায় বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কবির
বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশ
গভীর তন্ময়তার সৃষ্টি এই সোনার তরী। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি
রবীন্দ্র-প্রতিভার ঐশ্বর্য-উল্লাস, রহস্যময় সন্ধানপরমোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।...
উদ্‌ঘাটনের নিপুণপ্রকৃতর প্রাবিণতির উচ্চ শি, ...তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই
পুস্তকের র্ণ করিয়া এই সংসারকে বি স্বরিতত্ব প্রব প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে
অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।...... —আত্মচরিত

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসী-নায়ক পৃথিবীর রূপসৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যসাধনের মধ্য দিয়া মুক্তি পাইবার সাধনা করিয়াছিল। কিন্তু ঠিক 'আকাশের চাঁদে'র সাধকের মত, অথবা পরশপাথর-প্রত্যাশী ক্ষেপার মত তাহার ভুল ভাঙিয়া যায় এবং সে আকুলস্বরে বলিয়া উঠে—

> হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায়?
> আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।
> একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে!
> কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া
> আমিও চলিতে চাই উহাদের সাথে!—
> যে পথে তপনশশী আলো ধরে আছে
> সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে-আলো ত্যজিয়া,—
> আপনারি ক্ষুদ্র এ খদ্যোত-আলোকে
> কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।
>
> * * *
>
> পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
> মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
> যত ওড়ে—যত ওড়ে যত ঊর্ধ্বে যায়,
> কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
> অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

কবি যখন তাঁহার 'সোনার তরী' কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, তখনো এইরূপ

দুর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে এবং কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই আনন্দ ও অমৃত উপলব্ধি করার কথা তিনি বলিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রকাব্যের ও রবীন্দ্রকল্পনার একটি অন্যতম বিশেষত্বও বটে।

প্রকৃতির সহিত কবি-আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগের অনুভূতির কথাও 'সোনার তরী' কাব্যে রহিয়াছে। 'সোনার তরী'তে প্রকৃতির সহিত মানুষ একাত্ম হইয়া গিয়াছে। একের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা অন্যের ভাবতত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এ যুগে প্রকৃতি কবির কাছে প্রাণময়ী—প্রকৃতি তাঁহার চোখে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী। কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে সহস্রধার উৎসের মতো মাতা বসুন্ধরার বক্ষ হইতে—

> অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে গান
> শতেক সহস্ররূপে,—গুঞ্জরিছে গান
> শতলক্ষ সুরে,—

'সোনার তরী'র পূর্ববর্তী কাব্য 'মানসী'তে প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে কবির সংশয় ছিল। তাই প্রকৃতিকে কখনও তিনি নিষ্ঠুরা রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন (নিষ্ঠুর সৃষ্টি, সিন্ধুতরঙ্গ), আবার কখনও প্রকৃতিকে মমতাময়ী মহাস্নেহময়ী রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন (অহল্যার প্রতি)। কিন্তু 'সোনার তরী'তে আসিয়া কবির সেই সংশয়ের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির ধারণা এই যুগেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মৃন্ময়ী মাতা বসুন্ধরা চিন্ময়ীরূপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন এই 'সোনার তরী'র যুগ হইতেই। প্রকৃতির সহিত কবির যে আত্মীয়তার বন্ধন, তাহা যে ইহজীবনের নয়, তাহা যে যুগযুগান্তরের, জন্মজন্মান্তরের—সৃষ্টিরও পূর্বের, একথা রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'তে আসিয়া মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত এইরূপ আত্মীয়তা-বন্ধনবোধের নিমিত্তই কবির নিকট তৃণের শিহরণ, কুসুম-মুকুলের ফুটিয়া উঠিবার আনন্দ অতি পরিচিত ও গভীর অর্থভরা। সমুদ্রের তটে বসিলে ঐজন্যই কবি সেই 'আদিজননী সিন্ধু'র আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার ভাষা বুঝিতে পারেন।

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'। এক সময়ে এই কবিতাটির অর্থ-নিরূপণ লইয়া যত বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, এমন আর কাহারও কোনো কবিতা লইয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। সোনার তরী কবিতার অর্থ নানাজনে নানাভাবে করিয়াছেন। এখানে কবির নিজের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল :

বাংলা ১৩১৫ সালের চৈত্র মাসে আমি শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে কবির কাছে আমি বসিযাছিলাম। কথায কথায় আমি 'সোনার তরী'র অর্থ কবিকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন—"মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজেব সমস্ত কৃত-কর্ম কীর্তি সমর্পণ করিতেছে এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্য কালে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা কবিতেছে। কিন্তু যখন মানুষ মহাকালকে অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে লহ করুণা ক'রে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

> ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
> আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'!

মহাকাল মানুষের কর্ম কীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে; কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান্ মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না। হোমার বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস শেক্‌স্‌পীয়ার নেপোলিয়ান আলেকজান্দার প্রতাপসিংহ প্রভৃতির কীর্তিকথা মহাকাল বহন করিয়া লইয়া চলিতেছে, কিন্তু সে সেই সব কীর্তিমান্‌দের রক্ষা করে নাই। যিনি প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বস্ত্রবয়নের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাস রক্ষা করে নাই, কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।"

বোধ হয় এই সন্ধ্যার পরদিন প্রত্যুষেই কবি শান্তিনিকেতন-মন্দিরে উপাসনা করেন এবং ঐ সোনার তরীর কথা লইয়াই উপদেশ দেন। তাহা অনুলিখিত হইলে 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তক-পর্যায়ের সপ্তম ভাগে আমি ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই ব্যাখ্যা কবিকৃত বলিয়া তাহা সমগ্র উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

তরী বোঝাই

"সোনার তরী ব'লে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে

পারে।—মানুষ সমস্ত জীবন ধ'রে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেত্রটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠ্‌ছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হলো—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য-ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই ক'রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ; তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখ্‌বার সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখ্‌বার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান কর্‌ছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ কর্‌ছে রক্ষা কর্‌ছে, কিছুই নষ্ট হ'তে দিচ্ছে না,—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন ক'রে রাখ্‌তে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনো মতেই জমাবার জিনিস নয়।

—৪ঠা চৈত্র, ১৩১৫

কবি যে মহাকালকেই সোনার তরীর নেয়ে বলিয়াছেন তাহার সমর্থন তাঁহার অপর একটি রচনা হইতে পাওয়া যায়।—

গ্রীস ও রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব হইয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

—সঙ্কলন, পূর্ব ও পশ্চিম

কবিকৃত ব্যাখ্যা দুইটি হইতে সোনার তরী কবিতার মর্মার্থ দাঁড়াইতেছে এইরূপ: কবি দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করিয়াছেন। মহাকালের সোনার তরীতে কবির কবিতা-নির্মাল্য অর্পণ করিবার সময় আসিয়াছে। কবি তাঁহার সাধনার সোনার ফসল মহাকালের হাতে সঁপিয়া দিয়া রিক্ত হইয়া বলিলেন,—"এখন আমারে লহ করুণা করে"। কালস্রোত কবির সোনার ধান—কবিতার অর্ঘ্য—নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কবির স্থান সে নৌকায় হইল না। কারণ, কবির ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সোনার তরীর নেয়ে (মহাকাল) কবির সৃষ্টিকে গ্রহণ করিলেন মাত্র। তিনি যেন কবিকে বলিয়া গেলেন,—তোমার জীবনে যাহা তুমি সঞ্চয় করিয়াছ, তাহাই তোমার চরম

সঞ্চয় নয়। তোমার জীবনে আরও অনেক বর্ষা বসন্ত আসিবে, এখনও বহুকাল এই শূন্য নদীর তীরে বসিয়া তোমাকে সোনার ফসল ফলাইতে হইবে।

কাজেই শূন্য নদীর তীরে কবি পড়িয়া রহিলেন।—

শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি'

কবির বক্ষ ভেদ করিয়া তখন কেবল একটি বেদনার রাগিণী ধ্বনিত হইল—

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

'সোনার তরী' কবিতার প্রাণই এই করুণরসে, কবির হৃদয়োত্থিত ঐ গভীর বেদনায়!

এই কবিতায় সঞ্চিত ধান তরীতে বোঝাই করিবার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবিজীবনের একটি সাময়িক বিষাদকরুণ মানসচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছে। কবি যেখানে তাঁহার কবিকর্মের ছেদ টানিতে চাহেন, কবির কাব্যপ্রেরণাদাত্রী সেইখানে তাঁহাকে দাঁড়ি টানিতে দেন না; আরও বহুতর ও মহার্ঘতর ফসল ফলাইবার জন্য কবিকে কর্মক্ষেত্রে প্রতীক্ষারত রাখিয়া চলিয়া যান। তাই বেদনার মধ্যেও আশ্বাসের একটি ব্যঞ্জনার আভাসও এই কবিতায় পাওয়া গিয়াছে।

কবিতাটির মধ্যে ভরা বর্ষার ছবি ও গতি সুস্পষ্ট হইয়া আছে।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

এবং

শ্রাবণ-গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে-ফিরে,

ইত্যাদি বর্ণনা বর্ষাদৃশ্যকে আমাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যেদিন ভরা বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোতা পদ্মার উপর দিয়া কাঁচা ধানে বোঝাই নৌকায় চাষীরা পারাপার করিতেছিল, সেই দিনেই 'সোনার তরী' কবিতার সঞ্চার হইয়াছিল কবির মনে। কিন্তু কবিতাটির রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৮। ভরা বসন্তে, ভরা বর্ষার কথা—শ্রাবণ-গগনের মেঘরাজির কথা স্মরণ করিয়া কবি যে কবিতা লিখিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা অপরূপ সৃষ্টি। কবি তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—সোনার তরী কবিতাটি সেই জাতের কবিতা "যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে

নিয়ে।"* এই কবিতার সহিত জড়িত রহিয়াছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। একবার পত্রদ্বারা কবির কাছে তাঁহারই লেখা কয়েকটি কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি সোনার তরীর প্রসঙ্গে লেখেন,—

ছিলাম তখন পদ্মায় বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ব'য়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচাধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু-হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।......ভরা-পদ্মার উপরকার ঐ বাদল-দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

পরশ পাথর

(১৯-এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)

মানুষের আকাঙ্ক্ষা এমন কিছু চায় যাহা চরম সম্পদ্, যাহা সব কিছুকেই সোনা করে, যাহা লাভ হইলে আর খুচরা বিত্ত খুঁজিবার দরকার হয় না; যাহা পাইলে সবই সুখের হইবে, টুকরা টুকরা সুখ আর চাহিতে হইবে না। বণিক চায় ধন, রাজা চায় রাজ্য, কীর্তিমান্ চায় যশ; ক্ষেপা চায় সব-চেয়ে বড় বস্তু, যাহা পাইলে সকলের সকল আকাঙ্ক্ষার ধন তাহার পাওয়া হইয়া যাইবে। এই অসাধারণ আকাঙ্ক্ষা যাহার, সেই তো ক্ষেপা।

কতকগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড দস্তুর-বাঁধা কাজের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনই তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগে একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা অহংবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখন তাকে বলে পাগলামি।

—ছিন্নপত্র, কলিকাতা ২৪।৪।১৮৯৫।

ক্ষেপা চায় শ্রেষ্ঠ আনন্দ, তাহার সাধনা—ভূমাকে সে পাইবে; সে "একেবারে পেতে চায় পরশ পাথর"। কারণ ভূমানন্দের মধ্যে সকল আনন্দই পাওয়া যায়। সেই ভূমানন্দের সন্ধানে ক্ষেপার যাত্রা।

* লেখকের নিকট কবির লিখিত একখানি পত্রের অংশ। পত্রখানি এইরূপ: চারু, এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয়, বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়ত অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার 'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা

ভূমাকে পাইবার উপায়স্বরূপ কেহ প্রেম বিতরণ করে, কেহ তত্ত্ব আলোচনা করে, কেহ বা কৃচ্ছ্রসাধন করে। কিন্তু সেই ভূমা অতি সামান্যরূপে সামান্য উপলক্ষে জীবনে আসিয়া কখন যে কাহার জীবন সোনা করিয়া দিয়া যায়, তাহা অনেক সময়ে আগে টেরই পাওয়া যায় না। তাহাকে হারাইয়া হায় হায় করিতে করিতে মনে হয়— যাহা পরশ-পাথর তাহাকে আমি অবহেলা করিয়াছি!

অনেক সময়ে অন্তরে পরশ-পাথরের স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারা যায় তখনই যখন তাহাকে হারানো যায়।—

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্য মনে;
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই,
সে যে রইলো সঙ্গোপনে!

—গীতিমাল্য, ১৭ সংখ্যক গান

জীবনের বা প্রেমের অতি সামান্য ঘটনাকে যখন স্মৃতির মধ্যে ফিরিয়া দেখি, তখন দেখি সেদিন যাহাকে সামান্য বিবেচনা করিয়াছিলাম, আজ তাহা আমার জীবনে সোনা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই সোনা-করা পরম সুযোগ ও পরম ক্ষণ এখন আয়ত্তাতীত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। তুলনীয়—

চ'লে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।—লিপিকা, পরীর পরিচয়।

মানুষ অভ্যাস ও সংস্কারের দাস; সে মণি হাতে পাইয়াও চিনে না, তাহার দিকে লক্ষ্যই করে না। কিন্তু সেই মণি হারাইয়া তবে তাহার হুঁশ হয়, তখন ব্যর্থ সাধনরাশি পথে ফেলিয়া আবার বাকী জীবনটা অতিক্রান্ত পথেই অপচয় করিতে হয়।

সৌন্দর্যের মহত্ত্বের দেবত্বের সম্পদ্ জীবনের নানা শুভ মুহূর্তে একটি চিরপরিচিত অথচ অজানা সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইতেছে, পরশ-পাথর নানা শুভমুহূর্ত পাইয়া আমাদের চিত্তকে নানা দিক্ হইতে স্পর্শ করিতেছে। সেই স্পর্শলাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে জীবন ব্যর্থ হইবেই। তুলনীয় কবিবরের 'ডাকঘর' নাটিকা। রাজার চিঠি

বাহুল্য এটা শেষ জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত কিছু। যেমন 'সোনার তরী' কবিতাটি।—

নিত্য-নিরন্তর ক্রমাগতই আসিতেছে, তাহা বোধ করিবার মতন চেতনা পাইলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় ; অমলের কাছে রাজার সাদা চিঠির যে কী মর্ম তাহা মরমী ঠাকুরদাদা বুঝিতে পারেন, কিন্তু মোড়ল তাহাতে কিছুই লেখা নাই মনে করিয়া উপহাস করে।

ক্ষেপা চায় পরশ পাথর, বিশ্বের আর কোনো সুখ মান যশ ঐশ্বর্য তাহার কাম্য নয়। আত্মতৃপ্তি অথবা দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জাগতিক বস্তুরাশি ক্ষেপাকে প্রলুব্ধ করে না, সে সবই হেলাভরে পদদলিত করিয়া তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিতের উদ্দেশে ছুটিয়াছে—বিরাম-বিশ্রাম-বিহীন তাহার নিরন্তর যাত্রা। ক্ষেপার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা যে সে বুঝিতেই পারিতেছে না, যাহার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া দিনের পর দিন কেবলই সে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে লাভ করিবার মতো শক্তি তাহার আছে কি না! তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাহার জীবন মন সব ভরিয়া আছে। সে চায় জগতের সেই মূল সত্যকে, সেই মহানিয়মকে —যাহাকে ধরিতে পারিলে এই বিশ্বের সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এবং সকল বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়া একটি একত্ববোধের আনন্দ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। এই বিশাল বিশ্বের সকল সৃষ্টির মূলে যে একটি সুরের মূর্ছনা বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই শুনিয়া শিখিয়া লইবার জন্য এই জ্ঞানযোগীর সাধনা। সে জগতের মূলতত্ত্বের জ্ঞানান্বেষণে ব্যাকুল। বহু দিনের কঠোর সাধনার পরে যখন সে জানিতে পারে, তাহার সেই ঈপ্সিত তত্ত্ব তাহার অজ্ঞাতে মুহূর্তের জন্য তাহার কাছে ধরা দিয়াছিল এবং তাহার অসাবধানতায় তাহা আবার হারাইয়া গিয়াছে, তখনও তাহার সন্ধানের বিরাম হয় না। জীবনের অবশিষ্ট যে অংশ এখনও পড়িয়া আছে, তাহাই সে ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হয় হারানিধিকে ধরিবার আশায়।

এমনি করিয়া মানুষ যুগে যুগে সকল দেশে পরশ-পাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে —সেই পরশ-পাথরের সন্ধান এখনও মিলে নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত বড় তাহার ক্ষমতা তত বড় নহে—বিশ্বের অস্তিত্বের অন্তরালে এই মর্মান্তিক ব্যথার নদী চিরবহমান। তথাপি মানবজীবনে তপস্যারও বিরাম নাই।

সংসারের নানা বিচিত্রতার মধ্যে যে একটি সত্য বিরাজমান, সেই বিচিত্রতার মধ্যেকার ঐক্যকে আবিষ্কার করিতে চায় ক্ষেপা।

১ম স্তবক।—ক্ষেপা পরশ-পাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহার দৈহিক সৌন্দর্য ও বিলাসের দিকে লক্ষ্য নাই,—বৈষয়িকতার দিকে লোভ নাই,

তপস্যার কষ্টে তাহার দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেদিকেও তাহার দৃক্‌পাত নাই। তাহার অন্তরের মধ্যে সত্য-সন্ধানের ও সত্য-দর্শনের যে অদম্য আগ্রহ দিবারাত্র জাগিতেছে, তাহা সে বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহার চক্ষুর দৃষ্টি হইতে সদাই তাহার অন্তরের দাহ প্রকাশ পাইতেছে এবং সে নিজের অন্তরের আলোক দিয়া তাহার সাধনার ধনকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সে সংসারে অনাসক্ত, সে নিজের সাধনায় নিঃসঙ্গ একাকী, কেহ তাহার সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে না, কেহ তাহার সাধনার প্রতি সহানুভূতিও প্রদর্শন করে না। সে অর্থ সম্পদ্ মান যশ কিছু চাহে না, সে চাহে কেবল তাহার উদ্দিষ্ট সত্যটিকে ধরিতে। জগতের ও জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতি সে একেবারেই উদাসীন। তাই লোকে তাহাকে ক্ষেপা বলে।

২য় স্তবক।—জগতের অসীম রহস্য-সমুদ্র নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে, এবং তাহা আপন অন্তর্নিহিত সত্যকে নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, কারণ সেই তো কেবল জানে যে ক্ষেপার 'আজন্ম-সাধন-ধন' কোথায় তাহার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আছে। সেই ইঙ্গিত-ভাষা যে বুঝিতে পারে, সে সত্যকেও আবিষ্কার করিতে পারে,—ক্ষেপা কিন্তু সেই ইঙ্গিত বুঝিবার চেষ্টা বা সাধনা করিল না। পৃথিবীতে কত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই ক্ষেপার, সে কেবল পরশ-পাথরের সন্ধানেই রত।

৩য় স্তবক।—সৃষ্টির অতি আদিম যুগেই মানুষের জ্ঞান-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ জগতের সত্য-সিন্ধুর অনন্ত রহস্য মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং কত দুশ্চর তপস্যার ফলে, কত দুঃসহ দুঃখক্লেশ সহ্য করিবার পরে, সফলতা-লক্ষ্মীর অতুল সুন্দর আবির্ভাব ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। সেই সত্য-সিন্ধুর তীরেই ক্ষেপা আবার নূতন করিয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের গুপ্ত-মাণিক পরশ-পাথর খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

৪র্থ স্তবক।—সত্যানুসন্ধানে রত ক্ষ্যাপা কত কত পরিবীক্ষণ করিতেছে, তথাপি তাহার সফলতার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিতেছে না, সফলতার আশাও সুদূর-পরাহত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহার

আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।

বিরহী বিহঙ্গ যেমন আপনার প্রার্থিত দয়িতাকে সারানিশি ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হয়, এবং প্রিয়তমার দেখা না পাইলেও আশাহীন হইয়াও সে

শ্রান্তিহীন ভাবে ক্রমাগত ডাকিয়াই চলে; সমুদ্র যেমন কোন্ অজানা অচেনা অনায়ত্ত কাহাকে পাইবার জন্য সহস্র বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিরন্তর হাহাকার করে; অসীম আকাশে বিশ্বচরাচর গ্রহতারা লইয়া নিত্য-নিরন্তর প্রচণ্ড বেগে কাহাকে ধরিবার জন্য যেমন উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,

সেইমতো সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

৫ম স্তবক।—একদিন অকস্মাৎ ক্ষেপা দেখিতে পাইল যে, তাহার কোমরের লোহার শিকল সোনা হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষেপার নিকটে সত্য যে কখন প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা সে অন্যমনস্কতা-বশতঃ ধরিতেই পারে নাই। সে অভ্যাস ও সংস্কারের দাস হইয়া মণি হাতে পাইয়াও মণি চিনিতে পারে নাই বলিয়া—

পাগলের মতো চায়, কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা!

৬ষ্ঠ স্তবক।—ক্ষেপার জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহার জীবন-তপন মলিন হইয়া অস্তে যাইতে বসিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহার মনের আকাশ হইতে আশার রং একেবারে মুছিয়া যায় নাই, তখনো সে সোনার স্বপন দেখিতেছে। তাই

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন!

ক্ষেপা সন্ন্যাসী তাহার হারানো রত্নের সন্ধানে ফিরিয়া যাত্রা করিল। কিন্তু তাহার সেই যৌবনের উদ্যম ও শক্তি এখন আর নাই, তাহার মনের বিশ্বাস সে হারাইয়াছে, তথাপি—

বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

সমালোচক কুমুদনাথ দাস এই কবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়াছেন—

অসীম অনন্ত পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবার বাসনা ক্ষেপার পরশ-পাথর পাইবার বাসনা। সংসারের সব-কিছুকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বৈরাগ্য-চিন্তার দ্বারা ভগবানের সত্তার ক্ষণিক আভাস মনের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য জীবন্মৃত হইয়া সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। তাহা অপেক্ষা নিজের পরিবারের সমাজের দেশের বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তাহার আবির্ভাব অনুভব করিলে আনন্দময়কে অধিক আত্মীয়রূপে পাওয়া যায়।

তুলনীয় : কবির প্রসিদ্ধ কবিতা—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'।

অতি ক্ষুদ্র সামান্যের মধ্যেও যে বিপুল বিরাটের মহারহস্য নিহিত আছে, ক্ষেপা সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনের যে একটি আনন্দময় দিক আছে সে বিষয়ে ক্ষেপা ছিল উদাসীন। তাই সে একটা অধরা আদর্শের পিছনে ছুটিয়াছিল। নিজেকে জীবনের সহজ দুর্লভ ছোটখাট আনন্দগুলি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই ক্ষেপা, জীবনটা অতিক্রম করিয়া, একটা অলৌকিক আদর্শের সাধনায় ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া জীবনের শেষে হঠাৎ একদিন পৃথিবীর দিকে চাহিয়া তাহার ভুল বুঝিতে পারিল। জীবন কত সুন্দর, কিন্তু চলিয়া গেলে তাহা কত দুর্লভ! সীমার ভিতর দিয়া ক্ষেপার কাছে তাহার কাঙ্ক্ষিত অসীমের স্পর্শ আসিয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসের জড়তায় সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। জীবনের সাধনা যে সন্ন্যাসের সাধনা নয়, তাহা সে বুঝে নাই। তাই তাহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে ব্যর্থতা।

কবিতাটিতে জীবনকে অতিক্রম করিয়া নিরুদ্দেশ আদর্শ সন্ধানের ব্যর্থতা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব-কবিতা

(১৮ আষাঢ়, ১২৯৯)

বৈষ্ণব-কবিতা আমাদের মনকে যে এত মুগ্ধ করে তাহার কারণ ইহা নহে যে তাহার মধ্যে দেব-দেবীর অপার্থিব প্রণয়ের চিত্র আছে, পরন্তু তাহার মধ্যে এই মর্ত্যের মানবীয় প্রণয়ের নানা লীলা সুন্দরভাবে দেবতার বেনামীতে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের কবি স্বর্গ ও দেবতাকে মর্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, তিনি মর্ত্যে অবতীর্ণ স্বর্গকে ও মানবীয় ভাবের মধ্যে পরিস্ফুট দেব-ভাবকে কল্পিত স্বর্গ ও দেবতা অপেক্ষা অধিক সমাদর করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন যে মানবের সব স্নেহ-প্রেম রহস্যময়েরই পূজা—'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের মধ্যে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত সৃজনী ও পালনী শক্তির আবির্ভাব। যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে, সেই আনন্দের ক্ষণিক ও আংশিক উপলব্ধি হয় পার্থিব মানবীয় প্রেমে। বাস্তব প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত আছে, প্রেমকে বাস্তবক্ষেত্র

হইতে সরাইয়া অপ্রাকৃতের মধ্যে স্থাপন করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে, এবং তাহার মধ্যে চিরন্তন হৃদয়ের লীলা হইতেছে। এইজন্য বৈষ্ণব-কবি বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নর-বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

—চৈতন্যচরিতামৃত, ২১ পরিচ্ছেদ

কবি মিল্‌টন কল্পনা করিয়াছিলেন যে সোনার শিকল দিয়া মর্ত্য স্বর্গের সঙ্গে বাঁধা আছে। আমাদের কবিও স্বর্গকে মর্ত্যের সঙ্গে বাঁধিয়াছেন এবং সোনার শিকল দিয়াই বাঁধিয়াছেন। মানুষ ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করিতে পারে আপনার প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া। আমরা মানব হইয়া মানবের মধ্যে জন্মিয়াছি, মানবের মধ্য দিয়াই পরমের পরিচয় পাওয়া ছাড়া আমাদের আর অন্য উপায় নাই। একথা রবীন্দ্রনাথ 'বৈষ্ণব কবিতা'য় বলিয়াছেন এবং এই কথাই অন্যত্র বলিয়াছেন—

বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎটাকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে-ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়। —পঞ্চভূত

বাস্তবিক মনোজগৎ তো বিকশিত হয় বহির্জগৎটাকে আশ্রয় করিয়া— বস্তববধীনা ভবেদ্‌ বিদ্যা—মানুষের প্রত্যেক জ্ঞান বস্তুর অভিজ্ঞতার অধীন। ইহাই সহজিয়া সাধনার মূল তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

অর্থাৎ—

যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে

যা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই-সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।

—পঞ্চভূত, মনুষ্য

ওয়েল্‌স্‌ দেশের কবি ডেভিড্‌ অফ্‌ গুইলিম্‌ (Dafydd of Gwilym) রমণীর প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন দেখিয়া এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে রমণী-প্রেমের মধ্যে কি বিপদ্‌ লুক্কায়িত হইয়া আছে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তখন কবি সেই রমণী-প্রেমের বিভীষিকাগ্রস্ত সন্ন্যাসীকে জবাব দেন যে—কবি মূর্তিমতী বসন্তসুষমাময়ী প্রণয়িনীর সাহচর্যে তরুকুঞ্জের ভিতরে স্বর্গের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং পরে তিনি ধর্মভীরু সন্ন্যাসীকে সেই স্বর্গীয় আনন্দ আস্বাদ করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া বলেন—

"Come with me to the birch-tree church, to share in the piety of the cuckoo amid the leaves, where we with none to intrude on us shall attain heaven in the green grove."

তুলনীয়—

'Love is heaven and heaven is love'; so sings the bird.
—Byron, *Don Juan*, Canto XII, 13.

"God be thanked, the meanest of his creatures
Boasts two soul-sides one to face the world with,
One to show a woman when he loves her."
—Robert Browning.

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তকে (৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই কবিতার মধ্যে ফরাসী দার্শনিক কোম্‌তের মানবতা-পূজার প্রভাব দেখিয়াছেন।

দুই পাখী

(১৯-এ আষাঢ়, ১২৯৯)

রবীন্দ্রকাব্যের মর্মকথা যদি একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করিতে হয় ত' বলিতে হয় যে, সীমার সহিত অসীমের মিলনসাধনই রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর। সোনার তরীর 'দুই পাখী' কবিতায় সেই সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে। আপনার দিক্ হইতে বিশ্বের দিকে পরিপূর্ণ অনুভূতি লইয়া যাত্রার আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে 'দুই পাখী' কবিতায়। বিশ্বপ্রকৃতি মুক্ত, জীব বদ্ধ; এই দুইয়ের মিলন বাধাগ্রস্ত; বাধাগ্রস্ত বলিয়াই পরস্পরের প্রতি উভয়ের প্রেমের আকর্ষণ প্রবল। সীমা ও অসীম মিলনের জন্য সদা ব্যাকুল, অপরকে নহিলে তাহাদের কাহারও সত্তাই থাকে না। সীমাবদ্ধ জীব মাত্রেই মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত রূপ রস বর্ণ গন্ধ গান আস্বাদন করিয়া অপরূপের সংস্পর্শ লাভ করিতে চাহে।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুল ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর-একজন শত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী, আর-একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখীটাই বেশী গান গাহিয়া থাকে; কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

—আধুনিক সাহিত্য

বাড়ীর বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ীর ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশী যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকোর দিয়া এদিক্-ওদিক্ হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই; দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।

—জীবনস্মৃতি

বাউলের গান আছে—

> খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়।
> ধর্‌তে পার্‌লে মনোবেড়ী দিতাম পাখীর পায়॥

—গোরা

মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখীর বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না।

এই কবিতায় শ্রেয় ও প্রেয় সম্বন্ধে উপনিষদের যে ধারণা আছে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে, এমন কথা তত্ত্বপ্রিয় লোককে বলিতে শোনা যায়। দুই পাখী হইতেছে দুই শ্রেণীর মানুষ—এক যাহারা সাংসারিক বৈষয়িকতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাহারা সমস্ত আসক্তি হইতে মুক্ত বুদ্ধ বৈরাগী।

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োর একঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
> সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
> জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যম্ ঈশম্ অস্য মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।১,২

সর্বদা একসঙ্গযুক্ত ও পরস্পর-সখ্যভাবপ্রাপ্ত দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। মানব একই শরীররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া দৈন্য-বশত মুহ্যমান হয় ও শোক করে; কিন্তু সে যখন আপনা হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ শোক-দুঃখাদির অতীত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখন হইতেই বিগতশোক হয় (এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র-প্রবন্ধের 'মন্দির' রচনায় দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলার ও কবি মানসের এই একটি বড় লক্ষণ যে, তিনি বিশ্বজগতের নানা বিচিত্র রূপ-রসের সহিত একই কালে যুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকিতে চাহেন। তাই তাঁহার প্রার্থনা—

> যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
> মুক্ত করো হে বন্ধ।

—গান

আকাশের চাঁদ

(২২-এ আষাঢ়, ১২৯৯)

দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া এমন সুন্দর সোনা-ফলানো মানব-জীবনকে অবহেলা করা ও পণ্ড করার প্রতিবাদ এই কবিতা। এই বিচিত্র শোভা-সম্পদে পূর্ণ পৃথিবীর আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাহারা পরলোকের অজ্ঞাত সুখের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে, তাহাদের নিষ্ফল জীবনের চিত্র এই কবিতাটি।

যেতে নাহি দিব

(১৪-ই কার্ত্তিক, ১২৯৯)

জগতেব সবই চলিষ্ণু—মৃত্যু-অভিমুখ। কিন্তু পৃথিবীব সমস্ত সৌন্দর্য ক্ষণিক, এবং স্নেহ-প্রেমের সমস্ত সম্পর্ক অনিত্য বলিযাই কবির কাছে তাহা পরম রহস্যময় ও আশ্চর্য। সব স্নেহ প্রেম রহস্যময়ের পূজা—'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'। ভালোবাসা মাত্রেই আমাদের মধ্যে বিশ্ব-জগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব। যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে, সেই আনন্দের ক্ষণিক ও আংশিক উপলব্ধি হয় পাথিব প্রেমে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সমস্ত পদার্থেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে—এই বোধটি কবির মনে সামান্য উপলক্ষে জাগ্রত হইয়াছে। পৃথিবীতে মৃত্যু সব হরণ করে, তথাপি চিরজীবী প্রেম পরাভব মানিতে চাহে না—এই মহৎ তত্ত্বটি কবি অতি সামান্য ঘটনার ভিতর হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। কবি অনুভব করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত মানবীয় সম্পর্ককে মৃত্যু নির্মম ভাবে ছিন্ন করিয়া দেয়, তথাপি প্রেম পরাভব মানিতে চাহে না, প্রেম মৃত্যুকে অস্বীকার করে, সে প্রিয়জনকে নিজের স্মৃতিব মধ্যে চিরজীবী করিয়া রাখিতে চায়। নিষ্ঠুর সৃষ্টি এবং অমোঘ জগদ্‌বিধানের সঙ্গে কোমল প্রাণময় স্নেহপ্রেমের দ্বন্দ্ব অপরূপ কৌশলে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতার যিনি বক্তা তাঁহার কন্যাটি যেন পৃথিবীরই প্রতিনিধি, পৃথিবীর স্নেহ-মমতার প্রতিচ্ছবি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন সামান্য একটি ফুলকে গভীর ও করুণ চিন্তার কারণ বলিযা মনে করিয়াছিলেন, আমাদের কবিও তেমনি একটি অতি সাধারণ বিদায়ের দৃশ্যের ভিতর হইতে জগতের একটি চিরন্তন বেদনার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করিযা দেখাইয়াছেন। জর্জ এলিয়ট্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিদায়-দৃশ্যের

মধ্যে মৃত্যুর একটি ছায়াপাত হয়। সেইরূপ আমাদের কবি কন্যার নিকটে পিতার বিদায় চাওয়ার মধ্যে একটি চিরন্তন ব্যাপারের সন্ধান আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। এই কবিতার মধ্যে গৃহস্থালীর বর্ণনা, পারিবারিক বিচ্ছেদের করুণ দৃশ্য এবং গভীর দার্শনিকতা অতি অপূর্ব সুন্দর সুসঙ্গত ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সকলের মিশ্রণে কবিতাটি কবির একটি অসামান্য উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে।

কবিতাটির আরম্ভই হইয়াছে বিদায়ের সূচনা করিয়া—'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।' বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি যখন মধ্যাহ্নবিশ্রামে মগ্ন, তখন বিদেশযাত্রীর বাড়ীতে বিদায়ের আয়োজনে সকলের ব্যস্ততা দিয়া কবিতার আরম্ভ বিপরীতত্বে বড়ই করুণ হইয়াছে। কবি বিদেশযাত্রীর গৃহিণীর মমতার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা রঙ্গপূর্ণ হইলেও সেই হাস্যের মধ্যে অশ্রু সংগুপ্ত হইয়া আছে। আসন্ন বিচ্ছেদ-কাতরা গৃহিণী যে স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত খুঁটিনাটি বস্তু সঙ্গে দিতেছেন, তাহার বর্ণনা যে এমন মনোহর হইয়াছে, তাহার কারণ ইহা কবির নিজের অভিজ্ঞতারই চিত্র। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ কবির বন্ধু সার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কবির কাছে একখানি পত্রের মধ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উপস্থাপিত করিতেছি—

বন্ধু তুমি যাত্রাকালে ব্রাহ্মণীর গাঁটরী-বোঁচকা ইত্যাদির কথা লইয়া পরিহাস করো……—৪ঠা এপ্রিল, ১৯০২। প্রবাসী, ১৩৩৩ কার্ত্তিক, ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চারি বৎসরের কন্যা (কবির নিজের কন্যা) যেন অবুঝ মানব, সে প্রতি পদে নিয়তির বিধানে কত কিছু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়, তথাপি সে ক্রমাগত বলে 'যেতে নাহি দিব'। জীবনের অনিত্যতা ও নিয়তির অমোঘতা ইহার অপেক্ষা আর কিছুতে এমন সুন্দর ও স্পষ্ট করিয়া দেখানো যাইত না।

এ কবিতায় প্রকৃতিকে কবি মাতৃভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ধরিত্রী-মাতার অসীম সৌন্দর্য ও বিপুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার দুঃখের অন্ত নাই; তিনি সন্তানের অনন্ত ক্ষুধা মিটাইতে পারেন না, সন্তানকে কাছে ধরিয়া রাখিতে পারেন এমন সামর্থ্য তাঁহার নাই। অনিশ্চয়তাই মাতাকে অধিকতর স্নেহশীলা ও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। স্নেহের ধনকে হারাইবার আশঙ্কায় তিনি সদা সন্ত্রস্ত—'হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।' এইখানেই ধরিত্রীর যত ব্যথা যত শঙ্কা যত কাতরতা। কখনো কখনো স্নেহের গভীরতায় মাতা এই অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের কথা ভুলিয়া থাকেন; কিন্তু যখন সন্তানকে

হারান তখন তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসে। সন্তানকে বিদায় দিয়া শোকাকুলা বসুন্ধরা এলোচুলে জাহ্নবীর কূলে শ্মশানে ম্লান নির্বাক্ মুখে বসিয়া থাকেন, আর ভাবেন—

> 'দিব না দিব না যেতে'—ডাকিতে ডাকিতে
> হু হু ক'রে তীব্রবেগে চ'লে যায় সবে
> পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।

এর—পৃথিবীর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে হচ্ছে—'আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি না; আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারি না; জন্ম দিই—মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনে।

—ছিন্নপত্র (কালীগ্রাম, জানুয়ারি, ১৮৯১)

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বঙ্গদর্শনে এই কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য—কাব্যের উপভোগ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বঙ্গদর্শন, ১৩১৪, মাঘ, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)।

সমুদ্রের প্রতি

(১১-ই চৈত্র, ১২৯৯)

সোনার তরীর প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় কবির একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বপ্রকৃতি' ও 'বিশ্বমানবে'র মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা এই যুগে কবির মধ্যে বিশেষভাবে জাগিয়াছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি জল-স্থল-আকাশের সহিত কবির একাত্মতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সোনার তরী কাব্যের এই কবিতায় এবং 'বসুন্ধরা'য় কবি রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের যে বিচিত্র স্মৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির কোলে জন্মলাভের যে অনুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্য কবির অনুভূতিতে সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। কবি এই কবিতায় বুদ্ধি অপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টিতে বেশী আস্থাবান্ এবং অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তিনি সত্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

কবিতাটির মধ্যে কবি বলিতে চাহিয়াছেন:—আমাদের এই জীবনের যাত্রা-আরম্ভ তো আজিকার নয়। ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার সৃষ্টিও অনাদি অনন্ত, জীবনও এক অনন্ত অনাদি প্রবাহ। কবি অন্যত্রও বলিয়াছেন—

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

সেই আদি কাল কি অল্প কাল?—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজ্‌কে নয়, আজ্‌কে নয়। —গীতাঞ্জলি

তাই বলাকার উড়িয়া চলা দেখিয়া কবির—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে,
প্রাণ হ'তে প্রাণে।

মানবের জীবনযাত্রা পৃথিবী-সৃষ্টিরও পূর্বে সৃষ্টি-সম্ভাবনার ভিতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রাণই জড়জগতে স্পন্দিত হইয়াছিল, উদ্ভিদ্-জগতে ও প্রাণি-জগতেও এই প্রাণই নানা বিকাশের স্তরে স্তরে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাই তৃণের শিহরণ, কুসুম-মুকুলের ফুটিবার আনন্দ, সমুদ্রের কলরোল মানবের কাছে এত পরিচিত, এত অর্থভরা বলিয়া বোধ হয়। ইহাই অনুভব করিয়া কবি কয়েকখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়্‌ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর-বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে প'ড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে এবং নারকেল-গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপ্‌চে! এই পৃথিবীর উপর আমার একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে ·। —ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ২০-এ আগস্ট, ১৮৯২

এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে কর্‌তে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র-স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা কর্‌ছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে

কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম। তখন জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলচে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হতো। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠ্‌ত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ কর্‌ত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বস্‌লেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। —ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ৯-ই ডিসেম্বর, ১৮৯২

এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হ'তে থাক্‌ত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুন্‌লে তা যেন বোঝা যায়।...

—ছিন্নপত্র, কলিকাতা, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৩

এইজন্য কবি সমুদ্রকে 'আদিজননী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সমুদ্রের প্রতি মানবের প্রীতির মূলে যে তাহার আদিজন্মের নাড়ীর টান আছে, তাহার দার্শনিক তত্ত্ব কবিতাটিকে অতুলনীয় ও চমৎকার করিয়াছে। প্রকৃতিপরিচয়ের গভীরতাও এই কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটিতে সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রবাহ-তুল্য গভীর দীর্ঘপদী পয়ার ছন্দ, কল্পনা ও উপমার মাধুর্য কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবি সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গভঙ্গকে বিশ্বপ্রকৃতির স্নেহব্যাকুলতা ও অজানা বেদনার বাহ্য প্রকাশ বলিয়াছেন। সমুদ্রের গর্জনও প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কাছে অর্থহীন নহে, তাহাও তিনি পরমাত্মীয় বোবার ইঙ্গিত-ভাষার মতন বুঝিতে পারেন।

এই কবিতাটির সহিত বহু বর্ষ পরে লিখিত 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'সমুদ্র' কবিতাটি তুলনীয়।

এই ভাবের আভাস আমরা আরো অনেক কবির রচনায় পাই। তুলনীয়—

"Water, first of singers, o'er rocky mount and mead,
First of earthly singers, the sun-loved rill,
Sang of Him, and flooded the ripples on the reed,
Seeking whom to waken, and what ear to fill.

—George Meredith.

* * * *

The eternal sea,
Which, like childless mother, still must croon
Her ancient sorrows to the cold white moon,
Or, ebbing tremulously,
With one pale arm where the long foam-fringe gleams,
Will gather her rustling garments, for a space
Of muffled weeping, round her dim white face.

—Alfred Noyes, *The Haunted Palace.*

* * * *

Such as creation's dawn beheld, thou rollest now . .
The imag of eternity, the throne of the invisible.

—Lord Byron, *Childe Harold*

টেনিসন যেমন বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কবিতায় স্থান দিয়া গিয়াছেন, আমাদের কবিও তেমনি বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই কবিতার মধ্যে কবি বলিতেছেন যে আমাদের এই শরীর-ধারণের বহু বহু পূর্ব কাল হইতেই তাহার উপকরণ বিভিন্ন আকারে প্রকৃতির কারণ-সমুদ্রের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। জাতিস্মর কবি এখন সেই পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতেছেন। এই কবিতায় প্লেটোর জীবন-স্মৃতি-মতবাদ, নিও-প্লেটোনিক মতবাদ—জড়ে আত্মার অস্তিত্ব, এবং জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর একাত্মতা-মতবাদ (Plato-র Doctrine of Reminiscences; Neo-Platonic মতবাদ—Doctrine of a Soul in inanimate objects, Schelling-এর Doctrine of Identity), যেন একত্র মিশ্রিত হইয়া কবিত্বে মণ্ডিত হইয়াছে।

মানস-সুন্দরী

(৪-ঠা পৌষ, ১২৯৯)

এই কবিতার মধ্যে কবি ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বজীবনের লীলাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—Macrocosm in Microcosm। রাগিণীর মধ্যে যেমন স্বর অবিচ্ছিন্ন, চিরন্তন-জীবনের মধ্যে ক্ষণিক-জীবনও তেমনি। সকল সৌন্দর্য-

মূর্তির মধ্যে অনন্তস্বরূপের অখিল-রসামৃত-মূর্তি অনুভব করিতেছেন কবি। একটি নারী-মূর্তির মধ্যে সমগ্র সৌন্দর্যকে হৃদয়ে ধরিবার ইচ্ছা, প্রত্যেক খণ্ড রূপের মধ্যে অখণ্ডরূপেরই ভাতি দেখিবার আগ্রহ, ধরণী-গগনের সৌন্দর্যকে ব্যথিত হৃদয়ের বেষ্টনে মানসী প্রেয়সীর রূপে আহরণ করিয়া লইবার বাসনা এই কবিতার মর্মে মর্মে বিদ্যমান।

সৌন্দর্যের যে অনির্বচনীয় ধারণা মনের পটে অঙ্কিত থাকে, তাহাই কবির মানস-সুন্দরী, সে মানসী-রূপিণী, মানস-লোক-বাসিনী মূর্তিমতী সুন্দরতা। মানস-সুন্দরী কবির কল্পনা-সুন্দরী অথবা কবিতা-সুন্দরীও হইতে পারে। কবিতা-সুন্দরী তো কবির বাল্যকালের খেলার সঙ্গিনী এবং যৌবনকালের মর্মের গেহিনী। কবি নিজেই লিখিয়াছেন—

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী—আমার ছেলেবেলাকাব আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।
—ছিন্নপত্র

প্রথমেই তিনি 'কবিতা কল্পনা-লতা' প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কবিতা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার 'নিরুপম মুখখানি' বঙ্কিম গ্রীবা-বৃন্তেব উপর 'নবস্ফুট পুষ্পসম' [তুলনীয়—'মুখখানি তার নতবৃন্ত পদ্ম সম' (স্বপ্ন,—কল্পনা); 'ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো' (পতিতা)]; সেই তো কবির 'জীবনেব প্রথম প্রেয়সী'। অতি বাল্যে কবিতা কবিকে স্বয়ম্বরে বরণ করিয়া লইয়াছিল, কবিকে তাহার অনুগ্রহ পাইবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিতে হয় নাই। অতি শৈশবে 'দোঁহে দোঁহা ভালো ক'রে চিনিবার আগে'—কবিতা-মাধুযের সহিত ভালো করিয়া পরিচয় হইবার আগেই—উভয়েব মিলন ঘটিয়াছিল। কবিতাকে পাইবার জন্য পূর্বজ কবিদিগকে কবিতার আরাধনা সাধ্য-সাধনা করিতে হইয়াছে, আর আমাদের এই কবির কবিতা স্বযম্বরা হইয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছে। অপর কবিদিগের নিকটে কবিতা সম্ভ্রমের পাত্রী, দেবী; আর আমাদের এই কবির কাছে কবিতা তাঁহার প্রেয়সী 'জীবন-সঙ্গিনী' মর্মের গেহিনী। কবির কাছে কবিতা যেন নিজের আগ্রহে আসিয়া জুটিয়াছে, কবিকে কবিতার সন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় নাই। কবিতা স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া অভিসারে আসিয়া কবিব হাতে নিজের পাণিগ্রহণ কবাইয়াছে—'দুটি হাত ত্রস্ত কপোতের মতো'—

নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি'

আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়-প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মতো ॥— —কল্পনা, স্বপ্ন

বাল্যের কবিতা-প্রেয়সী ছিল বালিকা চঞ্চল; বয়ঃসন্ধিতে সমাগতা বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় কবিতার ক্রমশ পরিবর্তন ঘটিয়াছে—

প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহুকে লেল ॥
চরণ-চপলগতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥

—বিদ্যাপতি

কোথা সেই
অমূলক হাসি-অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা।

—মানস-সুন্দরী

কবি তাঁহার মানস-সুন্দরীকে একটি অনবদ্য অনিন্দ্য-সুন্দরী নারীমূর্তিতে দেখিতে চাহিতেছেন, কারণ পুরুষের কাছে নারীর সৌন্দর্যই চরম বলিয়া প্রতিভাত হয়। নারীকে সুন্দর লাগে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে—নারীকে রক্ত-মাংস-অস্থিতে বিশ্লেষণ করিলে তাহাকে অতি তুচ্ছ মনে হইবে; তথাপি তাহাকে যে অত সুন্দর লাগে, তাহার কারণ নারী হইতেছে পরম-সুন্দরের বিকাশ-মন্দির। বাহ্য-প্রকৃতিতে উপলব্ধ সৌন্দর্যমালা এক নারীর মধ্যে গ্রথিত হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কবির প্রসিদ্ধ 'উর্বশী' কবিতার মধ্যে কবি দেখিয়াছেন, জগতের সমস্ত সৌন্দর্যই যেন উর্বশীরই অঙ্গ হইতে জগৎ-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে, আর এখানে কবি দেখিতেছেন জগতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যরাশি যেন একটি লেন্সের ভিতর দিয়া একটি কেন্দ্রে আহৃত হইয়া একটি নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অতএব এই কবিতাটি যেন উর্বশী কবিতার অপর পৃষ্ঠ। জগতের সর্বসৌন্দর্যস্বরূপিণীকে কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধরা?' অর্থাৎ যাহা নিরবয়ব বস্তুনিরপেক্ষ (Abstract, Absolute) তাহা কি আকার (concrete form) গ্রহণ করিবে?

সর্ব ঠাঁই হ'তে, সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

'নদী হ'তে লতা হ'তে' প্রত্যেকের বিশেষ সৌন্দর্য আহরণ করিয়া একই আকারে রক্ষা করিতে চাহেন কবি, যেমন করিয়া মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে দেখাইয়াছেন যে পুরুরবা তাঁহার প্রেয়সী উর্বশীকে হারাইয়া তাহার সৌন্দর্য নদীতে লতাতে দেখিয়াছিলেন। কবি এই ভাবটিকে তাঁহার একটি সুন্দর সুরের সুন্দর গানে পরেও প্রকাশ করিয়াছেন—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে
বসেছো ফুলসাজে সে কথা যে গেছো ভুলে॥
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।
আজি কি সবি ফাঁকি? সে কথা কি গেছো ভুলে॥
গেঁথেছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে॥
গাঁথিতে যে-আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা,
তাহারি পরশন হরষণ- সুধা-ঢালা
ফাগুন আজো যে রে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে॥
আজি কি সবি ফাঁকি? সে কথা কি গেছো ভুলে॥

—প্রবাহিণী অথবা গীতবিতান

সেই সৌন্দর্যের বিগ্রহরূপিণী মানস-সুন্দরী যদি কখনো নারীরূপে কবিকে দেখা দেয়, তবে কবি তাহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার জননান্তরসৌহৃদানি তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিবেন এবং যেমন করিয়া 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' কবি তাঁহার 'পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়াবে' দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন, তেমনি এই মানস-সুন্দরীকে দেখিবামাত্র নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি' লভিয়া চেতনা। কবির মনে হইবে—

আমার নয়ন হ'তে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি।

ইহার কারণ, নারী তো সম্পূর্ণা মানবী নহে,

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি, নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে।......

*   *   *

অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা !

—চৈতালি, মানসী

কবি যেমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন যে, এখন যে-সব সৌন্দর্য বিচ্ছিন্ন খণ্ড আকারে ছড়ানো দেখিতেছেন তাহা একদিন একটি নারী-মূর্তির মধ্যে সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হইবে; তেমনি তাঁহার আবার ইহাও সন্দেহ হইতেছে যে, হয়তো বা একদিন ইহারা সব একত্র সমাবিষ্ট ছিল, পরে ইহারা বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; যাহা ছিল অশ্লিষ্ট তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে।—

মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে—
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।

'বলাকা'র 'শাজাহান' কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ একস্থানে এমন কথাই বলিয়াছেন :

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে।

—বলাকা, সাজাহান

একস্থ সর্বরূপকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত দেখিয়া কবির একটি উপমা মনে হইয়াছে—

ধূপ দগ্ধ হ'যে গেছে, গন্ধ-বাষ্প তার
পূর্ণ করি' ফেলিয়াছে আজি চারিধার।

আবার ইহার প্রতিধ্বনি শুনি অন্যত্র—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

—উৎসর্গ, আবর্তন

যে ছিল একদিন গৃহের বনিতা, সেই আর-একদিন বিশ্বের কবিতা-রূপে দেখা দেয় এবং তাহার অদল-বদল হয়। সে—

কখনো বা ভাবময়. কখনো মুরতি।

অর্থাৎ

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

—উৎসর্গ, আবর্তন

জগতে এইরূপে 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' চলিতেছে।

তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাবো পরশ-বন্ধনে।

এই কথাই পরে কবি তাঁহার উর্বশীকে বলিয়াছেন—

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে। —চিত্রা, উর্বশী

শেলীর Alastor কবিতায় এক কবি "all that is excellent and majestic to the contemplation of the universe" তাহারই সন্ধান করিতে পৃথিবী-পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন দেখা যায়। অর্থাৎ, কবি শেলীর কাছে আদর্শ-সৌন্দর্য হইতেছে সকল প্রকারের সৌন্দর্য। যে সৌন্দর্যকে আমরা বিশিষ্ট মূর্তিতে দেখি, শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তাহাকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ভাবে দেখিয়াছেন। বিশেষকে বিশ্বব্যাপী করিবার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকে অতীন্দ্রিয়-লোকে লইয়া যাইবার প্রবণতা উভয় কবির মধ্যেই বর্তমান। যাহাকে আমরা রূপজগতের মধ্যে দেখি, শেলী তাহাকে অরূপ রাজ্যের অশরীরী করিয়া তুলিয়াছেন এবং দুই কবিই একটু রহস্যের মধ্যে, নির্জনতার মধ্যে সৌন্দর্যভোগ করিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরী কবিকে

নির্জনেতে রহস্য ভবনে
জনশূন্য আকাশের তলে

আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত। সেখানে এক অর্থহীন স্বপ্নে তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। শেলীর কবি-মানসও বলিয়াছে :

And my heart ever gazes on the depth
Of thy deep mysteries. . . . .

* * * *

He would linger long
In lonesome vales, making the wild his home;

—*Alastor.*

আবির্ভাব হয় রুদ্ররূপে, তখন আমরা দেখি—পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'। তখন জগন্মন্দিরে জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কবিতাটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইভাবে—

যখন কোণে ব'সে ব'সে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের মনটাকে একটা সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে, এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয় বজ্ররূপে ভেঙে যায় তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখিতে পাই, সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

—ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুর, ৩০-এ আষাঢ়, ১৩০৪

বিশ্বনৃত্য

এই কবিতায় কবি নিজেব স্বার্থেব কবিত্ব-কল্পনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বের আনন্দ-নৃত্যে যোগ দিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি কবিকে আহ্বান করিতেছে। তাহাদের সহিত মিশিবার জন্য কবির যে ব্যাকুলতা তাহাই এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কবি স্বদেশের স্বজাতির গণ্ডি হইতেও নির্গত হইয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত যুক্ত হইতে চাহিতেছেন। কেবলমাত্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেই নিজের পূর্ণ প্রকাশ হইল না, বিশ্বমানবের সহিত মিলিতে হইবে। উপনিষদ বলিয়াছেন—"আপনাকে জানো।" কবি বলিতেছেন—"আপনাকে জানো এবং আপনাকে জানাও।" বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া আপনার বড়-আমির সহিত আমাদের মিলন-সাধন করিতে হইবে। যখন আমরা কেবল ছোট-আমিকে লইয়াই চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করিতে থাকে; দুঃখ শোক এমন একান্ত হইয়া উঠে যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোথাও সান্ত্বনা দেখিতে পাই না, তখন প্রাণপণে কেবল সঞ্চয় করি, ত্যাগ করিবার কোনো অর্থ দেখি না, ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হইয়া উঠে, তখন লাভ হয়—

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত-দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি।

—কল্পনা, বর্ষশেষ

এই বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায়। এখানে কবিতা প্রকৃতির ধাপ হইতে মানুষের ধাপে উঠিয়া বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করিয়াছে। বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়া চালনা করিতেছেন, এখানে তাঁহারই কথা দেখি।

দ্রষ্টব্য—আমার ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, ১৩২৪ পৌষ।

হৃদয়-যমুনা

(১১-ই আষাঢ়, ১৩০০)

কবি নিজের হৃদয়কে যমুনার সহিত তুলনা করিতেছেন, গঙ্গা বা অন্য কোনো নদীর সহিত নহে; কারণ যমুনা প্রেমের নদী, যমুনার তীরে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা হইয়াছিল, যমুনার তীরে সাজাহানের প্রেমের সাক্ষী তাজমহল বিরাজিত।

কবি নিজের হৃদয়-যমুনায় বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। যাহার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকুই লউক, কিন্তু সকলেই আসুক, সকলেরই অভাব মোচনের মতো প্রসারতা, গভীরতা ও উপযোগিতা তাঁহার হৃদয়ের আছে, এবং বিশ্ববাসী প্রত্যেককে তৃপ্ত করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ সার্থকতা যে হইবে না, এই অনুভূতি কবিমনে জাগিতেছে।

যদি আমার প্রেমের কাছে তোমার প্রয়োজনটুকু মিটাইয়া লইবার সম্পর্ক মাত্র তুমি রাখিতে চাও— কেবল লওয়া, কেবল ভোগ,—তবে তাহাও হইতে পারিবে। যদি তোমার কুম্ভটুকু ভরিয়া লইলেই তোমার চলে, তবে ততটুকুই আমার কাছে পাইবে। তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক কেবল ঐ দেওয়া-নেওয়ার, প্রয়োজন-পূরণের, ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার। যদি তুমি কর্মের প্রয়োজনে ব্যস্ত হইয়া সত্বর অল্প কিছু লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাও, তবে এসো আমার কাছে।

২

যদি তীরে থাকিয়াই, জলে না নামিয়াই তোমার কলসটি জলতলের উপর ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে ভুলিয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে চাও, যদি আমার প্রেমে তুমি উদাস আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতে চাও, তবে তাহারও আয়োজন আমার প্রেমের মধ্যে আছে।

৩

যদি আমার প্রেমের মধ্যে নামিয়া অবগাহন করিতে চাও, তবে তাহাও করিতে পারো, তাহারও আয়োজনের অভাব নাই। যদি জলে ডুবই দিবে, তবে আর বসনের—বাহ্যিক আবরণের, সামান্যতম ব্যবধানেরই বা কি প্রয়োজন। জলকেলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রেমের খেলাও চলিবে।

৪

যদি তুমি আমার প্রেমেব মধ্যে ডুবিযা তলাইয়া যাইতে চাও, তবে তাহাও তুমি করিতে পারো—আমাব প্রেমে অতলস্পর্শতাও আছে। যদি পরমপরিতৃপ্তিব আত্মবিস্মৃতি—মবণ লাভ কবিতে চাও, তবে তাহাও আমার প্রেমের নিকটে পাইবে।

আমার প্রেমের মধ্যে বিভিন্ন স্তর ও পরিমাণ আছে, আমি তোমার অন্তবেব সকল অভিরুচিকেও পরিতৃপ্ত করিতে পারিব।

কবি যৌবনের আবেগে নিজেব হৃদয়কে কূলে কূলে ভবা নদীর ন্যায় অনুভব করিতেছেন, এবং প্রিয়াকে সেই নদীতে আহ্বান করিতেছেন—তাঁহার প্রেমের পরিপূর্ণতা হইতে তিনি প্রিয়ার সকল প্রকার মনোভাব পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন। আকাঙ্ক্ষা মোচন, হেলাফেলার বিলাস, মিলনের আনন্দ এবং মবণ-তুল্য পরমা পরিতৃপ্তিতে আত্মবিস্মৃতি—সবই তাঁহার প্রেম হইতে পাওয়া যাইবে।

কবি নিজের হৃদয়-যমুনার এমন এক অতলস্পর্শ গভীবতা অনুভব করিয়াছেন যে তাহার নাম দিয়াছেন 'মরণ'।

যমুনা যে প্রেমের প্রতীক, তাহা অপর কবির কবিতাতেও দেখা যায়—

যমুনা প্রেমের ধারা জানি দুনিয়ায়,
তীর তার ঘিরি' চিরদিন
পীরিতির স্মৃতি যত জেগে আছে, হায়,

অতীত প্রেমের পদ-চিন,
ব্রজে কিবা মথুরায় কিবা আগ্রায়
রাজা ও রাখাল প্রেমে লীন !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অভ্র-আবীর, তাজ

তুলনীয়—

Just for the obvious human bliss
To satisfy life's daily thirst.

—Robert Browning.

বসুন্ধরা

(২৬-এ কার্তিক, ১৩০০)

জল-স্থল-আকাশের সহিত একাত্মতা বোধ করিবার ও সর্বত্র নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতায়। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা কবিকে একান্তভাবে বারংবার আকর্ষণ করিয়াছে। তুলনীয়—'সমুদ্রের প্রতি' ও 'মানসসুন্দরী' কবিতাদ্বয়।

চিরশ্যামা সুন্দরী ধরণীর নিগূঢ় প্রাণরস কবির চিত্তকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির একটি পরম নিবিড় যোগ ঘটিয়াছে। সমস্ত বসুন্ধরাই কবির দেহমনে মিশিয়া আছে প্রাণরূপে ভাবরূপে—

তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি
মর্মে গাঁথা।

ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে
...। তিনি দেশ ...

... মানব-ধর্মকেই অবলম্বন করিতে ও প্রমুক্ত ...

বিপুলা বসুন্ধরা কবি ... রিতে চাহিতেছেন। এই রকম বাসনা পারস্যের সুফী সম্পদের দিকে আকর্ষণ ... র কবি হুইট্‌ম্যানের রচনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া হইয়া উঠিয়াছে। ... কৃতি ও মান... হইয়া জগৎ। সমস্ত মানব-পরিবার

'বসু' অর্থ প্রাণ-প্রাচু... ত। অতএব শাশ্বত সত্যের উপর—বিশ্বজনীনতার ... ষ্ঠিত করিতে না পারিলে আপনাকে অখণ্ড মানব-

আছেন তিনি 'বসুন্ধরা'। তাঁহাকে কবি প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ভিতর দিয়া দেখিতেছেন—প্রকৃতির অন্তরের আনন্দ-চাঞ্চল্যকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন।

কবি মৃন্ময়ী মাতা বসুন্ধরার কোলে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন। তুলনীয়—

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চ'লে যাই মুক্তি-সুখে।
* * *
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ।

—পূরবী, মাটির ডাক

মানব-জীবন সঙ্কীর্ণতায় স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। কবি সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া মুক্ত উদার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে উৎসুক, সেইজন্য তিনি 'বক্ষপঞ্জর, পাষাণ-বন্ধ, সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, অন্ধকারাগার' ভগ্ন করিয়া যাইতে ব্যগ্র।

কবিতাটির মধ্যে কবি-প্রাণের অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রকাশের আনন্দ হিল্লোলিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি মাটির ভিতরের সমস্ত রস প্রাণোদ্গম ইত্যাদি লইয়া নিজেকে পরিপুষ্ট পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন। মাটির উপরের গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি সকলের সঙ্গে সমান নিবিড় আনন্দ উপভোগ করিতে চাহিতেছেন। প্রকৃতির রস-মাধুর্যের বৈচিত্র্য উপভোগের জন্য কবির মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন যে—গাছপালার ভঙ্গির সঙ্গে আমি মিশিয়া থাকিতে চাই, আমার আনন্দ ফুলের মতো রঙীন হইয়া যেন সহজ প্রকাশ লাভ করে। সমস্ত বসুন্ধরাকে কবি নিজের দেহে-মনে মিশাইয়া লইতে চাহেন প্রাণরূপে ভাবরূপে;—প্রকৃতির আনন্দ যেমন নানা বস্তুতে ছড়ানো রহিয়াছে, কবির ইচ্ছা যে আমার আনন্দও যেন তেমনি লীলাময় বৈচিত্র্য লাভ করে। কবি প্রকৃতির বিভিন্ন রসের পরমাত্মীয় হইয়া থাকিতে চাহেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য ভক্তের চক্ষে পবিত্র, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু; কারণ, ভক্ত সকল সৌন্দর্যের মধ্যে পরমসুন্দর ভগবানেরই স্ফুরণ দেখেন, এইজন্য হিন্দুর কাছে নদী, পর্বত, সমুদ্র, বন হইয়াছে তীর্থ,—তাহারা দেবতাত্মা, পবিত্র। বিশ্বপ্রকৃতি যেমন নিষ্কলঙ্ক, তেমনি কবি নিজেকে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র উত্তরীয়ের মতন সর্বত্র প্রসারিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন।

কবি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ দৃশ্য জাতি আকৃতি প্রকৃতির চিত্র মনের পটে ভাবের তুলিকায় অঙ্কিত করিতেছেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার বিশিষ্ট জীবনানন্দ উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যে তাঁহার একান্ত আত্মহারা ভাব, প্রকৃতির মূলে যে বিরাট্ রহস্য বা মিষ্টেরী তাহার নিবিড়তম অনুভূতি। প্রকৃতি তাঁহার নিকট জড় নহে, ইহা প্রাণময়ী। ইহাকে কবি কখনও জননী, কখনও বা প্রেয়সী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও শেলীর মতো মোটের উপর ইহার মধ্যে তিনি অনন্ত বিশ্বচৈতন্যের এক বিকাশ দেখিয়াছেন। মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যের আর-এক প্রকাশ। তাই মানুষ প্রকৃতির মধ্যে আপনার দোসরকে প্রাপ্ত হইয়া এত আনন্দ লাভ করে।

—মোহিতচন্দ্র সেন

কবির ইচ্ছা করে,—

আপনার করি যেখানে যা-কিছু আছে।—

কবির অনেক কবিতাতেই এই অদ্বৈতবাদের—সোঽহং ভাবের সুর বাজিয়াছে। বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বমানব সমস্তই তাঁহার অন্তরলোকের অধিবাসী—

জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর। —প্রভাত-উৎসব

জনমানবশূন্য বলিয়া 'সঙ্গহীন' মরুভূমিতে, কুমারসম্ভব-কাব্যে বর্ণিত মহাদেবের তপোবন-দ্বার-রক্ষী নন্দীর ন্যায় 'নিশ্চল নিষেধ' গিরিশ্রেণীতে—যেখানে কিছুই জন্মে না বলিয়া মনে হয় সে যেন অনন্ত কুমারী ব্রতচারিণী, যেখানে লোক-সমাগম নাই বলিয়া সে নিঃসঙ্গ, যেখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন সেই মেরু-প্রদেশে—এবং সমুদ্র-উপকূলে, সর্বত্র কবি আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছেন।

কবির মধ্যে বিশ্বজনীনতার ভাব প্রবল থাকাতে কবি সকল প্রকার বন্ধনের প্রথার সংস্কারের ও সঙ্কীর্ণতার বিরোধী। তিনি দেশ ও কালের ধর্মাধর্ম না মানিয়া চিরন্তন কালের শাশ্বত মানব-ধর্মকেই অবলম্বন করিতে ও প্রমুক্ত স্বাধীন ভাবে নিজেকে উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন। এই রকম বাসনা পারস্যের সূফী কবিদের মধ্যে ও আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যানের রচনার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বলেন, প্রকৃতি ও মানব লইয়া জগৎ। সমস্ত মানব-পরিবার দেশে কালে অখণ্ড ও শাশ্বত। অতএব শাশ্বত সত্যের উপর—বিশ্বজনীনতার উপর—আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, আপনাকে অখণ্ড মানব-

পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না। যিনি আপনাকে শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি সকলের পরমাত্মীয় হন, এবং সমস্ত বিশ্বই তাঁহার স্বদেশ হয়, তখন তিনি বলিতে পারেন—

'সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।' —উৎসর্গ, প্রবাসী

কবি আপনার মধ্যে বিশ্বকে স্পন্দিত অনুভব করেন; অন্তরের অনুভূতির মধ্যে বিশ্বের সত্তাকে সঞ্চারিত দেখেন। সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভালো মন্দ পাপ পুণ্য তাঁহার অনুভূতিতে ভূমানন্দের বার্তা আনিয়া দেয়। বিশ্বমানবতার প্রতি তাঁহার অগাধ সহানুভূতি ও অফুরন্ত ভালোবাসা।

রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এই বাহ্য জগৎকে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিকের ন্যায় কেবলমাত্র আত্মচেতনাব বহিঃপ্রক্ষেপ (projection of ideas) বলিয়া কল্পনা করেন। বিশ্বপ্রকৃতির সত্য পবিচয় যেন তাহার নিজের মধ্যে নাই, প্রত্যেক ব্যক্তির বোধের মধ্যেই তাহাব অস্তিত্ব রহিযাছে। আমাব মধ্যে যে প্রাণশক্তি চেতনাশক্তি কার্য কবিতেছে তাহাই আবার বিশ্বপ্রকৃতির অভ্যন্তরে কার্য করিতেছে।

যে আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশ-তলে,
দূরে রেখে দেখ্‌ছি তারে চেয়ে—
ধুলার সাথে, জলের সাথে,
ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চল্‌ছে ও যে ধেয়ে।

—প্রবাহিণী

কবি নিদ্রা হইয়া সকল প্রাণীর মধ্যে নিজেকে বিস্তারিত করিয়া দিতে ইচ্ছা কবিতেছেন। নিদ্রাই জীব-জীবনকে সতেজ করে, নবীনতা দান করে, নিদ্রা দ্বারাই সঞ্জীবনী শক্তি ও কর্মশক্তি লাভ হয়। তাই কবি নিদ্রারূপে সকলের মধ্যে নবীনতা, পূর্ণতা, সজীবতা ও কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করিতে চাহিতেছেন।

কবি বলিতেছেন যে বসুন্ধরার সহিত তাঁহার পরিচয় কেবল ইহজীবনের নয়, এই পরিচয় জন্মজন্মান্তরের (সমুদ্রের প্রতি, উৎসর্গ কাব্যের প্রবাসী, ছিন্নপত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা যে ক্রমবিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা

কবি অন্তরে অনুভব করিতেছেন—তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, আমাদের জীবনের যাত্রা তো আজকের নয়। জড়জগতেও এই প্রাণই স্পন্দিত হইয়াছিল, উদ্ভিদ্‌জগতে ও প্রাণিজগতেও এই প্রাণই অভিব্যক্তির স্তরে স্তরে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই মানবের কাছে তৃণের শিহরণ, কুসুম-মুকুলের ফুটিয়া উঠিবার আনন্দ, সমুদ্রের কলরোল এত পরিচিত ও অর্থভরা। কবি জানেন যে একদিন তিনি ইহাদের পরমাত্মীয় ছিলেন এবং ইহারা সকলেই তাঁহার সঙ্গে একত্র একদিন স্রষ্টার বুকে ঘুমাইয়া ছিল। পৃথিবীর যে এক বিরাট্ প্রাণ আছে তাহার অভিব্যক্তি হইতেছে গাছপালার ও পর্বতের উদ্‌গমের উল্লাস, সমুদ্রের ও বায়ুর চাঞ্চল্য। কোনো দিন আমরা সকলে একত্র একস্থানে ছিলাম, তাই পৃথিবীর সকল জিনিসকেই আমাদের ভালো লাগে,—সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া একই প্রাণ উদ্বেলিত ও স্পন্দিত হইতেছে। গৃহের কর্ত্রী অধিষ্ঠাত্রী জননী যেমন অন্তঃপুরে থাকিয়াই সমস্ত গৃহকে সম্পদে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখেন, তেমনি বিশ্বের যে মূল শক্তিকে কবি 'জননী' বলিয়া অভিহিত করিযাছেন তিনিও লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বাহ্য স্থূল জগতের পশ্চাতে অবস্থিতি করেন—অথচ জগতের যা কিছু সৌন্দর্য প্রাচুর্য সম্পদ সে সকলই তাঁহার সৃষ্টি। এই সৃজনশক্তির অন্তরের পরিচয় পাইলে হয়তো জীবনের সমস্ত ব্যাকুলতা সমস্ত দুঃখ-বেদনা অন্তর্হিত হইবে এবং অনাবিল শান্তি লাভ করা যাইবে। সেইজন্য কবি জননী বসুন্ধরাব সমুদ্র-মেখলা-পরা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে বসুন্ধরা! কী প্রাণ তোমার মধ্যে আছে, যাহার আনন্দরস আস্বাদ করিয়া জগতেব সকল বস্তু এত সুন্দর হইয়াছে? কবি নিজের আনন্দ বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া সকল-কিছুকে আনন্দময় দেখিতেছেন, কারণ—

> হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে। —সমাজ

মানবের প্রাণ অনন্ত তৃষ্ণা ভরা। বিশেষ করিয়া কবি-প্রাণ। সর্বানুভূতি ও সন্ধানপরতা প্রতিভার মূল লক্ষণ। তাই কবি অসীমসম্পৎশালিনী বসুন্ধরার ও পৃথুলা পৃথিবীর কোলে থাকিয়াও জীবনের স্বাদ গ্রহণে তৃপ্তি পাইতেছেন না। কবি বিচিত্র বিশ্বজীবনের স্বাদ বার বার ভোগ করিয়া তাঁহার প্রাণের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লইতে চাহেন। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধের দ্বারাই জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁহার

এই "দুরন্ত আশা" কি মিটানো সম্ভব হইবে? সেইজন্য প্রকৃতির যেখান হইতে প্রাণরস উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কবি সেইখানে প্রবেশ করিয়া উৎসের সন্ধান করিতে চাহেন। তিনি যেন ধরণীর শিশু, ধরণী-মাতার স্তন্যরস পান করিতে তিনি উৎসুক।

আমাদের দেশের জন্মান্তরবাদে মনুষ্যজন্ম দুর্লভ জন্ম এবং মনুষ্যেতর জন্ম পাপের পরিচায়ক। কিন্তু কবির কাছে সকল জন্মই সমান আনন্দের আকর, তাই কবি মনুষ্যজন্মের পরেও কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী ইত্যাদি হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন, যাহাতে তিনি নানা রূপে ধরণী-মাতার স্নেহরসধারা সম্ভোগ করিয়া দেখিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তিনি যতবার যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিবেন, ততবার তত রূপে তাঁহার জীবনের নব নব অভিব্যক্তি হইবে।

জীব-সৃষ্টির পর্যায়ে মানুষের জন্ম হইয়াছে সর্বশেষে, সেইজন্য মানুষ হইতেছে 'ধরিত্রীর যুবক সন্তান'। কবি বসুন্ধরার স্নেহ নিঃশেষে নিবিড় ভাবে পান করিয়া লইয়া, তাহার পরে অন্যান্য জ্যোতিষ্কলোকে দূরদূরান্তে সুদুর্গম পথে দেশ-দেশান্তর পর্যটনে যাত্রা করিবেন—কত গ্রহ উপগ্রহ তারা নক্ষত্র সূর্য রহিয়াছে, একে একে সেগুলির সকলের মধ্যে বিচরণ করিয়া তাহাদেরও প্রকৃতি ও স্বরূপ দেখিয়া লইবেন—এই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

তুলনীয়—

With beat of systole and of diastole
    One grand great life throbs through earth's giant heart,
And mighty waves of single Being roll
    From nerveless germ to man, for we are part
Of every rock and bird and beast and hill,
One with the things that prey on us,
                    and one with what we kill,
From lower cells of waking life we pass
    To full perfection; thus the world grows old.

—Oscar Wilde, *Panthea.*

*   *   *

This hot hard flame with which our bodies burn
    Will make some meadow blaze with daffodil,

Ay! and those argent breasts of thine will turn
To water-lilies; the brown fields men till
Will be more fruitful for our love to-night,
Nothing is lost in Nature, all things live Death's despite.

—Oscar Wilde

বসুন্ধরা কবিতার এই ভাবকে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন শেলিং-এর রোমান্টিক দার্শনিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন।

প্রতীক্ষা ও ঝুলন

'প্রতীক্ষা' (১৭-ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০) কবিতার মধ্যে কবি মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে চিত্তের মধ্যে যেখানে স্নেহ-মমতার পাত্রপাত্রীগুলিকে সযত্নে রক্ষা করি, সেখানেই মৃত্যু হানা দিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। মৃত্যু বক্ষোবাসী প্রাণকেও কম ভালবাসে না। কিন্তু কবি সেই প্রাণকে ইহারই মধ্যে মরণের হাতে সম্প্রদান করিয়া বধূবেশে বিদায় দিতে সম্মত নহেন, ধরাতলের শোভা আনন্দ সব এখনো সম্ভোগ করা তাঁহার শেষ হয় নাই। যদি পৃথিবীর সুখ শোভা মিথ্যা হয় হোক, এই মোহাবেশের আনন্দই কবি আরো কিছুকাল সম্ভোগ করিয়া লইতে চাহেন।—তাহার পরে যখন বার্ধক্যে জরাজীর্ণ হইয়া ভোগের শক্তি আর থাকিবে না, তখন—

আমার পরাণ-বঁধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু ; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো ;
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন-দানে
পাণ্ডু করি' দিয়ো।

'ঝুলন' কবিতাটি ১২৯৯ সালের ১৫-ই চৈত্র রাজসাহীতে লেখা। সেখানকার সাহিত্যিকদের কাছে কবি এই কবিতাটি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সকলে রাজসাহীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়কে এই কবিতার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পরম গম্ভীর হইয়া কেবল বলিয়া উঠিয়াছিলেন—'যুদ্ধ'। কবি

ইহাতে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কাছে আমরা শুনিয়াছি।

'ঝুলন' কবিতার মধ্যে প্রাণকে লইয়া কঠিন সাধনার কথা কবি বলিতে চাহিয়াছেন। প্রাণরূপিণীর সঙ্গে আমার খেলা হইবে, তাই আমার এই প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে। আজিকার উৎসব হইবে হট্টগোলে। আমরা নিজেকে উপলব্ধি করি সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া। বিপদে পড়িলেই নিজের ভিতরকার মহিমা ব্যক্ত হয়, জড়তার আবেশ দূর হইয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ একই দোলায় দোল খাইতেছেন, পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় রাধা কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিতেছেন, এবং তাহার দ্বারাই নিজেদের প্রেমকে নূতন করিয়া জাগ্রত করিতেছেন। তেমনি মরণের সঙ্গে ঝুলন-খেলাতে আমি আপনার প্রাণকে, উপলব্ধি করিতেছি। ভয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে ভয় অতিক্রম করিবার উল্লাস জানা যাইত না। আমার প্রাণকে আমি নানা ধন দিয়া লালন করিয়াছি, তাই আলস্যের অসাড়তা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, বিলাসে আবিষ্ট হইলে অসাড় হইতেই হয়। আমার বঁধু সেই, যে আমার প্রিয়, যে আমার আমি। আমি যেন স্বপ্নের মধ্যে যুঝিয়া মরিতেছি, সত্যের সন্ধান পাইতেছি না, আমার অতিপ্রিয় 'আমি' মধুরতার আবেশের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে। তাই স্থির করিয়াছি যে মরণ-খেলা খেলিতে হইবে—আমার 'আমিকে' আদর সোহাগ ও অতি-লালনের অলসতা হইতে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

এই ঝুলন কবিতার ছন্দের ও শব্দের মধ্যে একটি ঝুলনের দোলার ভঙ্গি আছে। অসাধারণ নিপুণ শব্দ-কুশলী কবি তাঁহার সকল কবিতাতেই ভাবানুযায়ী ছন্দ ও বাক্য ব্যবহার করিয়া একটি ঝঙ্কারের যাদু ও মায়া সৃষ্টি করেন।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবি অন্য একস্থানে নিজেই বলিয়াছেন—

বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হ'য়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো এক কবিতায় লিখেছিলেম, বলেছিলেম আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে

তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

—সাহিত্য-তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪১

বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা ইত্যাদি

বিম্ববতী (ফাল্গুন, ১২৯৮), রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে (চৈত্র, ১২৯৮), নিদ্রিতা (১৪-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯), এবং সুপ্তোত্থিতা (১৫-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯),—এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি প্রচলিত ছেলেভুলানো উপকথা অবলম্বন করিয়া সুন্দর রসমধুর কবিত্ব বিকাশ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক শিশুসাহিত্য-সঙ্কলয়িতা ও শিশু-সাহিত্য-রচয়িতা এবং শ্রেষ্ঠ কবি একত্র হইয়া এই কবিতা কয়টি রচনা করিয়াছেন। 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাদ্বয়ের মধ্যে নিদ্রিত সৌন্দর্যের মনোরম বর্ণনা আছে।

"হিংসুক পুড়িয়া মরে মনের আগুনে"—এই প্রবাদের সত্যটি "বিম্ববতী" কবিতাটির ভিতর প্রকাশ করা হইযাছে। হিংসান্বিত হইয়া আমরা যখন অপরের উন্নতির অথবা সুখের পথে বক্র দৃষ্টিপাত করি, তখন হিংসার জ্বালা আমাদের হৃদয়কেই পুড়াইতে থাকে। হিংসার ন্যায় অনিষ্টকারক আর কিছুই নাই। হিংসা কাহারও মনে একবার প্রবেশ করিলে তাহাব আর নিস্তার নাই। সে ব্যক্তি সর্বদা অন্য লোক হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন কবিতে চায়। আর সে যখন সেই অন্য ব্যক্তির সহিত নিজেকে তুলনা করিযা দেখে যে সেই অপর ব্যক্তি তাহার নিজের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তখন সে মনের জ্বালায়, হিংসার অনলে পুড়িতে থাকে। যতই সে ভাবে যে তাহার অপেক্ষা আর একজন শ্রেষ্ঠ, ততই তাহার মনের জ্বালা বাড়িতে থাকে। যখন কাহারও প্রতি হিংসায় আমাদের হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন ততই তাহাব ক্রমোন্নতি লক্ষ্যগোচর হয়, ততই তাহার সর্বনাশের চেষ্টায় আমরা তৎপর হইয়া উঠি। ফলে যে জন্য আমরা এত জ্বালা ভোগ করি তাহা তো নিষ্পন্ন হয়ই না, বরং আমরা নিজেরাই অধিকতর জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকি। অবশেষে আমাদের হিংসানলে আমরাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি। তাহাতে আমাদের নিজেদেরই অনিষ্ট হয়, অপরের কোনও ক্ষতিই হয় না।

তোমরা ও আমরা কবিতায় (১৬-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) কবি রসালো রঙ্গের সহিত নারী ও পুরুষের তারতম্য নির্দেশ করিয়াছেন। এই কবিতাটি যে অনেকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল তাহার প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ইহার একটি প্যারডি বা অনুকৃতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। এই কবিতাটিকে কবি-গায়ক সুরে বসাইয়া গানে পরিণত করিয়াছেন, এবং ইহাতে যে সুর সংযোজনা করিয়াছেন তাহাও অতীব মনোরম হইয়াছে। এই কবিতাটি রচনা করিয়া কবি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন—তাহার পরিচয় তাঁহার সেই দিনের ডায়ারিতে আছে (দ্রঃ রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

গানভঙ্গ

গানভঙ্গ কবিতার আখ্যানটি কবির স্বপ্নলব্ধ। এমন স্বপ্নলব্ধ কবিতা ও নাটক কবির আরও আছে। এই স্বপ্ন-সম্বন্ধে কবি একখানি পত্রে সাজাদপুর হইতে ৩-রা জুলাই ১৮৯২ সালে লিখিয়াছিলেন—

> কাল রাত্রে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্‌টেনাণ্ট্‌ গবর্ণর এসেছেন এবং তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। গাইয়ে একটা বড় রকম ইমন-কল্যাণ গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে—তার পর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হ'য়ে গানের কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ সেই সুরটা কেমন ক'রে কান্নায় পরিবর্তিত হ'য়ে গেল—সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' ক'রে উঠ্‌লেন। একজন প্রকৃত গুণীর মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগ্‌তে পারে তিনি যেন সেটা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারলেন। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হলো এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্‌টেনাণ্ট্‌ গভর্ণর কোথায় উড়ে গেলেন তার কিছুই মনে নেই।

এই স্বপ্ন দেখার কয়েক দিন পরে কবি এই কবিতাটি লেখেন ২৪-এ আষাঢ়, ১২৯৯ সালে। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীতে ও সোনার তরী পুস্তকে তারিখ আছে ১৩০৩ সাল। তাহা খুব সম্ভব ভুল, উহা ১২৯৯ হইবে।

গানভঙ্গ কবিতায় কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে কোনো-কিছু সৃষ্টির মধ্যে দুইয়ের সম্পর্ক থাকা দরকার, দাতা ও গ্রহীতা না হইলে সৃষ্টি কখনো সম্পূর্ণ হয় না। একজন দান করিবে, আর-একজন কায়মনে তাহা গ্রহণ করিবে, এই

দুইজনের আন্তরিক সংযোগ না থাকিলে কখনো সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কবির শ্রোতা বা পাঠক না থাকিলে, গায়কের শ্রোতা না থাকিলে, চিত্রকরের বা শিল্পীর দর্শক না থাকিলে তাঁহাদের সৃষ্টি ব্যর্থ। যুগল-মিলন না হইলে সৌন্দর্য-সৃষ্টি হয় না। তাই উপনিষদ্ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—স বৈ নৈক রেমে।···তস্মাদ্ একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ—বৃহদারণ্যক-উপনিষদ্, ১।৩।৩।

প্রকৃতিও এই একই বাণী ঘোষণা করিতেছে—তাহার আকাশে-বাতাসে জলে স্থলে সর্বত্র সেই একই কথা। তটের বুকে ঢেউ আসিয়া লাগিলে তবে সে কুলুকুলু স্বরে গাহিয়া উঠে—কেবল জলের অথবা কেবল তটের শক্তি নাই এই গান গাহিবার। আবার গাছের পাতায় বাতাস আসিয়া লাগিলেই তবে সে মর্মর-ধ্বনিতে মুখর হইয়া উঠে। তেমনি প্রাণের আবেগে কবির যে কবিতা বাহির হয়, তখন যদি কোনো শ্রোতা বা পাঠক তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে তবেই তাঁহার সৃষ্টি সার্থক হয়।

যেখানে দরদ নাই, প্রেম নাই, বুঝিবার ইচ্ছা বা আগ্রহ নাই, সেখানে কিছু বলিয়া বা করিয়াও কোনো লাভ নাই। রস আস্বাদন করিতে হইলে রসিক হৃদয়ের দরকার, রস জোর করিয়া বাহির করা যায় না, রস জোর করিয়া কাহাকেও আস্বাদন করানো যায় না। সৌন্দর্য ও রস সহৃদয়-সংবেদ্য। বিরূপ মন লইয়া যোগ দিলে সব কিছুই পণ্ড হইয়া যায়। দরদী হৃদয় না হইলে শিল্পকলার মর্যাদা বোঝা যায় না। কবিতা গান অথবা চিত্র-সমাদরের মধ্যে খুঁত-ধরা সমালোচকের স্থান নাই, অনুকূল মন লইয়া তবে তাহার রস আস্বাদন করা যাইতে পারে।

এই কবিতায় আরো বলা হইয়াছে যে নবীনের সঙ্গে প্রবীণের কখনো মিল হইতে পারে না। রাজা বৃদ্ধ, তিনি বৃদ্ধ বরজলালের গানের সমঝদার। কিন্তু নবীন যুবা কাশীনাথের গানের নবীন শ্রোতার দল বৃদ্ধ গায়কের সঙ্গীতের রসগ্রহণ করিতে পারিল না। নূতনে পুরাতনে চিরকাল সংঘর্ষ চলিয়াছে। পুরাতন চায় নিজের চারিদিকে গণ্ডি টানিয়া থাকিতে, আর নবীন চায় নব নব পথে প্রমুক্তি। তাই উভয়ের মিল হওয়া সম্ভব নয়। তাই বৃদ্ধ দুঃখ করিয়া বলিতেছে—

এখন আসিয়াছে নূতন লোক,
ধরায় নব নব রঙ্গ।

গানভঙ্গ কবিতাটি নবীন গায়কের নিকটে বিগতদিবস বৃদ্ধ গায়কের পরাভবের বেদনায় করুণ হইয়া উঠিয়াছে; এই কবিতাটি কাহিনীর কবিতার অগ্রদূত। গানের সভায় শ্রোতা ও গায়ক উভয় পক্ষ যদি একচিত্ত না হয়, শ্রোতা যদি দরদ দিয়া গায়কের গানকে সমাদর না করে, তবে সে সভা যে পণ্ড হয়, ইহাই এই কবিতায় বলা হইয়াছে। শিল্পসৃষ্টি মাত্রই সমঝদারের দরদ দিয়া বিচার না করিলে তাহার অপঘাত অবশ্যম্ভাবী, কারণ শিল্পকলা রুচির বস্তু, তাহা বুদ্ধির বা বিচারের দ্বারা আপন সৌন্দর্য প্রমাণ করিতে পারে না।

পুরস্কার

পুবস্কার কবিতায় (১৩ই শ্রাবণ, ১৩০০) কবি রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনেব, কবিচিত্তের একটি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কবিতাটি সুদীর্ঘ, কিন্তু ইহার মধ্যে ছন্দের অবাধ প্রবাহ, মিলের কারিগরি এবং বঙ্গ-মিশ্রিত কবিত্বময বর্ণনার সৌন্দর্য মনকে মুগ্ধ আবিষ্ট করে। কবির বাণীবন্দনা ও কবিচিত্তের আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা, কবির সংসার-বিষয়ে নির্লিপ্ত সাধনা, কবির আদর্শেব প্রতি কবির সহধর্মিণী কবিপ্রিয়ার শ্রদ্ধা, এবং কবিতাটিব মধ্যে কবি-জীবনেব উদ্দেশ্যের বর্ণনা মনকে পুলকে আপ্লুত করে।

সমঝদাবেব সমাদরই কবির শ্রেষ্ঠ পুবস্কার,—ধন জন মান ইত্যাদি কিছুই নহে। তাই সাংসারিক ও বৈষয়িক হিসাবে অভাবগ্রস্ত কবি প্রীত ও প্রশংসমান বাজার কাছে চাহিয়া লইলেন রাজার গলার ফুলের মালা এবং তাহাতেই "বাঁধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে লক্ষ্মী সরস্বতী।" কারণ, কোনো গুণের কোন পুরস্কারই যথাযোগ্য হইতে পারে না; পুরস্কার মাত্রই গুণের সমাদরের একটি চিহ্ন (token) মাত্র,—তাহা হউক না নোবেল-প্রাইজ বা রাজকণ্ঠের পুষ্পমাল্য বা সামান্য অলিভ্-শাখার মুকুট।

শৈশব-সন্ধ্যা

(ফাল্গুন, ১২৯৮ সাল)

কবি সন্ধ্যাবেলা রাত্রির অন্ধকারে বিশ্বচরাচর আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ার স্তব্ধ বিষণ্ণতা অন্তরে অনুভব করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন—

হোথা কোন্ গৃহ-পানে গেয়ে চ'লে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু॥

এই রাখালবালকের মনে বিশ্ব-বেদনা সম্বন্ধে উদাসীনতা দেখিয়া কবির নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়িল যে, তাঁহারও বাল্যকালে তো এমনি বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি উদাসীনতা ছিল; কিন্তু এখনো তো সমস্ত সংসার বৃদ্ধ চিন্তাগ্রস্ত বিমর্ষ হইয়া যায় নাই, এখনো

* * *

অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি' বালিকা বালক,
সন্ধ্যা-শয্যা, মা-র মুখ, দীপের আলোক।

এই কবিতা রচনার প্রায় দুই বৎসর পরের এক চিঠিতে কবি স্বয়ং এই কবিতাটির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাবনা শহরের খেয়াঘাটে কবির বোট বাঁধা হইয়াছে, আকাশে একরঙা মেঘ করিয়াছে এবং সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়াই লোকালয়ের নানাপ্রকার মিশ্র শব্দ কবির কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তখন কবি অনুভব করিতে লাগিলেন—

অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগ্ল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য,—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হ'য়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগ্লো। আমার 'শৈশব-সন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চল্ছে ও চল্বে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে,

সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্তঃশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড় বড় প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়—তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য।

—ছিন্নপত্র, সাহাজাদপুরের পথে, জুলাই, ১৮৯৪

ভরা বাদরে

ভরা বাদরে কবিতাটি (২৭-এ আষাঢ়, ১৩০০) বিশুদ্ধ লিরিক। 'নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান' দেখিয়া কবির মনে যে একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যের সঞ্চার হইয়াছে, অনামা কাহার কালো চোখের দৃষ্টির মোহ ও প্রকৃতির শোভা ও গান কবিহৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া যে আবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, সেইটুকু মাত্র কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ ক্ষণে বিশেষ আবেষ্টনে কবিচিত্তে যে একটি স্বর, একটি অনুভব জাগিয়াছে তাহাই এই কবিতার মধ্যে রূপ ধরিতে চাহিয়াছে! এটি যেন একটি অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্র ফুল, কিন্তু ফুলকণিকা হইলেও তাহার গঠন রং ও মধু তাহাকে পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে। অনির্বচনীয়তার মাধুর্য কবিচিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া এই কবিতাটি রচনা করাইয়াছে।

হিং টিং ছট্

(১৮-ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী ইউরোপে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া পরিগণিত। ঐ সময়ে স্টীম্ ও ইলেকট্রিসিটি মানুষের কর্মের সহায় হইয়া মানুষকে বহুগুণে শক্তিশালী ও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের বাংলা দেশেও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হওয়াতে এদেশের কৃতবিদ্য লোকেদের মধ্যেও বিজ্ঞানের চর্চা হইতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞান-চর্চার ফলে মানুষের মন বিনা পরীক্ষায় ও বিনা প্রমাণে কিছুই গ্রহণ করিতে বা মানিয়া লইতে স্বীকার করে না, সে সমস্ত-কিছুই প্রত্যক্ষ দেখিয়া বিচার করিয়া প্রয়োজন হইলে তবেই তাহা গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুপ্রাণিত ও বিদেশী সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া এদেশের এক সম্প্রদায় বিদেশী আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ অবলম্বন করিতেছিলেন; এইজন্য বিদেশী ভাব মাত্রই দেশের অন্য আর এক

সম্প্রদায়ের কাছে ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মন বুদ্ধির ও জ্ঞানের মুক্তি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা বিচার বিতর্ক দ্বারা সমর্থনীয় পালনীয় ও প্রয়োজনীয় না মনে হইতেছিল, তাহাই বর্জনীয় বলিয়া তখন ঘোষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক ও বিচারে আমাদের দেশের চিরাচরিত বহু আচার-ব্যবহার রীতিনীতি অনুষ্ঠান নিতান্ত অর্থশূন্য হাস্যকর মূঢ়জনোচিত কুসংস্কার মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে হিন্দুধর্মের ভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছিল এবং দেশের প্রতি মমতাসম্পন্ন মননশীল ব্যক্তিরা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বদেশের ধর্মকে বিচারসহ ও সঙ্কীর্ণতাশূন্য করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় নববৈদান্তিক ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রতিমাপূজক ও অবতার-বাদীদের দেশে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সর্বজনগ্রাহ্য হইতে পারিবে না সন্দেহ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরমেশ্বর-রূপে কৃষ্ণকে উপস্থিত করেন এবং বিচারের দ্বারা মাজিয়া-ঘষিয়া কৃষ্ণচরিত্রকে নূতন আলোকে প্রকাশ করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় দেশেব পারিবারিক সামাজিক ও আচারের প্রাচীন ব্যবস্থা আধুনিক বিচারপদ্ধতিতে সমর্থন করেন।

এই সময়ে কয়েকজন পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোক হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতি যে আধুনিক-বিচারসম্মত ও বিজ্ঞান-সঙ্গত তাহা প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য বিশেষ উদ্যমে চেষ্টা করিতে থাকেন। আমাদের দেশের দেবতা-পূজার যে-সব তান্ত্রিক মন্ত্র অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যেও গভীর গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করা হইল, এবং তাহার ব্যাখ্যা হইতে লাগিল ; মন্ত্রগুলি একাক্ষর হইলে কি হইবে, তাহার অভ্যন্তরে অনেকখানি অর্থ ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশের ত্রিকালদর্শী ঋষিরা কি না জানিতেন ? জগৎব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের অজানা কিছু ছিল না। যাহা এখন এতদিনে বহু গবেষণার পরে যবনেরা জানিতেছে, তাহা তাঁহারা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া জানিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যবন পণ্ডিতেরা তাহা এখন আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিলেই আমরা কোথাও না কোথাও তাহা মিলাইয়া হুবহু দেখাইয়া দিতে পারিব, আর্যরা যাহা পায় নাই এমন বস্তু ম্লেচ্ছরা কোথায় পাইবে ? এইরূপে ইঁহারা পরের প্রচারিত সত্যকে বা সত্যাভাসকে এমন ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন যে সকলে মনে করিতে লাগিল যে, সেই সত্য তাঁহাদেরই মন হইতে বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে।

হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার কল্পনা নামক পুস্তকে 'উন্নতি-লক্ষণ' শীর্ষক কবিতায় যে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা এই কবিতার সহিত তুলনীয়—

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটি যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগনেটিজ্‌ম্-শক্তি।
তিলক-রেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তায় জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হ'লে প্রাণপণ-বলে
বাজালে শঙ্খ ঘণ্টা,
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে,
সচেতন হয় মনটা।
এম্-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক্
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত!
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের,—
অন্ততঃ গ্যানো-খণ্ড,
হেল্‌ম্‌হোৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড।

উত্তর

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি,
ল'য়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি।

হিং টিং ছট্‌ কবিতাটি যে সময়ে লেখা, সেই সময়ে—১২৯০ সালের পরে কয়েকজন ব্যক্তি—হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার ও তাহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন—শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, এবং বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের পরিচালকগণ প্রভৃতি। ঐ সময়ে চন্দ্রনাথ-বাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদ ও তর্কাতর্কি হয়। চন্দ্রনাথ-বাবু 'সাহিত্য' পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিতেন সেই প্রবন্ধের বিষয় লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় প্রতিবাদ করিতেন। ১২৯৮ সালের পৌষ মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ-বাবুর এক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্বপ্রান্তে নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

এইরূপ বহু বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে ১২৯৯ সালের শ্রাবণ মাসের 'সাধনা'য় এই 'হিং টিং ছট্‌' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন ইহাও চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপর আক্রমণ এবং কেহ কেহ ইহা 'সাহিত্যে' স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করেন। তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসের 'সাধনা'য় লেখেন—

উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

অবশ্য এইরূপ সন্দেহ হইবার কারণ ঘটিয়াছিল চন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাতবৎসরব্যাপী তর্কযুদ্ধ চলাতে। ১২৯৯ সালের কার্তিক মাসের সাহিত্যে চন্দ্রনাথ-বাবু 'কড়াক্রান্তি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি তুচ্ছতম বিষয়ে পর্যন্ত লক্ষ্য রাখিয়া জীবনযাত্রা নিয়মনের জন্য ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইতে রাত্রিতে শয়ন করা পর্যন্ত সকল কর্মের শৌচাচার ও বিধিব্যবস্থা নির্দেশ করিতে আর্য ঋষিরা ভুলেন নাই। ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ সালের পৌষ মাসের সাধনায় এক প্রবন্ধ লেখেন 'কড়ায় কড়া, কাহনে কাণা', যাহাকে ইংরেজীতে বলে penny-wise pound-foolish, এবং সেই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, হিন্দুরা জীবনের তুচ্ছতম বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া জীবনের বৃহৎ অর্থ ও সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। এই-সব কারণ

ছাড়া লোকের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হইয়াছিল এই হিং টিং ছট্ কবিতার শেষ স্ট্যাঞ্জায় দুইটি লাইন দেখিয়া—

সবাই সরলভাবে দেখিবে যা-কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।

এই দুই পঙ্‌ক্তি হইতে লোকে মনে করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ পূর্বে যাহা গদ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন তাহাই তিনি কবিতায় প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। তখনকার লোকেরা যে এই কবিতাটির লক্ষ্য চন্দ্রনাথ বসু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহার আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' পুস্তকে। নবীন সেন যেখানেই চন্দ্রনাথ বসুর উল্লেখ করিয়াছেন সেখানেই তাঁহাকে 'হিং টিং ছট্' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন।

সঞ্জীবনী পত্রিকাতেও কবি রবীন্দ্রনাথ নব্য হিন্দুদের তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া এক কবিতা লেখেন 'দামু ও চামু'—তাহার একাংশ আমাদের মনে পড়ে—

দামু বোসে, চামু বোসে,
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যাখান৷ বড্ড ফেনিয়েছে।
আমার দামু, আমার চামু!
দামু ডাকেন,—"দাদা আমার"
চামু ডাকেন—"ভাই,
"সারা দুনিয়া খুঁজে এলাম,
মোদের জুড়ি নাই।
আমার দামু, আমার চামু!"

অনেকে মনে করিয়াছিলেন ইহা শশধর তর্কচূড়ামণির দলের চন্দ্রনাথ বসু ও বঙ্গবাসীর দলের যোগেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি বিদ্রূপ।

গায়ে পাতিয়া লইলে অনেক সময়ে ঠাকুর-ঘরে কে জিজ্ঞাসা করাও নিরাপদ হয় না। চিত্রকর যে চিত্র করেন তাহা যদি কাহারও সঙ্গে ঈষৎ সাদৃশ্য প্রকাশ করে তবে তাহার জন্য চিত্রকর সজ্ঞানে দোষী নাও হইতে পারেন।

এই কবিতাটির অপর নাম হইতেছে 'স্বপ্নমঙ্গল'। স্বপ্ন অলীক চিন্তা মাত্র বলিয়া পূর্বে লোকের ধারণা ছিল। সেই অলীক স্বপ্নের অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য মাথা ঘামাইবার মতন বাতুলতাকে এই কবিতায় উপহাস করা হইয়াছে।

যাহারা সামান্য ও তুচ্ছ বিষয় ব্যাখ্যা করিবার উপলক্ষ্যে কেবল অর্থহীন গুরুগম্ভীর শব্দরাশি উচ্চারণ করিয়া গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার ভড়ং করে, কিন্তু যাহা বস্তুতঃ নিরর্থক বুজরুকী মাত্র, সেইরকম ভণ্ড শব্দজীবী দার্শনিকম্মন্য ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রূপ এই কবিতা, এবং যাহারা মূঢ় পর-প্রত্যয়নেযবুদ্ধিঃ তাহাদেব প্রতিও বিদ্রূপ করা হইয়াছে এই কবিতায়।

মায়াবাদ প্রভৃতি সনেট

সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সনেটের মধ্যে কবি আমাদের দেশের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সুখদুঃখময় বিচিত্র শোভাসম্পদের আধার পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবম রমণীয়, ইহা মায়া নহে। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাত পরলোকের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই। জগতের সব কিছু লইয়াই আমাদের জীবনের সার্থকতা, তাহাদের সহিত যোগেই মানুষের মুক্তি, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমার একাকিত্বের মধ্যে মুক্তি নাই, আছে নিষ্ফলতা ও পণ্ডতা।

সোনার বাঁধন সনেটটি নারীর কল্যাণী মূর্তির সুন্দব বর্ণনা। দুর্বোধ, ব্যর্থযৌবন, প্রত্যাখ্যান, লজ্জা প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা নবনারীর প্রণয়ের বিচিত্ররূপ মনোভাবের নিপুণ বিশ্লেষণ।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

(২৭-এ অগ্রহায়ণ, ১৩০০)

এই কবিতায় কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে, সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে, অজানাকে সম্বোধন করিয়া জানিতে চাহিতেছেন যে, সেই সুন্দবী তাঁহাকে কোন্ নিরুদ্দেশ পথে কোথায় লইয়া যাইতেছেন। যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে শেষ বলিয়া মনে হয়, তাহা কিন্তু বাস্তবিক শেষ তো নয়, শেষের পরেই আবার তাহার আর একটি আরম্ভ আছে, তাই কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—'শেষের মধ্যে অশেষ আছে', এবং 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'। দূরে পশ্চিমে তপন ডুবিয়া

যাইতেছে, কিন্তু সেখানেই তো তপনের যাত্রা শেষ নয়। যাহা এক দেশের পশ্চিম, তাহাই অপর দেশের পূর্ব ; যাহা এক দেশের অস্তের দিক, তাহাই অপর দেশের উদয়ের দিক। অতএব কবির কাব্যলক্ষ্মী কবিকে মুগ্ধ করিয়া ক্রমাগত জানা হইতে অজানায়, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতের পানে লইয়া চলিতেছেন। জীবনে নব নব পরিচয় ও নব নব অভিব্যক্তি লাভ করিতে করিতে কবির যাত্রা, কিন্তু তাহার শেষ কোথায়! এই যাত্রার কি কোথাও শেষ আছে, অবসান আছে, পরিসমাপ্তি আছে, উদ্দেশ আছে?

সেই যেদিকে অজানা সুন্দরী কবিকে লইয়া চলিতেছেন, সেখানে কি স্নিগ্ধ মরণ-রূপিণী বিরতি শান্তি তৃপ্তি পরিসমাপ্তি অপেক্ষা করিতেছে! এই প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরী কেবল মন-ভুলানো হাসি হাসেন, তাঁহার মুখে কথা ফুটে না। তাঁহার শুধু হাসির ইঙ্গিত ক্রমাগত বলিতেছে—"Westward Ho!" এই ভাবটি কবি তাঁহার জাপানে-পারস্যে নামক পুস্তকে জাপান-যাত্রীর ডায়ারীর মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া—

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা-নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব করে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড়-বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, আরোব দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা, প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য তো নয়,—কেন না ঐদিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে তো বুদ্ধিমানের চলা, তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে, সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলার কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, সে চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মান্‌তে গেলেই তাকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না, তার এই চলার একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বলছে ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাক্‌ছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে। ঐ দিকে চেয়েই

মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরুতে টানে, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মরতে মরতে আকাশ-পারে ডানা মেলতে থাকে।

তুলনীয়—

Whither, O my sweet mistress, must I follow thee?
For when I hear thy distant footfall nearing,
And wait on thy appearing,
Lo! my lips are silent; no words come to me.
* * * *
Whither, O divine mistress, must I then follow thee?
Is it only in love, say is it only in death
That the spirit blossometh,
And words that may match my vision shall come to me?

—Francis Brett Young, *Invocation.*
(Georgian Poetry, 1918-19)

For one fair Vision ever fled
Down the waste waters day and night,
And still we followed where she led,
In hope to gain upon her flight
Her face was evermore unseen,
And fixt upon the far sea-line;
But each man murmur'd, 'O my Queen,
I follow till I make thee mine!'

—Tennyson, *The Voyage*

. . . . for my purpose holds
To sail beyond the sunset, and the baths
Of all the western stars, until I die.

—Tennyson, *Ulysses*

'সোনার তরী' কাব্যের প্রথম কবিতা রচিত হয় ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে, এবং শেষ কবিতা রচনার তারিখ ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ। অতএব আমরা এই 'সোনার তরী' কাব্যের মধ্যে কবি-মনের দুই বৎসরের ভাবের পরিচয় পাই।

বিদায়-অভিশাপ

ইহা একখানি কাব্য-নাটিকা। ইহা পাবনা জেলার কালীগ্রামে কবির জমিদারী-কাছারীতে থাকার সময়ে লেখা, রচনার সময় ১২৯৯ সাল অথবা ১৩০০ সালের ২৬-এ শ্রাবণ; ইহা ১৩০০ সালের মাঘ মাসের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যায়িকা হইতেছে মহাভারতের বৃহস্পতি-পুত্র কচ ও শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর প্রণয় ও বিদায়-ব্যাপার। মূল আখ্যায়িকা হইতে কবির বর্ণনায় একটু গরমিল আছে—কচ কর্তব্যের অনুরোধে দেবযানীর প্রণয় ও নিজের স্বার্থসুখ উপেক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দেবযানী কচকে শাপ দিয়াছিলেন, এবং মহাভারতে আছে যে কচও সেই শাপের বদলে দেবযানীকে পাল্টা শাপ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের কবি কাহিনীটিকে সুন্দরতর করিয়াছেন ও কচের চরিত্র মহত্তর করিয়াছেন কচকে দিয়া দেবযানীকে বর দেওয়াইয়া। ছোট-গল্পের ওস্তাদ শিল্পী-কবি কাহিনীটিকে একটি দিব্য শ্রী দান করিয়াছেন এই পরিবর্তনের দ্বারা।

কাব্যের মধ্যে তপোবনের বর্ণনা ও দেবযানীর অল্পে অল্পে উপযাচিকা হইয়া প্রণয়-নিবেদন ভাষার লালিত্যে ও কবিত্বে অতি সুন্দর হইয়াছে। একটি কাব্যের যে কত বকমের ব্যাখ্যা সম্ভব হইতে পারে, এবং সমালোচকদের মনের গঠন-তারতম্যে সেই-সব ব্যাখ্যা যে পরস্পরের বিপরীতও হইতে পারে, তাহা কবি স্বয়ং এই কাব্য বা টীকাটিকে অবলম্বন করিয়া পঞ্চভূতেব মধ্যে 'কাব্যের তাৎপর্য' নামক আলোচনায় দেখাইয়াছেন।

চিত্রাঙ্গদায় কবি নারী-আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছিলেন, 'বিদায়-অভিশাপে' পুরুষের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনের আদর্শকে মহীয়ান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র নারী মহীয়সী, 'বিদাব অভিশাপে'র পুরুষ মহীয়ান্। —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী

নদী

অতি ক্ষুদ্র কাব্য। বাল্য-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত, পরে 'শিশু' পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা শিশুর পাঠোপযোগী করিবার জন্য ইহাতে 'স্বপন' 'ক্ষেত' ও 'ক্রমে' ছাড়া আর কোনো সংযুক্তাক্ষর শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। নদী পর্বত-শিখর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে সমুদ্রাভিমুখে নামিয়া চলিয়াছে,

তাহারই যাত্রাপথের দৃশ্য ও শোভা বর্ণনা করা হইয়াছে; কথা দিয়া ছবির পরে ছবি আঁকিয়া কবি আমাদিগকে নদীর সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। এই কাব্যখানি ২২-এ মাঘ ১৩০২ সালে কবির পরমস্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিণয়-দিনে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। অতএব ইহা ঐ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে লেখা। বলেন্দ্রনাথের বিবাহ-উপলক্ষ্যে লিখিত আর একটি কবিতা 'উৎসব', ইহার পরবর্তী পুস্তক 'চিত্রার' মধ্যে আছে।

তুলনীয়—Tennyson-এর *Brook* এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য'।

চিত্রা

কবির বিকাশোন্মুখ প্রতিভা এই কাব্যে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে, কবির রচনা এখন বিচিত্র ভাবময় এবং কল্পনাময় হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যের কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩০০ সালের মাঘ মাস হইতে ১৩০২ সালের ২০-এ ফাল্গুন তারিখের মধ্যে লেখা। এই চিত্রা কাব্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্য 'সোনার তরী'র শেষ কবিতা লেখার তারিখ হইতেছে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাস, আর চিত্রার প্রথম কবিতা লেখা হয় মাঘ মাসে। চিত্রা কাব্য ১৩০২ সালের ফাল্গুন মাসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়।

বিচিত্র ভাবের কবিতা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া এই কাব্যের নাম হইয়াছে 'চিত্রা'; অথবা ইহার প্রথম কবিতার নাম হইতে কাব্যের নাম হইয়াছে 'চিত্রা'। খুব সম্ভব কাব্যের নাম আগে স্থির করিয়া তাহারই পরিচয়-স্বরূপ পরে 'চিত্রা' কবিতাটি রচনা করিয়া কাব্যের প্রথমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই শেষের অনুমানই ঠিক বলিয়া মনে হয়, কারণ 'চিত্রা' কবিতার রচনার তারিখ হইতেছে ১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ মাস। যদিও এই কবিতাটি অন্য অনেক কবিতার পরে লেখা, তথাপি তাহাকে যে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহা বোধ হয় পুস্তকের নামের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্যই। চিত্রা কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি এই পুস্তকের মধ্যেকার প্রধান ভাব।

এই পুস্তকের কবিতাগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিন্যাস করা যাইতে পারে। ১। সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবির ধারণা—চিত্রা, জ্যোৎস্না রাত্রে, শীতে

ও বসন্তে, পূর্ণিমা, আবেদন, উর্বশী, দিনশেষে, বিজয়িনী, প্রস্তর-মূর্তি, নারীর দান এই পর্যায়ের অন্তর্গত। ২। জীবনদেবতা ভাবের কবিতা—অন্তর্যামী, সাধনা, জীবনদেবতা, সিন্ধুপারে, শেষ উপহার। ৩। স্নেহ প্রীতি প্রেম সম্বন্ধীয় কবিতা—সুখ, প্রেমের অভিষেক, ব্রাহ্মণ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, স্বর্গ হইতে বিদায়, সান্ত্বনা, গৃহ-শত্রু, মরীচিকা, উৎসব, রাত্রে ও প্রভাতে। ৪। কর্তব্যনিষ্ঠা—এবার ফিরাও মোরে, নগর-সঙ্গীত। ৫। সমাপ্তি বা মৃত্যু সম্বন্ধীয় কবিতা—সন্ধ্যা, মৃত্যুর পরে, ১৪০০ সাল, প্রৌঢ়। সিন্ধুপারে কবিতাটিকেও এই পর্যায়ে লওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই সময় পর্যন্ত লিখিত কবিতাসহস্রের মধ্যে তিনটি কবিতা তাঁহার কাব্যের ও কবি মনের প্রধান সুর প্রকাশ করিয়াছে—'সোনার তরী', 'জীবনদেবতা', এবং 'উর্বশী'। *এই তিনটির মধ্যে শেষোক্ত দুইটিই এই কাব্যে* স্থান পাইয়াছে।

টম্‌সন সাহেব যখন কবির কাব্য সম্বন্ধে বই লিখিবেন বলিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রসপিপাসু ব্যক্তিদের নিকটে তথ্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতার মধ্যে সব চেয়ে কোন্ কবিতাটি আপনার ভাল লাগে?' ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—"আমার সব কবিতাই নির্বিচারে ভালো লাগে। অযুত কবিতার মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া সর্বশ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসানো বড় কঠিন। তবে আমার মনে হয় তিনটি কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের প্রধান বিশেষত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—*সেই* তিনটি হইতেছে 'সোনার তরী', উর্বশী', 'জীবনদেবতা'।" টম্‌সন সাহেব আমার উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মনে করুন আপনার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্য সেই ঘরে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নাই, এবং মাত্র একটি কবিতা রক্ষা করিবার মতন আপনার সময় আছে। এমন অবস্থায় আপনি কোন্ কবিতাটিকে রক্ষা করিবেন?' ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—'খুঁজিয়া বাছিয়া লইবার যখন সময়ই নাই, তখন যে কবিতাটিকে আমি আমার হাতের কাছে প্রথম পাইব তাহাই রক্ষা করিব।' এই উত্তর শুনিয়া টম্‌সন সাহেব আমার নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম কবিতা বাছাই করিয়া লইবার আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চিত্রা কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে কবির মনে সৌন্দর্য-পূজার এবং মহাজীবন-লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের যুগে কবির সৌন্দর্য-বোধের মধ্যে ভোগ-প্রবৃত্তি মিশিয়া যাওয়াতে স্বভাবশুচি কবিপ্রাণে যে বেদনা জাগিয়াছিল, সেই বেদনা দূরীভূত হইয়াছে এই চিত্রা কাব্যে—এখানে কবি সৌন্দর্যকে সকল মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে রাখিয়া তাহার বিশুদ্ধিতায় ও অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিয়াছেন। আর, এই চিত্রা কাব্যেই আমরা কবিকে প্রথম আঘাত-সংঘাতপূর্ণ বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য ব্যগ্র দেখিতে পাই।

এই কাব্যে সৌন্দর্য সম্বন্ধে ছয়টি কবিতা প্রধান— চিত্রা, উর্বশী, বিজয়িনী, আবেদন, জ্যোৎস্না-রাত্রে ও পূর্ণিমা। এই কবিতা কয়টির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কবির মানস-প্রতিমা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপ ভিন্ন ভিন্ন কবিতার ভিতর দিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সকলের অন্তর্নিহিত কথাটি এক,— একই অনুভূতি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

সৌন্দর্যের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রা কাব্যে বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের গুণগান করিয়াছেন। যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীব তীব্র অনুভূতি তিনি অন্তরের নিভৃত কোণে পাইয়াছেন, তাহারই বিকাশ জগতে প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত বিচিত্র রূপে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। এই অনন্ত সৌন্দর্যই বহির্জগতে বিকীর্ণ এবং অন্তর্জগতে স্থির ধীর এবং স্তব্ধ। তিনি সেই অন্তরবাসিনী সৌন্দর্যদেবীর প্রতিমূর্তি চাঞ্চল্যময় জগতে উপলব্ধি করেন। বহির্জগৎব্যাপী সমগ্র সৌন্দর্যের সমষ্টিকে তিনি উর্বশীরূপে মূর্ত করিয়াছে[illegible] আপান স[illegible] একটি সত্তা মাত্র, তাই বিশ্বমানবের ভিতর একটি সৌন্দর্যতৃষ্ণা লাগিয়া আছে সমস্ত বিশ্বে এবং সৌন্দর্যলাভের লোভ তাহার হৃদয়ে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত। তাই অস্কার ওয়াইল্ড্ বলিয়াছেন—

The only beautiful things are things that do not concern us.

'চিত্রা' কবিতাটিতে কবি সৌন্দর্যকে বহির্জগতের মধ্যে একপ্রকারে দেখিয়াছেন, এবং অন্তরে ভিন্নপ্রকারে তাহাকে দর্শন করিয়াছেন। বাহিরের সৌন্দর্যকে তিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়া নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। বহির্জগতের সৌন্দর্যদেবীর রূপ বহু বস্তুর মধ্যে

দিয়া বহু রূপে প্রকাশ পাইয়াছে—ফলে ফুলে গন্ধে বর্ণে নানা সঙ্গীতে নানা রসে নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বাহিরের সেই বহুবিভক্ত সৌন্দর্যই অন্তরে অভিন্ন একক রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বাহিরে যে সৌন্দর্য বিচিত্র বহু-বিভক্ত চঞ্চল, অন্তরে সে-ই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড স্থির গম্ভীর।

এই যে সৌন্দর্য, যাহার সত্তা কবি বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে উভয়ত্রই অনুভব করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি 'জ্যোৎস্নারাতে' আহ্বান করিয়াছেন ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত করিবার জন্য, তাঁহার দেহ-মনের সকল ব্যথা শুভ্র সুকোমল করপদ্মদলস্পর্শে দূর করিয়া দিবার জন্য। কবি বলিতেছেন যে, আজি এই সুন্দর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে, এই নীরব নিস্তব্ধ রজনীতে তুমি তোমার অপার রহস্যের আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া নগ্নসৌন্দর্যের রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তরুণী লক্ষ্মীর মতো আমার হৃদয়ের অতি নিকটে আঁখির সম্মুখে আসিয়া দেখা দাও। সৌন্দর্যপিপাসু কবিহৃদয় কাতর ভাবে বলিতেছে—

আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে, অসীম-সুন্দর
ত্রিলোক-নন্দন-মূর্তি! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়। ....

অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—

খোল দ্বার খোল দ্বার,
তোমাদের মাঝে লহ মোরে একবার
সৌন্দর্যসভায়।.........
বি[illegible]নী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা,
অষ্টত্তরে সন্তুষ্ট [illegible]র আনিয়াছি মালা।

সৌন্দর্যপিপাসু কবি তাঁহার কল্পলোকবাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই বিশ্বসোহাগিনী বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে আরাধনা করিয়া আরও এক জায়গায় বলিয়াছেন—

কোনো মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

যে সৌন্দর্যের অপরূপ রূপলাবণ্যসুধা পান করিবার জন্য কবি-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ণিমা রাত্রিতে দেখি সেই সৌন্দর্যদেবীই নিজে কবির কাছে

অভিসারিকার বেশে আসিয়া 'মু'খানি বাড়ায়ে' দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু কবি তখন শেলী, গেটে, কোল্‌রীজ প্রভৃতির কাব্যতত্ত্বের সমালোচনায় ব্যস্ত; অভিসারিকার সরম-সঙ্কুচিত মুখের দিকে তাকাইবার অবসর তাঁহার নাই। হঠাৎ যখন শাস্ত কবি বাতি নিবাইয়া শয়নের উপক্রম করিলেন, অমনি চমকিয়া দেখিলেন সৌন্দর্যের উদার রূপ অনাবিল চন্দ্রকরোজ্জ্বল কান্তিতে তাঁহার গৃহে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি তখন বিপুল সৌন্দর্যের উদার প্রকাশের নগ্নমূর্তির নিকটে আনতমস্তক হইয়া আপন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন,—উচ্ছ্বসিত কবিহৃদয় গাহিয়া উঠিল—

> হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
> অনন্তের অন্তরশায়িনী, নাহি সীমা
> তব রহস্যের! ....
> কি জানি কেমন ক'রে লুকায়ে দাঁড়ালে
> একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে,
> হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী! ....

কিন্তু পরে কবি 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' কবিতাদ্বয়ের মধ্য দিয়া সেই সৌন্দর্যদেবীকেই—

> সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধিতার মধ্যে, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।
>
> —অজিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—

> সৌন্দর্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা মাত্র। জগতের রহস্য-সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎচঞ্চল আঁচল-দোলানোর আভাস পাওয়া যায়। ইহারই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল লুণ্ঠিত, ইহারই স্তনহারচ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ববাসনার বিকশিত হৃদয়পদ্মের উপর ইহার অতুলনীয় অতিলঘুতার পাদপদ্ম স্থাপিত।
>
> —অজিতকুমার চক্রবর্তী

উর্বশী সমস্ত রূপের মধ্যে এক অপরূপের আবির্ভাব। সৌন্দর্যের এমন সুতীব্র অথচ নির্মল অনুভূতি আর কোথাও দেখা যায় না। এই উর্বশীর পরিকল্পনার ভিতর দিয়া কবি অবিশেষণযোগ্যা সৌন্দর্যদেবীকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সৌন্দর্যদেবী নিজেই নিজের জননী। তিনি প্রথম হইতেই পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

তাঁহার নিকটে সুধা ও বিষের কোনো পার্থক্য নাই, আছে কেবল তাহাদের সংমিশ্রণ—তাঁহাকে বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রাণী সুন্দরী উর্বশী ও কল্যাণী লক্ষ্মীর মিলন বলা যাইতে পারে। কবি উর্বশীর পরিকল্পনায় ভিতর দিয়াই তাঁহার স্বপ্নলোকবাসিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপটি পূর্ণ ভাবে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

'বিজয়িনী' কবিতাতে কবির এই সৌন্দর্যানুভূতি একটি রমণীমূর্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিজয়িনীকে তিনি সকল সৌন্দর্যের আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সকল সৌন্দর্যের আদি সত্তা। সৌন্দর্য দেখিলেই মানবের মনে ভোগবিলাসের বাসনা উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি সকল সৌন্দর্যের আদি সৌন্দর্য, তিনি ইটার্নাল বিউটী, তাঁহাকে দেখিলে লোভ বাসনা আর থাকিতে পারে না, তাঁহার দর্শনে চিত্ত নিমেষহীন হইয়া যায়, মনে তৃপ্তি ও ভক্তির উদয় হয়। তাই মদনদেব প্রথমে তাঁহার প্রতি পুষ্পশর সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সৌন্দর্যের মহিমান্বিত গম্ভীর মূর্তি যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি সৌন্দযের সেই নগ্নমূর্তির মহিমার সম্মুখে অবনত হইয়া আপনার ধনুর্বাণ তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন—

নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

'বিজয়িনী' কবিতায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য মূর্ত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই মহিম-সৌন্দর্যের মহিমা এত তীব্র ও মহান্ যে এমন কি মদন পর্যন্ত তাহার সম্মুখে পরাভব মানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়লালসার অতি উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাই এমন সৌন্দর্যের সম্মুখীন হইলে মানব সমস্ত লালসা বিস্মৃত হইয়া আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে।

'চিত্রা' কাব্যখানির মধ্যে দেখা গিয়াছে যে প্রথমে যে সৌন্দর্যকে কবি বাহিরে দেখিতেন ও অন্তরে অনুভব করিতেন, তাহাকে পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া কাতর ভাবে আহ্বান করিয়াছেন। সৌন্দর্যদেবী তখন সুন্দর জ্যোৎস্না-রজনীতে আসিয়া কবিকে আপনার উদার সৌন্দর্যের নগ্নরূপ দেখাইয়া গেলেন এবং কবি সেই সৌন্দর্যের রূপ বর্ণনা করিলেন উর্বশীর ও বিজয়িনীর রূপকে অবলম্বন করিয়া,—যে রূপের কাছে আমাদের ভোগবাসনা-মুগ্ধ প্রাণমন ভাবে ও ভক্তিতে পরাভব স্বীকার করিয়া পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে চায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে চিত্রার যুগ জীবনদেবতা-ভাবতত্ত্বের যুগ। জীবনদেবতা কবিজীবনের দ্বৈত সত্তা। সমগ্র জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে প্রেরণা, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই জীবনদেবতা বলিয়াছেন। এই জীবনদেবতা কবিজীবনের নিয়ন্ত্রী দেবতা—কবির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি। কবির অন্তরের অন্তরালে ইহার অধিষ্ঠান। অন্তরের অন্তরালবাসিনী এই দেবতা কবিকে নিরন্তর কাব্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, রূপ ও রসরচনার প্রেরণা দিয়াছেন। যে প্রেরণা, যে শক্তি কবিকে নব নব সৃষ্টির পথে পরিচালিত করিযাছেন, তিনিই 'জীবনদেবতা'। ইহারই প্রেরণায় কবি তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্য দান করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের আত্মার সংযোগ অনুভব করিতে পারিয়াছেন,—ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনের, বিচ্ছিন্নের মধ্যে একের, অসম্পূর্ণের মধ্যে সম্পূর্ণের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার জীবনের সমস্ত ভাঙাচোরা সমস্ত খণ্ডতা এই জীবনদেবতার প্রসাদেই অক্ষত সুন্দর হইয়া উঠিতেছে, কবির বিচ্ছিন্ন সুরগুলি এক অপরূপ রাগিণীতে পরিণত হইতেছে। জীবনদেবতা কবির ক্ষুদ্রতাকে, বন্ধনকে, সীমাকে ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন; বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, আনন্দের দ্বারা কবিকে বিপুল বিরাট্ ও মহত্তের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

> আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে-অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।
>
> —আত্মপরিচয়

এই জীবনদেবতার প্রেরণায় কবি 'কথনো উদার গিরির শিখরে', 'কভু বেদনার তমোগহ্বরে' অজানা পথ ধরিয়া অভিসারে চলিয়াছেন।

> কথনো উদার গিরির শিখরে
> কভু বেদনার তমোগহ্বরে
> চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
> চলেছি পাগল বেশে।

জীবনদেবতা কবির জীবনের মধ্যে আর এক জীবন, কবির অন্তরস্থিত আর এক কবি—'আর একজন কে রচনাকারী'। এই অদৃশ্য কবিতাটির সহিত রবীন্দ্রনাথের যে সম্বন্ধ তাহা যেন যন্ত্রীর সহিত যন্ত্রের সম্বন্ধের মত। কবি যেন

এই জীবনদেবতার হাতের বীণা। তাঁহার হাতের অঙ্গুলিস্পর্শে কবির মনোবীণায় বিচিত্র সুরলহরী ধ্বনিয়া উঠে।

আমি কি গো বীণা যন্ত্র তোমার
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে।

জীবনদেবতাই অতীতের ভিতর দিয়া অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া কবির সোনার তরীকে কালমহানদীর তীরে তীরে নূতন নূতন হাটে বহন করিয়া লইয়া চলেন। ইনিই কবির জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। ইনিই কবির ব্যক্তিগত বাণীতে নিত্যবাণীর সুর মিশাইয়া দিতেছেন। তাহারই ফলে কবির ব্যক্তিগত রাগিণী বিশ্বগত হইয়া উঠিতেছে।

আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর-জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি।

কবি বলিয়াছেন—

আমার পটে একটা ছবি দেখিযাছিলাম বটে, কিন্তু সেই রং ও রঙের তুলি তা আমার হাতে ছিল না।

এই তুলি ও রঙ জীবনদেবতা জোগাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি এই জীবনদেবতার প্রসাদেই ঘটিয়াছে—

তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, তাহা আমি মনে করি না। আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন, সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি। সেইজন্য এতোবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না। —আত্মপরিচয়

জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী সৃজনীশক্তির অনুপ্রেরণায় কবির কল্পনা অবাধে উৎসারিত হইয়া গলিয়া বহিয়া ছুটিয়া চলে, বাণীর সঙ্গীত-শতদল তখন ফুটিয়া উঠে, কবির কবিবীণায় তখন এক অনির্বচনীয় সুরের ঝঙ্কার উঠে।—

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস-তরঙ্গ তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।

জীবনদেবতা কবির চিরদিনের সঙ্গী—

হে চির পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

এই জীবনদেবতার অনুভূতিকে জীবনে বারংবার ফিরিয়া পাইবার কথা রবীন্দ্রকাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে দেখা যায়। কবির প্রথম বয়সের কবিতায় জীবনদেবতার রূপ অস্পষ্ট ও রহস্যময়, কিন্তু ক্রমে সে ভাব কাটিয়া গিয়াছে এবং কবিহৃদয়ে তিনি নানা লীলায় প্রকাশিত হইয়াছেন। কবি ইঁহাকে কখনও 'অন্তর্যামী' বলিয়াছেন, কখনও 'জীবনদেবতা' বলিয়াছেন, কখনও ইনি 'লীলা-সঙ্গিনী', কখনও 'দোসর', কখনও 'খেলার সাথী'। জীবনদেবতাকে কবি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন, আবার বিভিন্ন রূপে উপলব্ধিও করিয়াছেন। কবির জীবনদেবতা কবির কাছে কখনও 'দেবী', কখনও 'প্রেয়সী'।

'মানসী'র যুগে কবি যে মানস-সুন্দরীর ইঙ্গিতে চলিয়াছিলেন, তাহাকেই জীবনদেবতার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। সংশয়াকুল চিত্তে কবিকে আমরা ঐ যুগে বলিতে শুনি—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে',—
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে'!

'পূর্বকালে' কবিতায় কবি নিজেকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন—

অনাদি বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ!

ঐ যুগে এই মানসীর সহিত অভিন্নতাবোধের অনুভূতিও কবির মনে জাগিয়াছে—

সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।

'সোনার তরী'র যুগেও কবিমনে এই জীবনদেবতার অনুভূতি বিরাজমান। মানসীর জীবনদেবতার রূপ সোনার তরীতে স্পষ্টতর হইয়াছে। এই যুগে কবির জীবনদেবতা কবির কল্পনা ও কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—

আজন্ম সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা-লতা।

কখনও বা ইনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তা—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে, স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার।

আবার কখনও বা এই জীবনদেবতার আহ্বানে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন—

আর কতো দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী।
বলো কোন্ পাব ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে তোমার মনে।

দিগন্তবিস্তৃত অসীম সৌন্দর্যসাগরের বুকে কবির নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হইয়াছে এই সোনার তরীর যুগ হইতে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সোনার তরীতে জীবনদেবতা সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ও সচেতন নহে, জীবনদেবতার সহিত পরিচয় তখনও বেশ নিবিড় হইয়া উঠে নাই। তাই কবি বলেন—

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা।
কী বলিতে চাও মোরে প্রণয়-বিধুরা
সীমন্তিনী মোর! কী কথা বুঝাতে চাও?

আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঙ্কলে
সম্পূর্ণ হরণ করি লহগো সবলে
আমার আমারে। —সোনার তরী, মানস-সুন্দরী

এই মানস-সুন্দরী, কবির বাসনাবাসিনী, কবিকে নিরুদ্দেশ যাত্রার আকর্ষণে মুগ্ধ করিয়া জানা হইতে অজানায়, শেষের মধ্যে যে অশেষ আছে তাহার দিকে লইয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জীবনদেবতা কবির নিকট রহস্যময়ীরূপেই প্রতিভাত, না-পাওয়ারূপেই বর্তমান।

চিত্রার যুগে রবীন্দ্রনাথের সহিত জীবনদেবতার পরিচয় নিবিড় হইয়াছে।

'চিত্রা'র যুগে এই জীবনদেবতা প্রথমে অন্তর্যামী, পরে জীবনদেবতা। এই অন্তরবাসিনী কবিশক্তির প্রেরণারূপিণীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

কবির অন্তর্যামী নিয়ন্তা কবিকে লইয়া কৌতুক করেন। কবির কাব্যে তাহার সৃজনলীলার আশ্চর্য রহস্য অভিব্যক্ত হয়। এই অন্তর্যামী জীবনদেবতা যখন কবির একান্ত আপন নিতান্ত সাধারণ সাদা সোজা কথার মধ্যে নিত্যবাণীর সুর মিশাইয়া দিয়া উহাকে অসাধারণ ও অনির্বচনীয় করিয়া তুলেন, তখন কবির আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কবির কথায় বা কবির বর্ণনায় এমন এক নবীনতার,—এমন এক অনির্বচনীয় সুরের সঞ্চার হয় যে কবির রচনা তখন আর ব্যক্তিগত থাকে না, উহা বিশ্বের হইয়া উঠে। একান্ত আপন কথায় বিশ্বজনীন সুর ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়া যান।—

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বলিতেছিলাম বসি' একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাসারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাষায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।

এই অন্তরতম জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিযাষ
আসি' অন্তরে মম।

যদিও জীবনদেবতাই মানুষের সুখদুঃখ তুচ্ছতা মহত্ত্ব সব মিলাইয়া মানুষকে গঠন করেন, তবু মানুষ যাহা হইয়া উঠে, তাহা জীবনদেবতার আদর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। আপনার আদি-অন্ত দান করিযাও মনে হয়, জীবনদেবতার প্রেমের বুঝি যথার্থ প্রতিদান দেওয়া হইল না। তাই কবির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে।

জীবনদেবতার পূজায় কবি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না', তাই পূজা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তাই তিনি জীবনদেবতাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আমার সমস্ত ব্যর্থতাও কি তোমার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে?

কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি,
করেছো কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বার বার ফিরে গেছ নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি'।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি?

তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি ॥

চিত্রার 'সাধনা' কবিতাতে কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে সম্বোধন করিয়াছেন দেবীরূপে। কবি মনে করেন যে জীবনদেবতার একটুকু স্নেহ-সুকোমল করুণা-কটাক্ষ লাভ করিলে তাঁহার সকল সৃষ্টি সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে— তাঁহার সৃষ্টিতে অনির্বচনীয়তা ফুটিয়া উঠিবে, কবির ব্যর্থতা সার্থকতায় পরিণত হইবে।

তুমি যদি দেবী, পলকে কেবল
করো কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি ॥

কবি বলেন যে তাঁহার অন্তরে সৃষ্টির যে উচ্চতম আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহা চরিতার্থ করিতে তিনি পারেন নাই— সাধ অনুযায়ী গান শুনাইবার সাধ্য তাঁহার হয় নাই।—

মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা ॥

কিন্তু—

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,
হৃদয়াসীনা।

ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

কবি বলিতে চাহেন যে জীবনদেবতাই তাঁহার সকল সৃষ্টিকে ব্যর্থতার মধ্য হইতে সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতেছেন। জীবনদেবতার নিকটে কবি তাঁহার সকল বিফলতা ও সফলতা উৎসর্গ করিয়া দিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

'চিত্রা'য় জীবনদেবতা-সম্বন্ধীয় শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে'। কবি বলেন যে জীবনদেবতার সঙ্গে কবির যে সম্বন্ধ তাহা কেবল ইহজগতেই পর্যবসিত হইবে না। পরলোকেও কবির সহিত তাঁহার জীবনদেবতা-রূপিণী প্রাণ-সঙ্গিনীর মিলন হইবে। সেই প্রাণলক্ষ্মী মৃত্যুর ছদ্মবেশে কবিকে জীবন-সিন্ধুর পরপারে লইয়া যাইবে। তারপর পরজীবনের কূলে উপস্থিত হইয়া সে যখন তাহার কালো ঘোমটা খুলিবে তখন জীবনদেবতার সেই পরিচিত মুখশ্রী দেখিয়া কবির আর বিস্ময়ের অন্ত থাকিবে না।

'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি,—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!

'চৈতালী'তে এই জীবনদেবতার প্রসাদে কবির দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে এবং পরিপূর্ণ বেদনার ভারে ফাটিয়া পড়িয়াছে।

কবি তখন তাঁহার কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁহার জীবনের সকল সম্বল উল্লাসভরে উৎসর্গ করিয়া বলিয়াছেন—

তুমি এসো নিকুঞ্জ-নিবাসে,
এসো মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব সমর্পণ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যতো
বনের বেদন-নিবেদন।

তারপর 'কল্পনা'র যুগে ক্লান্ত কবি যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন —যখন কবির মনে হইয়াছিল, 'ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি সম',

তখনও কবির জীবনদেবতা কবিকে তাঁহার কবিবীণায় নব নব সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য 'আবার আহ্বান' করিয়াছেন। কবিকে তাঁহার জীবন-দেবতা কোনোদিনও বৈরাগ্যের বাণী শোনান নাই— কারণ, কবির জীবনদেবতা চিরজাগ্রত। তিনি যে রাজ্যের রাণী সেখানে 'শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে বৈরাগ্যের বাণী' কখনও বাজে না। কবিও তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর এই আহ্বানে সাড়া দিলেন,— পরম উৎসাহভরেই বলিলেন—

বল তবে কী বাজাবো, ফুল দিয়ে কী সাজাবো
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, কোরোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান॥

জীবনদেবতা কবিকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ডাকিয়াছেন। কবির আত্মশক্তির উপর আস্থা আছে। তাই কবি জীবনদেবতার আহ্বানের উত্তর নির্ভীকভাবেই দিয়াছেন—

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়
হবো আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান-বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর
টুটিবে না বীণা।
নবীন প্রভাত লাগি' দীর্ঘরাত্রি রবো জাগি',
দীপ নিবিবে না।

'ক্ষণিকা' এবং 'উৎসর্গ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই জীবনদেবতার ইঙ্গিতেই নানা সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছেন। 'উৎসর্গে' জীবনদেবতার মুখের দিকে

চাহিয়া তিমির রাতে তরণী বাহিয়া ছুটিতে কবির মনে কোনোরূপ দ্বিধা নাই—

> অরুণ আজি উঠেছে
> অশোক আজি ফুটেছে,
> না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
> তবুও আজি চলিব ছুটে
> তোমার মুখ চাহিয়া।

'উৎসর্গ' কাব্যে জীবনদেবতাকে বিচিত্ররূপে উপলব্ধি করিবার কথাও আছে। কখনও কবি তাঁহার জীবনদেবতার রাজসভায় বাঁশি বাজাইবার ভার পাইয়াছেন,—কখনও প্রণয়ীরূপে তিনি কবির বাতায়নে আসিয়া কবিকে গান শুনাইয়া যান, কখনও তিনি ললাটে বহ্নিলেখার মত তিলকরেখা পরিয়া হাতে লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া ভীষণ মূর্তিতে দেখা দেন।

খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির মধ্যেও কবিমনে জীবনদেবতার অনুভূতি জাগিয়াছে এবং কবি তাঁহার জীবনদেবতাকে নানাভাবে দেখিয়াছেন, এবং দুঃখে, আনন্দে, প্রলয়ে, ঝড়ের রাতে অথবা দিনের আলোতে বিচিত্ররূপে ইঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন।

ইহার পর বলাকার যুগ। এই যুগে জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক নূতন চঞ্চলতা আনিল, রবীন্দ্রকাব্যে গতি দিল। রবীন্দ্রকাব্যে স্থিতির কথা নাই, পূজার ঘরে সন্ধ্যারতির দীপ জ্বালাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে আরাম ও বিরতি লাভের কথা নাই। উহা জীবনদেবতারই লীলা। খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির যুগে যাঁহাকে কবি ধ্যানের মধ্যে পাইয়াছিলেন, বলাকার যুগে তিনিই কবির প্রাণে সাড়া জাগাইলেন— কবিচিত্ত গতির উন্মাদনায় আকুল হইয়া উঠিল।

অতঃপর 'পূরবী'র যুগে— যখন

> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
> শেষ রাগিণীর বীণ—

কবি তখনও জীবনদেবতার আহ্বান শুনিয়াছেন। বহুদিন পরে— একেবারে তাঁহার জীবনসায়াহ্নে উপনীত হইয়া কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী বা কাব্যের প্রেরণারূপিণী জীবনদেবতার আহ্বান শুনিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলিয়াছেন—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হলো যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে।
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিঙ্কিণী!
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে হেরি॥

এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতা কবিকে যেন নবযৌবন দান করিয়াছেন। ইঁহার অস্তিত্ব কবি সমস্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভারের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ ইনিই নানা উপলক্ষ্যে ও নানা অবকাশে কবির জীবনকে স্পর্শ করিয়া কবিচিত্তকে বহুবার আনন্দে ও সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

'পূরবী'র আহ্বান নামক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনী কবি-শক্তির কথা আছে। কবির জীবনদেবতাই যে কেবল কবিকে আহ্বান করিয়া নব নব সৃষ্টির জন্য চিরজীবন ডাকিয়া ফিরিয়াছেন তাহা নহে, কবিও প্রকাশের ব্যথায়—সৃষ্টির আকুলতায় এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতাকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন আজীবন। তারপর যখন কবির সহিত কবিপ্রতিভার বা কবির অনুপ্রেরণাদাত্রীর সাক্ষাৎ হইয়া যায়, তখন তিনি নিজেকে কবি বলিয়া চিনিতে পারেন।—

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে-নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার,
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

এই লীলাসঙ্গিনী জীবনদেবতার অনুপ্রেরণা পাইয়া কবির আত্মোপলব্ধি

ঘটে, কবির কবিশক্তি সজাগ হইয়া উঠে। অব্যক্ত তখন ব্যক্ত হয়, অসাড়ের বুকে সাড়া জাগে।

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্ব'লে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

কবির জীবনদেবতা বহুবার কবির প্রাণে অভিসারিকার বেশে আসিয়াছিলেন। এখানেও তিনি অভিসারিকার বেশে আসিয়া উপস্থিত। সেই প্রণয়াভিসারিকার প্রতীক্ষায় কবি বাণীহারা হইয়া একাকী জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কবির চিত্তপ্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, তাঁহার মনোবীণা নীরব হইয়াছে— কিন্তু সেই অভিসারিকা লীলাসঙ্গিনী আসিয়া কবির চিত্তপ্রদীপের শিখাটিকে জ্বালাইয়া তুলিবে, কবির বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিবে। তখন প্রকাশের আনন্দে তাঁহার চিত্ত হইয়া উঠিবে উদ্বেল এই অভিসারিকা আসিয়া কবির সৃজনীপ্রতিভাকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিবে।

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি'
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা ব'সে জাগি'
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস॥

কবির চিত্ত কবিত্বসুধা বর্ষণের জন্য কাঙাল হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।

মরণের কূলেও কবির এই কবিত্বরসধারা-বর্ষণ ক্ষান্ত হইবে না। মরণের কূলেও কবির অন্তরের গহনবাসিনী নবমানসী— যাঁহাকে তিনি 'শেষ পূজারিণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনি— কবিরই গানের অর্ঘ্য দিয়া বরণডালা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মরণোত্তর কালেও কবি 'কবি' হইবার কামনা প্রকাশ

করিয়াছেন। তখন পূরবীর রাগিণী প্রভাতী ভৈরবীতে পরিণত হইয়া সেই নবজীবনের নীরবতার বক্ষে নবীন ছন্দের উৎস ছুটাইয়া দিবে।—

রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীন রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ফুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।

'পূরবী'তে আর দুইটি কবিতা আছে— 'দোসর' ও 'খেলা'। কবি তাঁহার আশৈশবের দোসরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হ'তে আমায় গেলে ডেকে।

'খেলা' কবিতায় কবি জীবনদেবতাকে খেলার সাথী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। জীবন-সায়াহ্নে এই খেলার সাথীর আহ্বান শুনিয়া তিনি বলিতেছেন—

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় কর্‌লে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথী।
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙীন শিখাব বাতি।

এই আমন্ত্রণের ফলে কবি অনুভব করেন—

যৌবন বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি!

তিনি বলেন যে আজ এই অস্তগামী সূর্যের অরুণিমা দিয়া কি উদয়কালের ছবি আঁকিতে হইবে?—

অরুণ আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে বাতি।
উদয় ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি।

কবির এই জীবনদেবতা চিরদিনই কবিকে বাঁধা-পথের নিয়ম মানিয়া চলিতে দেন নাই। চিরদিনই তিনি কবিকে ঘরছাড়া করাইয়া দিশাহারা ক্ষেপার দলে নিরুদ্দেশ ছুটাছুটি করাইয়াছেন। তাই আজ আবার সেই জীবনদেবতার

আহ্বানে কবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আজ আবার এই জীবনসন্ধ্যায় কি জীবনপ্রভাতের মতই কল্পনাবিলাসে দিনযাপন করিতে হইবে ?—

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কী তুমি যেমন ক'রে হলো দিনের সুরু,
তেমনি হবে সারা।
সে-দিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে,
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব ক্ষ্যাপার দলে তেম্‌নি আবার জুটে
কর্‌বে দিশেহারা।
স্বপন মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তা'র ছুটে,
তেমনি হবো সারা।

জীবনদেবতা যখন কবির কাছে যে বেশেই আসিয়াছেন কবি কখনও তাঁহাকে নিরাশ করেন নাই। কবি চিরদিনই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। সকল শ্রান্তি ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া সেই লীলাসঙ্গিনীর সহিত কখনও বাঁশী বাজাইয়া ফিরিয়াছেন, কখনও বা তাঁহার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া নিজের বীণার সুর বাঁধিয়া লইয়াছেন। তাই এবারেও সেই খেলার সাথী জীবনদেবতার ডাকে কবি বলিতেছেন—

জানি জানি, তুমি আমার চাওনা পূজার মালা,
ওগো আমার খেলার সাথী।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধ প্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি॥
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে অনুভব করিয়াছেন—

যাত্রা হ'য়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিম-পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।

তথাপি কবির জীবনদেবতা তাঁহাকে ক্লান্তি মানিতে দেন নাই। তাঁহাকে দিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ নব নব সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন—কবির গানের অর্ঘ্য লইয়া বাণী-বন্দনার ডালি সাজাইয়া লইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। তাই দেখি যে কবির জীবনদেবতা 'বিচিত্রা' যখন তাঁহাকে দিয়া 'দিনের অবসানে' বাণী-বন্দনার ডালি সাজাইয়া লইলেন, তখনও কবি সেই 'বিচিত্রা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

তবুও কেন এনেছ ডালি দিনের অবসানে ?
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি' নিঃস্ব করা দানে ?

'পরিশেষ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই জীবনদেবতার ইঙ্গিতেই চির-চলিষ্ণু।

হে মহা পথিক
অবারিত তব দশদিক।
তোমাব মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে ;
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

'বীথিকা'র যুগে এই জীবনদেবতার সহিত, সেই 'কৈশোরের প্রিয়া'র সহিত কবির সাক্ষাৎ হইয়াছে। কবির তখন মনে পড়িয়াছে—

গোপন গভীর রহস্যে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে !

এই জীবনদেবতাই যে কবির গানে অসীমের সুর মিশাইয়াছেন, এ উপলব্ধি কবির তখন জাগিয়াছে।

দেশের কালের অতীত যে মহাদুর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর,
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

ইহারই জন্য কবি তাঁহার জীবনে বারংবার আরতির দীপ জ্বালিয়াছেন, পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, নৈবেদ্যের থালা সাজাইয়াছেন, বরণডালা রচনা করিয়াছেন, বারে বারে ইহার উদ্দেশে ছন্দের ডালি কবি উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিয়াছেন—

তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা, কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে।

কিন্তু কবি শেষ গানে কখনও এই জীবনদেবতার শেষ স্পর্শ লাভ করিবার প্রয়াসী হন নাই। রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতার অনুসন্ধানের শেষ নাই, ইহার অচেনা রহস্যের নিরসন নাই। কারণ জীবনদেবতাকে বারবার পাওয়া ও হারানোতেই তিনি চিরসৌন্দর্যময়ী ও চিরনূতন। জীবনদেবতা চির-রহস্যময়ী বলিয়াই তিনি চিরপুরাতন হইয়াও কবির কাছে চিরনূতন।

চিত্রা

চিত্রা কবিতাটি লেখা হয় ১৮-ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সালে। 'পূর্ণিমায়' (১৬-ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ পূর্ণিমা), 'জ্যোৎস্না রাত্রে' (৬-ই মাঘ, ১৩০০)। জ্যোৎস্না-প্লাবনের মধ্যে সৌন্দর্যসভায় যে 'বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা' একাকিনী বিরাজ করিতেছেন, যে 'বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী' 'অনন্তের অন্তর-শায়িনী' তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—'আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা'। এই চিত্রা কবিতাটি সেই বিশ্ববিমোহনী বিশ্বসোহাগিনী বিশ্বব্যাপিনী ও অনন্তের অন্তরশায়িনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীরই বন্দনা। যে অমূর্ত অনাকার ভাবময় সৌন্দর্য সমস্ত আকারের মধ্যে, মূর্তির মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত প্রতিভাত প্রতিস্ফূর্ত হইতেছেন, তাঁহারই বন্দনা এই চিত্রা কবিতা। সৌন্দর্য সম্বন্ধে য়ুরোপীয় মনীষীদের কয়েকটি অভিমত দেখিলে এই কবিতার তাৎপর্য বুঝা সহজ হইবে।

The universe is the visible garment of the invisible God. —*Carlyle*

যিনি ভুবনসুন্দর, তাঁহারই অঙ্গবিভূতি এই বিশ্বসৌন্দর্য।

The Beauty of finite things arises out of their participation in the eternal and ideal archetypes. —*Plato.*

The Beautiful is the absolute ideal realising itself; nothing is truly beautiful except this, nothing, therefore, which exists in concrete form can be so termed. In the finite mind, the absolute ideal is always striving to realise itself, but never completely succeeds; there is only a ceaseless approximation. Beauty is rare, accidental, *fugitive*, and tarnished by intermixture with the not-beautiful. —*Hegel.*

Beauty is a state of the mind, a satisfaction, which is purely subjective. —*Kant.*

Order amid diversity makes up the concept of Beauty. —*Leibnitz.*

Beauty is the shining of the Idea through matter .... The beautiful is the manifestation of the idea.

Hegel, quoted in *Tolstoy's* What is Art.

সৌন্দর্য আকার বা form-এর অন্তর্নিহিত একটি ভাব—এই সৌন্দর্য অমূর্ত। যে রূপটিকে আম[illegible] বলি, তাহা অবিকল এই form বা image নয়। বিভিন্ন অবয়প-রস-গন্ধময় আকৃতি। কিন্তু আকৃতি সুন্দর মনে হইলেও তাহার বিভিন্ন অবয়ব করিয়া[illegible] সুন্দর নাও মনে হইতে পারে। অতএব সৌন্দর্য আকারে সংযুক্ত থাকিয়াই বা[illegible]রে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। ইহাকে কাণ্ট্ বলিয়াছেন—Free [illegible]auty; হেগেল বলিয়াছেন—Fugitive। সৌন্দর্য সম্বন্ধে রুচি ও মত প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন; কিন্তু সকল রুচি ও মতের বিরোধের মধ্যেও যাহা কটাটের উপর সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাই সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্যের বোধটিই Æsthetic Sense, Æsthetic Idea। কাণ্ট্ বলিয়াছেন যে সৌন্দর্য নিরাকার বা অমূর্ত হইলেও ইহা সৎ—ইহার একটি অস্তিত্ব আছে, সত্তা আছে—যাহা সুন্দর তাহা চিরকালই সুন্দর—যাহাকে কবি কীট্স্ বলিয়াছেন—"A thing of beauty is a joy for ever"। সৌন্দর্যের সঙ্গে বহির্বিষয়ের সম্পর্ক থাকিয়াও নাই। এইজন্য বাহ্য বিষয়ের মলিনতা বা কলুষ তাহাকে স্পর্শ করিয়াও নষ্ট করিতে পারে না। যখন সুন্দরকে অসুন্দর দেখি, তখন বুঝিতে হইবে আমিই তাহাকে কলুষিত করিয়াছি; দ্রষ্টার দৃষ্টিদোষে সুন্দর অসুন্দর-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। চন্দ্রের

কলঙ্ককে দেখিতে গেলেই চন্দ্র নষ্ট হয়। বাহ্য বিষয়ের সহিত সৌন্দর্যকে জড়িত করিলেই তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, তখন সৌন্দর্যসম্ভোগের আনন্দ ইন্দ্রিয়জ বা sensuous হইয়া দাঁড়ায়। সাকার সৌন্দর্য উপাসনার বস্তু নয়,—তাহাতে কামনা মিশ্রিত থাকে—তাহাতে গরল আছে, সুধা নাই। অমূর্ত free beauty-ই শ্রী লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া—সর্বব্যাপীর বক্ষোবিহারিণী; কারণ-বারিধি হইতেই তিনি সমুৎপন্ন হন, তিনি অত্রির মানস-কন্যা—অত্র যে বস্তু আছে তাহারই মধ্যগত ভাবসৌন্দর্য।

চিত্রা কবিতাটি হইতেছে জগৎলক্ষ্মীর বন্দনা। যে ভূমার পরিচয় কবি অন্তরের নিভৃত কোণে পাইয়াছেন, তাহাকেই তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত বিচিত্র রূপে দেখিতে চাহেন ও দেখিতে পান।

অথবা বলা যাইতে পারে যে এই কবিতায় কবি তাঁহার কাব্য সাধনার মনোগত আদর্শের একটা রূপ দিয়া তাঁহার সেই কাব্য-প্রেরণাকেই বন্দনা করিয়াছেন—যে কাব্য-কল্পনা তাঁহার সমস্ত কবিতার মূলে, যাহা তাঁহার সমস্ত রসসৃষ্টির মূল উৎস, তাহাকেই তিনি রূপকের ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা অন্তর্মুখী—বহির্মুখী নহে। বাস্তবের প্রতি তাঁহার যে সচেতন ভাব তাহাকেই বলা যাইতে পারে কবি[illegible]তনা, এবং বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তরে যে রূপ তিনি [illegible] পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার আত্মচেতনা। এখানে কবি বিশ্বচেতনা [illegible] আত্মগত কল্পনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনা[illegible] সীমাবদ্ধ করিতে পারেন নাই, তাহা বহুরূপে এই বাস্তব জগতে আব[illegible] রহিয়াছে। সর্বত্র তিনি সেই অন্তরের সৌন্দর্য-কল্পনার বিচিত্র রূপ প্র[illegible]ত দেখিতে পাইতেছেন। তাঁহার এই বিচিত্র কাব্য-কল্পনা নানা ভাবে [illegible]স্তব জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, তিনি বিচিত্ররূপিণী হইয়া কবির কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। এই সৌন্দর্য-কল্পনাকে কবি বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া মনোজগতে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন—বিশ্বভূমি হইতে মনোভূমিতে কাব্য-কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত বলিয়া অন্তর্জগতে কোনো চঞ্চলতা নাই, আছে কেবল সৌন্দর্যবোধ, প্রীতি, মধুরতা এবং ভাবনিমগ্নতা। সেখানে ভাবোন্মোদনার জন্য যে বেদনা হয় তাহা বাস্তবিক দুঃখ নয়, বিলাস—তাহা সুখেরই আতিশয্য; সেখানে তীব্রতা নাই, তাই সেখানে তৃপ্তি আছে। আনন্দ-বিহ্বলতাই তাঁহার শান্তিময়ী কল্পনা-

মূর্তির পূজার একমাত্র উপকরণ। এখানে কবির এই বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি অন্তর্মুখী কল্পনাকে বহির্মুখী কল্পনা হইতে বড় করিয়াছেন।

কাব্য-প্রতিভা বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। যে কাব্য-রস আমরা প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগ্রহ করি তাহা এবং কাব্যচ্ছন্দে সাধারণ ভাবে যাহা প্রকাশ করিতে পারি তাহা বহির্মুখ, আর সেই সংগ্রহের আনন্দ ও উপলব্ধি আমাদিগকে যখন আত্মসমাহিত করে এবং তখন অন্তর-মন্দিরে যে মানস-প্রতিমার অদ্বিতীয়তার রূপ সৃষ্টি করে তাহা অন্তর্মুখ।

যে কাব্যরস অথবা সৌন্দর্যবোধ আমরা জগতের বৈচিত্র্য হইতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহরণ করি, তাহা সদা-চঞ্চল। 'নীল গগনে' তাহার অপরূপ আলোক, 'ফুল-কাননে' তাহার অভাবনীয় পুলকের শিহরণ; 'চিত্তে' তাহার মধুর চঞ্চল নৃত্য সহস্র রাগিণীর সৃষ্টি করে; গঠনে, পঠনে, চিত্রণে, রচনায়, রূপ-প্রকাশে তাহার বিচিত্র ধারা; বিচিত্রতায় ভরা তাহার মহিমা। কবি চিত্রী শিল্পী এই কল্পনাকে অসংখ্য বিচিত্র রূপে সৃষ্টি করেন ও বাহিরে প্রকাশ করেন। এইখানে চঞ্চল তাহার গতি, অশান্ত তাহার স্বভাব, বিচিত্র তাহার প্রভাব।

কিন্তু এই বাহিরের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির আনন্দ যখন একটা স্থির শান্ত অচপল রূপ ধারণ করিয়া অন্তরে সুসমাহিত হয় ও অনৈসর্গিক আত্ম-চেতনার সৃষ্টি করে, তখনই বাহিরের সেই সৌন্দর্য-আহরণের ও সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রকৃত সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় ঘটে। এই অন্তরাত্মার উপলব্ধির কোনো প্রকাশ একটা বিশিষ্ট রূপে বা ছন্দে বা চিত্রে নাই, এখানে আছে শুধু আনন্দের অনুভূতি; ইহা একটা ধ্যানের অবস্থা—যোগের অবস্থা—একটা পূজার একাগ্র ভাব; অনুভূতিতেই ইহার সার্থকতা।

সমস্ত চঞ্চলতা চপলতা বিচিত্রতা থামিয়া গিয়া একটা 'স্থির শান্তি', একটা 'বিপুল বিরতি', একটা 'অনিমেষ মূরতি', একটা 'মৌন মহিমা'র রূপ ধারণ করিয়াছে—যাহা 'অন্তর-মাঝে শুধু একা একাকী'। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহা শুধু একটি 'চন্দ্রকান্তি', সমস্ত চঞ্চলতায় অশান্ততায় ইহা শুধু একটি 'বিপুল বিরতি', বিপুল কোলাহলের মধ্যে ইহা শুধু একটি 'মৌন মহিমা'। অন্তরের সর্ব-গোপন প্রকোষ্ঠে কবির এই মানস-প্রতিমা কাব্য-সরস্বতীর নীরব পূজা চলিতে থাকে। ইহা কবির আপন আনন্দানুভূতিরই বন্দনা।

এই পূজার প্রসাদ কেবল পূজারীরই ভোগ্য—এই অর্ঘ্যের নির্মাল্য কেবল কবিরই প্রাপ্য।

কবি তাঁহার কবি-কল্পনাকে এক নূতন রূপে এখানে উপলব্ধি করিতেছেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে একটা সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়—এবং সেই সৌন্দর্যকে কেবল অন্তর দিয়াই উপলব্ধি করা যায়। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়া মানুষ বহির্জগতের সৌন্দর্যকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ ও ধারণ করে। এই বহির্জগৎ অর্থাৎ রূপ-জগতের সৌন্দর্য গ্রহণ করা যায় একটা concrete বস্তুকে অবলম্বন করিয়া। সেই বহির্জগৎ রূপ-জগৎ (concrete জগৎ) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কবি অন্তরে Æsthetic Beauty-কে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেই রূপের অনুভবে তিনি একটা মনো-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মনোজগতে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পূজারী তিনি একা একাকী। সেইখানে তিনি বহির্মুখী চেতনা হইতে আত্মচেতনায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং সেইখানে তিনি তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই মনোজগৎ স্থান-কালের অতীত। সেখানে তিনি মানবত্বের চঞ্চলতা অতিক্রম করিয়া দেবত্বের শান্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই কবি তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সৌন্দযের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই সৌন্দর্য, সেই আনন্দ সাধারণের ধারণার অপেক্ষা অনেক অধিক।

অন্তর-মাঝে ভূমার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু জ্ঞাতার নিজের অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে। আপন অভিজ্ঞতার মধ্যে অনন্ত ভাবের আধার যে স্থির অখণ্ড একত্বময় জ্ঞ-স্বরূপ সত্তা আছে, কবি তাঁহার চিত্রা কবিতায় তাহাকেই সম্বোধন করিতেছেন।

এই চিত্রা কাব্য যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তখন ইহার পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> এই তুমিটি যে কে, তাহা কবিতাটি পড়িয়া ধরিবার জো নাই। হয়তো অভিধানে সে নাম নাই। হয়তো ইনি 'সোনার তরী'র 'মানস সুন্দরী', কবির হৃদয়ের জাগ্রত দেবতা।

বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই এক অচপল; অন্তরের প্রশান্ত একই বাহিরের বিচিত্ররূপিণী। মনের মধ্যে বস্তু-নিরপেক্ষ অনাকার একটি সৌন্দর্যবোধ থাকে বলিয়া বস্তুকে আকৃতিকে সুন্দর বোধ হয়। আবার অন্য দিকে বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই অসংখ্য বস্তুর অন্তর্গত একটি বিশেষ সত্তাকেই আমরা সৌন্দর্যবোধ বলি। কবি রূপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে

বিচিত্ররূপিণী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্তরের একাকিত্বের মধ্যে অনুভব করিতেছেন। এ যেন খাঁচার পাখী ও বনের পাখীর পরস্পরের কাছে আনাগোনা—খাঁচার মাঝে অচিন পাখীর আসা-যাওয়া।)

স্বয়ং কবি তাঁহার এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে এই কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি সুস্পষ্ট হইতে পারে।—

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুল্ছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জান্ছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হ'য়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হ'লে মানুষকে মনমরা করে।

শাস্ত্রে আছে,—এক বল্লেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এ'কেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তা'র বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট ক'রে তুল্ছে 'আমি আছি'—এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ, অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।—সাহিত্যতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, ১৩৪১ বৈশাখ।

পূর্ণিমা

(১৩-ই অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা, ১৩০০)

এই কবিতাটি ভাবুক কবির নিজের অভিজ্ঞতার ফল। ইহা আমরা তাঁহার ছিন্নপত্র হইতে জানিতে পারি। (ছিন্নপত্র, শিলাইদা, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৪, ও শিলাইদা, ১১-ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫, দ্রষ্টব্য)।

উর্বশী

(২৩-এ অগ্রহায়ণ, ১৩০২)

চিত্রা পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উহার এক পরিচয় লেখেন। তাহাতে উর্বশীর পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—

পৌরাণিক উর্বশীর নাম করিয়া কবি যাহার স্তব করিয়াছেন, তাহাকে অনেক কবি অনেক দিন হইতেই স্তব করিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন—Ewige weibliche—The Eternal Woman, উর্বশীমূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন

আদর্শ রমণীকে দুই ভাগ করিলে এক ভাগে The Beautiful, আর এক ভাগে The Good পড়ে। উর্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তবগান।

রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি সম্বন্ধে কবীন্দ্রের জীবনী-লেখক ও কাব্য-সমালোচক টমসন সাহেব বলিয়াছেন—

Urbasi is perhaps the greatest lyric in all Bengali literature and probably the most unalloyed and perfect worship of beauty which the world's literature contains.

—অর্থাৎ উর্বশী কবিতাটি সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা এবং সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যের মধ্যেও সৌন্দর্যের অনাবিল পূর্ণপরিণত পূজার শ্রেষ্ঠতম কবিতা।

রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী ইহার বহু পূর্বেই লিখিয়াছিলেন:

বাস্তবিক উর্বশীর ন্যায় সৌন্দর্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

উর্বশী কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী এই বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—

উর্বশী কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যকে সমস্ত মানব-সম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে, তাহার বিশুদ্ধিতায়, তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।...জগতের বিচিত্র চঞ্চল সৌন্দর্য সকল সম্বন্ধাতীত এক অখণ্ড সৌন্দর্যে নিবিড় লীন।...সৌন্দর্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা। জগতের রহস্য-সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষণে-ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎচঞ্চল আঁচলদোলানোর আভাস পাওয়া যায়...ইহারই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল কম্পিত, ইহারই স্তনহারচ্যুত মণিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ববাসনার বিকশিত পদ্মের উপরে ইহার অতুলনীয় পাদপদ্ম স্থাপিত।

মোহিতচন্দ্র সেন কবির কাব্যগ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে সমস্ত কবিতাগুলিকে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল। তাহার 'নারী'-বিভাগের প্রথম কবিতাই এই উর্বশী। এই চিরন্তনী নারী সম্বন্ধে এমিয়েল বলিয়াছেন—

"Woman would be loved without reason, without analysis, not because she is beautiful or good, or cultivated, or gracious, or spiritual, but because she exists."

—Henri Frederic Amiel, *Journal Intime*.

আমি স্বয়ং কবিকে ইহার মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত আমার মতের মিল না হইলেও পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, তাহা আমি নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।—

উর্বশী যে কী, কোনো ইংরেজী তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাইনে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই এব্‌স্ট্র্যাক্ট্—সে তো বস্তু নয়—সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। 'নারীর' মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোনো কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল এব্‌স্ট্র্যাক্ট্ সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যে-হেতু নারীরূপকে অবলম্বন ক'রে এই সৌন্দর্য, সেইজন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে, তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি, সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়,—সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়,—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।

মনে রাখ্‌তে হবে উর্বশী কে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ-সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহ-সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।

কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় ক'রেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য। রসবোধের সঙ্গে পেটুকতার যে তফাৎ, এতেও সেই তফাৎ। ভোজন-রসিক যে, ভোজ্যকে অবলম্বন ক'রে এমন কিছু সে আস্বাদন করে যাতে তার রুচির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করে। পেটুক যে, তার ভোগের আদর্শ পরিমাণগত, রসগত নয়। সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়। উর্বশীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহ ধারণ করেছে, সুতরাং তা এব্‌স্ট্র্যাক্ট্ নয়।

মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্তভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে এব্‌স্ট্র্যাক্ট্‌ভাবে কেবলমাত্র তার ধ্যানেই আছে, কোনোখানেই তা বিষয়ীকৃত হয়নি, এ কথা মান্‌তে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গলোকের অবতারণা। যা আমাদের ভাবে রয়েছে এব্‌স্ট্র্যাক্ট্, স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন যে-কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যহ দেখতে পাইনে, অথচ যা আছে আমাদের ভাবে, সত্যযুগে মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তবরূপে এই কথা মনে ক'রে তৃপ্তি পাই।—তেমনি এই কথা মনে ক'রে আমাদের তৃপ্তি যে, নারীরূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়,

স্বর্গে তার প্রকাশ উর্বশী-মেনকা-তিলোত্তমায়। সেই 'বিগ্রহিণী' নারীমূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।

অন্ততঃ পৌরাণিক কল্পনায় এই উর্বশী একদিন সত্য ছিল, যেমন সত্য তুমি আমি। তখন মর্ত্যলোকেও তার আনাগোনা ঘটত, মানুষের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ ছিল—সে সম্বন্ধ এব্‌স্ট্র্যাক্ট নয়, বাস্তব। যথা পুরুরবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্বশী। আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে—কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিমা কোথায় গেল।

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী।

একটা কথা মনে রেখো। উর্বশীকে মনে ক'রে যে সৌন্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হোতো—হয়তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচু সুর লাগ্‌ত। কিন্তু রসিক লোকে কাব্যের বিচার এমন ক'রে করে না। উর্বশী উর্বশীই, তাকে যদি নীতি-উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী ক'রে গড়্‌তুম তা হলে ধিক্‌কারের যোগ্য হতুম।

—২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

আমি কিন্তু এই কবিতাটিকে এই ভাবে দেখি নাই। কবিতাটিকে আমি এইরূপ বুঝিয়াছি—উর্বশী বস্তুনিরপেক্ষ abstract ও absolute সৌন্দর্য।

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ। যে সৌন্দর্য Absolute, যাহা Essential Beauty, যাহা অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড সৌন্দর্য—যাহা Spirit of Beauty, তাহা সমস্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও বাহিরে, তাহা সকল মানব-সম্পর্কের অনায়ত্ত ও অতীত, তাহা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তামাত্র। এইজন্য ইংরাজ লেখকেরা বলিয়াছেন :—

The only beautiful things are things that do not concern us.

—Oscar Wilde.

That Beauty in which all things walk and move.

—Shelley, The Revolt of Islam.

'Tis the Beauty of all beauty that is calling for your love.

—A.E. (George William Russel).

Beauty lives though lilies die.

—James Elroy Flecker, The Golden Journey to Samarkand.

What is beautiful artistically is the object of delight apart from any interest. *—Emmanuel Kant.*

সেই অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্ভব জগতের রহস্য-সমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্য হইতে। এই উর্বশী বিশ্বসৌন্দর্যের চরম প্রকাশ, তাই তাহার ক্রমপরিণতি নাই এবং তাহার প্রত্যেক ক্রিয়া সুন্দর ও অপূর্ব। প্রকৃতির ও আকৃতির ভিতর দিয়া সেই সৌন্দর্য আমাদের আয়ত্তের অতীত, অনধিগম্য। উর্বশী 'বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী', উর্বশীর অনুপম রূপ ধ্যানপরায়ণ মুনির মনকেও চঞ্চল করিয়া দেয়, মুনি ঋষি যোগী কবি ভোগী সকলেই সৌন্দর্য-লাভের জন্য ব্যাকুল,—কারণ, Truth is Beauty and Beauty Truth; অথচ বস্তু-নিরপেক্ষ অ্যাব্‌সোলিউট্ সৌন্দর্যকে সম্ভোগ করিবার কোনো উপায় নাই। সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই উর্বশীর এক হাতের সুধাভাণ্ড এবং তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে না পারার যে অতৃপ্তি ও বেদনা তাহাই তাহার অন্য হাতের বিষভাণ্ড। ইহাকেই সুইন্‌বার্ণ বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

"Before thee the laughter, behind thee the tears of desire.
A better flower from the bud
Sprung of the sea without root,
Sprung without graft from the years."

—*Swinburne*, Birth of Love.

"Perilous goddess born of the sea-foam."

—*Swinburne*.

অপরূপকে সমস্ত অনুভবের মধ্যে উপলব্ধি এবং সৌন্দর্যের সুতীব্র অথচ নির্মল অনুভূতি এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা বস্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের স্তুতি— যাহা ভোগাতীত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যাহা অনির্বচনীয়, যাহার কোনও মূর্তি নাই, বিশ্বের সহিত কোনও বন্ধন নাই এবং যাহার কোনও বন্ধন বা সম্বন্ধ নাই, এবং যাহা কোনও স্থূল বাস্তব পদার্থ নহে, সেই অবিশেষণযোগ্যা বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রাণীকে বলা হইয়াছে উর্বশী। পূর্ণা সৌন্দর্যদেবী নিজে নিজের জননী, তিনি প্রথম হইতেই পূর্ণপ্রস্ফুটিতা। আমাদের মনের মধ্যে এই সৌন্দর্যদেবীর একটি পরিকল্পনা আছে। যে-কোনও বাস্তব পদার্থের মধ্যে সেই কল্পনালোকের একটি রশ্মি প্রতিফলিত হয়, এবং সেই রশ্মির দীপ্তিটিকেই আমরা সুন্দর বলি। সিন্ধুর তরঙ্গাভিঘাত, শস্যশীর্ষের শিহরণ, উল্কাগণের ছুটাছুটি এবং সঙ্গীতের

মূর্ছনা, সকলই আমাদের নিকটে অতি সুন্দর বোধ হয়, তাহার কারণ আমাদের মানস-স্বর্গে সৌন্দর্যদেবীর যে নৃত্য চলিতেছে, তাহারই তাল-মান-সুসঙ্গত ভূষণ-শিঞ্জনের একটু আভাস উহাদের মধ্যে পাই। সেই সৌন্দর্যদেবীর জন্যই বিশ্বমানব কাঁদিয়া আকুল। বর্ষাকালে যখন সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ হয়, তখন মনে হয় যে আকাশও যেন তাঁহারই জন্য অশ্রুবিসর্জন করিয়া ক্রন্দসী হইয়াছে। তাঁহারই জন্য কুসুমাকর বসন্তকালেরও অতৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। যেমন—

আশাবন্ধঃ কুসুম-সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি।

সেইরূপ আমাদেরও মনেব হতাশার ক্রন্দনের মধ্যে আশা জাগিয়া থাকে যে একদিন তাঁহার দর্শন মিলিবেই মিলিবে। কিন্তু উর্বশী নিজেই বলিয়াছেন— দুরাপনা বাতম্ ইবাহম্ অস্মি— আমি বাতাসের মতন অধরা। ইহাকেই কবি এ. ই. ও দার্শনিক হেগেল বলিয়াছেন—The Fugitive.

আমাদের দেশের পৌরাণিক কল্পনায় ও প্রাচীন কবি-কল্পনায় উর্বশী স্বর্গের ছন্দ ও নৃত্যের পরিপূর্ণ মূর্তি এবং আদর্শ সৌন্দর্যের প্রতীক। আদর্শ সৌন্দর্যের বন্দনা এবং বর্ণনা করিতে গিযা রবীন্দ্রনাথ পুরাণবর্ণিত কল্পমূর্তি উর্বশীকে গ্রহণ করিয়াছেন।

সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিক কবি কালিদাসেব বিক্রমোর্বশী নাটকের উর্বশীও রূপবতী হইয়াও রূপাতীত অপরূপ। তাঁহার উর্বশী কেবল সৌন্দর্য রূপিণী, যুবতী-শশিকলা, যূথিকা-শবল-কেশী, স্থিরযৌবনা। বাংলার কবিও উর্বশীকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী!

সেই উর্বশীর ক্রমবিকাশ নাই, দেশকালে সৌন্দর্যের ন্যূনাধিক্যের তারতম্য নাই, সে চিরন্তনী, স্বসম্পূর্ণা! এই উর্বশী 'অলঙ্কারো সগ্‌গস্‌স'—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু ভালোর ভাণ্ডার স্বর্গ, সেই স্বর্গেরও অলঙ্কারস্বরূপা এই উর্বশী।

(বিক্রমোর্বশী, ১ম ও ৪র্থ অঙ্ক)

পুরূরবা একস্থ-সৌন্দর্যদিদৃক্ষু হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বসৌন্দর্য-স্বরূপিণী উর্বশীকে প্রেয়সী করিয়াছিল। কিন্তু ভোগ-বাসনাতে সৌন্দর্য কলুষিত হয়,

তাই রূপসী উর্বশীকে সেবাদাসী করিবার বাসনা প্রকাশ পাওয়াতে উর্বশী পুরুরবার উপর কুপিতা হইয়া সৌন্দর্যের জন্মভূমি হিমালয়ের একান্তে কুমার-বনে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত কামনাপরবশ পুরুরবা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে শরীরিণী দেখিতেছিল; এখন তাহাকে হারাইয়া তাহাকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখিতে লাগিল।—

তখন বর্ষাকাল।

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্ দূরসংস্থে।—

মেঘোদয় হইলে প্রিয়পার্শ্ববর্তী জনেরও চিত্ত উদাস হয়, বিরহী জনের তো কথাই নাই।

পুরুরবার চিত্তও প্রিয়া-বিরহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সে কল্পনায় সর্বত্র প্রিয়ার আবির্ভাব অবলোকন করিতে লাগিল। বর্ষার আবির্ভাবে নূতন ভূঁইচাপা ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া পুরুরবা বলিতেছে—

আরক্ত-কোটিভিব্ ইয়ং কুসুমৈব্ নবকন্দলী মলিনগর্ভৈঃ।
কোপাদ অন্তর্বাষ্পে স্মরযতি মাং লোচনে তস্যাঃ॥
রক্ত-প্রান্ত কৃষ্ণ-মধ্য নবকন্দলী ফুল
যেন গো তাহার কোপছলছল লোচন রাতুল।

সেই সুগাত্রী উর্বশীর অলক্তক-রঞ্জিত পদরাগ বনস্থলীর বুকে অঙ্কিত দেখিতে দেখিতে পুরুরবা চলিযাছে। কিছুদূর গিয়া সে দেখিল—হরিদ্বর্ণ শাদ্বলাচ্ছাদিত স্থানে রক্তবর্ণের ইন্দ্রগোপ কীট বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; অমনি তাহার ভ্রম হইল সেখানে বুঝি লাল-বুটি-দেওয়া টিয়াপাখীর পেটের ন্যায় ফিকে-সবুজ-রঙের কাপড় তাহার প্রিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে—শুকোদরশ্যামম্ স্তনাংশুকম্! ময়ূরের 'মৃদুপবন-বিভিন্নো ঘন-রুচিব-কলাপঃ'—মৃদু পবনে বিচ্ছিন্ন ঘন মনোরম চন্দ্রক-অঙ্কিত কলাপ দেখিয়া পুরুরবার মনে পড়িল 'সুকেশ্যাঃ কুসুম-সনাথঃ কেশপাশঃ'—সেই সুকেশীর কুসুম-ভূষিত কেশপাশ! রাজহংসকূজন শুনিয়া পুরুরবার ভ্রম হয় বুঝি সে উর্বশীর নূপুর-শিঞ্জন শুনিতেছে। পুরুরবা হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

মদখেলপদং কথং নু তস্যাঃ
সকলং চৌর গতং ত্বয়া গৃহীতম্?

কেমন ক'রে কর্‌লি রে চোর এমন অপহরণ
আমার প্রিয়ার চরণ হতে লীলাঞ্চিত গমন?

পুরুরবা নদীর রূপে সাকার উর্বশীকেই দেখিতে পাইল—

তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিত-বিহগশ্রেণি-রসনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনম্ ইব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতম্ অভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবম্ অসহমানা পরিণতা॥

(বিক্রমোর্বশী ৪র্থ অঙ্ক)

নদীতরঙ্গ প্রিয়ার ভ্রূকুটি, মুখর পাখীর মেখলাখানি,
পুঞ্জিত ফেন অঙ্গের বাস গমন-ত্বরায় শিথিল মানি।
এঁকে-বেঁকে তার স্খলিতগমন দেখিয়া আমার মনেতে ভায়
প্রেয়সী আমার কোপের জ্বালায় গলিয়া নদীর রূপেতে ধায়!

পুরুরবা উর্বশীকে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিয়াছে আর দেখিতেছে—উর্বশী সীমার সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। পুরুরবা চলিতে চলিতে পথে গৌরীচরণ-কৃতাঙ্গরাগ-যোনি একটি মণি কুড়াইয়া পাইল—সেই মণিটিতে গৌরীর চরণের অলক্তকরাগ জমাট বাঁধিয়া রূপ ধরিয়াছে, সেটি পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর মিলনের সোনার কাঠি বা জীয়নকাঠি। কিন্তু পুরুরবা জানে না যে সেটি মিলনমণি; সে রক্তাশোকস্তবক-সমরাগ সেই মণিটিকে সুন্দর দেখিয়া মন্দারপুষ্প-অধিবাসিতা উর্বশীর শিখাতে অর্পণ করিবে বলিয়া উহা তুলিয়া লইল। তখনি তাহার মনে হইল—সৈব প্রিয়া সংপ্রতি দুর্লভা মে—সেই প্রিয়া তো এখন আমার দুর্লভ, এ মণি তবে কি হইবে? তখনি সে তাহার অন্তরে এই দৈববাণী শুনিল যে, সে তাহার প্রিয়াকে নিশ্চয় ফিরিয়া পাইবে। তখন সে সেই মণিটি রাখিয়া দিল।

চলিতে চলিতে পুরুরবা দেখিল, একটি লতা কুসুমবিরহিতা শূন্যাভরণা মেঘজলে আর্দ্রা হইয়া রহিয়াছে। সেই নিরলঙ্কারা লতাকে দেখিবামাত্র পুরুরবার মনে হইল—কোপবশে ত্যক্তভূষণা আর্দ্রনয়না তন্বী শ্যামাঙ্গী এই তো আমার প্রিয়া! সে উর্বশীভ্রমে সেই লতাকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সেই মিলন-মণির স্পর্শ লাগিয়া লতাটি উর্বশীর রূপ ধারণ করিল। পুরুরবা যে উর্বশীকে এতক্ষণ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখিতেছিল, সেই বিচ্ছিন্ন রূপকে এখন একটি লতার

বাহুল্যবর্জ্জিত শ্রীর ভিতর হইতে একত্র কুড়াইয়া পাইল। উর্বশীর সঙ্গে মিলন হইলে পুরুরবা উর্বশীকে বলিল—

মোরা-পরহুঅ-হংস-রহঙ্গং
অলি-গঅ-পব্বঅ-সরিঅ-কুরঙ্গম্।
তুজ্ঝহ কারণে রগ্ন ভমন্তে
কো ণ হু পুচ্ছিঅ মঞি রোঅন্তে?

(বিক্রমোর্বশী, ৪র্থ অঙ্ক)

ময়ূর কোকিল হাঁস আর চক্রবাকে
অলি গজ পর্বতে দেখেছি যাহাকে
নদী ও হরিণে পুছি কাননে ভ্রমিয়া
তোমারি কারণে প্রিয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

উর্বশীকে লইয়া পুরুরবা রাজধানীতে ফিরিবে। তখন সে অপ্সরা উর্বশীকেই অনুরোধ করিল—

অচিরপ্রভা-বিলসিতৈঃ পতাকিনা,
স্থর-কার্মুকাভিনব-চিত্র-শোভিনা।
গমিতেন খেলাগমনে বিমানতাং
নয় মাং নবেন বসতিং পয়োমুচা॥

ললিতগমনা প্রেয়সী আমার, নিয়ে চলো ফিরে মোরে
আমার বাড়ীতে, নূতন মেঘকে রথে পরিণত ক'রে,
বিজলী-বিলাস হবে চঞ্চল পতাকা রথের শিরে,
ইন্দ্রধনুটি রথের চিত্র সকল অঙ্গ ঘিরে।

যতদিন উর্বশী পুরুরবার কাছে কেবলমাত্র ভাবরূপিণী, abstract ও ideal মাত্র, ততদিন পুরুরবা আর উর্বশীর অবিচ্ছেদ মিলন—পুরুরবা উর্বশীকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছে। তখনই পুরুরবা উর্বশীর মিলন-মণি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। কিন্তু অপ্সরা উর্বশীকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিতেই একটি শ্যেন পক্ষী তাহাদের মিলন-মণি হরণ করিয়া লইয়া পলাইল।

পুরুরবা আর উর্বশীর মিলনের একটি সর্ত ইন্দ্র স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে দিন পুরুরবা উর্বশীর সন্তান সন্দর্শন করিবে, সেইদিন তাহাদের মিলনের অবসান হইবে। উর্বশীর সন্তান-সম্ভাবনা হইল; কিন্তু উর্বশী পুরুরবার সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে পুত্র আয়ুকে গোপনে চ্যবন-ঋষির আশ্রমে তাপসী সত্যবতীর নিকট

পালন করিতে দিয়া আসিল। চ্যবন সেই ঋষি, যিনি বৃদ্ধ হইয়াও পুনর্যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। সেই চিরযৌবনের আশ্রম হইতে সত্যবতী একদিন উর্বশীর পুত্র আয়ুকে লইয়া তাহার পিতা-মাতার হাতে সমর্পণ করিবার জন্য রাজধানীতে আসিলেন। সত্যবতীর আবির্ভাবে সৌন্দর্য-কল্পনার মিথ্যা কুহক টুটিয়া গেল—উর্বশী আর সম্বন্ধাতীত ভাবমাত্র রহিল না, পুরুরবা ও উর্বশীর বিচ্ছেদ আসন্ন হইয়া আসিল; কিন্তু কল্পনার ইন্দ্রজালে সম্মোহিত পুরুরবা অনুমান করিতে লাগিল উর্বশী তাহার আজীবন-সহধর্মিণী, যতদিন আয়ু তাহার নিকটে আছে ততদিন উর্বশীর স্মৃতিও তাহার নষ্ট হইবার নয়। সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত করা রীতিবিরুদ্ধ হওয়াতে কালিদাস আয়ু ও ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রের আশীর্বাদের রূপকে উর্বশীকে পুরুরবার আজীবন-সহধর্মিণী করিয়া দিয়াছেন।

সুন্দরকে সম্ভোগ করিবার কামনা মনে স্থান দিলে অভিশপ্ত হইতে হয়, এ কথা কবি কালিদাস তাঁহার অনেক কাব্যেই প্রচার করিয়াছেন। শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত যখন কেবলমাত্র ভোগলিপ্সার আকর্ষণে মিলিত হইতে চাহিয়াছেন, তখন তাঁহারা শাপগ্রস্ত হইয়াছেন। পার্বতী যখন মদনকে সহায় করিয়া শিবের হৃদয় জয় করিতে চাহিয়াছেন, তখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কামপরবশ যক্ষকে প্রভুশাপে প্রিয়ার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে নির্বাসিত হইতে হইয়াছিল। কালিদাস দেখাইয়াছেন—বিরহী যক্ষ দূরবন্ধুর্গতিঃ হইয়া প্রিয়ার রূপের আদল বহু বস্তুতে দেখিতে পাইয়াছে; কিন্তু মনের মধ্যে ভোগবাসনা প্রবল থাকাতে সে কিছুতেই সমগ্র রূপকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাই যক্ষ খেদ করিয়া বলিয়াছে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতং।
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্॥
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্।
হন্তৈকস্থং ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যম্ অস্তি॥

(মেঘদূত, উত্তরমেঘ)

তব অঙ্গের লীলা দেখি আমি শ্যামা-লতিকার দোদুল দোলে,
চন্দ্রেতে মুখ চকিত দৃষ্টি হরিণীর টানা আঁখির কোলে,
ময়ূর-বর্হে কেশরাশি তব, ভ্রূবিলাস নদীবীচির গায়,
একস্থানে তবু ছবিটি তোমার হেরি না তো কভু কোপনা হায়!

যক্ষ তাহার প্রিয়াকে লাভ করিবার লালসায় ধাতুরাগ দিয়া শিলাপট্টের উপর

প্রিয়ার ছবি আঁকিয়াছে; কিন্তু যখনই সেই ছবিকে সে লালসার দৃষ্টিতে দেখিতে যায়, তখনই তাহার দৃষ্টি অশ্রুজলে আচ্ছন্ন হয়, আঁকা ছবি সে আর দেখিতে পায় না; স্বপ্নে সে প্রিয়ার দর্শন যদি বা পায়, তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া তাহার প্রসারিত ভুজদ্বয় শূন্যকেই বুকে বাঁধিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে; তাহার দুঃখে বনদেবতারা শিশিরাশ্রু বর্ষণ করে—

ত্বাম্ আলিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদ্ ইচ্ছামি কর্তুম্,
অস্রৈস্ তাবন্ মুহুর্ উপচিতৈর্ দৃষ্টির্ আলুপ্যতে মে;
ক্রূরস্ তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥
মাম্ আকাশ-প্রণিহিত-ভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতোর্
লব্ধায়াস্ তে কথম্ অপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু,
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্ তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥

প্রণয়কুপিতা, তোমার ছবিটি শিলাতলে লিখি ধাতুর রাগে,
চরণে পড়িয়া সাধিব তোমায় এমন ইচ্ছা মনেতে জাগে;
অশ্রুজালেতে দৃষ্টি আমার রুদ্ধ হয় গো আঁখির পাতে,
ক্রূর কৃতান্ত পারে না সহিতে মোদের মিলন ছবিরও সাথে।
স্বপ্নে তোমারে দেখিলে কখনো আলিঙ্গনের জন্য হায়,
ব্যাকুল দুহাত বাড়ায়ে বক্ষে বাঁধি গো কেবল শূন্যতায়!
আমার দুঃখে বনদেবতার চোখের অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,
মুক্তা-সমান শোভা পায় তাহা তরু-কিশলয় ফুলের পরে।

রাজা অজ প্রেয়সী পত্নী ইন্দুমতীকে হারাইয়া বিলাপ করিতে করিতে হারানো প্রিয়ার সৌন্দর্য প্রকৃতির মধ্যে পরিক্ষিপ্ত দেখিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন—

কলম্ অন্যভৃতাসু ভাষিতং
কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলম্ ঈক্ষিতং
পবনাধূত-লতাসু বিভ্রমাঃ।
ত্রিদিবোৎসুকয়াপ্যবেক্ষ্য মাং
নিহিতাঃ সত্যম্ অমী গুণাস্ ত্বয়া।

(রঘুবংশ, অজবিলাপ, ৮।৫৯, ৬০)

তুমি তো স্বর্গের সুষমা, মর্ত্যে কিছুদিনের জন্য স্খলিত হইয়া পড়িয়া আমার প্রিয়া-রূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছিলে; তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও—

কোকিল-কণ্ঠে কণ্ঠের স্বর,
মরাল-গমনে গতি মনোহর,
হরিণ-নয়নে দৃষ্টি চটুল,
দোদুল লতায় ভঙ্গী অতুল,
সান্ত্বনা দিতে রেখে গেছ হায়
স্বর্গে যাবার বিষম ত্বরায়।

রামচন্দ্রও সীতাহরণের পর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রকৃতির সর্বত্র প্রিযার সাদৃশ্য পরিব্যাপ্ত দেখিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করেন; কিন্তু বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে বিরহব্যাকুল রামচন্দ্র সেই প্রিয়াচ্ছবি আর দেখিতে পাইতেছেন না; তাই তিনি বিলাপ করিযা বলিয়াছেন—

যৎ-ত্বন্-নেত্র-সমান-কান্তি সলিলে মগ্নং তদ্ ইন্দীবরম্;
মেঘৈর্ অন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী;
যেঽপি ত্বদ্‌গমনানুকারি-গতযস্ তে রাজহংসা গতাঃ;
ত্বৎ-সাদৃশ্য-বিনোদ-মাত্রম্ অপি মে দৈবং ন হি ক্ষাম্যতি।

তোমার নেত্র-সমান-কান্তি সুনীল-নলিনী সলিলে ডুবে;
তোমার মুখের ছবি-অনুকাবী চন্দ্র ঢেকেছে মেঘের স্তূপে,
তোমাব গমন-অনুকারী রাজহংসেরা গেছে মানস-সরে,
সদৃশ বস্তু দেখার তৃপ্তি-টুকুও দৈব লুপ্ত করে।

প্রিয়ের সঙ্গে মিলনে সেই প্রিয় নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিরহে প্রিয়ের রূপ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। রূপের বাঁধন ভাঙিলেই রূপাতীত অপরূপ প্রকাশ পায়। এই তত্ত্বটি অনেক কবিই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।— রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিশুর বিদায়' কবিতায় খোকাকে দিয়া বলাইয়াছেন যে, সে তাহার মাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও মাকে একেবারে ছাড়িয়া যাইবে না; সে হাওযার স্পর্শ হইযা, জলের শীতলতা হইয়া, বৃষ্টির শব্দ হইয়া, বিদ্যুতের চমক হইয়া, জ্যোৎস্না হইয়া, স্বপ্ন হইয়া তাহার মাকে বারংবার দেখা দিবে—

পুজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে—
"খোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে?"

বলিস্—"খোকা সে কি হারায় !
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে-কোলে !"

শেলী তাঁহার সন্তানের বিয়োগে লিখিয়াছিলেন—

Where art thou, my gentle child?
Let me think my spirit feeds,
With its life intense and mild,
The love of living leaves and weeds
Among these tombs and ruins wild!—
Let me think that through low seeds
Of the sweet flowers and sunny grass
Into their hues and scents may pass
A portion..........................

(To William Shelley, অসম্পূর্ণ কবিতা)

কোথায় তুমি বাছা আমার, কোথায় তুমি হায় ?
তোমার মধুর উজল জীবন
হয়তো জোগায় সরস গোপন
তরু-তৃণের আনন্দিত বাঁচার প্রেরণায় !
এই শ্মশানের বিজন বাসে
ঘাসের রঙে ফুলের বাসে
গোপন বীজের প্রাণের মাঝে নূতন জীবন পায় !

এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রসজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন—

সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরম্ ইহ বিরহো ন সঙ্গমম্ তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব যদ্ একা ত্রিভুবনম্ অপি তন্ময়ো তদ্ বিরহে ।

মিলন-বিরহ মাঝে বিরহ বরং ভালো মিলনের চেয়ে—
মিলনে সে একটাই, বিরহে রহে যে প্রিয়া ত্রিভুবন ছেয়ে ॥

সৌন্দর্যজগতে ভাবরাজ্যে এই তত্ত্ব যেমন ভাবে কবিরা প্রয়োগ করিয়াছেন, ঠিক তেম্নি ভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ভাবুক ভক্ত কবিগণ ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাবুক ভক্তেরা বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক সৌন্দর্যের মধ্যে সর্ব-সৌন্দর্যাধার যিনি তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান; ঊষার গোলাপী আলোকে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড দাহনে, গোধূলির ধূসরতায়, সন্ধ্যার লালিমায়, রাত্রের গভীর অন্ধকারে ও প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায়, লতায় ফুলে পল্লবে, জলে স্থলে, সর্বজীবের

ব্যবহাব-লীলায় সর্বত্র সর্বকালে অখণ্ড সৌন্দর্যমূর্তিরই স্ফূর্তি দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন। এইরূপ অবস্থাকে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। এইরূপ একটি মানসিক অবস্থাকে রূপক উপাখ্যানের ছদ্মবেশেব ভিতব দিয়া ভাগবত পুবাণেব ভাবুক কবি বর্ণনা কবিয়াছেন—

তা রাত্রীঃ শরদুৎফুল্ল-মল্লিকাঃ

সেই বাত্রি শবৎকালেব আগমনে প্রস্ফুটিত মল্লিকাফুলে সুশোভিত ও আমোদিত হইয়াছে, বমাব আননেব ন্যায় অখণ্ডমণ্ডল নববুঙ্কুমারুণ চন্দ্র উদিত হইয়া বনবাজিকে বঞ্জিত কবিযাছে। সেই শাবদজ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে ব্রজগোপীবা কৃষ্ণেব বাঁশীব গান শুনিল। তৎক্ষণাৎ তাহাবা ব্যাকুল হইযা হাতেব বাজ ফেলিযা বাহিব হইয়া পডিল—

দৃষ্ট্বা বন কুসুমিতং বাকেশ-বব-রঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজৎ-তরুপল্লব-শোভিতম্

দেখিল কানন কুসুমভূষণ পূর্ণচাঁদেবি জ্যোৎস্না মাতা,
যমুনা-বিহাবী শীতল বায়ুতে লীলাচঞ্চল বৃক্ষপাতা।

এই সৌন্দযপুঞ্জেব মধ্যে তাহাবা দেখিল অনিন্দ্যসুন্দব অখিল-বসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ কবিতেছেন। এই শ্যামসুন্দবেব দর্শনে গোপীদেব মনে যেই ভোগবাসনা উদ্দীপ্ত হইল অমনি অবণ্যজনপ্রিয় কৃষ্ণ তবল আনন্দেব ন্যায় কুমুদামোদিত বায়ু দ্বাবা বীজ্যমান হিমবালুক যমুনাপুলিনে অন্তর্ধান কবিলেন। তখন প্রিযেব প্রতিরূঢ-মূর্তি তদাত্মিকা গোপীবা প্রিয়েব ভাবে তন্ময় হইয়া সর্বত্র প্রিযেব মূর্তি প্রতিভাত দেখিতে লাগিল এবং সকলেব মধ্যগত অথচ সকলাতীত সেই সৌন্দযমূর্তি প্রিযকে অন্বেষণ কবিতে কবিতে জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল—

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদ অশ্বত্থ-প্লক্ষ ন্যগ্রোধ
কচ্চিৎ কুরুবকমশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ।
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্ মল্লিকে জাতি-যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধব॥
কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর বিভাসি?

দেখেছ তোমরা অশথ, পাকুড়, বট তুমি কি গো দেখেছ তায়?
কুরুবক নাগকেশর অশোক চম্পা চামেলি দেখেছ হায়?

মল্লী মালতী জাতি ও যূথিকা মধুময় তারে দেখেছ মানি,—
তাই তোমাদের এত আনন্দ, শোভা দেছে তার পরশখানি।
ওগো ধরিত্রী, বলো বলো বলো কোন্ সে গোপন-পুণ্যতপ
তার চরণের পরশে জাগাল অঙ্গে পুলক-মহোৎসব!

গোপিকারা বৃন্দাবনের প্রতি পদার্থে কৃষ্ণের আবির্ভাব অনুভব করিতে করিতে বনভূমিতে সকল বস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মার চরণ-চিহ্ন দেখিতে পাইল—

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতাস্-তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥

এইরূপে তারা কৃষ্ণে ঢুঁড়িয়া পুছিল ব্রজের লতা ও গাছে—
বনের বুকেতে পরমাত্মার পায়ের চিহ্ন দেখিল আছে!

একটি গোপী কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছে মনে করিয়া যে মুহূর্তে নিজেকে কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভাবিয়া গর্বিতা হইয়া উঠিল এবং কৃষ্ণকে একান্ত নিজস্ব করিবার বাসনা তাহার মনে উদিত হইল, অমনি কৃষ্ণ তাহার কাছ হইতে অন্তর্ধান করিলেন। গোপীরা অন্তর্হিত কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"দিন-শেষে তুমি যখন গোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করো তখন নিবিড়-ধূলিপটলে-ধূসরিত নীলকুন্তলে-আবৃত তোমার বদন-কমল প্রদর্শন করিয়া আমাদের মনে অনুরাগ ও সঙ্গলিপ্সা উজ্জীবিত করিয়া দাও, কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ দাও না।"

অকস্মাৎ অন্বিষ্যমানা গোপিকাদের সম্মুখে সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ পরমশ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন এবং

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎ-কুন্দ-মন্দার-সুরভ্যানিল-ষট্পদম্॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহ-ধ্বস্ত-দোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ত-তরলাচিত-কোমল-বালুকম্॥

বিশ্বব্যাপক বিভু সুন্দর-সুন্দরীদের সঙ্গে ল'যে
চলিল যমুনাপুলিনে যেথায় সুরভি অনিল যেতেছে ব'য়ে—
অলিচুম্বিত কুন্দ-মাদার চুমিয়া বহিছে গন্ধবহ,
শরৎশশীর জোছনা যেথায় বধিছে আঁধার অশিব সহ,
কৃষ্ণা যমুনা তরল হস্তে বিছায়ে দিয়েছে কোমল বালি,
সকলের আজ প্রাণের হরষ নিঃশেষে সব দিতেছে ঢালি।

শ্রীকৃষ্ণ সেই যমুনাপুলিনে গোপীদের লইয়া রাসমণ্ডলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রত্যেক গোপী মনে করিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাহার পাশেই বিরাজ করিতেছেন— তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্ দ্বয়োঃ— মণ্ডলাকারে অবস্থিত প্রত্যেক দুজন গোপীর মধ্যে তাহারা কৃষ্ণকে বিরাজমান দেখিতে লাগিল। এবং শ্রীকৃষ্ণ—

চকাস গোপী-পরিষদ্-গতো-ঽর্চ্চিতস্
ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্ দধৎ ॥
[ভাগবত, ১০।২৯-৩৩]

গোপীচক্রে অর্চিত হয়ে হইল শোভান্বিত—
ত্রিলোক চুনিয়া শোভা-সম্ভার একটি দেহস্থিত।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, যিনি সত্য শিব সুন্দর ভগবান্ তিনি সকল সম্বন্ধাতীত অথচ সর্বগত; পূর্বকালের ঋষিরা তাই বলিতেন— সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, তাঁহারা জড়ের ও রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু বিজ্ঞান ঘোষণা করিতেছে— জড়ই সব, ব্রহ্ম-তত্ত্ব মানুষের কল্পনা মাত্র। সে কল্পনার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে যুগ আর ফিরিবে না— 'ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী, অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।' কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা এই কথায় মিটে না— 'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে, অয়ি অবন্ধনে!'

রূপাতীত যে সৌন্দর্য তাহাকে উপলব্ধি করা যায়, উপভোগ করা যায় না। এ কথা শেলী তাঁহার Hymn to Intellectual Beauty— অনুভব-বেদ্য সৌন্দর্য-বন্দনা নামক কবিতায় বলিয়াছেন—

Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form, where art thou gone?

ওগো সৌন্দর্যের লক্ষ্মী, আপন প্রভাতে
মণ্ডিত কর গো তুমি মহামহিমাতে
মানবের রূপ-রাগ যা-কিছু সুন্দর।
কোথায় রয়েছ তুমি ওগো মনোহর?

উর্বশীর আভাস আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্ররূপে পাই—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশি!

ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা!

এই উর্বশীকে—বস্তুনিরপেক্ষ সৌন্দর্যকে পাওয়ার চেষ্টাই জগৎব্যাপারের চিরন্তন সমস্যা। বিশ্বপ্রকৃতি সেই অ-ধরা উর্বশীকে ধরিতে না পারিয়া ক্রন্দসী হইয়া আছে—তাহার সে ক্রন্দনের বিরাম আজ পর্যন্ত হয় নাই, সে অ-ধরাকে ধরিতে না পারিয়া শূন্য বক্ষ মেলিয়া আকাঙ্ক্ষিত হইয়া আছে—

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।
ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশি!

একদিন কোনও এক শুভলগ্নে প্রকৃতির প্রাণস্বরূপিণী সৌন্দর্যময়ী উর্বশী মূর্তি ধারণ করিয়া জীব-রূপী প্রত্যেক পুরুরবাকে কৃতার্থ করে, তারপর অকস্মাৎ একদিন সেই মূর্ত সৌন্দর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হইয়া যায়—যে এক সময়ে একটি বিশেষ স্থান কাল ও রূপকে আশ্রয় করিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, সে-ই পরক্ষণে অসীমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন মানুষের প্রাণে জাগিয়া থাকে কেবল অন্তবিহীন আশা আর শ্রান্তিবিহীন অন্বেষণ, আর তাহার অন্তর অপ্রাপ্তির অতৃপ্তিতে হাহাকার করিয়া বলিতে থাকে—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী!

* * * *

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে!

কবিতাটির শেষ স্ট্যাঞ্জায় কল্পনাবিলাসী কবির, ভাবপ্রবণ আইডিয়ালিস্টের অন্তরের আক্ষেপ আছে। তথাপি সৌন্দর্যের পূজারী কবি রূপের মধ্যে অপরূপের রূপাতীতের আভাস পাইয়াছেন।

বিজয়িনী

(১-লা মাঘ, ১৩০২)

এই কবিতায় কবি সৌন্দর্যদেবীর জয়ঘোষণা করিয়াছেন। এই কবিতাটি যেন একখানি সুন্দর চিত্র। যে দৃশ্য চিত্রকর নানা রঙে জীবন্ত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ ভাষার তুলিকা দ্বারা ভাবের রং লাগাইয়া কথার ফুলে খচিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

স্বচ্ছতোয়া অচ্ছোদ সরোবর। বসন্ত কাল। বেলা দ্বিপ্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। কোকিলের কুহুতান, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি, গন্ধবহ বায়ুর নিঃশ্বাস একত্র মিলিয়া এই নিস্তব্ধতাকে মধুরতর করিয়া রাখিয়াছে। সরসীর স্বচ্ছ জল কানায় কানায় পূর্ণ। তাহার চতুর্দিকে সবুজ তৃণক্ষেত্র যেন একখণ্ড মখমলের আস্তরণের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতা ফুলফলে সুশোভিত। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে রবির কিরণ আলোছায়ার সুন্দর আল্‌পনা আঁকিয়াছে। সবই সুন্দর সবই শোভায় ও সম্পদে পূর্ণ। সেখানে—

সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া-রৌদ্রকরে,
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে,
বসন্ত-দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাবে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে।

এই সু-সম সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে বিরাজমানা, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য দিয়া গঠিতা সুষমাময়ী কল্যাণী এক নারীমূর্তি। দীর্ঘ কেশরাশি তাহার সমস্ত অবয়বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, অচ্ছোদ-সরসী-নীরে সেই অনুপমা সুন্দরী তরুণীর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। রমণী একটি শ্বেতহংসকে আদর করিতেছে। সৌন্দর্যের ও প্রেমের সকল প্রকার উপকরণ সেই স্থানে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং এইরূপ স্থানে স্বভাবতঃই মদনের আবির্ভাব হয়। বসন্তসখা মদন বকুলের তলে পুষ্পাসনে লুকাইয়া বসিয়া নিরাবরণা মোহিনী সুন্দরী তরুণীর স্নানলীলা দেখিতেছিল। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের লীলানিকেতনে আবির্ভূত হইয়াও মদন তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইল।

এই আখ্যায়িকাটির ভিতর হইতে একটি বিশেষ সুন্দর তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যখন প্রত্যেক চেতন ও অচেতন পদার্থ এইরূপ সুন্দর ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই আমরা বলিতে পারি যে সৌন্দর্যদেবী অবতীর্ণা হইয়াছেন। কারণ, অন্তরের সেই পূর্ণা একীভূতা সৌন্দর্যদেবীই জগতের নানা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে বিক্ষিপ্তা ও চঞ্চলা হইয়া চিত্রা-রূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন। মদন নর-নারীর উপরে, এমন কি দেব-দেবীর উপরেও, তাহার শর নিক্ষেপ করিতে পারে; কিন্তু যিনি ইঁহাদের সকলের সৌন্দর্যের কারণ, যাঁহার জন্য মদনও সৌন্দর্য ও মাদনা লাভ করিয়াছে, সেই আদ্যা সৌন্দর্যজননী সম্পূর্ণা ও নিরাবরণা সৌন্দর্যদেবীর নিকট মদনের মস্তক অবনত না হইয়াই পারে না। তাই কামদেব এই দেবীর চরণে তাহার তূণ সমেত সমস্ত পুষ্পশর উপহার দিল। মদনের পুষ্পশরের মহিমা কোথা হইতে আসিয়াছে? সৌন্দর্যদেবীর ইচ্ছাতেই মদনের শরের এত উন্মাদনা, তাহার পুষ্পধনুর এত গুণ। মদন পূর্ণরূপ তো আর কখনোই দেখে নাই। যিনি পরিপূর্ণা, সকল সৌন্দর্যের আধার তাঁহাকে দেখিলে আর লোভ বা লালসা তো থাকে না, থাকিতে পারে না। তাঁহার দর্শনে চক্ষু নিমেষহীন হইয়া যায়, মনে তৃপ্তি ও ভক্তির উদয় হয়। তখন মনে আসে 'অকূল শান্তি', সেখানে 'বিপুল বিরতি'।

যুবতী সুন্দরী নারীর দেহরূপের উগ্র আভায় মুগ্ধ হইয়া তীব্র লালসার আবেগে পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহাকে ভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, এবং কুণ্ঠাহীন ও বিবেকশূন্য হইয়া কামনার অনলে নিজেকে পূর্ণাহুতি দেয়, সেই লালসাপূর্ণ রূপই আবার কামনায়-ভরা যুবতী-দেহের অন্তরতম অন্তরে আর এক অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে; তাহা অনবদ্য, তাহা পবিত্র, তাহা স্বর্গীয়, তাহা দেবীত্বের আত্মপ্রকাশ। তৃপ্তিহীন অশ্রান্ত ভোগের লালসা—উগ্রকামনা—উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা তাহার পূজার অর্ঘ্য নয়; সেই অপরূপ দেবীরূপের কাছে পুরুষ সমস্ত কামনা লোলুপতা লালসা বিসর্জন দিয়া নতশিরে শ্রদ্ধাপ্রণতি জানায়। নিষ্ঠা সংযম ও ভক্তিই সেই পূজার অর্ঘ্য। নারীদেহের রূপ কামনা বাড়ায়, লালসা জাগায়, দেহ-মন বিহ্বলতায় ভরায়, আবার তাহারই অন্তরের দেবীমূর্তি বিস্ময় ও ভক্তিতে হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া দেয়। সুন্দর নারীর দেহের রূপ,—সুন্দরতর তাহার অন্তরের রূপ।

নারীর দেহের রূপকে ভোগ করিতে পুরুষ সদাই ব্যগ্র; সেই বাহ্য রূপশিখা তাহার সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়, তাই দেহভোগের জন্য পুরুষের মনে কামনা জাগে; কিন্তু বিভিন্ন দৈহিক রূপের মধ্যে যে অন্ত

একটি চির-সত্য নিত্য শাশ্বত চির-পবিত্র চির-সুন্দর চিরপূজ্য চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারা আছে, তাহারই সত্তার অনুভূতিতে পুরুষ কামনারহিত হইয়া নারীর পায়ে প্রণতি জানায়; পুরুষের সমস্ত কামনা ও লালসা দেবীরূপে প্রকটিত সেই নারীর পদপ্রান্তে ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

এই তত্ত্বটিকে প্রকাশ করিবার জন্য কবি বিজয়িনী কবিতায় দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিতা যে স্নানরতা সিক্তবসনা পরিপূর্ণযৌবনা রমণীর দেহের সুপরিব্যক্ত রূপকে ভোগ করিবার জন্য অনঙ্গদেব কামনায় বিহ্বল হইয়াছিল, সেই রমণীরই অন্তরতম অন্তরবাসী রূপের সন্ধান ও অনুভূতি যখন সে লাভ করিল, তখন—

সম্মুখেতে আসি'
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখ পানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি' বসি' নির্বাক্ বিস্ময়-ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি'।

তৃপ্তিহীন ভোগের জন্য যে রূপের কাছে মদন আসিয়াছিল, সেই রূপকেই এখন পূজা করিয়া সে আনন্দ পাইল এবং পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিল। নারীর দেহের রূপ মদনকে কেবল আকর্ষণই করিয়াছিল, কিন্তু বিজয়িনী হইল নারীর অন্তরের শাশ্বত দেবীমূর্তি। যখন মদন বিজয়িনীর কাছে পরাভব মানিল, তখন—

নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

অচ্ছোদ-সরোবরের প্রথম উল্লেখ ও বর্ণনা দেখা যায় মৎস্যপুরাণের ১২১ পরিচ্ছেদে। এই সরোবর 'কামনার মোক্ষধাম'—অলকার এবং মদন-দহন মহাদেবের আবাস কৈলাস-পর্বতের মধ্যস্থানে, মন্দাকিনী-নদীর উৎস-সন্নিধানে। ইহার পরে মনে পড়ে বাণভট্টের কাদম্বরী-কথায় অচ্ছোদ-সরোবরের কাহিনী। সেই সরোবরের তীরে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র-চরিত্রা মহাশ্বেতা তাঁহার মৃত স্বামীর জীবনলাভের জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। সে তপস্যাক্ষেত্রে মদনের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁহার বৈধব্যের সকল ক্লেশ ও নিষ্ঠা দয়িতের

পুনর্জীবনলাভের জন্য জাগিয়া থাকিয়া মদনের প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রহরা দিত, কোনও বাধা বা কামনা বা প্রলোভন তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। পুণ্ডরীকের সহিত যে অচ্ছোদ-সরোবরের তীরে মহাশ্বেতার প্রথম সাক্ষাৎ হইতে প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল, সেই প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি মৃতমগ্ন স্বামীর প্রতি তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের কাল পর্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন। তিনি তাঁহার আচরণের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে প্রেমের অর্থ পূজা, সম্ভোগ নহে। তাই বৈশম্পায়ন-রূপী পুণ্ডরীক মহাশ্বেতাকে দেখিয়া কামোন্মত্ত হইলে মহাশ্বেতারই শাপে তিনি শুক-পক্ষীতে পরিণত হন। সেই আখ্যায়িকাই বোধ হয় কবিকে এই কবিতারচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

উর্বশী ও বিজয়িনী কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যকে সমস্ত মানব-সম্বন্ধের সিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার অখণ্ডতায উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব নিহিত আছে।

—অজিতকুমার চক্রবর্তী।

হ্যারল্ড্ মনরো একজন অতি আধুনিক ইংরেজ কবি (Georgian poet)। তিনি তাঁহার Children of Love নামক একটি কবিতায বর্ণনা করিয়াছেন যে, শিশু মদন শিশু যিশুখৃষ্টকে দেখিয়া তাহার বাণ আঘাত করিল। ইহার জন্য যিশু মদনকে কোনো তিরস্কার করিলেন না, তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইল, তাঁহার চক্ষে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, তথাপি তিনি নির্বাক্ হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মদন অপ্রতিভ হইয়া শিশু যিশুর কাছে আসিয়া বলিল—ভাই, তুমি আমার ধনুর্বাণ লইয়া আমাকে আঘাত করো। কিন্তু যিশু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে প্রস্থান করিলেন এবং বিস্মিত মদন যিশুর ব্যবহারের রহস্য না জানিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ কবিতায় পাশ্চাত্ত্যের কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে যিশু প্রেমের দ্বারা ক্ষমার দ্বারা সকলকে জয় করিতে চাহেন, কামনা লালসা লোভের প্রলোভনের দ্বারা নহে।

তুলনীয়—

Beauty sat bathing by a spring,
    Where fairest shades did hid her;
The winds blew calm, the birds did sing,
    The cool streams ran beside her.
My wanton thoughts enticed mine eye
    To see what was forbidden :

But better memory said Fie,
So vain desire was hidden.

—Anthony Munday (1553-1633),
Beauty Bathing.

Methinks her sweet looks make all things else
Beauteous and glad, might kill the fiend within you.

—Shelley, *Cenci.*

এই কবিতাকে নিখুঁত ভাবে সাজাইবার জন্য নিপুণ শিল্পী কবি সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ আহরণ করিয়াছেন। স্থান কাল এবং পাত্রী সকলই সৌন্দর্যের চরম উপাদান দিয়া গঠিত। এই অত্যুত্তম চিত্র সকল দিক্ দিয়াই নিখুঁত হইয়াছে এবং নিপুণ শিল্পীর সকল পরিশ্রম সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে—এই চিত্র আঁকিবার উদ্দেশ্যও তাঁহার সফল হইয়াছে।

আবেদন

(২২-এ অগ্রহায়ণ, ১৩০৩)

এটি একটি ক্ষুদ্র কাব্যনাটিকা, Poetic Dialogue,—রাণী ও তাঁহার ভৃত্যের কথোপকথনে গ্রথিত। মহামহিমময়ী মহারাণী কল্পতরু হইয়া তাঁহার অনুগত ভৃত্যদিগকে তাহাদের প্রার্থনা-অনুযায়ী ধন মান পদ গৌরব গুরু-কর্তব্যের ভার দিয়া যখন অবসর লইবেন, তখন নির্জন সভায় সকলের শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল এক ভৃত্য, সেও মহারাণীর প্রসাদপ্রার্থী। সভাশেষে অসময়ে সে আসিয়াছে; কারণ, সে ভিড়ের মধ্যে হাবাইয়া যাইতে চায় না, সে একাকী মহারাণীর দৃষ্টিতে পড়িতে চায় এবং তাহার প্রার্থনাও সামান্য—

এক কর্ম কেহ চাহে নাই—
ভৃত্য 'পরে দয়া ক'রে দেহ মোরে তাই,—
আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর।

রাণী ভক্ত ভৃত্যের প্রার্থনা পূরণ করিলেন—খুশী হইয়া তিনি বলিলেন—

তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর!

এইটুকু আখ্যায়িকা। ইহার ভিতরে তত্ত্ব কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু কেন আমরা সেই তত্ত্বের জন্য মাথা ঘামাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, পুরুষের সঙ্গে রমণীর যে সম্পর্ক, তাহার মধ্যে যে মাধুর্য আছে তাহাই তো

কবিতার পক্ষে যথেষ্ট। যাহাকে ইংরাজীতে বলে human interest, তাহা থাকিলেই তো কবিতা সার্থক হইল। মানব-হৃদয়ের এই অতি চিরন্তন কাহিনীই তো কবির কবিত্ব উন্মেষ করে এবং তাঁহার কবিতাকে মাধুর্য দান করে। (দ্রষ্টব্য পঞ্চভূত, কাব্যের তাৎপর্য।)

মনে করা যাক, সেই মহারাণী তরুণী রূপসী, আর সেই ভৃত্য তরুণ সুপুরুষ। উভয়ের উভয়কে ভালোবাসা কিছু বিচিত্র আশ্চর্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সেই ভৃত্য নিজের প্রাণের গোপন ভালোবাসা সেই মহামহিময়ী মহীয়সী মহারাণীর কাছে প্রকাশ করিতে পারে না,

> Because her womanhood is such
> That, as on court-days subjects kiss
> The Queen's hand, yet so near a touch
> Affirms no mean familiarness..............
> —Coventry Patmore (1823-1899), *The Married Lover.*

আর সেই মহারাণী ভৃত্যের মনোগত ভাব অনুভব করিয়াও তাহাকে জানিতে দেন না যে তিনি তাহার অনুরাগের আভাস পাইয়াছেন। সেই ভৃত্য চাহিল যে সে রাণীর মালঞ্চের মালাকর হইয়া থাকিবে। রাণী তাহাকে সেই কর্ম সানন্দে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— কি লইবে পুরস্কার?

ইহার উপর আবার পুরস্কার? এমনই যদি ভৃত্যের সৌভাগ্য ও মহারাণীর বদান্য প্রসন্নতা, তবে—

> প্রত্যহ প্রভাতে
> ফুলের কঙ্কণ গড়ি', কমলের পাতে
> আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
> ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি' মম
> আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
> প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
> চিত্রি' পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
> লেশমাত্র রেণু—চুম্বিয়া মুছিয়া লব,
> এই পুরস্কার।

রাণী পরম গম্ভীর হইয়া বলিলেন—

> ভৃত্য, আবেদন তব
> করিনু গ্রহণ!

এই যে মনের মধ্যে চাপা লুকানো প্রণয়ের ছবিটি, ইহাই কি সুন্দর নয়? কবিই তো বলিয়াছেন—'লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!'—(মানসী, ব্যক্তপ্রেম।)

এখন যাঁহারা গভীর তত্ত্বকথা না হইলে খুশী হন না, তাঁহাদের জন্য কী তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায় দেখা যাক।

রাণী হইতেছেন বিশ্বপ্রকৃতি, 'বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বসোহাগিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী'। তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য, অতুলন মহিমা। ভৃত্য স্বয়ং কবি। কবির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধের কথা এই কবিতায় রূপকে বলা হইয়াছে। কবিজীবনের চরম আদর্শ বিশ্বসৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে সেবা করা। রাণীর যত ভৃত্য আছে, কেহ বা স্বর্ণতরী লইয়া দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যায়, কেহ বা রাণীর জয়ধ্বজা লইয়া দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়ায়, কেহ বা যশ ধন কামনা করে রাণীর নিকটে, কেহ খনি হইতে হীরক মণি স্বর্ণ আহরণ করে, এবং তাহারা রাণীর প্রসাদপ্রার্থী হইয়া রাণীর সিংহাসনের পার্শ্বে ভিড় করিয়া থাকে। কিন্তু কবি একাকী মহারাণীর মালঞ্চের মালাকর মাত্র হইতে চাহেন। কেবল বিশ্বপ্রকৃতির শোভা-সুষমার তিনি মালা গাঁথিবেন। ইহা সাংসারিক প্রয়োজনের দিক্ হইতে মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর।

এই কবিতায় কবি তাঁহার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী, সৃষ্টির মূলাধার আদ্যাশক্তিকে সম্বোধন করিতেছেন—ইহাও বলা যাইতে পারে। কর্মই মানবজীবনের একমাত্র ধর্ম। এই জগৎ একটা কর্মপ্রবাহ, এবং কর্মশক্তিই এই জগৎযন্ত্রের মূল। নানা ভাবে সেই শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। সেই মূলাধার আদ্যাশক্তি কোন্ কেন্দ্রে বসিয়া চন্দ্র সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের অণুপরমাণু পর্যন্ত সমস্ত জগৎকে কর্মে চালনা করিতেছেন। এই কর্ম-কোলাহলময় জগতে প্রত্যেক বস্তু আপনাকে কর্মের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মানুষও আপনার জীবনের প্রত্যেকটি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সফল দেখিতে চায়, তাই জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে সেও আপনাকে তাহারই সন্ধানে কঠিন কর্মের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কর্মীরা মনে করেন এই রূঢ় বাস্তবতার জগতে, এই কর্মময় জগতে কবির কোনো মূল্য নাই, কবি কেবল আবেশের বশে স্বপ্ন রচনা করেন, তাঁহার কাজ মানুষের কোনো কাজে বা প্রয়োজনে লাগে না, কবির কাজ অলসতারই নামান্তর। কর্মীর কাছে কবির গান, পাখীর কাকলি, আর ফুলের সৌরভ নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। কর্মীরা যুগে যুগে জগৎকে নব

কলেবর দান করিয়া আসিতেছেন, আর কবি ও শিল্পীরা কেবল আলস্য-বিলাসে দিন যাপন করেন, কল্পনার জাল বুনিতেই তাঁহাদের আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ কবিপ্রাণ কর্মী মানুষের এই অবজ্ঞার কথা মনে করিয়া বলিতেছে যে—কর্মময় জগতে কর্ম সর্বত্র আছে। আত্মার বা হৃদয়ের নিভৃত নির্জন অন্তঃপুরেও কর্ম আছে। কিন্তু সেই কর্ম অন্য প্রকারের। সেই কর্মের মূল্য নিরূপণ করা যায় না—কোনো-কিছু দ্বারা তাহাকে যাচাই করিয়া তাহার নিরিখ স্থির করা যায় না। কিন্তু সেই কর্ম আনন্দ সৃষ্টি করে। কবির কাব্য-কল্পনা কমল-বিলাসীর স্বপ্ন-রচনা মাত্র নয়, জগতে তাহারও মূল্য আছে, প্রয়োজন আছে। মানুষ পশু মাত্র নহে, তাই সে চায় তাহার কর্মের অন্তে অবসর-মুহূর্তগুলি স্নেহ প্রেম সেবা প্রীতি আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে; এই অবসর মুহূর্তে মানুষের প্রাণের খোরাক জোগানোই কবির প্রধান কাজ। কবি বিশ্বশক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই আবেদন করিতেছেন যে, যদিও তিনি তাঁহার জন্য অন্য কোনো কাজ করিতে পারিবেন না, তথাপি তিনি তাঁহার অবসর-মুহূর্তগুলি আনন্দ দিয়া ভরিয়া দিবার এবং সুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া তুলিবার ভার লইতে চাহেন। (তুলনীয় "পুরস্কার" কবিতায় কবির উক্তি।) আর-সকলে চারিদিকে যেমন কাজ করিতেছেন, কবি তেমন কাজ হয়তো করিতে পারিবেন না, তাই তিনি চাহেন অকাজের কাজ, সে কাজ হইতেছে আনন্দের সৃষ্টি, বেতন দিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা যায় না। কবি পদগৌরব চাহেন না, আত্মপ্রতিষ্ঠার ভীষণ দুরন্ত উদ্যম তাঁহার নাই। তিনি সকল কিছু হইতে অব্যাহতি চাহিয়া, সকল কিছু ত্যাগ করিয়া খ্যাতি-হীন নির্জনে আনন্দের নীড় রচনা করিতে চাহেন। এই কর্মজগতের বাহিরে যেখানে মানুষ শান্তি চায়, প্রেম চায়, সেই জগতে কবির সমাদর, কবির প্রয়োজন সমধিক। সৃষ্টির ও কর্মের অন্তরালে আনন্দ না থাকিলে কেহ বাঁচিতে পারে না। যিনি আনন্দ বিরচন করেন তাঁহার কর্মের মূল্য নিরূপণ করা যায় না, তাহা যাচাই করিবার কোনো প্রতিমান নাই। সেই জন্য সে কাজ কেজো লোকের দৃষ্টিতে অকাজ হইলেও আসলে মস্ত বড় কাজ। বাহিরের কর্মের মধ্যে সম্মানের খ্যাতির লাভের একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকে,—তাহা স্বার্থের সহিত জড়িত। কিন্তু কবি কোনো উচ্চ পদ বা বেতন প্রত্যাশা করেন না, তিনি কেবল আনন্দের মালা গাঁথিতে চাহেন মালাকর হইয়া, মানুষকে আনন্দ দিয়া যে তৃপ্তি তাহাই তাঁহার মাল্যের মূল্য। মানুষ কবি ও

শিল্পীর নিকটে এই আনন্দের উপহার পায়, এই প্রয়োজনাতীত অপার্থিব বস্তু উপহার পায় বলিয়াই আবার নূতন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। যদি সে এই সুখ এই তৃপ্তিটুকু না পাইত এবং ক্রমাগত কাজ করিয়াই যাইত, তবে সে তাহার কার্যের মধ্যে অবসাদ অনুভব করিত, তাহার কার্যে দুদিনেই ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তাহাতে কোনো উৎসাহ পাইত না। সুতরাং কবি কোনো প্রয়োজনীয় কাজ না করিলেও, মানুষের সকল কাজের মূলেই কবির প্রভাব ও প্রেরণা আছে।

আনন্দ রচনা করিতে হইলে আত্মিক শক্তির প্রয়োজন। কবি সেই শক্তির পূজাই করিতে চাহিতেছেন। কবির 'মিশন্' অনেক বড় এবং তাঁহার কর্মের কোনো তুলনাও চলে না। কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আনন্দ রচনায় ব্যাপৃত করিয়া রাখিবার জন্য বিশ্বলক্ষ্মীর প্রসাদ পাইতে চাহেন, ইহাই তাঁহার 'আবেদন'।

এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনের সঙ্গে সৌন্দর্য-সৃষ্টির যে নিবিড়তা দেখাইয়াছেন তাহা অনবদ্য। সহজ সরল প্রাণস্পর্শী কথোপকথনচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিজীবনের প্রগতি-নিয়ামক জীবনদেবতাকে আপনার বাসনা জানাইয়াছেন। 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে 'নিষ্ক্রমণ' করিয়া কবি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সুন্দর প্রভাতের সুর অতিক্রম করিয়া মানসী-যুগের ভিতর দিয়া সোনার তরীর যুগে যে অন্তর-দেবতার বা জীবন-দেবতার সন্ধান পান, চিত্রার যুগে তাহারই 'স্তব্ধ অতল স্নিগ্ধ নীলিমার' বিচিত্র রূপের কাছে কবি আজ দীন সেবক। কিন্তু সোনার তরীতে যে জীবন-দেবতাকে উদ্‌ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখিয়াছেন, এখানে তাহাকেই আবেশপূরিত রসাপ্লুত অন্তরের নিবিড়তা দিয়া পরাণ-বঁধুয়া-রূপে আরতি করিতেছেন। কাজেই এই কবিতায় উল্লিখিত রাণী কবির অন্তর-মোহিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী বা কবিতা-দেবী।

ইংরেজ কবি Morris-এর মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন কবি শুধু রসপিপাসু, সৌন্দর্যের সাধক মাত্র। অকাজের কাজ, আলস্যের সহজ সঞ্চয়ই তাহাদের পরম বৃত্তি। কবি যেন—idle singer of an empty dream। কবিতালক্ষ্মীকে ষড়্‌ঋতুর অভিনব সৌন্দর্যে পূজা করাই কবির কাজ। এ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক নাই,—the highest æsthetic pleasure is a pleasure without any interest, এ যেন 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত' হইয়া আছে। ইহার সার্থকতা শুধু প্রাণের

অফুরান আনন্দধারায় সৌন্দর্যকে স্নান করাইয়া তাহার জ্যোতিষ্মান্ রূপের কাছে আত্ম-নিবেদনে। সবাই যখন অভীষ্ট বস্তু আশীর্বচন লইয়া চলিয়া গেছে, তখন কবি নিশান্তের শশাঙ্কের মতো ভীত কম্পিত হৃদয়ে দুরু দুরু বক্ষে রাণীর কাছে আসিয়া আপনার 'আবেদন' জানাইলেন। তিনি ঐশ্বর্য বিত্ত সম্ভ্রম—এ সব কিছুই চাহেন না। তিনি যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা হয়তো প্রয়োজনের দিক হইতে মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর—তবু তাহাকেই তিনি অন্তর দিয়া পাইতে চাহেন। সকলের চাওয়ার দাবী মিটিয়া গিযা যেটুকু অবশিষ্ট আছে—তিনি তাহাই কামনা করেন। "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর"—এই তাঁহার বিনীত প্রার্থনা। তিনি কর্ম-কোলাহলের মধ্যে থাকিতে চাহেন না। তিনি চাহেন, একান্তে থাকিয়া শুধু বিচিত্র সৌন্দর্য-সম্ভারে দেবীর সেবা করিতে।

প্রেমের অভিষেক

[১৪-ই (?) মাঘ, ১৩০০ সাল ; বোধ হয় পতিসরে লেখা]

এই কবিতাটি প্রথমে সাধনা পত্রিকায প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে উহা চিত্রা পুস্তকের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরে এই কবিতাটির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধার করিতেছি, তাহা হইতে ইহার ইতিহাস ও মর্ম দুই বুঝা যাইবে।

সাধনার কবিতায় সমস্ত উক্তিটি একটি ক্ষুদ্র লাঞ্ছিত দরিদ্র কেরানীর মুখে দেওয়া হইয়াছিল। চিত্রায় সে কেরানীটিকে পদচ্যুত করিয়া তাহাব স্থানে একটি সাদাসিধে মানুষকে বসানো হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে তাহার 'অপোগণ্ড সাহেব-শাবক' মনিবটিকেও অন্তর্ধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্তনের কারণ কি? কেহ কেহ সাধনার সেই কবিতা পাঠ করিযা নাকি বলিয়াছেন—'আপিসের কেরানীর সহিত জড়িত না করিযা সাধারণ-ভাবে আত্ম-হৃদযের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা অধিক সবল উদার উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধ-ভাবে দেখান হয়। সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরানীর মুখে এ কথাগুলো যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মতো শুনায়।' আমি কিন্তু এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আস্ফালন নহে তো কি? আস্ফালনই বটে। যে অপমানিত ক্ষুধিত সর্বজনের উপেক্ষিত, সে যখন বলিবে—আমার কিছু নাই, কেবল প্রেম তুমি আছ, তাহাতেই আমি রাজার অপেক্ষা অধিক সুখী!—সেই প্রেমের যথার্থ সার্টিফিকেট! আর যাহার কোনো কষ্ট নাই, চাকরী করিবার প্রয়োজন নাই,

দিব্য আহার করিয়া নাদুসনুদুস্ চেহারাটি, তাহার মুখে 'তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব-মুকুট!'—তেমন শোনায় কি? প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ ছবিটির পাশের ছবিটি যত ম্লান হইবে, প্রথমটি তত উজ্জ্বল দেখাইবে। এই Law of Contrast-এর জন্য চিত্রার ছবিটির উজ্জ্বলতা অনেক হ্রাস হইয়াছে।

নিত্যকৃষ্ণ বসুর সাহিত্য-সেবকের ডায়ারি ১৩১০ সালের সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহার ২৯৯ পৃষ্ঠায় আমরা এই কবিতাটির উল্লেখ দেখিতে পাই।

ফাল্গুন মাসের সাধনায় রবীন্দ্র-বাবুর 'প্রেমের অভিষেক' ইতিশীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। * * * * কবিতাটিতে কঠোর কার্যময় জীবনের সহিত কাব্যের কল্পনাপূর্ণ আলস্যময় রাজ্যের একটুকু বেশ মধুর বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। * * কবি বলিতেছেন, বাহিরে—অর্থাৎ কলিকাতার কর্মক্ষেত্রে, ইংরাজের আফিসে—তিনি শত তাচ্ছিল্য বা অপমান সহ্য করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই;—মৃত্তিকার উপর আধিপত্য তিনি অকাতরে ইংরাজের করে ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে, তাঁহার উদার প্রশান্ত প্রেমের প্রস্ফুটিত কুঞ্জে,—সেখানে তিনিই একমাত্র রাজা, তাঁহার প্রেমময়ী প্রণয়িনীর অসীম সোহাগ ও সৌন্দর্য-গর্বে গৌরবান্বিত, সেখানে ইংরাজের আফিস আদালত চাকুরী লাঞ্ছনা—কিছুই নাই। তথায় কেবল মহাশ্বেতা শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি হৃদয়ের গৃহ প্রেমের সৌরভে পূর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন; আর কবি আপনাকে তাহাদেরই একজন নিতান্ত আত্মীয় ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন। * * *

কবি এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছেন যে প্রেমের মহিমা ও শক্তি অসীম। মানুষ যতই সামান্য হীন কুৎসিত নগণ্য দরিদ্র পতিত হউক না কেন, তাহার যদি সমাজে কোনো স্থানও না থাকে, তথাপি সে তাহার প্রিয়জনের নিকটে রাজার তুল্য সমাদরের পাত্র। তাহার প্রিয়জন তাহাকে অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া তাহাকে সহস্রের মধ্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রিয়পাত্র তাহার সমস্ত অভাব ত্রুটি অক্ষমতা ক্ষুদ্রতা এবং সামান্যতা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করে। জগতে যেখানে যে কালে যত প্রেমিক-দম্পতি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে এই সামান্য প্রেমিক-যুগলের মধ্যে যেন নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রণয়-লীলার পুনরভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। পুরাতন পৃথিবীতে নূতন পথিকেরা যখন ভালোবাসিতে আরম্ভ করে, তখন অতীতে বর্তমানে কেহ যে তেমন ভালোবাসিতে পারিয়াছে বা পারে এ ধারণা তাহাদের থাকেই না এবং তাহারা মনে করে বহুবর্ষের পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রেমসুধাধারায় স্নান করিয়া শুদ্ধ উজ্জ্বল হইল এবং নবীনতর সম্পদে সর্বোচ্চ সিংহাসনে তাহার অভিষেক হইল।

কবিকে তাঁহার মানসপ্রিয়া পবিত্র প্রণয়ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সেই প্রেমের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত এবং তাঁহার অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ। প্রিয়ার সেই প্রেমই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, অধিক তৃপ্তি দান করিয়াছে। প্রেমের অমরাবতীতে কেবল তিনি এবং তাঁহার প্রিয়া,—আর কাহারও প্রবেশের পথ বা অধিকার সেখানে নেই। তিনি প্রেমমুগ্ধ অন্তরে জগতের সকল প্রেমের কাহিনী অনুভব করিতেছেন। নল-দময়ন্তীর প্রেমের গাথা, শকুন্তলার প্রণয়োপাখ্যান, পুরুরবার প্রেমের বেদনা, মহাশ্বেতার প্রেমস্মৃতির তীব্র দাহন—সকলই তিনি তাঁহার অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি তাঁহার নিজের প্রেমলীলার ভিতর দিয়া জগতের সমস্ত প্রেমলীলা অনুভব করিতেছেন অন্তরের অন্তস্তলে।

কবির প্রিয়া কবিকে প্রেমের নন্দনভূমিতে লইয়া গিয়াছেন। সেইখানে তাঁহার প্রিয়া তাঁহাকে প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রিয়ার স্নেহপূর্ণ স্পর্শ, মধুর বাণী, নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁহাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অন্তরে কোনো রিক্ততা, কোনো শূন্যতা নাই। অন্তর বাহির সকল দিক্ তাঁহার প্রিয়া পরিপূর্ণ করিয়াছে। প্রিয়ার প্রেম তাঁহার চারিদিকে এক নন্দন-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পঞ্চভূত' নামক পুস্তকের 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধের মধ্যে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষকে তাহার প্রণয়াস্পদের প্রেমই একটি মূল্য দান করে, একটি অসামান্যতা দান করে।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতার অন্য দিক্ দিয়াও এক ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে প্রিয়তমারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সৌন্দর্য বা কবিতালক্ষ্মীকে আবাহন করা সকল দেশের সকল কবিদের মধ্যেই দেখা যায়। হোমার মিল্টন ও আমাদের মাইকেল মধুসূদন—ইহারা সকলেই তাঁহাকে দেবী হিসাবে কল্পনা করিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার কাছে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিতালক্ষ্মীকে প্রিয়তমা-রূপে গ্রহণ করিয়া যে অকুতোভয়তার ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতি মধুর। ইহাতে কবিতাটি মানবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্ররূপিণী ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সৌন্দর্যলক্ষ্মী এখানে আবেগ-গভীর স্পর্শ-কাতর কবিচিত্তে প্রেমিকার যাদু-স্পর্শ দিয়া তাহাকে দিব্য-জ্যোতি দিয়াছেন।

'প্রেমের অভিষেক' কবির সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সহিত অভিনব মিলন-সঙ্গীত।

বিগত জীবনের সকল ব্যথা তাঁহারই স্পর্শে আজ গোলাপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কবি আজ ধন্য। তাঁহারই প্রসাদে তিনি সম্রাট অপেক্ষাও অধিক সম্পদের অধিকারী। এই কবিতায় কবি তাঁহার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে পরিপূর্ণভাবে আপনার করিয়া লইয়াছেন। কবি সেখানে ভীতিকম্পিত হৃদয়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর করুণাভিখারী নহেন। সৌন্দর্যের একান্ত অধীশ্বর তিনি। সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে তাঁহার অন্তর-মোহিনী মর্ম-নিবাসিনী রূপে পাইয়া কবির চোখে আজ সৌন্দর্য-জগতের এক নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে ভালবাসার ভিতর দিয়া এবং প্রাপ্তির ভিতর দিয়া কবির কাছে আজ সবই সুন্দর, সবই মনোহর মনে হইতেছে। কবির দীনতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা, আজ তাঁহার অসীম দানে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বজগৎ তাঁহাদের এই মিলন-বার্তা হয়তো জানে না, কিন্তু এ মিলন-গীতি যেন আজ বিশ্বের কবিদের গানে স্তোত্রে সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। অতীত যুগের প্রেমিক-প্রেমিকাদের সুখ-দুঃখ-বিমিশ্র কাহিনী তাই আজ তাঁহার কাছে এত স্বচ্ছ, এত পরিষ্কার। তিনি যেন আজ প্রেমের একান্ত অনুভূতির ভিতর দিয়া রূপাতীতাকে, অরূপাকে রূপায়িতভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রেমের সর্ব-ব্যাপকতার স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। অরণ্যের বিষণ্ণ পত্রান্তরালে নল-দময়ন্তীর নির্জনভ্রমণ, দুষ্মন্ত-বিরহ-কাতরা ম্লানমুখা শকুন্তলার "করপদ্মদললীন ম্লানমুখশশী", পুরুরবার দুঃসহ বিরহব্যথা, মহাশ্বেতার মহেশবর্ণনা, প্রেমবার্তা কহিবার ছলে ফাল্গুনীর সুভদ্রাকে প্রেমচুম্বন, হরপার্বতীর আবেগ-গভীর প্রেম-আলাপন—সবই যেন আজ তাঁহার কাছে স্পষ্ট। অতীতের সেই প্রেমের অমরাপুরীতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন কেবল কাব্যলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া; কবিতা-লক্ষ্মীকে ভালোবাসিয়া বিশ্বের সমস্ত প্রেম-উৎফুল্ল ও বিরহ-ম্লান হৃদয়ের ভাষার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। সৌন্দয-লক্ষ্মীকে তিনি যে প্রিয়তমারূপে পাইয়াছেন তাহা কেহ জানে না, কিন্তু তিনি কবিকে অভিনব লাবণ্যবসনের মতো সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্পর্শ, তাঁহার প্রেম, তাঁহার বাণী, তাঁহার দৃষ্টি, সবই কবির কাছে স্পষ্ট, অনুভূত খাঁটি সত্য। চন্দ্র যেমন দেবভোগ্য অমৃতকে নিজের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, জ্যোতির্ময় ভগবানের রূপ যেমন সৃষ্টির ভিতর দিয়া সীমায়িত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কমলার চরণবিচ্ছুরিত সৌন্দর্যলেখা যেমন অনন্ত নীলিমাকে পরিশোভিত করিতেছে, তেমনি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রেমও কবির জীবনকে অপরূপ সাজে সজ্জিত

করিতেছে। তাই তিনি একান্ত আগ্রহে ও সাহসে নির্ভর করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট।

তুলনীয়—অনন্ত প্রেম, মানসী।

Few are my books, but my small few nave told
Of many a lovely dame that lived of old;
And they have made me see those fatal charms
Of Helen, which brought Troy so many harms:
And lovely Venus, when she stood so white
Close to her husband's forge in its red light.
I have seen Diana's beauty in my dreams,
When she had trained her looks in all the streams
She crossed to Latmos and Endymion.
And Cleopatra's eyes, that hour they shone
The brighter for a pearl she drank to prove
How poor it was compared to her rich love:
But when I look on thee, love, thou dost give
Substance to those fine ghosts, and make them live.

—W. H. Davies, *Lovely Dames* (*Georgian Poetry*, 1918-19).

Not in thy body is thy life at all
But in this lady's lips and hands and eyes
Through these she yields thee life that vivifies;
What else was sorrow's servant and death's thrall.

—D. C. Rossetti, *The House of Life, Life-in-Love.*

The reduction of the universe to a single being, the expansion of a single being even to God, such is Love.—Victor Hugo, *Les Miserables.*

Love has a tendency of pressing together all the lights, all the rays, emitted from the beloved object, by the burning glass of fantasy, into one focus, and making of them one radiant sun without spot. —Goethe.

Tennyson-এর "Dream of Fair Women" কবিতাটিও ইহার সহিত তুলনীয়।

রাত্রে ও প্রভাতে

(১লা ফাল্গুন, ১৩০২)

নারীর মধ্যে দুইটি ভাব আছে—এক ভাবে সে প্রেয়সী, ভোগের পাত্রী; অপর ভাবে সে কল্যাণী, সম্ভ্রমের পাত্রী। যিনি প্রেয়সী, তিনিই তো আবার সন্তানের জননী, অতিথির সেবিকা, পীড়িতের শুশ্রূষাকারিণী, দুঃখে সান্ত্বনাদায়িনী, সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী কল্যাণী। এই দুই ভাবের বিকাশকে কবি তাঁহার বলাকা কাব্যের মধ্যে বলিয়াছেন 'দুই নারী'—

একজনা—উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা—লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই কবিতাটির অনুপম ছন্দমাধুর্য ও শব্দসংযোজনার দক্ষতা কবিতাটিকে চমৎকারিত্ব দান করিয়াছে।

সান্ত্বনা

(২৯এ অগ্রহায়ণ, ১৩০২)

সুন্দর লিরিক কবিতা। প্রেমিকা প্রেমিককে সান্ত্বনা দিতেছে। প্রণয়ী হয়তো প্রণয়িনীকে ছাড়িয়া অপর কোনো রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ম্লান মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে আপনার পূর্বপ্রণয়িনীর কাছে, অথবা সেই প্রণয়ী হয়তো বা কাহারও দাম্ভিক দুর্ব্যবহারে মর্মপীড়িত হইয়া আসিয়াছে, এবং প্রণয়িনী বলিতেছে যে সে প্রণয়ীর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার দুঃখকে আবার নবীভূত করিয়া দিবে না, সে কারণ না জানিয়া কেবল তাহার দুঃখের উপর মমতার ও প্রেমের প্রলেপ দিবে। সে যে-রাত্রি আনন্দে রভসে যাপন করিবার আশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই রাত্রি যদি দুঃখের অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া ব্যর্থ হয় তো হোক, তথাপি প্রণয়ীর ব্যথিত চিত্ত যদি একটু শান্তি পায় তবে তাহাই প্রণয়িনীর পক্ষে পরম আনন্দের কারণ হইবে।

প্রস্তরমূর্তি

(২৪এ মাঘ, ১৩০২)

এটি একটি ছোট সনেট। কিন্তু সুন্দর। প্রস্তরময়ী সুন্দরী নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মহাকাল যেন তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহাকে কথা কহাইবার জন্য, তাহার মানের মৌন ভঙ্গ করিবার জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তথাপি সেই পাষাণী সুন্দরীর মানভঙ্গ হইতেছে না। তুলনীয়—কবি কীট্‌সের *Ode on a Grecian Urn*।

উৎসব

(৩২এ মাঘ, ১৩০২)

এই কবিতাটির তারিখ হইতে জানা যায় যে, এই কবিতাটি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের দিনে সেই উৎসব উপলক্ষ্য করিযাই লেখা হইয়াছিল। বলেন্দ্রনাথের বিবাহ যে ঐ তারিখে হইয়াছিল তাহা জানা যায় কবির 'নদী' নামক কাব্যের উৎসর্গ হইতে। এই কবিতাটি যে বিবাহ-উপলক্ষ্যে লেখা তাহা এই কবিতা হইতেও জানা যায়—ইহার এক স্থানে আছে—

তুমি কি বসেছ আজি
নব বরবেশে সাজি'।

অন্য স্থলে আছে—

তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে?

স্বর্গ হইতে বিদায়

(২৪এ অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল)

'আবেদন', 'উর্বশী' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়' পর পর তিন দিনে লেখা। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একটি ভাবসূত্রের যোগ আছে। কবি abstraction লইয়া তৃপ্তি না পাইয়া বাস্তব জগতে অবতীর্ণ হইতেছেন—স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া মর্ত্যে অবতরণ কবিতেছেন।

সকল দেশের মধ্যযুগের কবি দার্শনিক ও ধর্মপ্রবক্তাদিগের ধারণা ছিল যে মর্ত্যে কেবল দুঃখ, আর যত সুখ সঞ্চিত আছে স্বর্গে। কবিদের কল্পনা স্বর্গের সুখসম্ভোগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া মর্ত্যকে তাহার তুলনায় অত্যন্ত হীন ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকেরা কল্পনা করিত স্বর্গলোকের সকলই ভালো, আর এই মর্ত্য মিথ্যা, এই জীবন মায়া। এই স্বর্গকল্পনা এক যুগের লোককে প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং তাহারা এই কল্পিত স্বর্গ লাভ করিবার আশায় সংসার ত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার আত্মনিগ্রহ করিত। তাহারা বলিয়াছে যে স্বর্গ পুণ্যবান্-দিগের আবাসস্থল, সেখানে চিরসুখ, চির-আনন্দ, চিরযৌবন বিরাজিত; দুঃখ বা ব্যথার সহিত স্বর্গবাসীদের কোনও পরিচয় নাই। সুতরাং এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ মর্ত্য-জীবনকে তাহারা উপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে এই মাটির পৃথিবীর জীবন অতীব হেয়, অতএব কোনও প্রকারে এই জীবন শেষ করিয়া এই জীবনেব পরপারে স্বর্গের সেই চির-আনন্দময় রাজ্যে পৌঁছিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য সাধনা করো, যোগ-তপস্যার অনুষ্ঠান করো।

পুণ্য-সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুসারে স্বর্গবাসের মেয়াদ্ স্থির হয়। সঞ্চিত পুণ্য স্বর্গভোগে খরচ হইয়া গেলে মানুষকে আবার মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্‌কে দিয়া বলানো হইয়াছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈর্-ইষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্-
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

ত্রিবেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠানপর সোমপায়ী বিগতপাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞ-দ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকেন।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মম্-অনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন।

—গীতা, নবম অধ্যায়, ২০-২১ শ্লোক

কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের উপযোগী এক নূতন সুর ধরিয়া প্রাচীন স্বর্গের ধারণাকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, আমাদের এই মাটির 'মা'-টি বিমাতা স্বর্গভূমি অপেক্ষা আমাদের অধিক কাম্য এবং নিকটতর প্রিয় বস্তু। কবির মতে এই জীবনটা তুচ্ছ নয়, মর্ত্যলোক হেলার সামগ্রী নয়, বরং মর্ত্যই স্বর্গ অপেক্ষা অনেক লোভনীয় ও সুন্দর। এই মর্ত্যে এমন কিছু আছে যাহা সুদুর্লভ। এই মর্ত্যের সঙ্গে আমাদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা আনন্দ-ব্যথার সম্বন্ধ, সে আমাদিগকে জন্মকাল হইতে স্নেহ দিয়া আহার দিয়া শিক্ষা দিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে আমরা কায়ে মনে প্রাণে চিনিয়াছি, বুঝিয়াছি। মৃত্যুর পরপারে কি আছে তাহা কল্পনা করিয়া কোনো লাভ নাই, জ্ঞাতকে ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতের জন্য মাথা কুটিয়া কোনো লাভ নাই। কারণ, সেই অনন্তলোকে কি আছে কে বলিতে পারে? সুখ থাকিতেও পারে, নাও পারে। সুতরাং স্বর্গের কল্পিত প্রলোভন যতই প্রবল হউক না কেন, পৃথিবীর স্নেহের কাছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সেই কল্পনালোকে অনন্ত সুখ হয়তো বা আছে, অফুরন্ত আনন্দের পসরা হয়তো বা সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি হয়তো সেখানকার জীবনকে ভরিয়া রাখে,—কিন্তু সেই সুখের কি কোনো মূল্য আছে? স্বর্গে চিরসুখ চিরশান্তি বিরাজিত, কিন্তু তাহার মাধুর্য কোথায়? একটানা সুখের ভিতর যদি ব্যথার একটু লেশও না থাকে তবে সেই সুখের মাধুর্যের উপলব্ধি হইবে কিরূপে? একধারা অবিশ্রান্ত সুখ যেখানে, সেখানে সুখের কোনো বিশেষত্ব নাই, উপলব্ধিরও কোনো উপায় নাই। মানব-মন পরিবর্তনের দ্বারা, বৈষম্য বৈপরীত্য ও তারতম্যের দ্বারা সুখ ও আনন্দ উপলব্ধি করে; নিরবচ্ছিন্ন কোনো কিছুই তাহাকে আনন্দ দিতে পারে না। মর্ত্যলোকে দুঃখের সঙ্গে ব্যথার সঙ্গে সুখ ও আনন্দ যমজ হইয়া ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই সুখের মাধুর্য এত প্রবল, আনন্দের মূল্য এত অধিক। সুখকে যদি সমস্ত অন্তর দিয়া, সমস্ত প্রাণ মন দিয়া উপভোগ করিতে চাওয়া যায়, তবে দুঃখের প্রয়োজন আছে। দুঃখকে এড়াইতে চাহিলে চলিবে না, সুখ ও দুঃখকে সমভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে—তবেই সুখ দুঃখ উভয়ে মিলিয়া ঢালিয়া দিবে অপার আনন্দ। দুঃখ ছাড়া জীবনের কোনো মূল্য নাই, কোনো অর্থ নাই,—যেমন অন্ধকার ছাড়া আলোকের কোনো অর্থ হয় না, কোনো মাধুর্য বা বিশেষত্ব থাকে না। স্বর্গের সুখ

পরিপূর্ণতা লাভ করিত যদি ইহা পৃথিবীর ন্যায় হাসিতে কাঁদিতে পারিত। বিচ্ছেদ-ব্যথা আছে বলিয়াই পার্থিব প্রেম এত-মধুর ও লোভনীয় মহামূল্যবান্ পদার্থ। তাই কবি বলিয়াছেন—"বিচ্ছেদেরই ছন্দ-লয়ে মিলন ওঠে পূর্ণ হ'য়ে"। বিরহের ভিতরেই প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গ যদি পৃথিবীর ন্যায় তাহার কোনও অধিবাসীকে বিদায় দিতে ব্যথা অনুভব করিত, যদি দুঃখীজন তাহার কোলে আশ্রয় লইয়া আপনার শোকে সান্ত্বনা লাভ করিত, তাহা হইলে স্বর্গ বাঞ্ছনীয় হইতে পারিত। কিন্তু স্বর্গে সে স্নেহ, সে সমবেদনার আশা করা বৃথা, সেখানে কেহ কাহারও নহে, সকলেই আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, সকলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত। স্বর্গের অপ্সরা পৃথিবীর মানবের বুকে কেবল প্রেমহীন কামনার বহ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করে, আবার তাহার স্পর্ধাকে নিষ্ঠুর হাস্যে বিদ্রূপে দলিত মথিত করিয়া তাহাকে অপমানের কশাঘাতে জর্জরিত করে। কিন্তু পৃথিবীর কন্যা তাহার স্নেহ-প্রেমে ভরা শঙ্কিত বক্ষের সমস্ত মাধুর্য দিয়া তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী মানবকে বরণ করিয়া লয়, তাহার নিমিত্ত সর্ব দুঃখগ্লানি অকাতরে সহ্য করে, পরের জন্য আপনাকে দান করিয়া দুঃখ বহন করাতে সে গৌরব বা আনন্দ অনুভব করে। সে স্বয়ং শত দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আপনার সমস্ত বেদনা অভাব ভুলিয়া গিয়া তাহার প্রেমাস্পদের মঙ্গল-কামনায় দেবতার বর প্রার্থনা করিয়া লয়। সুতরাং এই নিষ্ঠুর স্বর্গের প্রলোভন অপেক্ষা ধরণীর এই সহানুভূতিময় দুঃখপূর্ণ জীবন মানবের অধিক কাম্য, তাই সুখ-দুঃখ-ভরা হাসি-কান্নায় পরিপূর্ণ পৃথিবীই কোন্ অচেনা অজানা স্বর্গ অপেক্ষা অধিকতর ইপ্সিত। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই পৃথিবীর বুকেই নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেওয়াই কবির পরম ও চরম কামনা। তাই কবি বৈচিত্র্যহীন মায়া-মমতাহীন স্বর্গ হইতে বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর মাতৃস্নেহক্রোড় অধিক লোভনীয় ও শ্লাঘ্য বিবেচনা করিতেছেন। পৃথিবী মাতৃভূমি, আর স্বর্গ মানবের প্রবাস।

তুলনীয়—কবিবরের 'দরিদ্রা', 'প্রাণ', প্রভৃতি কবিতা।

এই কবিতা লিখিবার প্রায় চার বৎসর পূর্বে কবি লিখিয়াছিলেন—

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ ক'রে প'ড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালোবাসি। ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা শুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত

এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত্যহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখ্‌তে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে! আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে—'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই; আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা কর্‌তে পারিনে; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ কর্‌তে পারিনে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।' এইজন্যে স্বর্গের উপরে আড়ি ক'রে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশী ভালোবাসি; এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই।

—ছিন্নপত্র, কালীগ্রাম, জানুয়ারী ১৮৯১ (বাংলা ১২৯৮ পৌষ)।

এইরূপ ভাব ইউরোপীয় কবিদের মধ্যেও দেখা যায়—রবার্ট ব্রাউনিং-এর রেফ্যান্ (Rephan) নামক কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে যে একজন লোক পুণ্য করিয়া রেফ্যান্ নামক জ্যোতির্লোকে গমন করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে সমস্তই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন—Nowhere deficiency nor excess—all merged alike in a neutral rest—এবং সেখানকার অধিবাসীদের মায়া-মমতাহীন দেখিয়া রেফ্যান্-প্রবাসী পুণ্যবান্ মানুষটি অনুযোগ করিতে লাগিল, "And I yearned for no sameness but difference in thing and thing", তখন সেখানকার অধিবাসীরা সেই মানুষটিকে বলিল—

Thou art past Rephan, thy place be Earth.
—Robert Browning.

The Earth, that is sufficient,
I do not want the constellations any nearer,
I know they are very well where they are,
I know they suffice for those who belong to them.
—Walt Whitman, *Song of the Open Road.*

You promise heavens free from strife,
Pure truth, and perfect change of will;

But sweet, sweet is this human life,
So sweet, I fain would breathe it still;
Your chilly stars I can forego,
This warm kind world is all I know.

You say there is no substance here,
One great reality above:
Back from that void I shrink in fear,
And childlike hide myself in love:
Show me what angels feel. Till then,
I cling, a mere weak man, to men.

You bid me lift my mean desires
From faltering lips and fitful veins
To sexless souls, ideal quires,
Unwearied voices, wordless strains:
My mind with fonder welcome owns
One dear dead friend's remembered tones.

Forsooth the present we must give
To that which cannot pass away,
All beauteous things for which we live
By laws of time and space decay.
But oh, the very reason why
I clasp them, is because they die.
—W . J. Cory (1823-92), *Mimnermas in Church.*

I saw a new world in my dream,
Where all the folks alike did seem.
* * *
Nobody laughed, nobody wept;
This world was a world of the living dead.
* * *
And woke from my dream in my little room.
* * *

And I thought to myself how nice it is
For me to live in a world like this.

* * *

Where Love wants this, and Pain wants that

* * *

—William Brighty Rands (1827-82).

সন্ধ্যা

(৯ই ফাল্গুন, ১৩০০। বোধ হয় পতিসরে লিখিত।)

এই কবিতায় সন্ধ্যাকালের একটি গম্ভীর বিষাদাচ্ছন্ন ভাব অতি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। উষা হইতেছে জাগরণের চেতনার পূর্বাভাস, তাই উষাকালে জীবের মন প্রফুল্ল হয়, আর সন্ধ্যা হইতেছে নিদ্রার অচেতনার পূর্বাভাস, সে যেন মৃত্যুর সহোদর, তাই সন্ধ্যাকালে মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়। উষার সম্মুখে আলোকের সম্ভাবনা, আর সন্ধ্যার সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, এই জন্যও উষা ও সন্ধ্যার সময়ে মনের ভাবের তারতম্য ঘটে। প্রভাতে আলোকের আবরণে আকাশের লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্ক সব ঢাকা পড়িয়া যায়, কেবল প্রকাশ পায় এই পৃথিবীটুকু, আর সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে পৃথিবী হইয়া যায় উহ্য, এবং প্রকাশ পায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, এবং তাহার দ্বারা আমাদের মনে বিরাটের যে ভাব জাগে তাহাতে মন স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

যেই মানুষ চুপ করে, অমনি দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক হতে শান্তি নেমে এসে হৃদয় পূর্ণ করে তোলে, সে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত, আমিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পাই। অস্তিত্ব নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি এক আসন পেয়ে যাই।

—ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৪।

এই কবিতায় কবি সন্ধ্যাকে একটি বিষাদময়ী অশ্রুমুখী রমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কল্পনা, বর্ণনা ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব একত্র মিলাইয়া এই কবিতা একটি মনোরম সৃষ্টি হইয়াছে। কবিতাটির আরম্ভেই সমস্ত সন্ধ্যার ভাবটি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং সমস্ত সন্ধ্যার ছবিটি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

বসুন্ধরার জীবনের ইতিহাস তাহার বাল্যকালে নীহারিকা-অবস্থা,

যৌবনকালে উজ্জ্বল অবস্থা। তাহার কোলে কালে কালে কত কত জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আবার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কঙ্কালাবশেষ ভূপঞ্জরের স্তরে স্তরে প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। জীব-জগতে কত দ্বন্দ্ব ও কত যোগ্যজনের উদ্বর্তনের ও জীবের ক্রমপরিণতির কাহিনী তাহার অন্তরে লেখা রহিযাছে—এই সব কথা যেন বিষাদিনী পৃথিবী দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া চিন্তা করিতেছে। ভূতত্ত্বের এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যে এমন সুন্দর কবিতায় পরিণত হইতে পারে, তাহা এই কবিতা না পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ইহার সংযত অথচ সুন্দর ভাষা মনকে অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে। এই কবিতাটি দেশী বিদেশী যে কোনো কবির সন্ধ্যা-বর্ণনা অপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

পুরাতন ভৃত্য

(১২ই ফাল্গুন, ১৩০১। শিলাইদহে লেখা।)

প্রাচীন সাহিত্যের নায়ক নায়িকা হইতেন, দেবতা অথবা রাজা ও রাণী, নিতান্ত কম পক্ষে অভিজাত শ্রেণীর লোক। ইহার এক মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় মৃচ্ছকটিক নাটকে। প্রাচীন কাব্যে ও নাটকে ইতর শ্রেণীর লোকের চরিত্র চিত্রিত করা হইত—হয় হাস্যরস উদ্রেক করিবার জন্য, নতুবা নায়ক-নায়িকার চরিত্রের পরিপূরকরূপে। ইংরেজী সাহিত্যে গ্রে, গোল্ড্‌স্মিথ্, কাউপার, বার্ন্‌স, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ এবং ফরাসী-সাহিত্যে ভিক্তর্ হিউগো প্রভৃতি প্রথমে দরিদ্রকে মর্য্যাদা দান করেন। বঙ্গসাহিত্যে অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ। কবি নিজে অতি অভিজাত বংশের লোক, এবং তিনি যদিও রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—

> আকাশ মাঝে জাল ফেলে' তারা ধরাই ব্যবসা,
> কাজ কি আমার ভবের হাটে মথুর কুণ্ড শিবু সা।

তথাপি তিনি—

> ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
> নিতান্তই সহজ সরল,
> সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
> তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

(সোনার তরী, বর্ষাযাপন)

আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। এই কবিতার সহিত কাঙালিনী, বধূ প্রভৃতি কবিতা এবং কাবুলিওয়ালা, খোকা-বাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার, শাস্তি, আপদ, অতিথি প্রভৃতি ছোট-গল্প তুলনীয়।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের প্রতি একটি মমতা আছে—রাজা ও রাণী নাটকের শঙ্কর, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের রাইচরণ ইত্যাদি তাহার প্রমাণ।

এই কবিতায়-লেখা গল্পটির মধ্যে পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের প্রতি প্রভুর কৃত্রিম-বিরক্তি-মিশ্রিত মমতার বর্ণনা এবং অনাড়ম্বর অথচ অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ লক্ষ্যযোগ্য। কথ্য ভাষায় অতিপরিচিত বিষয়ের বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ করে। সমস্ত কবিতাটি হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া শেষের কলিতে করুণরসের অতর্কিত অকস্মাৎ অবতারণা গল্পটিকে মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। দুইটি বিপরীত প্রকৃতির রসকে আশ্চর্য অপূর্বভাবে মিশ্রিত করা হইযাছে এই কবিতায়।

এককালে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই শুনা যাইত অধিক, এবং যাঁহাদের নিন্দা করাই ছিল পেশা, তাঁহারাও রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির প্রশংসা করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একদিন আমার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—রবি-বাবুর একশতটি কবিতা বাছিয়া ভালো বলা যাইতে পারে, আর তাহার মধ্যে 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতা দুইটি প্রধান।

দুই বিঘা জমি

(৩১এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২। শিলাইদহে লেখা।)

এই কবিতাটির মধ্যে পৈতৃক বাস্তুভিটার প্রতি টান, স্বদেশের প্রতি ভক্তি, এবং অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের চিত্র চমৎকার সুন্দর ফুটিয়াছে। কবি মাটি ও গাছপালার মধ্যে মানব-মনের প্রীতির প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকেও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ

(৭ই ফাল্গুন, ১৩০১। শিলাইদহে লেখা।)

এই কবিতাটি ছান্দোগ্য-উপনিষদের ৪র্থ প্রপাঠকস্থ ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত। কবির স্বাভাবিক সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগ ও সংস্কৃতের কথাগুলিকে হুবহু বাংলা করিয়া কবিতায় প্রয়োগ করিবার নিপুণতা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যনিষ্ঠাই যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ তাহাই উপনিষদের ঐ কাহিনীতে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহাও দেখানো হইয়াছে যে সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কাহারও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকে তবে সে দ্বিজোত্তম বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য। উপনিষদের বাণী কবি কি সুন্দরভাবে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, মূল আখ্যায়িকাকে সুন্দরতর করিয়াছেন, তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার যোগ্য।

এবার ফিরাও মোরে

(২৩এ ফাল্গুন, ১৩০০ সাল। রাজসাহীতে লেখা।)

এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবি নিজে বলিয়াছেন—

যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি চিত্রায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশীর সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।...... মাধুর্যের যে শান্তি, এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়।.... বিরাট্‌চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের, তা নয়। অশেষের দিক্ থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশীর ললিত সুরে নয়......এ আহবান তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্ম্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।—আমার ধর্ম, প্রবাসী, ১৩২৪ পৌষ, ২৯৪ পৃষ্ঠা, অথবা সবুজপত্র, আশ্বিন-কার্ত্তিক।

মহাজীবনের জন্য মানুষের আত্মায় মাঝে মাঝে যে ক্রন্দন জাগে, তাহারই অসাধারণ প্রকাশ এই কবিতাটি। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার ধারায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাব্য-বিলাসিতার নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্যময় জীবন কবির ভালো লাগে না, তাঁহার মধ্যে যে অসাধারণ

কর্মপ্রেরণা আছে তাহা তাঁহাকে তাগাদা দিয়া সংঘাতের পথে বাহির করিয়া দিতে চায়। কবি প্রথম যৌবনে লিখিয়াছেন—

হেথা এই আকাশের কোণে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।

সেখানে তিনি তাঁহার কল্পনাসুন্দরীকে লইয়া সুখের আরামের নিশ্চিন্ততার ঘর বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহার স্বপ্নবিলাসী মন বাস্তব-জগতের রূঢ়তার সংস্পর্শে আসিতে চাহিত না, কল্পনার জাল বুনিয়া হেলাফেলায় বেলা কাটাইয়া দেওয়াই তাঁহার অন্তরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু সে সুখ তাঁহার সহিল না, দেশের দশা দেখিয়া দরদী কবির বুকে ব্যথা বাজিল, কল্পনার স্বপ্নসৌধ চক্ষের নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল; কবি আকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন—এবার ফিরাও মোরে! তাঁহার কল্পনাকে, তাঁহার মানস-সুন্দরীকে, তাঁহার কবিতা-প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—ওগো মোহিনী, আমাকে কেবল বাঁশীর ললিত তানে মুগ্ধ করিয়া আর ভুলাইয়া রাখিয়ো না, আমার চারিদিকে মায়ার আবরণ টানিয়া আমাকে আর সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়ো না, আমায় সমস্ত কিছু দেখিতে দাও, সব কিছু বুঝিতে দাও,—আমাকে ফিরিয়া যাইতে দাও বাস্তব-সংসারেব দৈনন্দিন কুশ্রীতার মাঝখানে, নিরন্নের আর্তস্বরে চঞ্চল সংসারের মধ্যে; উহাদের ব্যথা আজ আমার বুকে আসিয়া লাগিয়াছে, আমাকে আর জড়াইয়া ধরিয়া রাখিও না, আমায় মুক্তি দাও—আমি আমার এই দৈন্য-কদর্যতাময় প্রতিবেশীদের জীবনের অংশীদার হই। কবি এইরূপে বিলাস ও আরাম ত্যাগ করিয়া সংগ্রামের কর্মের বিদ্রোহের জীবন বরণ করিয়া লইবার আগ্রহ বারংবার বহু কবিতায় প্রাকাশ করিয়াছেন—আহ্বান, শঙ্খ, বর্ষশেষ, নববর্ষ, দীক্ষা ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য। এবং তুলনীয়—

বিশ্ব-সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারও।

—গীতাঞ্জলি।

নগর-সঙ্গীত

এই কবিতার সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার চিত্রা-সমালোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন যে—

নগর-সঙ্গীত কবিতাখানা যেন একখণ্ড জ্বলন্ত লৌহ, তাহার চারিদিক্ হইতে যুক্তাক্ষরের স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

এই কবিতায় কবি উত্তেজনাপূর্ণ স্বার্থান্ধ নাগরিক-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নগরে যত কিছু ঘটনা ও অঘটন চোখে পড়ে তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বহুজনাকীর্ণ নগরীতে জীবনলীলার যে অবিরাম ও অভিরাম নাট্যাভিনয় চলিতেছে, কবি তাহাই দেখিয়া একই কালে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি সংসার-সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন যে তাঁহার চোখের সম্মুখ দিয়া অগণিত লোক সংসার-সমুদ্রে গা ভাসাইয়া স্বকার্য-সাধনেব নেশায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও মুখমণ্ডল বিষাদম্লান, কাহারও মুখে কঠিন হাস্যের কুটিল রেখা, কাহারও ভাবে দাম্ভিকতাব পূর্ণবিকাশ, আবার কাহারও ভাবে বিনয়েব চরম নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছে। কত শত লোক নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য এই বিশ্বসংসারকে অর্থ-অনর্থের সংঘাতে আবিল করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু করিতেছে, যাহা কিছু সেখানে ঘটিতেছে, তাহার কিচ্ছুই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাহার জন্য কাহারও ভাবনার লেশ নাই, ভাবিবার অবসরমাত্রও নাই। সকলে নিত্য নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে কোন্ অনির্দিষ্ট ফললাভের দুরাশায় নিরুদ্দেশ হইয়া। তাহাদের পাশের লোকের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর নাই, কাহারও সহিত পরিচয় করিবার অবকাশ নাই, কেহ কাহারও প্রতি মমতা বোধ করে না। বিপুল যজ্ঞকুণ্ডের হোমানলে ঘৃতাহুতির ন্যায়, এই ধরাপৃষ্ঠের বেদীতে স্বার্থোদ্ধারের বিরাট্ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া লক্ষ কোটি নরনারী আবালবৃদ্ধ জাতিধর্মনির্বিশেষে স্ব স্ব জীবন আহুতি দিতেছে। সংসারমায়ায় ভুলিয়া পথভ্রান্ত সকলেই ছুটিয়া চলিয়াছে, কেহ কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করিতেছে না, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি থাকিয়াও কেহ কাহারও সহিত মমতায় মিলিত হইতে পারিতেছে না, কিন্তু অবশেষ সকলেই গিয়া মিলিত হইতেছে একই স্থানে, একই লক্ষ্যে—মৃত্যুরূপ মহাসিন্ধু-পারে। সেখানে সকলেই ব্যর্থ, সকলেই নিরাশ।

নগরে প্রকৃতির শ্যামলতা নাই, নীলাকাশ বা সূর্যের উজ্জ্বল আলো নাই, বিশুদ্ধ বায়ু নাই। সেখানে নানা বর্ণের অট্টালিকা প্রকৃতির শ্যামল রূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, আলো-বাতাসকে অবরুদ্ধ করিয়াছে; কলকারখানার ধূমে সেখানকার আকাশ ধূসরবর্ণ। এক কথায় বলিতে গেলে, সেখানে প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে মানবের কৃত্রিমতা একেবারে পেষণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে শান্তি নাই, আছে ক্ষণিক খণ্ড সুখ, এবং অপরিতৃপ্ত ভোগ! সেখানে মানুষে মানুষে বাহ্যিক আর্থিক সম্বন্ধ আছে, কিন্তু আন্তরিক আকর্ষণ বা যোগ নাই। সেখানে সকলেই এক মাধ্যাকর্ষণশক্তির টানে স্বর্ণ-মায়ামৃগের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে। নাগরিকগণ দিন দিন নূতন নূতন ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছে, এবং সেই ক্ষুধাবহ্নিকে সতেজ রাখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে নব নব উন্মাদনার সম্মোহন বায়ুপ্রবাহ উত্থিত হইতেছে। সেখানকার সমস্ত জীবনটাই যেন মন্থনকালের সমুদ্রের ন্যায় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে।

নগরের কোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কবি স্মরণ করিতেছেন পল্লীর নির্মল নিরুদ্বেগ শান্তির কথা। যে বিপুল শান্ত সমাহিতি তাঁহার নীরব নিভৃত শ্যামল উপবনে এতদিন তাঁহাকে নীলোজ্জ্বল আকাশের স্বর্ণমদিরা পান করাইয়াছে, তাহারই প্রান্তে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছেন। অদূরে মহানগরীর মহাজনারণ্য, অগণ্য সজ্জিত গৃহশ্রেণী। বিপণিতে পণ্য-ক্রেতা-বিক্রেতার কাকলি-কল্লোল—সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া এক ঘোর আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে শান্তিপথচারী কবির নিমীলিত চক্ষে স্তব্ধ ধ্যানপরায়ণতার অবকাশ নাই। এখানে ভ্রমর গুঞ্জরণ করিবার অবসর পায় না, নির্বাধ আলোকের পুলক-উচ্ছ্বাস বিরাট হর্ম্যশোভিত উত্তপ্ত রাজপথে আহত হইয়া ম্লান হইয়া যায়। লুব্ধ স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতময় সংসারে যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তাহাতে কত নর-নারী কত শত অত্যাচার অনাচার অনর্থ ঘটাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত লোভ, কত ক্ষুধা, কত আবেগ, কত দুঃখ সংসারের এই যাত্রাপথকে 'পিচ্ছিল রক্তসিক্ত' করিয়া রাখিয়াছে। তবু বহ্নিমুখ পতঙ্গের মতো তাহাদের সেই পথে ছুটিয়া চলার বিরাম নাই। মানুষের চিরন্তন চলার নেশায় বর্তমানের সভ্যতা-সমারোহ উগ্র মদের মতো তীব্র ও সংঘাত-মুখর। অর্থের লোভে মানুষ দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য। স্বর্ণ-স্বপ্নে তাহাদের প্রতি স্নায়ু-শিরা চঞ্চল, উন্মুখ। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মানবহৃদয়ের অত্যুগ্র

কামনা-শক্তি একটার পরে একটা অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়িতেছে, নিজের শেষ রক্তবিন্দু দ্বারা সিক্ত করিয়া ফসলের জন্য ভূমি উর্বরা করিতেছে,—কিন্তু তাহা ক্ষণিকের। বাহিরে চিরপরিবর্তনশীল জগতের কোলে নিত্য-নূতন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মানুষের সেই প্রাণপণ প্রচেষ্টার কাহিনী বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী। তথাপি এই বিশাল রুদ্র জীবন-যজ্ঞে সকলেই আহুতি ঢালিতে বদ্ধপরিকর।

বৈচিত্র্য-পিপাসু কবি-হৃদয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ শান্তিপ্রিয়তার শ্যাম-নিকুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া এই অভূতপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব জীবনকে অন্তত ক্ষণিকের জন্যও ভোগ করিতে চায়। নিজেব সযত্নসমাহৃত শাশ্বত-অখণ্ড-রূপের পূজা-উপহার ফেলিয়া রাখিয়া, কবি তাঁহার পারিপার্শ্বিক সামাজিক মানুষের জীবন-ধারার আস্বাদ গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। পৃথিবীর স্থূল আকর্ষণের মাঝে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাব পিপাসা-লালসাব স্রোতে গা ভাসাইতে তাঁহার কেমন নেশা ধরিয়াছে। সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য—জীবনের যাবতীয় পথে-বিপথে বিচরণ করিবার বাসনা তিনি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার মাঝেও জাগিয়া উঠিবে বিশাল বিশ্বগ্রাসী গগন-চুম্বী উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্মনিষ্ঠা, নবতর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, এবং তাঁহার জীবনেব সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যাযেব স্বাদ তিনি গ্রহণ করিবেন। দুরধিগম্য বন্ধুর পথে কবি যাত্রা শুরু করিয়াছেন। নূতন এক কর্মোদ্দীপনার প্রজ্বলন্ত শিখা হৃদয়ে জ্বালিয়া অগ্রসর হওয়াব জন্য তাঁহার প্রবল ও অসীম উৎসাহ। মানবজন্ম ও খ্যাতি, ধন, জন, কিছুই শাশ্বত নহে,—সমস্তই অলীক ও অনিত্য, ক্ষণবিধ্বংসী। কালের দুর্বাব স্রোতে ইহাবা সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে। সংসারেব এই কৌতুকময়ী খেলাব অবসানে জীবনধারার পরিণতি কোথায়—কে জানে? তাই কবি বলিতেছেন—

তবে দাও ঢালি, কেবল মাত্র
দু-চারি দিবস, দু-চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবন-পাত্র
জন-সংঘাত-মদিরা।

কবি সংসার-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কোন্ অলক্ষ্যে জীবনসংঘাতের এই মোহ তাঁহারও হৃদয় জুড়িয়া বসিল, তিনি জীবনের উদ্দাম লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এতক্ষণ তিনি যাহা কেবল

দেখিয়াই ভীত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাহারই জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, বিষয়াসক্ত মানব-জীবনের উদ্দাম আবেগ তাঁহার লোভনীয় মনে হইতেছে। বিশ্বের মোহমদিরা পান করিয়া কবি বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন, তাই তিনি চাহিতেছেন অন্যান্য জনগণের ন্যায় আপনার কবি-কল্পনাকে বিশ্ব-সংসারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের সহিত সংগ্রাম করিতে। তিনি চাহিতেছেন তাঁহার কবি-কল্পনাকে অশ্বের ন্যায় অবাধ গতিতে সংসারের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা পাপ-পুণ্য ইত্যাদি সকল কিছুর ভিতর দিয়া ছুটাইয়া চালাইতে। তিনি দুরাশার তাড়নে বলিতেছেন—

ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ,
বাহু বাড়াইব তপনে।

সব কিছুকে আত্মসাৎ করিবাব দুর্দম আবেগে কবি বলিতেছেন—

আমি নির্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হ'তে করিযা ভ্রংশ,
তুলিব আপন কবলে।

কবি গন্ধ-পন্থের নাগর-দোলায় চাপিয়া আকাশে-পাতালে দোল খাইয়া সব-কিছুকে জয় করিবেন, সর্বত্র আপন অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিবেন, সকলের উপর আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন, সকল কর্মের সিদ্ধিকে জয় করিয়া দাসী করিবেন, চপলা লক্ষ্মী ঠাকরুণকে পযন্ত তিনি জয় করিয়া বন্দিনী কবিবেন—

পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া।

সংসারের যত কিছু আবিল-অনাবিল, দুঃখ-সুখ, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য, জরা-যৌবন, মৃত্যু-জীবন, জটিল-কুটিল, সবল ও সহজ, সত্য-মিথ্যা, প্রভুত্ব-দাসত্ব, সকলকেই কবি তাঁহার কল্পনার জালে ছাঁকিয়া তুলিয়া শুক্তিপুটের বক্ষগুপ্ত মুক্তার মতন তাঁহার স্বকীয় উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান করিয়া তুলিবেন, এই তাঁহার মনের বাসনা।

কবি এই সময়ে নানাবিধ বিষয়কর্মে লিপ্ত হইয়া কর্মজীবনের মহিমা

অনুভব করিতেছিলেন। তাহারই উল্লাসের ফল এই কবিতা। কবি এই সময়কার এক পত্রে লিখিয়াছেন—"কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।"

শীতে ও বসন্তে

(১৮-ই আষাঢ়, ১৩০২। সাহাজাদপুরে লেখা।)

এই কবিতা-সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার চিত্রা-সমালোচনার মধ্যে বলিযাছেন—

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাক্টিক্যাল্ সম্প্রদায় সর্বদা কবিদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কবি 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় প্রাক্টিক্যাল্-গণকে খুব একহাত লইয়াছেন। যাহার মনোদেশটা শীতপ্রধান, সে বলে—ইতিহাসের কাঠ কাটি, বিজ্ঞানের পাথর ভাঙি, সমালোচনার কামান গড়ি। আবার যাহার মনোদেশে বসন্ত ঋতুটা প্রবল, সে বলে নাটকের ফুলগাছ তৈয়ারি করি, কবিতাফুলের মালা গাঁথি। সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়।

শীতকালে কবি নানাবিধ প্রযোজনীয় কর্ম করিবার সঙ্কল্প ও আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বসন্ত-বায়ু আসিযা সেই-সব কাজের কাগজ উড়াইয়া লইয়া গেল, কবির হিতসাধনব্রত পঙ্গু হইয়া গেল, কবি পরম আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বসন্তকে সমাদর করিয়া ডাকিয়া লইলেন—

> এস এস বঁধু এস,
> আধেক আঁচরে বস,
> অবাক্ অধরে হাস,
> ভুলাও সকল তত্ত্ব।

এই কবিতাটিতে কবি যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই এই কবিতা-রচনার পরের দিনে লিখিত একখানি পত্রে গদ্যে লিখিয়াছেন। (সাহাজাদপুর, ২রা জুলাই, ১৮৯৫, ছিন্নপত্র)।

অন্তর্যামী ১

(ভাদ্র, ১৩০১)

কবি যখন বোটে করিয়া পতিসর হইতে দীঘাপতিয়া দিয়া বোয়ালিয়াতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১৮৯৪ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বরের কয়েকদিন পূর্বে) তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন। ছিন্নপত্রে ১৮৯৪ সালের ২৫ এ সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত এক চিঠিতে এই 'অন্তর্যামী' কবিতাব উল্লেখ আছে।

যিনি অন্তবে বাস করেন, যিনি জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়মনকর্তা, যিনি চিত্তবৃত্তির নিয়ামক, যিনি অন্তরাত্মা, যিনি অন্তর্জ্ঞানী, তিনি অন্তর্যামী। কবির সমগ্র জীবনের অন্তর-প্রেরণাই তাঁহার অন্তর্যামী। কবি-শিল্পী যখন কিছু নূতন রচনা করেন, নূতন সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাঁহার অন্তরে একজন অজানা বড়-আমির সন্ধান পান—যিনি কবির অন্তরের অন্তরালে থাকিয়া কবিকে দিয়া রচনা করাইয়া লন। কবির চরম সার্থকতার মূলে যে আন্তর প্রেরণা আছে, তাহাই তাঁহার অন্তর্যামী। কবি যখন লেখেন তখন মনে কবেন তিনি লিখিতেছেন এক, কিন্তু তাহার প্রকাশ ও অর্থ হইয়া দাঁড়ায় অন্য। এই যে মানবের অজ্ঞাতসারে তাহাকে পবিচালনা করেন যিনি, তিনি মানব-মনকে লইয়া কৌতুক কবেন। তিনি তাহার দ্বাবা নিত্য নূতন কাজ করাইয়া লইয়া তাহাব সঙ্গে কৌতুক কবেন। কবি কর্তা, কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে তাঁহার কোনো কর্তৃত্ব নাই, এইখানেই কৌতুক। তাঁহাব নিজের রচনার উপর তাঁহার কোনো অধিকার নাই, তিনি যখন লেখেন তখন নিজের ক্ষমতা দেখিয়া নিজে বিস্ময় মানেন, কিন্তু পবে তিনি আর নিজের মধ্যে সেই লেখক-আমিকে খুঁজিয়া পান না। কবি ইচ্ছা করেন যাহা তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার, যাহা তাঁহার নিজের দেশের ব্যাপার—তাহা লইয়া কবিতা লিখিতে, কিন্তু লেখা হইলে সেই রচনার মধ্যে এমন একটা সুর শুনেন যাহা ব্যক্তিগতকে ও স্থানিককে বিশ্বের করিয়া তুলিয়াছে। কবির অন্তর্যামী তাঁহার জীবনে ও কাব্যে সৃজনলীলার আশ্চর্য রহস্য প্রকাশ করেন। যে-ব্যক্তি কাব্য রচনা করেন, তিনি যেটুকু সীমার মধ্যে আপনার কথার অর্থ কল্পনা করিয়া রাখেন, এই অন্তর্যামী কৌতুকময়ী জীবনদেবতা সেই সীমাবদ্ধ ছোট কথারই ভিতরে আপনার নিত্যবাণীর সুর যখন মিলাইয়া দেন, তখন কবি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যান।

এই বিস্ময় কেবল কবির মধ্যে নয়, জীবনেও ঘটে। এই জীবনদেবতাই জীবনকে ক্রমাগত ছোট দিক্ হইতে বৃহতের দিকে, আরামের দিক্ হইতে পরম দুঃখের মধ্যে উপনীত করেন; জীবন যখনই একটা বিশেষ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, একটি প্রবৃত্তির মধ্যে বাঁধা পড়ে, তখনই জীবনদেবতা বেদনার দ্বারা সেই বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে আবার সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই যে, যেটা উপস্থিত সেইটাই মনে হয় আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত; কিন্তু সেটা যে বাস্তবিক একটা সোপান-পরম্পরার অঙ্গ ও অংশ মাত্র তাহা আমরা ভুলিয়া থাকি। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয় ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য, যেন সে বন-লক্ষ্মীর সাধনার চরম ধন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে ফল ফলাইবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। খণ্ডের মধ্যে সমগ্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। বর্তমান হইতেছে ক্ষুদ্র খণ্ড—অতিক্ষুদ্র—ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে হাইফেন মাত্র—একাকী তাহার মধ্যে কোনো তাৎপর্য নাই; কিন্তু সমগ্র জীবন—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলাইয়া যে সমগ্র জীবন তাহার মধ্যে তাৎপর্য পাওয়া যায়। অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া জীবনদেবতা কবিকে এই বর্তমান অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন। কবি কাজ করিয়া যান, কিন্তু সেই কাজের মধ্যে, খণ্ড-পরম্পরাব মধ্যে তিনি কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পান না। কেবল তাঁহার অন্তর্যামী, যিনি তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ ও জন্ম-জন্মান্তর মিলাইয়া তাঁহাকে চালনা করিতেছেন, তিনিই তাঁহার সমগ্র জীবনের সবটা সার্থকতা বুঝিতে পারেন। জীবনদেবতা জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে কখনো কখনো জীবনকে অন্য দিকে লইয়া যান, তখন লোকে ভাবে যে তাহার জীবন বুঝি ব্যর্থ হইয়া গেল, কিন্তু জীবনদেবতাই আবার সেই জীবনকে সার্থকতার মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া আসেন, সমস্ত বিফলতার মধ্য দিয়া তিনি চরমের দিকে লইয়া যান। কবি তখন নিজের মিলন ও বিরহের মধ্যে বিশ্বের মিলন ও বিরহ দেখিতে পান, তিনি জীবনদেবতার প্রেম দিয়া তাঁহার বিশ্ব-প্রেমের রাগিণীর সাধনা করেন। যখন তিনি নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবেন, তখন জীবনদেবতার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মিলন ঘটিবে—তাঁহাদের মধ্যে কোনো বিভিন্নতা থাকিবে না, তখন কবি নিজের মধ্যেই জীবনদেবতাকে পাইবেন, তাঁহাকে আর অন্যত্র খুঁজিতে হইবে না। কারণ পূর্ণ সার্থকতা লাভ হইলে অন্বেষণের বিরাম হইবে এবং অন্বেষণ-বিরতির অর্থই পূর্ণ-সার্থকতা লাভ।

অলিভার ওয়েণ্ডেল্ হোম্স্ তাঁহার Autocrat at the Breakfast Table পুস্তকে অটোক্র্যাট্‌কে দিয়া বলাইয়াছেন যে—তিনি যখনই একটা সুন্দর লাইন লেখেন তখনই তাঁহার মনে হয় যেন উহা তাঁহার নিজের নয়, তাঁহার নিজের দ্বারা উহা লেখা সম্ভবপর নয়।

মানুষের এই আত্মাতিরিক্ত প্রেরণার ভাবকে আত্মিকশক্তিরহস্য-সন্ধানকারী Psychic-গণ বলেন—"Prósopepsis."

সাধনা

(৪-ঠা কার্ত্তিক, ১৩০১, শান্তিনিকেতন)

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'চিত্রা'-সমালোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

সাধনা কবিতাটি দেবী বীণাপাণির প্রতি কবির আত্মনিবেদন।

কবি তাঁহার অন্তরপ্রেরণাকে দেবীরূপে সম্বোধন করিতেছেন। সেই কবিত্বের অন্তরপ্রেরণাকে আমরা যে কোনো নামেই অভিহিত কবিতে পারি—তিনি কবি কৃত্তিবাসের কাছে দেবী সরস্বতী, তিনিই দেবী বীণাপাণি, তিনিই কবির জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতার চবণে কবি তাঁহার জীবনেব সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলতা ও সফলতা উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন। ব্যর্থতা তো সার্থকতারই পূর্বাবস্থা। সমস্ত ব্যর্থতাই জীবনদেবতা সার্থক কবিয়া তোলেন—তিনি সকল ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ ভাঙা-গড়া মিলাইয়া জীবনকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলেন,—তিনিই উপস্থিত বর্তমানকে চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত সামগ্রীকে বিশ্বব্যাপারেব সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণেব সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া সমস্ত কিছুকে তাহার ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলেন। কবি বলিতে চাহেন যে মানুষের জীবনের ব্যর্থ চেষ্টাও কখনো নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয় না—যাহা লোকে মনে করে ব্যর্থ, জীবনদেবতা তাহার দ্বারাই জীবনকে সার্থকতার দিকে লইয়া চলিয়াছেন। এইজন্য কবি রবার্ট্ ব্রাউনিং বলিয়াছেন যে, স্বর্গ এমন কিছু যাহা সহজে পাওয়া যায় না, যাহা সর্বদা আয়ত্তের বাহিরে—সেই স্বর্গকে লাভ করিবার সাধনাই এই মানব-জীবন।

এই কবিতায় আমাদের কবি আরো বলিয়াছেন যে কর্মে প্রকাশ অপেক্ষা মনের গোপন ইচ্ছার মূল্য অনেক বেশি।

এই ভাবের কথা বিদেশী বহু কবির কাব্যে দেখা যায়—

এই যে দুঃখ, এই যে আবেগ, এই যে ভ্রান্তি ভুল,
এই লালসা পাপ্‌ড়ি এরাই, গড়্‌ছে প্রাণের ফুল।

—Emile Verharen (*Belgium.*)

সন্ধ্যাসঙ্গীত পুস্তকের 'সন্ধ্যা' কবিতার ব্যাখ্যার মধ্যে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক জেভন্‌সের উক্তি এবং রবার্ট্‌ ব্রাউনিং-এর উক্তিসকল হইতে আমরা এই কবিতার মর্ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব।—

Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through language and escaped,
All I could never be,
All, men ignored in me,
This, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped.

—Robert Browning, *Rabbi Ben Ezra.*

Fool! All that is, at all,
Lasts ever, past recall,
Earth changes, but the soul and God stand sure,
What entered into thee,
That was, is and shall be
Time's wheel runs back or stops: Potter and clay endure.

—Robert Browning, *Rabbi Ben Ezra.*

Nothing worth keeping is ever lost in this world; look at a blossom............ it drops presently, having done its service and lasted its time, but fruits succeed, and where would be the blossom's place could it continue? —Robert Browning, *Pippa Passes.*

All things once are things for ever;
Soul, once living, lives for ever;
Blame not what is only once,
What that once endures for ever;

—Richard Monckton Milnes or Lord Houghton (1809-85), *Ghazeles.*

We poets pride ourselves on what
We feel, and not what we achieve
The world may call our children fools
Enough for us that we conceive.

—W. H. Davies, *On Hearing Mrs Woodhouse Play The Harpsichord* (*Georgian Poetry*, 1918-19)

দ্রষ্টব্য—পরিশেষ পুস্তকে অপূর্ণ কবিতা।

জীবনদেবতা

(২৯-শে মাঘ, ১৩০২)

কবির কাছে যিনি আগে ছিলেন অন্তর্যামী, এখন তিনিই হইয়াছেন জীবনদেবতা। কবি ইহাকে কখনো রমণীরূপে এবং কখনো পুরুষরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। আমরা অন্তর্যামী কবিতার ব্যাখ্যার সময়ে দেখিয়াছি—সমগ্র জীবনের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের যে প্রেরণা, এই মানব-যন্ত্রের যিনি চালক, তাঁহাকেই কবি অন্তর্যামী বা জীবনদেবতা বলিয়াছেন। কবি যখন কবিতা লিখিতেছেন তখন তিনি মনে করেন যে তিনিই তাহা লিখিতেছেন, কিন্তু পরে যখন সেই কবিতা তিনি পাঠ করেন, অথবা অপরে তাহার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া নব নব অর্থ আবিষ্কার করে, তখন আর কবির কোনো কর্তৃত্বাভিমান বা অহংকার থাকে না। এই কথা মনে করিয়াই বোধ হয় সংস্কৃত কবি বলিয়াছিলেন—কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ। কবি তখন বুঝিতে পারেন, কোনো শক্তি যেন অন্তরের অন্তরালে বসিয়া তাঁহার কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়াছে—উহারই ফলে তিনি কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শক্তিকেই কবি মনে করেন অন্তর্যামী বা জীবনদেবতা। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে অবস্থাকে বলিয়াছেন Serene and the Blessed Mood, সক্রেটিস যাহাকে বলিয়াছেন Daemon, প্লেটো যাহাকে বলিয়াছেন Idea, কৃশ্চানদের কোয়েকার সম্প্রদায় যাহাকে বলিয়াছেন অন্তরের আলোক, দার্শনিক ফেকনার যাহাকে বলিয়াছেন ব্যক্তি-চৈতন্যাতীত মহাচৈতন্য, যাহা জীবনের পরিচালনী শক্তি, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন অন্তর্যামী বা জীবনদেবতা। ইহাকেই

H. G. Wells বলিয়াছেন—The living reality in our lives (God the Invisible King), The Driver of the Machine-man ।]

কবির জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তিনি জানেন না তাঁহার জীবনের শেষ তাৎপর্য কি, আর তাহার পরিণতি ও সার্থকতা কোথায়। জীবনের শেষে হয়তো তিনি নিজে না হোক, অপরে তাহা অনুভব করিতে পারিবে এবং তখন তাঁহার জীবনের সমগ্র তাৎপর্য অনুভব করা ও উপলব্ধি করা সহজ হইয়া যাইবে। জীবনের সার্থকতা যখন কবি নিজের অন্তরে অনুভব করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার নবজন্ম লাভ হইবে। তখন জীবনদেবতা ও তাঁহার মিলন সম্পূর্ণ হইবে। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আর কোনো প্রভেদ থাকিবে না—তখন জীবনদেবতা ও জীবন এক হইয়া যাইবে। তখন জীবনদেবতা বলিয়া অপর স্বতন্ত্র কাহাকেও খুঁজিতে হইবে না। কারণ সার্থকতা লব্ধ হইয়া গেলে তাহার জন্য আর অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে হয় না।

অতএব, যিনি পূর্ণজীবনের অখণ্ড আনন্দানুভূতির মধ্যে বিরাজমান তিনিই জীবনদেবতা। যিনি জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত উপকরণ লইয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিশ্বের সহিত কবি-জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করেন, যিনি বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি অবলম্বন করিয়া কবির অগোচরে কবির মধ্যে বিরাজ করেন, কবির অন্তর্নিহিত যে সৃজন-শক্তি জীবনের সব সুখ-দুঃখকে ও সমস্ত ঘটনাকে ঐক্য দান ও তাৎপর্য দান করে, কবির রূপ-রূপান্তরকে ও জন্ম-জন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথে, যাহার মধ্য দিয়া কবি বিশ্বচরাচরের মধ্যে স্বকীয় আত্মার ঐক্য অনুভব করেন, সেই শক্তি হইতেছে জীবনদেবতা। কোন্ এক আদিম যুগের আমি ক্রমশ নানা অবস্থার পরিণতির ফলে বিবিধ বিবর্তনে এই আমি হইয়া উঠিয়াছি; সেইজন্য সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ আমি অনুভব করি। যিনি এই ব্যক্তি-চৈতন্যের অধিপতি, তিনিই জীবনদেবতা। তিনিই অতীতের ভিতর দিয়া অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া কবির সোনার তরীকে কাল-মহানদীর তীরে তীরে নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলেন। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ বলেন—চেতনা মানে স্মৃতি। ব্যক্তির চেতনা যতক্ষণ বিশ্বচৈতন্যে মগ্ন হইয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার বিকাশ বন্ধ হইতে পারে না—এক দিকে তাহার অনাদি অতীত, অন্য দিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ, এই অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যক্তি-চৈতন্য একটি অতি ক্ষুদ্র হাইফেন-সদৃশ, উভয়কে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

জীবনদেবতা কবিকে নানা অবস্থায় সংগীত বা ফুলের ন্যায় সুন্দর ভংগীতে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন; অসংখ্য বাধা উদ্যত হইয়া উঠে; অসম্বদ্ধ ভাব ও আদর্শের আলো-আঁধারে পথ ভুল করিয়া কবি নিজেকে অংশের মাঝে, খণ্ডতার মাঝে হারাইয়া ফেলেন; তখন জীবনদেবতা কবিচিত্তে অবতীর্ণ হইয়া কবির মনে আত্মদর্শন ও আত্মচেতনা জাগাইয়া দেন এবং তাঁহাকে এক মহৎ আদর্শের সন্ধানে নিয়োজিত করেন—সে সন্ধান ভূমাব বা বৃহতেব সন্ধান।

কবি-প্রাণ অনন্ত-ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। সমস্ত ঐশ্বর্যের মধ্যেও একটা অখণ্ড অনন্ত সমগ্র পরিপূর্ণ জীবনের অভাব কবিকে সারা জীবন ধরিয়া কাঁদাইতেছে। সেই পূর্ণ জীবনের জন্য কবির তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অন্তহীন বিশ্রামহীন ব্যাকুল সন্ধান তাঁহার কবিজীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্বের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে যখন পূর্ণ সমগ্রেব মধ্যে উপলব্ধি করি, তখন জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য—অসামঞ্জস্য—ভাঙাচোরা—পূর্ণ সুন্দর হইয়া উঠে। সেই সুন্দরেব সোনাব কাঠির ছোঁওয়া কোনো এক শুভ মুহূর্তে ক্ষণিকের তরে লাভ করিয়া কবি-হৃদয় চেতনা লাভ কবে,—সেই পরশ-পাথরেব ছোঁয়াব আস্বাদ একটা স্থির শান্ত সত্য অখণ্ডেব, একটা পূর্ণ জীবনের অর্থাৎ অন্তরতর জীবনের বার্তা আনিয়া দেয় ও তাহাকে পাইবার প্রলোভন মনে জাগাইয়া তুলে। সেই পূর্ণজীবন, যাহার অখণ্ড আনন্দ শুধু অনুভূতিব ভিতবেই বহিয়াছে, তিনিই জীবনদেবতা। ক্ষণিকের মধ্যে বিচ্ছিন্নেব মধ্যে অংশেব মধ্যে ও অসম্পূর্ণের মধ্যে সম্পূর্ণের একের চিরন্তনেব উপলব্ধি হইতেছে জীবনদেবতার পরিচয়। বিশ্ববোধই তাঁহার একমাত্র প্রকৃত স্বরূপ। জীবনের সমস্ত ভালোমন্দ, ভাঙাগড়া ও বিচিত্রতার মধ্য হইতে নিঙড়ানো অখণ্ড আনন্দই তাঁহার অনুভব, চিরন্তনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক, বিশ্বপ্রেমে তিনি পরিব্যাপ্ত। সম্পূর্ণতায় সমগ্রতায় অনন্তে তাঁহার পূর্ণ পরিচয়। জীবনে ও কাব্যে ও শিল্পসৃষ্টিতে এই জীবনদেবতার সৃজনলীলা আশ্চর্য রহস্যজনক।

অন্তরের কোন্ গোপন রহস্যপুর হইতে কবির অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে এই অন্তর্যামী জীবনদেবতা কবিহৃদয়ের সীমাবদ্ধ কল্পনার মধ্যে, ছোট কথার ভিতরে বিশ্বের নিত্যবাণীর সুর মিলাইয়া দেন; কবির নিজের অসম্পূর্ণ ভাঙা বীণার বেসুরা রাগিণীর মধ্যে জীবনদেবতা তাঁহার বিশ্ববীণার অনির্বচনীয় সুরমূর্ছনা সংযোজনা করিয়া দিয়া এক নূতন অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করেন।

আমাদের অন্তরনিবাসী যে ব্যক্তিজীবন পার্থিব সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াই

ক্লান্ত হয়, আমাদের জীবনদেবতা তাহার সুখ-দুঃখের পরমানন্দটুকু গ্রহণ করিয়া সেই ব্যক্তিজীবনকে বড়োর দিকে অনন্তের দিকে নিয়তই চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহার এই রূপের বিকাশ সর্বত্র; আদিম যুগের বাষ্পনীহারিকার মধ্য দিয়া, পৃথিবীর প্রাথমিক তরুলতার ও পশুপক্ষীর বিচিত্রতার ভিতর দিয়া, সমস্ত সৌন্দর্যবোধ ও বিশ্বাভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জীবনকে জীবনদেবতা চিরন্তন পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিতেছেন, এবং বর্তমান জীবনের মধ্যেও তাঁহার অবিশ্রাম ক্রিয়া চলিতেছে। বিচিত্ররহস্যময় ও অপার এই জীবনদেবতার লীলা। মানবের অন্তরবিহারী হইয়াও তিনি মানবমনের অগোচর। সেই প্রথম প্রত্যূষের অন্ধকার মহার্ণবে প্রস্ফুটিত সৃষ্টিশতদলের মর্মকোষে উৎপন্ন বিচিত্র জীবজীবনের বিস্মৃত স্মৃতিকে ক্রমাগত বহিয়া আনিতেছেন জীবনদেবতা। তাই না আমাদের বিশ্ববোধ এমন প্রবলভাবে প্রকাশ পায়; তাই না আমাদের সেই অন্তরবিহারী ব্যক্তিচৈতন্য সমস্ত বিশ্বপ্রাণের আনন্দের নিবিড় অনুভূতি ও সুমধুর স্পর্শ লাভ করিতে পারে!

জন্ম-জন্মান্তরের যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়া এই পরিবর্তনশীল সৃজনধারাকে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র করিয়া অনাদি কাল হইতে জীবনদেবতা ব্যক্তিত্ববোধের মধ্যে বহন করিয়া আনিতেছেন। নূতন নূতন জীবনে এই স্বতন্ত্র সৃষ্টিধারার সংগে জীবনদেবতার নব নব অপরূপ লীলা। তাই কবি বলিতেছেন—

নূতন করিয়া লহ আরবার
  চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
  নূতন জীবন-ডোরে।

এই জীবনদেবতার পূজায় নানা সুখ-দুঃখের আঘাতে আপনাকে ক্রমাগত গলাইয়া নিজের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীগুলিকে কবি উৎসর্গ করিয়াছেন, সমস্ত আনন্দোচ্ছ্বাস ও দুঃখবেদনা অর্ঘ্যরূপে সাজাইয়া দিয়াছেন, তবু তাঁহার ইহজীবনের পূজা সারা হইল না, কিছুতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি হইতেছে না।

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
  মুরতি নিত্য নব।

তবু তাঁহার নাগাল পাওয়া গেল না, তাঁহার মহিমার অন্ত পাওয়া গেল না! যে জীবনদেবতার প্রেরণা সকল কাজে কর্মে, যাঁহার সত্তা নিজের সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, কবির সৃজনরহস্যে যাঁহার অপার মহিমা দেদীপ্যমান হইয়া প্রকটিত, তাঁহার পূর্ণ পরিচয় তবু পাওয়া যায় না। তাই কবির ব্যথিত চিত্ত হাহাকার করিয়া বলিতেছে—

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি!

কিন্তু জীবনদেবতা একটা অ-ধর মহান্-আদর্শ-রূপেই রহিয়া গেলেন—

সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি,
সেই সুধাভরা আঁখি,
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল,
চিরদিন দিল ফাঁকি।

দিক ফাঁকি, তবু যতটুকু পরিচয় তাহার পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই জানা গিয়াছে যে সেই জীবনদেবতার উপলব্ধির আনন্দের অনুভূতিতেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

নীরব-তন্ত্রী

(৪-ঠা ফাল্গুন, ১৩০২)

এই কবিতায় কবি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিয়া নিজেই তাহার উত্তর দিতেছেন। কবির কাব্যবীণা সহস্রতন্ত্রী, তাহার মধ্যে নয়শত নিরানব্বইটি তার বাজে, কিন্তু একটি তার বাজে না কেন, তাহাই তিনি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, লোকে যেমন তীর্থদর্শনে যাইয়া দেবার্চনা করিবার সময়ে কোনো একটি দ্রব্য দেবতাকে দান করিয়া আসে এবং তাহার জীবদ্দশায় সেই দ্রব্য আর ব্যবহার করে না, সেইরূপ কবিও তাঁহার অন্তর্যামী জীবনদেবতাকে অর্চনা করিবার সময়ে তাঁহার বীণার যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ তার সেই সুবর্ণ-তারটি দেবতার পদে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সূক্ষ্মতম গভীরতম গূঢ়তম ও সুন্দরতম ভাবধারাই এই সুবর্ণ-তার। কবির মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহার

কতটুকুই বা তিনি ভাষায় প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারেন? কবি স্বয়ং অন্যত্র লিখিয়াছেন—

অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও অপরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

—ছিন্নপত্র, সাজাদপুর, ২৮ জুন, ১৮৯৫।

কবি এই মৌন ভাবরাশি হইতে অপার আনন্দ উপভোগ করেন। সেগুলিকে ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহার সৌন্দর্য অনেকখানি ক্ষয় হইয়া যায়, এবং অনেক স্থলে তাহা ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। তাই কবীন্দ্রের সহস্রতন্ত্রী বীণার ঐ তারটি মৌন হইয়া আছে। তাই বুঝি বিশ্বকবি তাঁহার মর্মবীণার স্বুবর্ণ-তারটিকে নীরব নিশ্চল দেখিয়া এবার তুলির আলিম্পনের ভিতর দিয়া তাঁহার মনের অব্যক্ত ভাবরাশিকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাই বুঝি তিনি ছবির নাম পর্যন্ত দিতে পারিলেন না, পাছে ভাষা প্রয়োগ করিলে তাঁহার সত্যভঙ্গ হইয়া যায়। যাঁহারা কবির ছবির মর্ম বুঝিবেন তাঁহারা সেই নীরব মৌন স্বুবর্ণ তারের ঝঙ্কার ছবির রেখা ও রঙের ভিতরে কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন এই কথা মনে করিয়াই কবি তাঁহার সাধনা কবিতার মধ্যে বলিয়াছেন—

দেবী! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি'।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি!

* * * *

মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।

* *

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি',
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,
হৃদয়াসীনা॥
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

এই কথাই এই কবিতার মর্মকথা—যাহা কবির আশায় থাকে, আশয়ে থাকে, ভাবনায় থাকে, অনুভবে থাকে, তাহাকে তো তিনি ভাষায় প্রকাশ করিয়া তুলিতে পারেন না। যাহা প্রকাশিত হয় তাহা জানে জগজ্জনে, আর যাহা অপ্রকাশ থাকিয়া যায় তাহা জানেন কেবল কবির অন্তর্যামী জীবনদেবতা। যত বড় কবিই হোন না কেন, তিনি কিছুতেই নিজের সমস্ত চিন্তাকে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহাকে পরাস্ত হইয়া স্বীকার করিতে হয়—

যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না!

দিনশেষে

(২৮-এ অগ্রহায়ণ, ১৩০২)

কবি যখনই তাঁহার কর্মজীবন সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে চাহেন, তখনই তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহাকে এত অজ্ঞাত নূতনের উদ্দেশে ঘরছাড়া করিয়া 'আবার আহ্বান' করিয়া অকূলে বাহির করেন। যিনি ভুবনলক্ষ্মী সৌন্দর্যলক্ষ্মী তিনিও ক্রমাগত কবিকে নব নব রূপ দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটাইয়া ছাড়েন। কবি ক্লান্ত হইয়া বারংবার সেই লীলাসঙ্গিনী দোসরকে জিজ্ঞাসা করেন—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী!
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী!

—নিরুদ্দেশ যাত্রা।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে।……যে দিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশী বাজ্‌ছে।

কবির আকর্ষণ সেই দিকে।

আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্য-সিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি—তাহাকেই শারদ-প্রাতে মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই—হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমার দ্বারে, ওগো বিদেশিনী। —জীবনস্মৃতি

যখনই কবি দিন শেষ হইয়া আসিল মনে করিয়া তরণী বাওয়া বন্ধ করিতে চাহেন, তখনই 'অশেষের' 'আবার আহ্বান' আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি জীবনদেবতার 'শঙ্খ' ধূলায় পড়িয়া থাকিতে দেখেন, বলাকার ডাক শুনিতে পান—'হেথা নয়, হেতা নয়, অন্য কোনোখানে।'

প্রত্যেক নূতন বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশী—সেই অচেনা অজানা দেশে নামিয়া যখনই জিজ্ঞাসা করি—

হাঁগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে?

তখনই সেই দেশের বিমোহিনী তরুণী 'ভরা ঘট ছলছলি' নতমুখে সরিয়া চলিয়া যায়, তাহার কোনো পরিচয় সে ব্যক্ত করিতে চাহে না, তাহার পরিচয় সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়—সেই তরুণী যে লাজময়ী রহস্যময়ী।

যিনি নবীনা, যিনি নানা রূপের ভিতর দিয়া নানা অনুভবের মধ্য দিযা কবিচিত্তকে স্পর্শ করেন ও মুগ্ধ করেন, তিনিই কবিকে একটু দেখা দিয়া চলিয়া যান, তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাই কবি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সংসারের সমস্ত বৈষয়িকতা ছাড়িয়া সেই সুন্দরের মনোহরের রাজ্যে বাস করিতে চাহিতেছেন। সকল ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া কবি সৌন্দর্যের রাজপুরাতে থাকিতে চাহিতেছেন—

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান

—গীতিমাল্য।

কবি বলিতেছেন,—

কত মানুষের ভিতরে তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল, মন ভরল না, সে কেঁদে বলল—জীবন ব্যর্থ হলো,—এমন একটি লোককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিতে পারি।···অন্তরাত্মাকে যা কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করছে, সে বলছে—এ নয়, এ নয়, এ নয়; আমি আমার প্রিয়তমকে চাই।

কবি সেই সকল-সৌন্দর্যের সুন্দরকে, সকল মাধুর্যের মধুরকে, সকল জানার জ্ঞানময়কে, সকল বিষয়ের নবীনকে পাইতে চাহিতেছেন।

এই কবিতাটিকে তত্ত্বের দিক্ হইতে না দেখিয়া মানবীয় ভাবে দেখিলেও ইহার সৌন্দর্য মনকে মুগ্ধ করিবে। ইহার মধ্যে যে শব্দচিত্র আছে তাহা অতীব মনোহর। কথা দিয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়া যাইতে কবি রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সিন্ধুপারে

(২০-এ ফাল্গুন, ১৩০২)

এই কবিতাটি চিত্রা-কাব্যের ও জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতার শেষ কবিতা। যে রহস্য-সঙ্কুল ভুতুড়ে বর্ণনা কবির 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'কঙ্কাল' গল্পের মধ্যে দেখিতে পাই, সেই রহস্যঘন বর্ণনা এই কবিতাটিকে অতি চিত্তাকর্ষক ও চমৎকারজনক করিয়াছে।

এই কবিতায় কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে জীবন ও মৃত্যু দুইটি পরস্পর-বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাপার নহে, উহাদের একটি অপরের প্রতিবাদ নহে, উহারা উভয়ে একই অস্তিত্বধারার দুইটি দিক্ মাত্র। মৃত্যু জীবনকে সমষ্টি-জীবনের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যায়, মৃত্যু অবসান বা নির্বাণ নহে।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার চিত্রা-সমালোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

মৃত্যুসিন্ধুর পারে প্রেমিকের সহিত তাহার প্রিয়ার নূতন করিয়া বিবাহ হইল। মৃত্যু-রজনীতে অবগুণ্ঠনমুখী অশ্বারোহিণী এক রমণী আসিয়া পুরুষকে ডাকিল। সঙ্গের দ্বিতীয় অশ্বে তাহাকে বসাইয়া সিন্ধুপারে লইয়া গেল। রমণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল।—ভিতরে অপূর্ব ক্ষোদিত বহু কক্ষ-যুক্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। রমণী এক পালঙ্কে বসিয়া পুরুষকে পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিল। দশ দিকে বীণা বে[ণু] বাজিতে লাগিল। ক্রমে বিবাহ হইল। বিবাহের বর্ণনাটি বড় চমৎকার।

পুরুষ মন্ত্রচালিতের মতো বিবাহ করিয়া গেল, কিন্তু তখনও জানে না রমণী কে। পরে কাকুতি মিনতি করিয়া যখন মুখ দেখিতে পাইল, দেখিল সেই! তখন প্রেমিক প্রেয়সীর অমল কোমল চরণ-কমলে চুম্বন করিল। ব্যাকুল অশ্রু বাধা না মানিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং

অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশী।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

এই কবিতার তাৎপর্য আমি কবিগুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। স্বয়ং কবি তাহার এই তাৎপর্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

যে প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখদুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেলো। যে নিয়ে যায় মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাবো চিরপরিচিত মুখশ্রী। কোন পৌরাণিক পরলোকের কথা বলছিনে, সে কথা বলা বাহুল্য, এবং কাব্যরসিকদের কাছে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে বিবাহের অনুষ্ঠানটা রূপক। পরলোকে আমাদের প্রাণ-

সঙ্গিনীর সঙ্গে ঠিক এই রকম মন্ত্র প'ড়ে মিলন ঘটবে সে আশা নেই। আসল কথা, পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।

এই কবিতাটির শেষের দিকে জীবনদেবতার কথাটুকু বাদ দিলে কবিতাটির মধ্যে এই তত্ত্বকথা থাকিত না বটে, কিন্তু কবিতাটি একটি নিরবচ্ছিন্ন রহস্যঘন ও গায়ে-কাঁটা-দেওয়া চমৎকারজনক বর্ণনা হইত। যে দিক হইতেই দেখা যাক, মোটের উপর কবিতাটি অনুপম সুন্দর।

মৃত্যুর আহ্বানকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রার সঙ্গে তুলনা আধুনিক ইংরেজ কবির একটি কবিতায় দেখা যায়।—

Suppose...and suppose that a wild little Horse of Magic
Came cantering out of the sky,
With bridle of silver, and into the saddle I mounted,
To fly—and to fly;

And we stretched up into the air, fleeting on the sunshine,
A speck in the gleam,
On galloping hoofs, his mane in the wind out-flowing,
In a shadowy stream;

And oh, when, all lone, the gentle star of evening
Came crinkling into the blue,
A magical castle we saw in the air, like a cloud of moonlight,
As onward we flew.

And across the green moat on the drawbridge we foamed and we snorted,
And there was a beautiful Queen
Who smiled at me strangely and spoke to my little Horse, too,—
A lovely and beautiful Queen,

And she cried with delight—and delight—to her delicate maidens
'Behold my daughter—my dear!'
And they crowned me with flowers, and then to their harps sate playing,
Solemn and clear;

And magical cakes and goblets were spread on the table;
And at window the birds came in;
Hopping along with bright eyes, pecking crumbs from the platters,
And sipped off the wine,

And splashing up—up to the roof tossed fountains of crystal;
And Princes in scarlet and green
Shot with their bows and arrows, and kneeled with their dishes
Of fruits for the Queen;
And we walked in a magical garden with rivers and bowers,
And my bed was of ivory and gold;
And the Queen breathed soft in my ear a song of enchantment—
And I never grew old..............
And I never, never came back to the earth, oh, never and never;
How mother would cry and cry!
There'd be snow on the fields then, and all those sweet
flowers in the winter
Would wither and die. ....
Suppose .....and suppose................
—Walter de la Mare, *Suppose* (*Georgian Poetry*, 1920-1922)

মৃত্যুর পরে ৮

(বৈশাখ, ১৩০১ সাল)

এই কবিতাটির রচনার তারিখ কবিতায় দেওয়া নাই। তবে ইহা ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে দুইজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল—সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ সালের ২৬-এ চৈত্র এবং কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় ১৩০১ সালের ১১-ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩১০ সালের সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত নিত্যকৃষ্ণ বসুর সাহিত্য-সেবকের ডায়ারি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই কবিতাটি প্রকাশিত হইলে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ইহা বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত; আবার ইহা যে বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া লেখা নহে এই সন্দেহ ঐ ডায়ারিরই অন্যত্র আছে। যাঁহারই মৃত্যু এই কবিতাটি লেখার উপলক্ষ্য হোক না কেন, ইহা এখন সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে কোনো বাধা নাই।

মানুষ যেরূপ ইচ্ছা করে, কামনা করে, সেইরূপই তাহার বিশ্বাস হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষের মনে একটা ইচ্ছা প্রবল হইয়া থাকে যে 'আমি মরিব না'। তাই তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মৃত্যুর পরেও মানুষ

কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকে—সে একেবারে লুপ্ত হয় না। মানুষের টিকিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রবল, কারণ সে মনে করে যে মৃত্যুই যদি ঘটিল, তবে তো আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ আনন্দ সবই সেই সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। বাস্তবিকপক্ষে মৃত্যুর পরে কি হয় না-হয় তাহার কোনও বিচার-সঙ্গত প্রমাণ ও উত্তর মানুষ এখনও পায় নাই। পরলোক নাই—এ কথাও বলা যায় না, আর আছে—এ কথাও বলা যায় না। যাহার যেরূপ রুচি সে সেইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা হইতেই বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রকারের স্বর্গ নরক ও পরলোকের পরিকল্পনা।

মৃত্যুর পরে দেহের কোনও শক্তি থাকে না। সুতরাং দেহটাই যদি সব হয়, তবে মৃত্যুর সঙ্গেই সব-কিছু শেষ হইয়া চুকিয়া যায়। কিন্তু দেহাতিরিক্ত কিছু আছে কি না, সে কথা কেহ জানে না। মৃত্যুর পরে কিছু আছে কি না—এই কথা ভাবিবার একটা মূল্য আছে,—কারণ, তাহা হইলে মানুষ মনে স্ফূর্তি পায়, কর্মের প্রেরণা ও শক্তি পায় এবং তাহার জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ হইয়া যায়।

মৃত্যুর পরে কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলিয়া—individuality বা personality বলিয়া কিছু থাকে না। যে একবার চলিয়া যায়, সে আর 'পূর্বের সে' থাকে না। যদি সে সেই থাকিত, তবে সে আবার ফিরিয়া আসিত এবং এই সমস্যারও সমাধান হইতে পারিত। কিন্তু সে তো তাহার জীবনের ভাল মন্দ সব কিছু দিয়া গিয়াছে—সে আর কিছু লইবেও না, দিবেও না। অতএব তাহার সঙ্গে এখন কলহ করা বৃথা। অনন্ত জীবনে অনন্ত কাজে সে চলিয়া গিয়াছে। এতদিন ছোট্ট একটা আকারের মধ্যে তাহার আত্মা বাঁধা ছিল, এখন সে বিশ্বজীবনের মধ্যে সমগ্র-জীবনের মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে। এই জগতের খণ্ড-জীবনে কোনো পূর্ণতা নাই। মৃত্যু জীবনের একটা সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা আনিয়া দেয়। এই জীবনের সুখ-দুঃখগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, মৃত্যু কি মালাকারের মতো সেগুলি কুড়াইয়া একত্র করিয়া একটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া দিয়াছে? যে মরিয়া গিয়াছে, সে বোধ হয় ইহার হাঁ বা না যাহা হোক একটা উত্তর পাইয়াছে। মৃত্যুর পরে হয়তো সাংসারিক সংস্কারের ভালো-মন্দ ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যায়; যাহা এখন সামাজিক সংস্কারের বশে নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছে তাহা হয়তো সেখানে সংস্কার-বিমুক্ত অবস্থায় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এবং এখানকার উৎকৃষ্ট হয়তো সেখানে নিকৃষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। চিতার আগুনে মানুষের সব লজ্জা লাঞ্ছনা শেষ হইয়া যায়।

মৃত্যুর কোনও আবরণ নাই, সে স্বভাব-নির্মল, সে নিরাবরণ সত্যরূপে

দেখা দেয়। সে যাহাকে গ্রহণ করে তাহাকে মহাবিশ্ব কোলে তুলিয়া লয়; সে কাহারও সুখ-দুঃখের পাপ-পুণ্যের সফলতা-বিফলতার কথা না ভাবিয়া সকলকে সমান ভাবে নিজের স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দেয়। মানুষ তাহার আত্মীয়ের বিরহে কাতর হয় কেন? কারণ, তাহার অন্তরাত্মা জানে যে সে তাহার নয়—সে সমগ্র বিশ্বের—ক্ষণকালের জন্য মাত্র সে তাহাকে পাইয়াছিল।

অসমাপ্ত খণ্ড-জীবনের কোনও সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, একটি খণ্ড-জীবন দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবন এবং মরণের অর্থ এক মহাজীবনের মধ্যে জাগরণ ও নিদ্রা—আলোক ও অন্ধকারের পর্যায় মাত্র। জীবন ও মৃত্যু একই প্রাণশক্তির দুইটি অবস্থা, দুইটি সংস্থিতি। মৃত্যু আসিলে জীবন সুস্পষ্ট হয়, মৃত্যুই জীবনকে সপ্রমাণ করে। মৃত্যুই জীবনকে ক্রমাগত প্রকাশ করে। মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন আছে। বন্ধন আছে বলিয়াই যেমন মুক্তি আছে—অন্ধকার যেমন আলোককে প্রকাশ করে—তেমন মৃত্যু জীবনকে প্রকাশ করে। রূপের ভিতর দিয়া অপরূপের প্রকাশ হয়। জীবনকে সত্য বলিয়া জানিতে হইলে মৃত্যুকে চাই, মৃত্যুতেই জীবনের প্রকৃত পরিচয়। যে মৃত্যুকে এড়াইতে চায় সে শুধু কাপুরুষ নয়, সে প্রাণধর্মকেই স্বীকার করে না। মৃত্যুকে খুঁজিতে গেলেই তবে জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, এই কথাই কবি তাঁহার ফাল্গুনী নাটকে বলিয়াছেন। যাহাদের মৃত্যুর সহিত মনের মিল হইয়াছে তাহারা তাহার বাহিরের ভীষণ রূপ দেখিয়া ভয় পায় না, তাহারা আরো ভালো করিয়া সেই সুন্দরকে ধরিতে চায়। জীবন অর্থই মৃত্যুর সমাধি। জীবনই কেবল সুন্দর নয়, মৃত্যুও অতি সুন্দর। জীবন ও মৃত্যু একই সূর্যের উদয়াস্তের মতন এক সোনার সিংহদ্বার হইতে অপর এক সোনার সিংহদ্বারে লইয়া যায়। এক দেহের বন্ধন হইতে মুক্তির প্রকাশই মৃত্যু।

মরণের স্নেহের স্পর্শ কেহই এড়াইতে পারে না। তবুও মানুষ মরণ-দেবতার আগমনের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠে, সে মরণকে এড়াইতে প্রাণপণ করে, কিন্তু মরণ তাহাকে প্রিয়ের মতন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। যে মুহূর্তে জীবনের সহিত মরণের শুভদৃষ্টি হয়, তখন হইতেই জীবনযাত্রা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। মৃত্যুর পরে মানুষ পার্থিব ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ সব কিছুর অতীত হইয়া যায়। যে অজানা অচেনা দেশে সে চলিয়া যায় সেখানে কি আছে কে বলিতে পারে? মৃত্যুর পরে মানুষের অস্তিত্ব থাকে কি না এই প্রশ্নের সমাধান বিচার বা বুদ্ধির দ্বারা করা যায় না। এই পৃথিবীতে মানুষ ক্ষণিকের

অতিথি। তবুও সে ইহার সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া থাকে। মৃত্যু আসিয়াই ইহার সঙ্গে তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বাঁচিয়া থাকার সময়ে ক্ষুদ্র একটা দেহের মধ্যে জীবন আবদ্ধ হইয়া থাকে, মৃত্যু আসিয়া সেই জীবনকে শাশ্বত জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেয়, অনন্তের মধ্যে তাহাকে বিলাইয়া দেয়। জীবনের মাঝে প্রতি পদে অসম্পূর্ণতা অসার্থকতা ছড়াইয়া থাকে, মৃত্যু সকল কিছুর পরিপূর্ণতা আনিয়া দেয়। জীবন বহিয়া চলে ব্যর্থতার বোঝা, আর মৃত্যু বহিয়া আনে পূর্ণতার বিজয়মালা। আমাদের জীবনে হাসি ও কান্না, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য ছাড়া ছাড়া হইয়া ছড়াইয়া থাকে, মৃত্যু একসংগে সেগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া নিপুণ শিল্পীর ন্যায় মালা গাঁথিয়া দেয়। জীবনকালে যে মাপকাঠির দ্বারা বস্তুর মূল্য নিরূপণ হয়, মৃত্যুর পরে তাহারও পরিবর্তন ঘটে। আবরণহীন মৃত্যু সত্যের সকল-সংস্কার-নির্মুক্ত জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রকাশ করিয়া দেয়। সে চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধ প্রশান্তি বিস্তার করে, কোনো প্রকার বাচালতা বা চঞ্চলতা সেখানে থাকে না। মরণ-দেবতার রাজ্যে চিরন্তন শান্তি ও শাশ্বত আনন্দ বিরাজ করে।

"দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।" —পঞ্চভূত।

এই জীবনের পিছনে ছায়ার মতন মরণ ঘুরিতেছে তাহাকে নিশ্চল পরিসমাপ্তি দিবার জন্য। জীবনের প্রান্তে মরণ দাঁড়াইয়া থাকে বলিয়াই জীবনের মাঝে এত মাধুর্য লুকাইয়া থাকে—তাই মানুষ এই মুহূর্তটুকুকে উপভোগ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। তাই জীবনে এত মাদকতা, এত আনন্দ, এত উল্লাস।

দ্রষ্টব্য—"পরিশেষ"—"বিচার", এবং তুলনীয়—

Then gently scan your brother man
Still gentler sister woman,
Though they may gang a kennin' wrang,
To sleep aside is human.

* * * *

Then at the balance let's be mute,
We never can adjust it,
What's done we partly may compute,
But know not what's resisted.

—Robert Burns

১৪০০ শাল

(২-রা ফাল্গুন, ১৩০২ ; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)

১৩০০ সালের কোটায় বসিয়া কবি ভাবিতেছেন যে একশত বৎসর পরের পাঠকেরা তাঁহার কবিতা কি ভাবে গ্রহণ করিবে। কবি যে আবেষ্টনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তখন অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর ঋতুপর্যায়ের বিচিত্র সুষমার তো পরিবর্তন ঘটিবে না এবং সেইজন্য বর্তমান কবির সময়ের বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে যে ভাব কবির হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎকালীন কবি তাহাকে নিজের কালের বসন্ত-কালীন আনন্দ-অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদিও বর্তমান কবির কালের কিছুই সেই ভবিষ্যতের কবির কালে যাইবে না বা থাকিবে না, তথাপি সেই ভবিষ্যৎকালীন কবি এই অতীতের কবির কাব্য পাঠ করিয়া নিজের কালের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার রসাস্বাদ করিবেন। সেই অনাগত ভবিষ্যতের কবিকে বর্তমান কবি আনন্দ-অভিবাদন পাঠাইয়া দিতেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পূরবী' কাব্যের মধ্যে 'ভাবী কাল' বলিয়া একটি কবিতায় দূর ভাবী শতাব্দীর সপ্তদশী সুন্দরীর একটি সুন্দর ছবি অংকিত করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে সেই সপ্তদশী এই অতীত কবির কাব্যখানি লইয়া পাঠ করিতেছেন এবং

হয়তো বলিছ মনে "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তার লাগি তবু
মোর বাতায়ন-তলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো !"

রবীন্দ্রনাথের ১৪০০ সাল রচনার বহু পরবর্তী-কালে রচিত জনৈক জজিয়ান কবির নিম্নলিখিত কবিতাতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

TO A POET A THOUSAND YEARS HENCE

I who am dead a thousand years,
And wrote this sweet archaic song
Send you my words for messengers
The way I shall not pass alone.

* * * *

O friend unseen, unborn, unknown,
Student of our sweet English tongue,

Read out my words at night alone :
    I was a poet, I was young,
Since I can never see your face,
    And never shake you by the hand,
I send my soul through time and space
To greet you. You will understand.

—James Elroy Flecker (1884-1915).

মালিনী

এখানি নাটক। ১৩০২ বা ১৩০৩ সালে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন কবি উড়িষ্যায় ছিলেন সেই সময়ে সেইখানে লেখা। মালিনীর উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal হইতে গৃহীত—তাহা বৌদ্ধ মহাবস্তাবদান গ্রন্থের একটি কাহিনী। মূল হইতে কবির সৃষ্টি অনেক বদল হইয়া গিয়াছে।

মালিনী রাজকন্যা। তিনি কাশ্যপের কাছে নূতন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিযাছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকটে মালিনীর নির্বাসন প্রার্থনা করিয়াছে। রাজা শঙ্কিত হইয়া কন্যাকে নবধর্ম-প্রচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। মালিনী এই নির্বাসন উপলক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগ করিতে চান। সেনাপতি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। প্রজাদের নায়ক ক্ষেমঙ্কর। ক্ষেমঙ্করের বন্ধু সুপ্রিয় প্রজা ও ব্রাহ্মণদের মতের প্রতিবাদ করিয়া তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে কোনো বিশেষ ধর্মমত পালন করা অপরাধ নয়। সুপ্রিয় সেই দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চান, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর তাঁহাকে ছাড়েন না। যখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদের অন্যায়ের সমর্থনের জন্য দেবশক্তিকে আহ্বান করিতেছিল—আয় মা প্রলয়ঙ্করী,—তখন মালিনী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মনে করিল স্বয়ং দেবী বুঝি ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইযাছেন। পরে সকলে মালিনীর পরিচয় পাইল এবং তাঁহার সর্বজীবে করুণা, মৈত্রী ও সেবার আগ্রহ দেখিয়া মালিনীকে সমাদর করিয়া নিজেদের গৃহে লইয়া গেল।

ক্ষেমঙ্কর নিজের দেশে প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইতে না পারিয়া ভিন্নদেশের রাজসৈন্য সংগ্রহ করিতে যাত্রা করিলেন। যুবরাজ প্রজাবিদ্রোহে সিংহাসন হারাইবার শঙ্কায় ভগিনীর নির্বাসনের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে কাহাকে নির্বাসন দিবেন, মালিনী স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া প্রজাদের কল্যাণব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রজারা রাজকুমারীকে পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরাইয়া দিয়া গেল। প্রজারা নিত্য আসিয়া মালিনীকে দেখিয়া যায়, তাঁহার মুখের মিষ্ট বচন শুনে। সুপ্রিয়

আসেন, সুপ্রিয় মালিনীর মাধুর্য ও মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছেন। মালিনী যখন সুপ্রিয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তখন সংবাদ আসিল প্রজারা মালিনীর দর্শন চায়, কিন্তু মালিনী সুপ্রিয়কে ছাড়িয়া প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। সুপ্রিয় যে তাঁহার একাধারে বন্ধু ভাই প্রভু ক্ষেমঙ্করের অভিপ্রায়ের বিরোধী হইয়া পড়িতেছেন, তাহার জন্য তিনি মালিনীর নিকটে অনুতাপ করিতেছিলেন। মালিনী ক্ষেমঙ্করের ইচ্ছাও পূর্ণ করিতে প্রস্তুত। সুপ্রিয় সংবাদ পাইয়াছেন যে ক্ষেমঙ্কর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোপনে এই রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। সুপ্রিয় মালিনীর প্রতি অনুরাগের বশে সেই সংবাদ রাজাকে বলিয়া দিয়াছেন এবং রাজা সেই সুযোগে অতর্কিতে ক্ষেমঙ্করকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়াছেন।

রাজা সুপ্রিয়ের সাহায্যের জন্য সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্রিয়কে পুরস্কার দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।—

> কি ঐশ্বর্য চাহ? কি সম্মান অভিনব
> করিব সৃজন তোমা তরে?

সুপ্রিয় পুরস্কারের প্রস্তাবে ধিক্কার দিলেন। তখন রাজা মনে করিলেন, সুপ্রিয় মালিনীর পাণিপ্রার্থনা করিতেছেন অথচ তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না। রাজা সুপ্রিয় ও মালিনীর অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তিনি সুপ্রিয়কে বলিলেন—

> বেশি দিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
> এই কন্যা মালিনীর নির্বাসন তরে
> অগ্রবর্তী ছিলে তুমি। আজি আর বার
> করিবে কি সে প্রার্থনা—রাজদুহিতার
> নির্বাসন পিতৃগৃহ হ'তে?

কিন্তু সুপ্রিয় রাজহস্ত হইতে পুরস্কারস্বরূপ মালিনীকে পাইতে চাহেন না।

> আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
> করেছি বিক্রয়—আজি তারি বিনিময়ে
> লয়ে যাব শিরে করি' আপন আলয়ে
> পরিপূর্ণ সার্থকতা?

রাজা ক্ষেমঙ্করের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। মালিনী তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বন্ধুকে বন্ধু দান করিলে সুপ্রিয়কে পুরস্কার দেওয়া

হইবে। রাজা সম্মত হইলেন; কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি একবার ক্ষেমঙ্করের বীরত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন কি না।

বন্দী ক্ষেমঙ্কর রাজার সকাশে আনীত হইলেন। সুপ্রিয় বন্ধুকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে ক্ষেমঙ্কর বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে দূরে থাকিতে আদেশ করিলেন। সুপ্রিয় বলিলেন যে তিনি যাহা ধর্ম বলিয়া মালিনীর নিকটে পাইয়াছেন তাহারই জয় হইল—

হে দেবী, তোমারি জয়! নিজপদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
জ্বালায়েছ,—আজি হলো পরীক্ষা তাহার—
তুমি হ'লে জয়ী! সর্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠুর ঘাত করিনু গ্রহণ।

ক্ষেমঙ্কর বলিলেন—মৃত্যুই ধর্মরাজ, তিনিই কেবল সত্যধর্মের বিচার করিতে সক্ষম, মৃত্যুর দ্বারাই ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

সব চেয়ে বড় আজি মনে কর যারে,
তাহারে রাখিয়া দেখ মৃত্যুর সম্মুখে।

সুপ্রিয় তাহাই স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া নিজের বদ্ধ হস্তের শৃঙ্খল-দ্বারা সুপ্রিয়ের মাথায় আঘাত করিলেন। সুপ্রিয়ের মৃত্যু হইল। ক্ষেমঙ্কর বন্ধু সুপ্রিয়ের মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে আহ্বান করিলেন। রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া সিংহনাদ করিলেন—

কে আছিস ওরে! আন খড়্গ!

মালিনী বলিলেন—মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমঙ্করে! এবং তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। মালিনীর মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্মের ক্ষমা জয়লাভ করিল।

এই নাটকের তাৎপর্য-সম্বন্ধে স্বয়ং কবি লিখিয়াছেন—

আমি বালক-বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম,……তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।…

পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি।—

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় ;—দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হ'য়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি', অনুরক্ত হ'য়ে
করে সর্বসমর্পণ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে।

—বঙ্গভাষার লেখক।

কবির মনের এই ভাব সুপ্রিয়ের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রিয়ের বিরুদ্ধ-চরিত্র ক্ষেমঙ্করকেও কবি দৃপ্ত ও মহৎ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ ও মালিনী নাটকে কবি দেখাইয়াছেন যে মানব ধর্ম লৌকিক শাস্ত্রীয় ধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

সুপ্রিয় মানবের ন্যায়ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে ; লৌকিক বা আচারগত ধর্মকে বড় বলিয়া সে মানে না। তাহার মন শান্ত, কিন্তু সে দুর্বল, এমন কি ভীরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ যেন 'গোরা'র বিনয়, 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ, 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ। একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার যে, সুপ্রিয়, বিনয়, জয়সিংহ প্রত্যেকেই নারীর প্রেমের কাছে তাহাদের মত ও ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিযাছে। নারী-শক্তির জয় তিনি আরও অনেক জায়গায দেখাইয়াছেন। ক্ষেমঙ্কর দীপ্ত, গর্বিত, কঠোর ; সংস্কারগত ধর্মকেই সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে ; সে রঘুপতির ন্যায় কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষেমঙ্করকে কোথাও ভীরু বা দুর্বল ভাবে বর্ণনা করেন নাই ; আচারধর্মকে তিনি বিশ্বাস করেন না. তাঁহার সহানুভূতি সুপ্রিয়ের সহিত, তাহার সংস্কারহীন ন্যায়ধর্মকে তিনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সে পক্ষপাতিত্ব লেখার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই ; ক্ষেমঙ্করকে তিনি মহৎ করিয়াছেন। —রবীন্দ্র-জীবনী।

চৈতালি

চৈতালির কবিতাগুলি ১৩০২ সালের চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের মধ্যে লেখা। কবিতাগুলির অধিকাংশই শিলাইদহে ও পতিসরে বোটে বাস করিবার সময়ে লেখা এবং ইহাদের অধিকাংশই সনেট। প্রথমে কবিতাগুলি একত্র করিয়া কবির প্রথম-প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'চৈতালি' নামে প্রকাশিত হয়; পরে ইহা স্বতন্ত্র বই হইয়া বাহির হইয়াছিল। ইহার নাম সম্বন্ধে কবি সেই কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

> চৈতালি-শীর্ষ কবিতাগুলি লেখকের সর্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।

কবি তাঁহার কাব্য-জীবনের এক এক পর্যায়ের প্রান্তে আসিয়া প্রায়ই মনে করিয়াছেন ইহাই তাঁহার সর্বশেষের লেখা, তাঁহার কবি-জীবনের শেষ ফসল। এই কবিতাগুলিকে কবি তাঁহার প্রতিভার শেষ দান মনে করিয়া ইহার নাম চৈতালি রাখিয়াছিলেন, যেমন পরে কবি বারংবার নিজের কাব্যের সমাপ্তি-সূচক নাম রাখিয়াছেন—খেয়া, পূরবী, পরিশেষ, শেষের কবিতা। কিন্তু তাঁহার জীবনদেবতা তাঁহাকে দিয়া 'পুনশ্চ' লেখাইয়া ছাড়িয়াছেন।

কবির বাল্যজীবন অবরোধের মধ্যে কাটিয়াছিল বলিয়া কবির মনে আবাল্য একটি আগ্রহ ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিবার। ইতিপূর্বেই কবিতায় কবি প্রকৃতিকে কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহার পরে তাঁহার মনে হইল মনুষ্য-ব্যতিরিক্ত প্রকৃতি নিরর্থক। তখন তাঁহার চিত্ত মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হইল, তিনি 'জগৎ-স্রোতে' ভাসিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, কল্পনাকে অনুরোধ করিলেন 'এবার ফিরাও মোরে'। কিন্তু এই চৈতালির যুগে আসিয়া কবি অনুভব করিয়াছেন যে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নয়, প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য সম্পূর্ণ করিয়াছে। কবি একটি প্রবন্ধে ইহার তিন বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন—

> সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ……প্রকৃতি-বর্ণনাও উপলক্ষ্য, কারণ প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথা নেই—কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখ-দুঃখের চারিদিকে কি রকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্যে তাই দেখায়। সৌন্দর্য-প্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। —সাধনা, ১২৯৯, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

চৈতালি কবিতাগুলির অনেকগুলিতেই কবি মনুষ্যত্বের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি অতি সামান্য ও দরিদ্র নরনারীর জীবনযাত্রার প্রতি তাঁহার মমতা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদের যে সুখ-দুঃখ কর্তব্যনিষ্ঠা ও মহত্ত্ব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার ছোট ছোট চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। মানবত্বের মহিমায় কবি-হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। চৈতালির বহু কবিতায় পল্লীগ্রামের সরল অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে গ্রাম্য নরনারীর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন যে কলকারখানাময় নগরের অস্বাভাবিক কৃত্রিম জীবন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তাহার ইঙ্গিত আছে—প্রকৃতি ও মানব উভয়ে উভয়ের পরিপূরক রূপে কবির নিকটে প্রতিভাত হইয়াছে। কবি প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ও আধুনিক সভ্যতার চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া ভারতের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে, প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে ভালবাসিয়াছেন।

মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো —ধরাতল, ২৭ চৈত্র।

তাঁহার নিজের দেশবাসীর হীনতা কর্মবিমূঢ়তা পরানুকরণপ্রিয়তা ও পরনির্ভরতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে, এবং সেই বেদনা তিনি তীক্ষ্ণ শ্লেষের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সৌন্দর্য-সম্ভোগের অনাবিল আনন্দ কবির কাছে সকল-সৌন্দর্যাধার আনন্দময়েরই পূজা—

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের —অভয়, ৩০ চৈত্র।

কবির কাছে এখন মানব-সেবাতেই পুণ্য, তাহাতেই দেবতার পূজা—

যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা

—পুণ্যের হিসাব, ১৪ চৈত্র।

কারণ, কবি অনুভব করিতেছেন—

যারেই দেখিতে পাই তারে ভালোবাসি। —প্রেম, ২২ চৈত্র।

এবং কবি অবশেষে সব-কিছুকে ভালবাসিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি!

—শেষ কথা, ৩০ চৈত্র।

উৎসর্গ

(১৩-ই চৈত্র, ১৩০২)

কবির মানস-দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ধরিয়াছে। তাই কবি তাঁহার কবিতা-সুন্দরীকে, তাঁহার জীবনদেবতাকে আহ্বান করিয়া সেই ফলসম্ভার উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সাধনা সার্থকতা লাভ করিবে। বসন্ত যেমন আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করে, তেমনি তিনিও তাঁহার সকল চিত্তসম্পদ্ নিঃশেষে দান করিয়া দিতে প্রস্তুত। কবির মানস-দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে তাঁহার কবিত্ব-মধু-লুব্ধ অনুরাগী-পাঠক-ভ্রমর চঞ্চল হইয়া গুঞ্জন করিতেছে, কিন্তু কবির জীবন-দেবতা দ্রাক্ষারসের আস্বাদ না লইলে সবই বৃথা হইবে।

কর্ম

(১৮-ই চৈত্র, ১৩০২)

এই ছোট কবিতাটি কবির নিজের একটি অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত। তিনি সেই ঘটনার চার মাস পরে ছিন্নপত্রে ইহার পরিচয় দিয়াছেন—

সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরী ক'রে আসাতে আমি রাগ ক'রেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি ক'রে ঈষৎ অবরুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে ক'রে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। [ছিন্নপত্র, শিলাইদা ১৪ আগষ্ট, ১৮৯৫]।

কবি অন্যত্র এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—

ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখ্লুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হ'য়ে গেলো, সে হ'লো প্রত্যক্ষ, সে হ'লো বিশেষ।······সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রামের মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিল্লো, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হলো বাস্তব।—সাহিত্যতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, ১৩৪১, বৈশাখ ১২ পৃঃ।

তপোবন

(১৯-এ চৈত্র, ১৩০২)

এই সনেটে তপোবনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার রং আহরণ করা হইয়াছে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রা, বাণভট্টের কাদম্বরীকথা, শকুন্তলা নাটক প্রভৃতি হইতে। কবিকে প্রাচীন তপোবনের আদর্শ এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি ইহার পরে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পদ্মা

(২৫-এ চৈত্র, ১৩০২)

পদ্মার জলস্রোতের ও ঢেউয়ের শব্দ তরল-ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল—কলকল তলতল ছলছল। সেই ধ্বনি সঙ্গীতের মত তালমানলয়যুক্ত ও মধুর। কবি নদীর বক্ষে নৌকায় বাস করিয়া সেই গান শুনেন ও নিজে নানা ভাবের গান রচনা করিযা চলেন। নদীর কোন্ গান তাঁহার কোন্ গানের প্রেরণা জোগাইয়াছে তাহা শুধু তিনি জানেন, আর তো কেহ তাহা জানিতে পারে না। বাস্তবিক পদ্মা নদী কবির কাব্যে নব নব রস শক্তি সৌন্দর্য সঞ্চার করিয়া দিয়াছে।

কবি পদ্মাকে ভালোবাসিয়াছেন। তাই তিনি মনে করেন যে পরজন্মে তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি যদি তখনো কোনো উপলক্ষ্যে এই পদ্মার সাক্ষাৎ পান, তাহা হইলে সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই তিনি তাহাকে প্রেয়সী বলিয়া চিনিতে পারিবেন, কারণ—

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনম্ অবোধপূর্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥ —শকুন্তলা নাটক, ৫ম অঙ্ক।

বঙ্গমাতা

(২৬-এ চৈত্র, ১৩০২)

কবি বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে তিনি যেন তাঁহার সন্তান বাঙালীকে পাপে পুণ্যে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দেন। বঙ্গমাতার সন্তানেরা কেবলমাত্র বাঙালী হইয়া আছে, তাহারা মানুষ হইয়া উঠুক।

কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, কোনো অংশকে বাদ দিলে সত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের একরঙা ও একঘেয়ে তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ রুদ্রের ভয়ঙ্কর আবির্ভাব অনেক সময়ে পাপের আকারে ঘটিয়া থাকে। বীজকে অঙ্কুরিত হইতে হইলে তাহার কিছুকাল মাটির তলে গোপন থাকা আবশ্যক; কিন্তু সে যদি চিরকাল গোপন থাকিতে চায় তবে তাহার বীজ-জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়। বীজ যখন অঙ্কুররূপে আকাশে মাথা তোলে তখন তাহা ভালোমন্দ পাপপুণ্য দ্বৈতের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করে। পাপাচরণ না করিলে মানুষের পুণ্য করিবারও অধিকার জন্মে না। মূঢ় যে সেই কেবল জানে যে পাপ আর পুণ্য দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। দৃষ্টিমান্ কবি প্রত্যক্ষ করেন যে ভালোমন্দ পাপপুণ্য সমস্তর ভিতর দিয়াই মানবাত্মার মনুষ্যত্বের পথে বিজয়-যাত্রা। সেই যাত্রাপথে মানুষের চরণতল মোহদুর্বলতার সহস্র কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হয়, কলঙ্ক-পঙ্কও তাহার অঙ্গ মলিন করে; কিন্তু সে-সব বাহ্য ব্যাপার, তাহাদের অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্ব জয়ী হয়।

কর্তব্য পালন না করা এক প্রকারের পাপ, তাহাকে প্রত্যবায় বলে, sin of omission। কবি সেই পাপ করিতে বলিতেছেন না। তিনি সক্রিয় অনুষ্ঠানের দ্বারা, sin of omission দ্বারা ভুল করিতে করিতে সত্যের সন্ধানে, পুণ্যের সন্ধানে, মনুষ্যত্বের সার্থকতার সন্ধানে, সকল বঙ্গবাসীকে যাত্রা করিতে বলিতেছেন। জগতের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন একঘরে হইয়া জীবনযাপনের পঙ্গুতা পরিহার করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কর্মময় জীবনের রসাস্বাদ করিতে বাঙালী উন্মুখ হইয়া ছুটুক কবির ইহাই কামনা।

কবি বাঙালী জাতিকে পরানুকরণ ত্যাগ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিতে বারংবার আহ্বান করিয়াছেন। এই কবিতার পূর্ববর্তী সনেট 'স্নেহগ্রাস' এবং পরবর্তী সনেট 'পরবেশ' দ্রষ্টব্য।

মানসী

(২৮-এ চৈত্র, ১৩০২)

কবি বলিতেছেন যে নারী কেবল মাত্র বিধাতার সৃষ্টিকৌশলেই এমন সুন্দরী আকর্ষণীয়া হয় নাই, পুরুষের মনের লালসা কামনা তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে মাধুর্য দান করিয়া লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য কবি নারীকে বলিতেছেন যে—

অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

পরবর্তী সনেট "নারী" দ্রষ্টব্য।

কালিদাসের প্রতি

(১২-ই শ্রাবণ, ১৩০৩)

'কালিদাসের প্রতি' হইতে 'কাব্য' পর্যন্ত চারিটি কবিতা কালিদাসকে স্মরণ করিয়া লেখা।

কালিদাস এখন আমাদের কাছে কেবল কবি মাত্র। কারণ কালিদাস নামক মানুষটির জীবনেতিহাস সমস্ত হারাইয়া গিয়াছে, তাঁহার পিতামাতার নাম কি ছিল, কোথায় তাঁহার বাড়ী ছিল, কবে তাঁহার জন্মমৃত্যু হইয়াছিল, তাহা কিছুই এখন জানিবার উপায় নাই। কেবল তাঁহার কাব্যগুলি প্রচার করিতেছে যে তিনি মহাকবি ছিলেন। যে কল্পলোক অলকা কালিদাসের সৃষ্টি, তিনি যেন তাহারই একজন অধিবাসী ছিলেন এখন মনে হয়, এবং মেঘদূতের পূর্বমেঘের ৩৪, ৩৬ ও ৪৪ শ্লোকে তিনি যে-সব বর্ণনা করিয়াছেন সেই বর্ণনা হইতে কবি কল্পনা করিতেছেন যেন কালিদাস মহাদেবের নৃত্যের তালে তালে গান গাহিতেন, এবং সেই গান শুনিয়া তুষ্ট হইয়া

কর্ণ হতে বর্হ খুলি' স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া-'পরে।

কুমারসম্ভব-গান

(১৫-ই শ্রাবণ, ১৩০৩)

অনেকে মনে করেন কুমারসম্ভব কাব্য কবি কালিদাসের কাব্য-রচনার প্রথম উদ্যম, এবং উহার লেখা কাঁচা হইতেছে মনে করিয়া তিনি মাত্র সাত সর্গ পর্যন্ত লিখিয়া উহা অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করেন; পরের সর্গগুলি অন্য কোনো কবির পরবর্তী সংযোজনা।

কুমারসম্ভবের আখ্যায়িকা হইতেছে সতীবিরহে কাতর তপস্যানিরত মহাদেবকে বিবাহে সম্মত করাইয়া তাঁহার সন্তানের দ্বারা তারকাসুরকে বধ করার উদ্দেশ্যে দেবতারা মদনকে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে পাঠান, এবং বশী শিবের ক্রোধানলে মদন ভস্মীভূত হয়। পার্বতী উমা ইহাতে লজ্জিতা ও মর্মপীড়িতা হইয়া নিজে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, এবং পরে শিবের প্রণয় লাভ করিয়া শিবের সন্তানের জননী হন। সপ্তম সর্গে শিব-পার্বতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পরে শিব-পার্বতীর বিহার ও কুমার-সম্ভব বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহের পর বিহারের বর্ণনার উপক্রম করিতে দেব-দম্পতি লজ্জা পাইতে লাগিলেন, তখন

কবি, চাহি' দেবী পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন যে দেব-দম্পতির লজ্জা দেখিয়া কবি কালিদাস আর কাব্য-রচনায় অগ্রসর হন নাই।

কাব্য

(১১-ই শ্রাবণ, ১৩০২)

কবি কালিদাসের জীবনের ইতিহাস হারাইয়া গিয়াছে—"পণ্ডিতেরা বিবাদ করে ল'য়ে তারিখ সাল"—কেবল তিনি যে কাব্যামৃত পরিবেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহার কবিমনের আনন্দে আমাদের হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিতেছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কবি কালিদাস তাঁহার কবিজীবনে যেমন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন তাঁহার মানবজীবনও কি তেমনি কেবল আনন্দময়ই ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ

যেমন তাঁহার সমসাময়িক ঘটনায় নানা দুঃখ আঘাত পাইতেছেন, সমসাময়িক লোকের কাছে অনাদর অপমান পাইতেছেন, কবি কালিদাসেরও নিশ্চয় সেইরূপ দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কবিরা হইতেছেন নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়—

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি' পান,
অমৃত যা উঠেছিল ক'রে গেছ দান।

ইহা হইতে কবি রবীন্দ্রনাথেরও মনে আশ্বাস হইতেছে—তাঁহার জীবনের সমস্ত পঙ্ক ভেদ করিয়া 'নিলিপ্ত নির্মল সৌন্দর্য-কমল আনন্দের সূর্যপানে' ফুটিয়া উঠিবে এবং 'চপল-ভ্রমর' বিশ্ববাসী 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!'

দেবতার বিদায়

(১৪-ই চৈত্র, ১৩০২)

এই কবিতাতে কবি দেখাইয়াছেন যে নারায়ণ দরিদ্র নর-রূপে দ্বারে দ্বারে দয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছেন—

জগতে দরিদ্র-রূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

পুণ্যের হিসাব

(১৪-ই চৈত্র, ১৩০২)

সাধু স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি চিত্রগুপ্তের খাতায় দেখেন, যতদিন তিনি সংসারকে ভালোবাসিয়াছেন ততদিন তাঁহার হিসাবে অনেক পুণ্য জমা করা হইয়াছে, এবং যখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া দেবারাধনায় ব্যাপৃত তখন তাঁহার পুণ্যের খাতায় জমার অঙ্ক শূন্য। সাধু ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

চিত্রগুপ্ত হেসে বলে, 'বড় শক্ত বুঝা,
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পুজা'।

এই কবিতাটিতে লে হাণ্টের আবু বিন আদম নামক কবিতার একটু ছায়া দেখা যায়।

এই-সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সাধক-জীবনের মূল তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে —ইহারা যেন তাঁহার নৈবেদ্যের কবিতারই অগ্রদূত। এই-সব কবিতা যে-কবি লিখিয়াছেন, তিনিই পরে লিখিতে পারিয়াছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। —নৈবেদ্য।

যে কবি আরম্ভে বলিয়াছেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—কড়ি ও কোমল, প্রাণ।

সেই কবিই এই চৈতালিতে মানবকে ও ধরণীকে ভালোবাসাতেই পুণ্য ও আনন্দ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে কবির জীবনের আদর্শ আবাল্য স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার আর বিশেষ নড়চড় হয় নাই।

বৈরাগ্য

(১৪-ই চৈত্র, ১৩০২)

এই কবিতাতেও কবি দেখাইয়াছেন যে সংসারের আত্মীয়-স্বজন সকলেই দেবতারই প্রতিনিধি হইয়া মানবকে প্রেম দয়া শিক্ষা দেয়। সেই সংসার ত্যাগ করিলে দেবতাকেই ত্যাগ করা হয়।

কণিকা

এই পুস্তিকার উৎসর্গের সঙ্গে একটি তারিখ আছে—৪-ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। অতএব এই কবিতাগুলি ১৩০৬ সালে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে লেখা। কণিকার কবিতাগুলি দুই পংক্তি হইতে দশ পংক্তির মধ্যে রচিত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি বলিয়া পুস্তিকার নাম কণিকা। ইংরেজিতে যাহাকে এপিগ্র্যাম্ বলে, এই কবিতাগুলি সেই জাতীয়। এপিগ্র্যাম্-জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব এই যে অতি সহজ সত্যকে বহু বাহুল্যের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া সহজভাবে অল্প কথায় প্রকাশ করা; যাহা সাধারণ তাহাকে অসাধারণ দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার গভীর তত্ত্ব অতি অল্প কথায় কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করা। কবিতাগুলি সংক্ষিপ্তাকার বলিয়া ও প্রত্যেকটিতে একটিমাত্র ভাব সুন্দর পরিষ্কার মনোরঞ্জক ভাবে প্রকাশিত হওয়াতে পড়িবামাত্র তাহাদের সৌন্দর্য মনে গাঁথিয়া যায়। কবি সকলের জানা কথাকে কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়া অতি সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, এবং উপমা রূপক শ্লেষ ও বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ করিয়া এমন একটি আকস্মিক বিস্ময় পাঠকের ও শ্রোতার মনে উৎপাদন করেন যে, কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির, গভীর জ্ঞানের, কৌতুকের, কৌশলের এবং নিপুণ শ্লেষপটুতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এই প্রকারের কবিতার ভাষা হয় সরল অথচ কোমল কবিত্বমধুর, বিষয় হয় বিবিধ, এবং প্রকাশভঙ্গিমার মধ্যে থাকে চাতুর্য ও সূক্ষ্মদর্শন, এবং তাহাতে কবিতাগুলি হয় মোটের উপর জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ। এইরূপ রচনায় কবিবর একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কথা

এই পুস্তকের কবিতাগুলি লেখা আরম্ভ হয় ১৩০৪ সালে বা তারও আগে। পুস্তকের উৎসর্গের মধ্যে তারিখ আছে অগ্রহায়ণ ১৩০৬, এবং পুস্তকের প্রকাশের তারিখ ১লা মাঘ ১৩০৬। অতএব কবিতাগুলি ১৩০৪ সাল হইতে ১৩০৬ সালের মধ্যে রচিত।

কবি এক এক সময়ে এক জাতের কবিতা লিখিতে থাকেন, এবং যতদিন সেই কবিতাগুলি পুস্তকের মধ্যে ছাপার অক্ষরে বন্দী না হয় ততদিন তাঁহার সেই শ্রেণীর রচনা চলিতে থাকে। বই ছাপা হইয়া গেলে সেই প্রকারের কবিতা আর আসে না, তখন তাঁহার কবিতার অন্য পালা আরম্ভ হয়। 'কথা' কাব্যে কতকগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই যুগে কবির নিকটে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আবেশ-বিহ্বলতা হ্রাস পাইয়াছে এবং মানবজীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কবির মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হওয়াতে কবি স্বদেশকে ও স্বজাতিকে বর্তমান হীনতার গ্লানি হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এবং কাব্য-পুরাণের মধ্যে দেশের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। কবি 'ছোট-আমি'কে বিদায় দিয়া 'বড়-আমিকে' বরণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

কথা কাব্যখানির প্রায় সকল আখ্যায়িকাই ত্যাগের কাহিনী—বৌদ্ধ শিখ মহারাষ্ট্র ও রাজপুত ইতিহাসের এবং বঙ্গের সামাজিক জীবনের ত্যাগের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবি মহৎ আদর্শের জন্য আত্মদানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। মহৎ জীবনের মহিমা দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পালনের জন্য যাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সকল ত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও কবি তাহার উপর অপূর্ব কবিত্বের একটি উজ্জ্বল আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন। অতীত যেন আর তাঁহার কাছে অতীত মাত্র নহে, অতীতের ইতিহাসে যে মহৎজীবনের আদর্শ দীপ্যমান হইয়া আছে, তাহারই প্রভায় কবিচিত্ত সমুদ্‌ভাসিত, কবিচিত্তের মধ্যে

অতীত যেন নবজীবন লাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তাই কবি অতীতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে। —উৎসর্গ, অতীত

'কথা' কাব্যের কবিতাগুলি সব গাথা বা ব্যালাড্ জাতীয়। এগুলি যেন কবিতায় ছোটোগল্প। ব্যালাডের মধ্যে গল্প ও গীত দুইই মিলিত হইয়া থাকে; ব্যালাডের বিশেষত্ব তাহার সবল সরলতায় ও লিরিক কবিতার সমধর্মে। ব্যালাডের মধ্যে বীরত্বের, যুদ্ধের, সাহসের, ত্যাগের কাহিনী প্রধান হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন, প্রেমের ঐকান্তিক অনুরাগ, শত্রুতার ঘৃণা, বিদ্বেষ, দয়া এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য কোমল ও গুণাবলীও ব্যালাডের বর্ণনীয় বিষয় হইতে পারে। ইহার বর্ণনার মধ্যে থাকা চাই একটা আবেগ ও গতি, সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাব, এবং সমস্ত কবিতাটি বাহুল্যবর্জিত ঠাস-বুননী হওয়া আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে নাটকীয় উপস্থান থাকে, ছন্দের সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য থাকে এবং মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম বর্ণনা থাকে। ইহাদের অবসানে মনের উপর একটা গম্ভীর মহনীয় প্রভাব অনেকক্ষণ পর্যন্ত লাগিয়া থাকে। ব্যালাডের সকল লক্ষণই 'কথা'র কবিতাগুলির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই রচনাতেও কবি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' নামক কবিতার মধ্যে দেখি নারী আপনার লজ্জা পর্যন্ত ভুলিয়া একমাত্র জীর্ণ মলিন বসন বুদ্ধদেবকে দান করিতেছেন মহৎ ত্যাগের আবেগে, এ ত্যাগ নিজের ভোগোদ্‌বৃত্ত যৎকিঞ্চিৎ কিছু দেওয়া নয়, ইহা আপনার সর্বস্ব সমর্পণ। **'দেবতার গ্রাস'** কবিতায় ব্রাহ্মণ মৈত্র মহাশয় আপনার অঙ্গীকার পালনের জন্য প্রাণ দান করিলেন। **'স্পর্শমণি'** কবিতায় সন্ন্যাসী সনাতন গোস্বামীর নিস্পৃহ ত্যাগের পরিচয় আছে। **'বন্দী বীর'** বান্দার স্বদেশের জন্য মহৎ ত্যাগের ও নির্ভীকতার কাহিনী। 'কথা'র মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর কবিতা বোধ হয় **'পরিশোধ'**। শ্যামা তাহার প্রতি অনুরক্ত উত্তীয়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বজ্রসেনের স্থলাভিষিক্ত করিয়া বজ্রসেনকে লাভ করিয়াছিল। বজ্রসেন যখন জানিতে পারিল যে শ্যামা কোন্ উপায়ে তাহাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে, তখন শ্যামার প্রেম ও সঙ্গ বজ্রসেনের নিকট বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু শ্যামাকে দূরে সরাইয়া সে আবার শ্যামার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। উত্তীয় শ্যামাকে ভালবাসিত, তাই সে প্রিয়ার

অনুরোধে নিজের প্রাণ দিয়া প্রিয়ার প্রেমপাত্রকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া প্রিয়ার তুষ্টিসাধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিল। শ্যামাকে বজ্রসেনও ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার অপকর্মকে নয়। সে শ্যামাকে ত্যাগ করিল এবং এই দুঃখে শ্যামা প্রাণত্যাগ করিল। বজ্রসেন শ্যামার কাছে প্রাণ পাইয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিলেন তাহার প্রাণ লইয়া। এই যে ক্রমাগত আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং অনুরাগ ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ কবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কবিতাটির নৃত্যনাট্যরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

কাহিনী

পুস্তক প্রকাশের তারিখ যদিও ২০-এ ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল, কিন্তু ইহার অন্তর্গত কবিতাগুলিও কথার কবিতাগুলির ন্যায় ১৩০৪ সাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা।

এই পুস্তকে দুইটি কবিতা—পতিতা (৯-ই কার্ত্তিক ১৩০৪), এবং ভাষা ও ছন্দ (রচনার তারিখ অপরিজ্ঞাত)—এবং পাঁচটি নাট্যকাব্য—গান্ধারীর আবেদন (রচনার তারিখ অপরিজ্ঞাত), সতী (২০-এ কার্ত্তিক, ১৩০৪), নরকবাস (৭-ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৪), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (২৯-এ অগ্রহায়ণ, ১৩০৪), কর্ণকুন্তী-সংবাদ (১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬)—আছে।

ভাষা ও ছন্দ ১৩০৫ সালের ভাদ্রমাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লক্ষ্মীর পরীক্ষাও ঐ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হয়।

গান্ধারীর আবেদন ছাপিয়া প্রকাশের পূর্বে কবি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে পাঠ করেন, সেই সভার সভাপতি ছিলেন সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বোধ হয় ১৮৯৭ সালে। তাহা হইলে বাংলা ১৩০৫ সাল হয়।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাট্যটি লঘু তালের ছন্দে, বিশুদ্ধ হাস্যরসে, তীক্ষ্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিতে অতি মনোরম। ইহাতে সব কয়টি স্ত্রীচরিত্র, কাজেই স্ত্রীলোকের অভিনয়ের উপযোগী। রাণী কল্যাণীর চরিত্রটি সুন্দর মহনীয় করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে।

'সতী' নাটকটিতে কবি দেখাইয়াছেন—সামাজিক ধর্ম ও সংসারের ধর্ম অপেক্ষা মানব-ধর্ম হৃদয়-ধর্ম অনেক বড় ও সত্য। মানব-মনের শাশ্বত ধর্ম প্রেম সংসারের সমাজের কৃত্রিম শাসনের অধিকারের অতীত। অমাবাঈ ভালবাসিয়া যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন তিনি যে-ধর্মেরই লোক হউন না কেন, তিনিই তাঁহার পতি, এবং সেই পতির প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগের বলে তিনি সতী, তিনি নিত্যধর্মের বলে ক্ষুদ্র সংস্কারান্ধ ধর্মের উপরে জয়ী।

'নরক-বাস' নাট্যে রাজা সোমক তাঁহার পুরোহিত ঋত্বিকের প্ররোচনায় পুত্রকে যজ্ঞাগ্নিতে বলি দিয়াছিলেন। মানব-ধর্মের চেয়ে কৃত্রিম শাস্ত্র-ধর্মকে বড় করিয়াছিলেন ও আপনার কৃতকর্মের জন্য একটুও অনুতপ্ত হন নাই বলিয়া ঋত্বিকের নরক-বাস দণ্ড হয়। কিন্তু রাজা পুত্রহত্যার অনুশোচনায় শুচি হইয়া

স্বর্গবাসের অধিকারী হন। তথাপি স্বর্গপথে রাজাকে নরক দর্শন করিয়া যাইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে ঋত্বিককে দেখিয়া রাজা ধর্মকে বলিলেন যে তাঁহারা উভয়েই সমান অপরাধী, অতএব তাঁহার স্থান ঐ ঋত্বিকের পার্শ্বে নরক-কুণ্ডে। রাজা স্বেচ্ছায় নিজকৃত অপরাধের জন্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া মহান্ হইয়া উঠিলেন। রাজার নরক-দর্শন বর্ণনার সহিত মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে রামচন্দ্রের নরক-দর্শন তুলনীয়। উহার প্রভাব ইহাতে পড়িয়াছে মনে হয়।

কুন্তী তাঁহার মাতৃধর্ম পালন না করিয়া কৃত্রিম সমাজশাসনের ভয়ে তাঁহার কানীনপুত্র কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার পথ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মাতৃস্নেহবঞ্চিত কর্ণ পরাজয়ের দলেই রহিয়া গেলেন—"মোরে হারের দলে বসিয়ে দিলে জানি আমি পারব না" (খেয়া, হার)—তথাপি গত্যন্তর নাই। এখানে কর্ণের চরিত্রের সহজ মহত্ত্ব উজ্জ্বলতর হইয়াছে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণ এবং কুন্তী কর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ণকে পাণ্ডব-পক্ষে আনিবার জন্য বহু যুক্তি ও প্রলোভন উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণ সে-সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া ও প্রলোভন বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজের কর্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কবি কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ রচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের Poet Laureate Masefield এই কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের কবিকৃত ইংরাজী গদ্য অনুবাদকে Blank Verse কাব্যে পরিণত করিয়া নাম দিয়াছেন—The Foundling Hero.

এই কয়খানি নাট্যকাব্যে কবি এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে সামাজিক বা লৌকিক ধর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটি নিত্যধর্ম সত্যধর্ম আছে—তাহা মানবধর্ম, তাহা শাস্ত্রাচারের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়, সাম্প্রদায়িকতার মোহে অভিভূত নয়, তাহা ন্যায়ে যুক্তিতে প্রেমে কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত।

গান্ধারীর আবেদন

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলি চমৎকার। পৌরাণিক এক একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি সেই-সকল কাহিনীর চরিত্রগুলিকে একটি নূতন মহিমা ও মর্যাদা দান করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক চরিত্রকে একটি নূতন অর্থ দান করিয়াছেন। পৌরাণিক নাট্যকাব্যের মধ্যে 'বিদায়-অভিশাপ' (১৩০৯),

'গান্ধারীর আবেদন', এবং 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৩০৬) প্রধান, ও কবিপ্রতিভার অতুলনীয় বিশেষত্বে মণ্ডিত।

গান্ধারীর আবেদনে মহীয়সী মহারাণী গান্ধারী পাণ্ডবদের প্রতি তাঁহার নিজপুত্রদের অন্যায় অবিচারে ব্যথিতা হইয়া স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি অন্যায়াচারী পুত্র দুর্যোধনের নির্বাসন প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সেই ন্যায্য অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। দুর্যোধনও স্বীকার করিলেন যে তিনি এই অন্যায়ের দ্বারা সুখী হন নাই, কিন্তু তিনি জয়ী হইয়াছেন, এই জয়ের উল্লাসেই তিনি সন্তুষ্ট।

গান্ধারীর আবেদন নাট্যকাব্য যখন কবি সভায় পাঠ করেন তখন আমরা ছাত্র। তখন আমাদের মনের মধ্যে নূতন স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা ঐ নাটিকার মধ্যে আমাদের দেশের সমসাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত হইয়াছে মনে করিয়াছিলাম। আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম যে—ধৃতরাষ্ট্র হইতেছেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট্, যিনি তাঁহার স্নেহপাত্র পুত্রের অন্যায়ও সমর্থন করিতেছেন অন্ধভাবে; দুর্যোধন হইতেছেন ইণ্ডিয়ান্ ব্যুরোক্রেসী অর্থাৎ ভারতীয় আমলাতন্ত্র, যিনি ন্যায়ের দিকে দেখেন না, দেখেন নিজের জয়লাভের দিকে; গান্ধারী ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা, ইংরেজ জাতির ধর্ম্মবোধ, যিনি নিজের অতি নিকট আত্মীয়কে অন্যায় করিতে দেখিলে দণ্ড দিতে সঙ্কুচিত হন না, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ পরে 'বড় ইংরেজ' বলিয়াছেন গান্ধারী সেই বড় ইংরেজের প্রতিনিধি, তিনি Sense of British Justice; দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতী হইতেছেন ব্রিটিশ প্রেস্টিজ, নিজেদের প্রভুত্ব ও জয়াধিকার বজায় রাখিবার অশোভন জেদ, তিনি ন্যায়-অন্যায় কিছু বিচার করেন না, কেবল কিসে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েমী থাকিবে, কিসে তাঁহাদের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য; পাণ্ডবেরা হইতেছেন দুর্যোধনের ছল-বল-কৌশলে পরাভূত ও স্বাধিকারবঞ্চিত ভারতবাসী, নিজ বাসভূমে পরবাসী; আর দেবী দ্রৌপদী হইতেছেন ধর্ম্মপথে চলার শান্তি ও গৌরব, যিনি সর্বস্বহারা পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় বনবাসে অনুগমন করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে বড়লাট লর্ড কার্জন প্রেস আইন করিয়া ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সেই দুরভিসন্ধির প্রতিবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ লেখেন ও টাউন হলে পড়েন। সেই কণ্ঠরোধের

উল্লেখ এই কাব্যেও পাওয়া যায়—ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনকে উপদেশ দিতেছেন—

নিন্দারে রসনা হ'তে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি' রাখে চিত্ততল।

.... প্রীতি মন্ত্রবলে
শান্ত করো বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে।

ইহার উত্তরে দুর্যোধন বলিলেন—

অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজ-মর্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ নাহি করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি।—কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ!

এই কাব্যখানি বাংলার ক্লাসিক কাব্য। মহাভারতের পুরাতন কাহিনীকে কবি একটি নূতন রূপ দিয়াছেন ও তাহার একটি নূতন অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। কবিতাটিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরনারীর তর্কবিতর্ক, প্রত্যেক পাত্রপাত্রীর চরিত্রানুগত বাক্য এবং উপমার মালা কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে।

পতিতা

(৯-ই কার্ত্তিক, ১৩০৪)

এই কবিতাটির সহিত আমার একটি সৌভাগ্যের স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁহার ভাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মজুমদার-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন। মজুমদার-লাইব্রেরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং বঙ্গদর্শনের সম্পাদকও ছিলেন তিনি। মজুমদার-লাইব্রেরীর উদ্‌যোগে লাইব্রেরী-বাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে পক্ষে পক্ষে একটি সম্মিলনী হইত, তাহাতে সুবিখ্যাত সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত হইতেন এবং প্রবন্ধ পাঠ,

পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দেয়, 'মোহচঞ্চল লালসা-ভ্রমর' তাঁহার হৃদয়ে কালো ছায়া ফেলিতে পারে না।

কিন্তু সংসারে নারীর সৌন্দর্য আবার পণ্যের ন্যায় বিক্রয়ও হয়। লালসাদীপ্ত বিলাসমত্ত হৃদয়ের কাছে নারীর সৌন্দর্য স্বর্গীয় নহে, মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার যোগ্য তুচ্ছ সাধারণ সামগ্রী। তাই কত অভিশপ্তা অভাগিনীকে তাহার নারীমহিমা বিসর্জন দিয়া পৃথিবীতে নরক সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে, তাহাদের অন্তরের সহজ পবিত্রতা প্রতিভাত হইবার অবসর পাইতেছে না। দেহকেই তাহারা সর্বস্ব বলিয়া জানে, মুগ্ধ হতভাগ্যদের প্রতারিত করিয়া রূপের অনলে কামনার আহুতি দিয়া পুড়াইয়া মারাকেই তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু তাহাদের অন্তরে যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য লুকানো থাকে তাহার দিকে তাহারা ফিরিয়াও তাকায় না, এবং এক জাগ্রৎ-সুষুপ্তির মধ্যে তাহাদের অভিশপ্ত জীবন কাটিয়া যায়।

কিন্তু এই হতভাগিনীকে কেহ যদি কখনো তাহার পবিত্র হৃদয়ের কামগন্ধহীন মুগ্ধ দৃষ্টির অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহারও প্রাণ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতে পারে। তখন এক নিমেষে আপনার প্রকৃত পরিচয় তাহার কাছে ফুটিয়া উঠে, সে তখন বুঝিতে পারে—সে কেবল মোহিনী কামিনী নহে, সে স্বর্গের সৌন্দর্যের ও আনন্দের প্রতিমা, সে দেবী, সে চিরপবিত্রা নারী! তখন ঘৃণিত জীবন পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জীবনের সার্থকতা লাভ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে আকুল আগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠে। সে তখন দেখিতে পায় প্রেমের যে পরশমণি এতদিন তাহার হৃদয়ে অনাদরে অবহেলায় পড়িয়া ছিল, তাহারই উজ্জ্বল আলোকে বহুদিনের কলঙ্কিত লাঞ্ছিত জীবন শুভ্র প্রভাময় সুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই পতিতা কবিতাতে এই চিরকরুণ সত্যটিকে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—লোমপাদ রাজার সভায় যে-কয়টি রূপোপজীবিনী ছিল তাহাদিগকে যখন সরল-হৃদয় ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য পাঠানো হয় তখন তাঁহার পবিত্রতার জ্যোতিঃপাতে তাহাদের একজনের জীবনে নবীন প্রভাতের সূত্রপাত হইয়াছিল। এতদিন সেই বারবনিতা আপনাকে ছলনাময়ী মোহিনী বলিয়াই জানিত, রূপের বদলে অর্থ সংগ্রহ করাই তাহার ব্যবসায় ছিল; কিন্তু আজ

সমাজের বাহিরে তপোবনের স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে প্রবর্ধিত যুবক ঋষি যখন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া অবশেষে যে উচ্চমহান্ সঙ্গীত তিনি উষা ও সন্ধ্যার বর্ণনার জন্য উচ্চারণ করিতেন তেমনি একটি মহনীয় বন্দনা-গানে তাহার সৌন্দর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তখন বিস্মিতা বারবনিতা বুঝিতে পারিল তাহার দেহের লাবণ্যের মধ্যে এমন একটি অপার্থিব সৌন্দর্য লুক্কায়িত আছে যাহা এতদিন আর অন্য কাহারও চোখে পড়ে নাই এবং উহার মূল্য পার্থিব সম্পদে পরিমিত হইতে পারে না। নারীর নারীত্বের মহিমা-জ্ঞান তাহার হৃদয়ে তখন জাগিয়া উঠিল, দেবীত্বের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া তাহার চিত্ত আশ্চর্য আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে গণিকা দেবীতে পরিণত হইয়া গেল। তখন তাহার মন পূর্বজীবনের কথা স্মরণ করিয়া গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। সে ভোগবিলাসের লালসা ও মোহ ত্যাগ করিয়া সমাজের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার জ্বালাময়ী অতীতস্মৃতির উপরে ঋষিকুমারের সরল হৃদয়ের পবিত্র প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়া রহিল।

এই কবিতাটি পতিতার নবজীবনলাভের আনন্দগাথা। পতিতার পবিত্রতায় জাগিয়া উঠার আনন্দবেদন কবি অনুভব করিয়াছেন, সেইজন্য এই কবিতাটির ছন্দ ও ভাষার মধ্যে একটি বিশেষ আনন্দ-চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়।

এই কবিতায় দুইটি বিপরীত চিত্রের একত্র সমাবেশ হওয়াতে, পরস্পরের বৈপরীত্যে পরস্পর উভয়কে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।—একদিকে ঋষিকুমার পুণ্যতপোধন—অপর দিকে পতিতা পাপীয়সী। ঋষিকুমার ইহার পূর্বে কখনো রমণী দেখেন নাই—আর পতিতা বার-বিলাসিনী। ঋষিকুমার সরল অনভিজ্ঞ—আর পতিতা চতুরা কুটিলা, মিথ্যা প্রতারণা করাই তাহার ব্যবসায়। সত্যসন্ধ ঋষি যখন পতিতার মধ্যে দেবীত্বের সন্ধান পাইলেন, তখন পতিতা তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারিল না, এবং তাহারই প্রভাবে সে সকল কলুষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া উঠিল।

ভাষা ও ছন্দ

এই কবিতায় কবি দেখাইয়াছেন যে ব্যবহারিক সত্য এক পদার্থ ও কাব্যগত সত্য ভিন্ন পদার্থ। যাহাকে ইংরেজীতে Poetic Truth বলে,

সেই বিষয়টি এই কবিতায় একটি পরিচিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া অবতারণা করা হইয়াছে।

বাল্মীকি মুনি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ বধ করিল। তিনি তাহা দেখিয়া শোকার্ত হইয়া ব্যাধকে যে অভিসম্পাত দিলেন, তাহার ভাষা এক অভিনব ছন্দে গ্রথিত হইয়া উচ্চারিত হইল। এই ছন্দগ্রথিত ভাষা শোকে জন্মলাভ করিল বলিয়া তাহার নাম হইল শ্লোক। এই যে নূতন 'ভাষা ও ছন্দ' মুনি লাভ করিলেন তাহা তিনি কোন্ কাজে নিযুক্ত করিবেন ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি নূতন সৃষ্টির আবেগে বিহ্বল হইতেছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাকে সেই ভাষা ও ছন্দ দেব-বন্দনায় নিয়োগ করিতে বলিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি ঐ কার্যে সম্মত হইলেন না, যাহা স্বর্গীয় তাহাকে আবার দেব-বন্দনায় নিযুক্ত করিলে তাহা স্বর্গেই ফিরিয়া যাইবে; তিনি উহা মানুষের মহত্ত্ব বর্ণনায় নিযুক্ত করিতে চাহিলেন, এবং জানিতে চাহিলেন যে কোন্ মহামানবকে তিনি বর্ণনা করিবেন। নারদ অযোধ্যার রামচন্দ্রের নাম করিলেন। বাল্মীকি বলিলেন,—হাঁ, আমি রামের নাম ও মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমার জানা নাই। তাহাতে

> নারদ কহিলা হাসি',—"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

এই কথাটিই এই কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার ব্যাখ্যা আমরা কবির কথাতেই করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' নামক পুস্তকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা এখানে উদ্ধার করিতেছি, কেবল কৃষ্ণ স্থানে আমরা রাম বসাইয়া দিতেছি।—

রাম আদর্শ পুরুষ ছিলেন। কবির মনে আদর্শের একটি উচ্চধারণা ছিল। রামের প্রাত্যহিক বা প্রকৃত জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিলেই তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধ হয় না; সেই আদর্শ চরিত্রের অনুকূল করিয়া কবির যে অনুমান তাহা প্রকৃত তথ্য অপেক্ষা অধিক সত্য। তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনার সাহায্যে সত্যকে আবিষ্কার করেন কবি। তাই কবিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। রামায়ণে কবি-বর্ণিত রাম-চরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে; রামের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্যকলাপের আরোপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে; কিন্তু রামের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন

তাহাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য তথ্য। রামের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবত তাহাতে এমন সহস্র ঘটনার উল্লেখ থাকিত যাহা রাম কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোনো স্থায়ী মূল্য নাই, অর্থাৎ সে-সকল কাজ রামের রামত্ব প্রকাশ করে না।—এমন কি শেষ পর্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি রামের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষ অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। রামায়ণের রাম-চরিত্রে সেইসকল অনাবশ্যক তথ্যগুলি বর্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত সত্যগুলি নির্বাচিত হইয়াছে—এমন কি, রাম যে-কথা বলেন নাই কিন্তু যে-কথা কেবল রামই বলিতে পারিতেন, সেই কথা রামকে বলাইয়া, রাম যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে-কাজ কেবল রামই করিতে পারিতেন, সেই কাজ রামকে করাইয়া কবি বাস্তবিক-রাম অপেক্ষা তাঁহার রামকে অধিকতর সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ, বাস্তব-রামে স্বভাবতই অরামত্ব যাহা ছিল তাহা দূরে রাখিয়া এবং বাস্তব-রাম নিজের চরিত্রগুণে কবির মনে যে আদর্শের উদয় করিয়া দিয়াছেন পরন্তু নানা বাহ্য কারণে যাহা কার্যে সর্বত্র ধারাবাহিক পরিস্ফুটভাবে ও নির্বিরোধে প্রকাশ হইতে পারে নাই সেই আদর্শকে সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুট করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম নিত্যতম রামকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।

তথ্য, যাহাকে ইংরাজীতে fact বলে, তদপেক্ষা সত্য অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। সেই কারণেই কবি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। মহৎব্যক্তির কার্যবিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবিপ্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।

এইজন্য তুলসীদাস গোস্বামী তাঁহার রামায়ণ রচনা করিয়া বলিয়াছেন—

'জমীন্ আস্‌মান্-কে কুলাবে মিলায়ে হৈঁ"—

তুলসীদাস মর্ত্যের সহিত স্বর্গকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে মহাকবি গ্যেটে চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

"The artist's work is real in so far as it is always true; ideal, in that it is never actual."

গেটের উক্তি বুঝিবার জন্য আরও তিনটি উক্তি নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। তাহাতে এই কবিতাটি বুঝার পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

"In true poetry the real is idealised, and the ideal realised, and we have quite a genuine but a higher kind of real object. As Tennyson puts it, poetry is truer than fact."

—Professor Sir Sarvapalli V. Radhakrishnan, *The Philosophy of Rabindranath.*

"By poetic truth we do not mean fidelity to facts in the ordinary acceptation of the term. Such fidelity we look for in science. By poetic truth we mean fidelity to our emotional apprehension of fact, to the impression which they make upon us, to the feelings of pleasure or pain, hope or fear, wonder or religious reverence, which they arouse. Our first test of truth in poetry, therefore, is its accuracy in expressing, not what things are in themselves, but their beauty and mystery, their interest and meaning for us."

—William Henry Hudson, *An Introduction to the Study of Literature.*

Literary truth transcends facts and turns facts into ideal reals. The truth is not factual, it is not a copy of reality, but a higher reality.

—Aristotle.

Hence, pageant history! hence, gilded cheat!
Swart planet in the universe of deeds!
What care, though owl did fly
About the Athenian admiral's mast?

* * * *

Juliet leaning
Amid her window flowers.........
..............The silver flow
Of Hero's tears, the swoon of Imogen,
Fair Pastorella in the bandit's den,
Are things to brood on with more ardency
Than the death-day of empires. —Keats

ঐতিহাসিক ক্রাইস্ট কেহ ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন; ক্রাইস্ট-চরিত্র নাকি Apostle-দের মনঃকল্পিত। কিন্তু ক্রাইস্ট বিদ্যমান থাকা fact না হইলেও তাঁহার যে আদর্শ দু-হাজার বৎসর ধরিয়া কত চরিত্র গঠন করিল তাহা তো truth, তাহা fact অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ বাল্মীকি-বর্ণিত চরিত্রের অনুরূপ রামচন্দ্র বলিয়া কোনো ব্যক্তি যদি নাও থাকেন, তথাপি যে চরিত্র তিনি সৃষ্ট করিয়াছেন তাহা তথ্য অপেক্ষা বহু পরিমাণে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক যুদ্ধ প্রভৃতি অপেক্ষা তাঁহাদের যে আদর্শচরিত্র ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অনেক বড়, ও তথ্য অপেক্ষা অধিক সত্য।

রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

অসম্পূর্ণ real এবং পরিপূর্ণ ideal মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য। কল্পনার centrifugal force ideal-এর দিকে real-কে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের centripetal force real-এর দিকে ideal-কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে বাষ্প হ'য়ে যায় না, এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হ'য়ে কঠিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

—সবুজপত্র, ১৩২৪ শ্রাবণ।

তুলনীয়—

বাল্মীকি বলিলেন—ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য। আমি রামকে ধার্মিকও করিব না, বীরও করিব না, রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্র-বর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটি মনুষ্য-চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্দর্শনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন—তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শ-স্বরূপ হইয়া থাকেন।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাল্মীকির জয়।

দ্রষ্টব্য—তথ্য ও সত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গবাণী, ১৩৩১ ভাদ্র।

কল্পনা

কল্পনার কবিতাগুলি ১৩০৪ হইতে ১৩০৬ সালের মধ্যে লেখা। পুস্তক প্রকাশের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়—বিশ্বভারতীর প্রকাশিত নূতন সংস্করণের বইয়ে লেখা আছে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের চৈত্র মাসে। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীতে এবং শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসের বিচিত্রা মাসিক-পত্রিকার মধ্যে রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জীতে ও রবীন্দ্রজীবনীতে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ দিয়াছেন—২৩-এ বৈশাখ, ১৩০৭ সাল,—৫-ই মে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

এই পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি কবিতা ও কতকগুলি গান আছে। এই কাব্যে শ্রেষ্ঠ গীতিকবির কল্পনা রঙীন নেশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃসময়

কবিতাটি লেখা হয় ১৩০৪ সালে, ছাপা হয় ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসের ভারতীর প্রথম পৃষ্ঠায়। ইহার অল্পদিন পূর্বে বোধ হয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ড হয়। তখন আমরা এই কবিতাটিকে দেশের সাময়িক দুঃসময়ের সহিত সম্পর্কিত মনে করিয়াছিলাম।

বিগত জীবনের স্মৃতিতে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নূতন জীবনযাত্রায় পক্ষবিস্তার করিতে যাইতেছেন। কবি জীবনের এমন এক অবস্থার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন যাহার পূর্ণ পরিচয় তিনি অবগত নহেন; কিন্তু পিছনে-ফেলিয়া-আসা ঐশ্বর্যের দিকে চাহিয়াও তিনি আর পরিতৃপ্তি পাইতেছেন না। —অজিতকুমার।

১

সন্ধ্যা জীবনে ঘনাইয়া আসিয়াছে, জীবনের পর্যায়ে এক অবস্থার অবসান হইয়া গেল, এখন নূতন পথে একাকী যাত্রা করিতে হইবে। সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নূতন, সুতরাং অপরিজ্ঞাত, এবং সেই জীবনযাত্রার প্রত্যেক ব্যক্তিকে একাকী শঙ্কিত চিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে।

২

যাত্রাপথে যাহা দেখা যাইতেছে তাহার কিছুই পূর্বপরিচিত নহে, পাখীর

আশ্রয় অরণ্য বলিয়া যাহা ভ্রম হইতেছে তাহা সমুদ্র, সেখানে কোনো আশ্রয় নাই। তথাপি যাত্রা করিয়া চলিতে হইবে।

৩

যদিও সম্মুখপথ অন্ধকারাবৃত, তথাপি ক্ষীণ শশাঙ্ক তোমার পথনির্দেশ করিবার জন্য উদয় হইয়াছে, সেই অস্পষ্ট আলোকে পথ করিয়া চলিতেই হইবে।

৪

জগতে সকল জাগ্রত চক্ষুর দৃষ্টি তোমার যাত্রা লক্ষ্য করিতেছে, এবং তোমার সম্মুখে সঙ্কট সত্ত্বেও অগ্রসর হইয়া তাহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য অজানা তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

৫

নির্ভয়ে সকল স্নেহ-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কোনো আশা মনে না রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অনন্ত পথ আছে, আর তোমার পক্ষবিস্তারের ক্ষমতা আছে, অতএব কোনো দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল অগ্রসর হইয়া চলো।

বর্ষামঙ্গল

১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কবে লেখা হয় তাহার কোনো নির্দেশ নাই।

বর্ষার ঘনঘটায়·আকাশ বাতাস পৃথিবী সরস হয়, সহৃদয় ও রসানুভূতিতে আর্দ্র হয়। বেদের আমল হইতে মেঘের বন্দনা-গান করা হইয়াছে—ঋগ্বেদ ৫।৮৩, যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২।৪।৫, অথর্ববেদের ৪র্থ কাণ্ড ১৫শ সূক্তে মেঘের উৎসব বর্ণিত আছে। ঋতুসংহারে বর্ষার বর্ণনা আছে, মেঘদূত তো বর্ষারই কাব্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যও বর্ষার বন্দনা দিয়া আরম্ভ। বাংলার বৈষ্ণব কবিরা মেঘের ও বর্ষার গান গাহিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানের কাজরী, গুজরাটের গরবা, পাঞ্জাবের লোড়ী কাজল-বরণ মেঘেরই গান—বর্ষা-মঙ্গল।

ভারতবর্ষের সকল দেশের সকল কালের বর্ষার গানের মধ্যে যে মধুরিমা আছে তাহারই যেন ঘনসার এই কবিতাটি। এক একটি পংক্তি পাঠ করিতে করিতে কত কত কবির কত বর্ণনা যে মনে পড়িয়া যায় তাহা যিনি দেশের বর্ষাকাব্যের সহিত পরিচিত আছেন তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন। আমি কয়েকটি স্থূল নির্দেশ করিয়া দিতেছি।

১

শ্যাম ঘটা বহুদিসি চঢ়ি আই,

নাচন লাগে মোর।

বকুলা উড়ত সুহাবন লাগে

কড় কড় কড়কন্ত ঘোর॥

—কবি সংতরাম, কাজরী গান।

পবন-চালিত-শাখৈঃ শাখিভির্ নৃত্যতীব।—ঋতুসংহার, বর্ষা ২৩।

২

অপহৃতম্ ইব চেতস্ তোয়দৈঃ সেন্দ্রাচাপৈঃ

পথিকজনবধূনাং তদ্‌বিয়োগাকুলানাম্॥—ঋতুসংহার, বর্ষা ২২।

পক্ষোৎক্ষেপাদ্ উপরি-বিলসৎ-কৃষ্ণসার-প্রভানাম্॥—মেঘদূত, পূর্বমেঘ ৪৮।

শিরসি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাম্। ঋতুসংহার, বর্ষা ২৪।

তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ প্রয়ান্তি রাগাদ্ অভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ।—ঋতুসংহার, বর্ষা ১০।

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলম্।—গীতগোবিন্দম্ ৫।৪।

নীল-নিচোল-চারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গম্ আলিঙ্গতি।—গীতগোবিন্দম্ ১১।২।

স্ত্রিয়শ্চ কাঞ্চী-মণিকুণ্ডলোজ্জ্বলাঃ। ঋতুসংহার, বর্ষা ১৯।

৩

ভূর্জ্জপত্রেণ লেখং সম্পাদ্য অন্তরা তস্য ক্ষেপ্তু্ম্ ইচ্ছামি।—বিক্রমোর্বশী, ২য় অঙ্ক।

৪

পুষ্পাবতংস-সুরভীকৃত-কেশপাশাঃ।—ঋতুসংহার, বর্ষা ২১।

জনিত-রুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ।—ঐ, ২৬।

মালাঃ কদম্ব-নবকেশর-কেতকীভির্

আযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্য।—ঐ ২০।

নবভবদ্-অশোকদল শয়নসারে প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপম্ ইহ।—গীতগোবিন্দম্ ২১।২।

তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া,

রণরণ বাজে তায় বালা।—মেঘদূত, উত্তরমেঘ ১৮,

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদ।

বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্ দত্ত নৃত্যোপহারঃ।—মেঘদূত, পূর্বমেঘ ৩৩।

৫

দিবা চিৎতমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন।—ঋগ্‌বেদ ১।৩৮।৯

অন্ধকারীকৃতশর্বরীষপি। ঋতুসংহার, বর্ষা ১০।

বিরহ-শয্যায় হেরিবে কৃশকায়

প্রেয়সী একপাশে করিয়া ভর।—মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২৮,

—প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ।

৬

বিকসিত-নবপুষ্পৈঃ যূথিকা-কুট্মলৈশ্চ। ঋতুসংহার, বর্ষা ২৪।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাওত ছাতিয়া।—বিদ্যাপতি।
মেঘৈর্ মেদুরম্ অম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্ তমালদ্রুমৈঃ।

—গীতগোবিন্দম্, ১ম শ্লোক।

রঘুবংশ কাব্যের ৯।৪৬, মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে, কামসূত্রে, হালের গাথাসপ্তশতীতে, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী নাটিকায় দোলের উল্লেখ আছে। ঝুলন ও দোল ভারতের দুটি ঋতু-উৎসব, বর্ষায় ও বসন্তে অনুষ্ঠিত হয়।

৭

বহুগুণ-রমণীয়ঃ কামিনীচিত্তহারী
তরু-বিটপ-লতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদ-সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥

—ঋতুসংহার, বর্ষা ২৮।

স্বপ্ন

কবিতাটি লেখা হয় ৯-ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ সালে। প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের মাঘ মাসের ভারতী পত্রিকায়।

এই কবিতার একাধিক তাৎপর্য নির্দেশ করিতে পারা যায়।

১

কবিতাটি হয়তো নিছক স্বপ্ন, নিছক কল্পনা, কালিদাসের কাব্য পাঠ করিয়া কবির মনে সেকালের যে ছবি জাগিয়াছিল তাহারই কবিত্বময় প্রকাশ মাত্র, আধুনিক কালে কালিদাসের আমলের একটি পরিবেশ সৃষ্টি মাত্র। অথবা—

২

অতীত জীবনের কৃতকর্মকে স্বকীয় করিয়া রাখিবার ব্যর্থ বাসনার বিলাপ এই কবিতা। তুলনীয় 'সাধনা'।

৩

জন্মজন্মান্তরের জাতিস্মর কবি আপনার পূর্বজন্মের প্রেয়সীর সন্ধানে রত। তিনি তো মহাকবি কালিদাসের কবিপ্রতিভারই উত্তরাধিকারী, তিনি তো বলিয়াছেন—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।

—ক্ষণিকা, কালিদাসের কাল।

তাই তিনি মনে করেন যে যদি তাঁহার পূর্বজন্মের—কালিদাসের কালের—প্রেয়সীর সন্ধান ও সাক্ষাৎ তিনি পানও তবু তাঁহাদের আলাপের ব্যাঘাত ঘটিবে।

৪

অথবা, কবি ইহাতে বলিয়াছেন—ইহজন্মেই এক সময়ে যে খুব নিকটের অন্তরঙ্গ প্রিয় লোক ছিল, ক্ষণিক বিরহের পর যদি তাহাকে খুঁজিতে যাওয়া যায় তবে ঠিক আগের মতন আর তাহার সহিত মিলন ঘটে না, কোথায় একটা ব্যবধান থাকিয়া যায়। প্রেমিক-প্রেমিকা একবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে পুনর্মিলিত হইলে আর পূর্বের মতন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইতে পারে না; পুরাতন গভীর প্রেম অগভীর হইয়া যায়, তীব্র আকর্ষণ শ্লথ হইয়া পড়ে; মনে হয় যেন দুজনের জীবনে জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে, দুজনে যেন বিভিন্ন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে, দুজনে দুজনের নাম ভাষা ভুলিয়া যায়, এবং তখন মামুলি কুশল-প্রশ্নেই সেই মিলন পর্যবসিত হয়। এখানে পূর্বজন্ম ও উজ্জয়িনী কবিত্বের পটভূমিকা মাত্র, কিন্তু ব্যাপারটা ইহজন্মেরই হইতে কোনো বাধা নাই।

৫

যে প্রেমিক, তাহার বার বার মনে হয় আমি যে কেবল আজ ভালো-বাসিতেছি তাহা নহে, আমার এ ভালোবাসা জন্মজন্মান্তরের। বর্তমান ভালোবাসার মধ্যে থাকিয়াও মনে হয় আমি যেন এইরকমই ভালোবাসিতে-বাসিতে জন্মজন্মান্তর বাহিয়া এই বর্তমানে আসিয়া পৌছিয়াছি; আমার এই ভালোবাসার জন্ম আমার ইহজন্মে নহে, হয়তো অন্যরূপে অন্য পরিবেশের মধ্যে আজ যাহাকে ভালোবাসিতেছি তাহাকেই ভালোবাসিয়া আসিয়াছি।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার,—
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার। —অনন্ত প্রেম।

অতীতের ও ভবিষ্যতের কথা যখন ভাবি, অতীত ও অনাগত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমলীলা যখন অনুভব করি, তখন একবারও মনে হয় না যে উহাদের মধ্যে আমি ছিলাম না বা উহাদের মধ্যে থাকিব না। আমি ছিলাম ও থাকিব, এবং আমার প্রিয়াও ছিল ও থাকিবে সেই-সব প্রেমিক-প্রেমিকাদের

রূপে ৷ আজও যখন সেই কথা ভাবি তখন তন্ময় হইয়া যাই ; তখন চোখের সম্মুখে পৃথিবীর যবনিকা সরিয়া গিয়া মনের সম্মুখে প্রেমরাজ্য প্রকাশিত হয় সেই আগেকার জন্ম-জন্মান্তরের নিদর্শন অনুসরণ করিয়া, আর তখন তাহারই ভিতর হইতে আমার প্রিয়ার ভবন অনুসন্ধান করিয়া বাহির করি। দেখি—সেই যাহাকে সেদিন ভালোবাসিয়াছি সে তেমনি বেশেই আসিয়াছে, তাহার কার্যপ্রণালীও ঠিক তেমনি আছে, কেবল কালভেদে ভাবপ্রকাশের বাহন ভাষার তারতম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ভাবের কোনো ব্যত্যয় হয় নাই। চিরদিন ধরিয়া আমাদের কেবল এমনই হইবে—বর্তমান হইতে অতীতের প্রিয়ার কাছে কখনো যাইব, কখনো বা অনুভব করিব যে, পরজন্মেও প্রিয়ার পার্শ্বে এইরকম করিয়া দাঁড়াইব। ভাষার আদান-প্রদানের কেবল গোলমাল ঘটিবে, আর কোনো পরিবর্তন আমাদের হইবে না। প্রেমের কতটুকুই বা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে, যাহা করে চোখের দৃষ্টি, মুখের ব্যক্ত ভাব, আর প্রণয়ের লীলা। আজও বর্ষার দিনে তাই মনে হয় আমি যেন বহুযুগের ওপারে চলিয়া গিয়াছি, আর সেখান হইতে—

সেই চাহনি ভেসে আসে
কালো মেঘের ছায়ার সনে।

এবং আরও মনে হয়—

মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে।

আগেকার ও পরেকার জীবনে আমার যোগ রহিয়াছে, কেবল পূর্বজন্মের বাণী আর মনে আনিতে পারিতেছি না—

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে!
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে!
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চির-দিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে!

—প্রবাসী।

কিন্তু তথাপি—

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে, দাঁড়াব থমকি';
নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি'
লভিয়া চেতনা। জানি মনে হবে মম
চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা সম
চির-পরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ!

—মানস-সুন্দরী।

যে প্রেমিক, সে সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে আপনার প্রেম উপলব্ধি করে, তাহার দেশ নাই, কাল নাই। তাই প্রেমকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন যেখানে দময়ন্তী, যেখানে শকুন্তলা, যেখানে মহাশ্বেতা, যেখানে সুভদ্রা, যেখানে রাধা প্রণয়লীলা করিয়াছেন, সেখানে—

হাত ধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দন-ভূমি
অমৃত-আলয়ে; সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী!

—প্রেমের অভিষেক।

এই অনুভব মনে রাখিয়া প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারা যায়—

তব স্পর্শ, তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব দেহ-মন
পূর্ণ করি; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ-যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি'......

—প্রেমের অভিষেক।

সকল কালের ও সকল দেশের মাঝে আমারই এই প্রিয়া ছিল ও আছে এবং থাকিবে; বর্ত্তমান হইতে অতীতে ও ভবিষ্যতে তাহাদের কাছে আমার অভিসার চলিবে।

হে আমার প্রিয়া,

নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ-মূরতি,
তুমি অচপল-দামিনী!

—চিত্রা।

এবং আমি সুস্পষ্ট অনুভব করি—

তোমার নাহি শীত বসন্ত,
জরা কি যৌবন।
সর্বঋতু সর্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি'
চির বিরাজ করে!

—কল্যাণী।

তাই চিরন্তন প্রেমিক তাহার চিরন্তনী প্রেমিকাকে যৌবনের লিপি প্রেরণ করিয়া বলে—

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার-ওপার!

—বলাকা, ১৩ নম্বর কবিতা।

৬

অথবা,

কবি চিরন্তন, এবং তাঁহার যে প্রেয়সী কবিতা সেও চিরন্তনী। কবি হোমার ছিলেন, তাঁহার পূর্বে ও পরে ভার্জিল, দান্তে, তাসো, শেক্সপীয়ার, মিল্‌টন, শেলী, কীট্‌স, বায়রন, টেনিসন, গ্যেটে, শীলার, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, মাইকেল মধুসূদন, বিহারীলাল, হেম, নবীন প্রভৃতি কত কত কবির আবির্ভাব হইয়াছে। বিশেষ-নামাঙ্কিত লোকগুলি এখন নাই, কিন্তু কবি বিদ্যমান আছেন অন্য নামে—কবি রবীন্দ্রনাথ আছেন; কিন্তু তিনিও যখন থাকিবেন না তখন কোনো না কোনো নামে কবি বিদ্যমান থাকিবেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কবি-প্রিয়া কবিতা বা কবিত্বও বিদ্যমান থাকিবে। কবি ও কবি-প্রিয়া

কবিতার বিনাশ নাই, কেবল এক কালের কবির সঙ্গে অন্য কালের কবিতার ভাষার অপরিচয় ঘটিয়া যায়—ভিন্ন কালে ও ভিন্ন দেশে তো ভাষাভেদ ঘটেই, একই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন ঘটে, অথবা একই ভাষার এমন পরিবর্তন ও পরিণতি ঘটে যে, এক কালের কবি অন্য কালের কবির ভাষা আর সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। এইজন্য ইংরেজ কবি জেমস্ এল্‌রয় ফ্লেকার বলিয়াছিলেন যে হাজার বৎসর পরে তাঁহারই দেশের পাঠক-পাঠিকারা তাঁহার কবিতা পাঠ করিবে, কিন্তু সেই কবিতার ভাষা পুরাতন অপ্রচলিত দুর্বোধ্য হইয়া যাইবে।—১৪-শ সালের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই কবিতাটিতে কালিদাসের কালের পরিবেশ দিবার জন্য কবি মেঘদূত ঋতুসংহার রঘুবংশ প্রভৃতি কালিদাসের কাব্য হইতে বর্ণনা আহরণ করিয়া নিজের কবিতায় সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে কবি কালিদাসের কাব্যের বর্ণনা-অনুযায়ী বর্ণনা-বিন্যাস করিয়াছেন।

উজ্জয়িনীপুরে—শিপ্রা নদী-পারে।

মুখে তার লোধ্ররেণু ইত্যাদি— —মেঘদূত, পূর্ব ৩২।

হস্তে লীলাকমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতাম্ আননে শ্রীঃ।
চূড়া-পাশে নব-কুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদ্-উপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

—মেঘদূত, উত্তর ২।

তনুদেহে রক্তাম্বর—

সরাগ-কৌশেয়ক-ভূষিতোরসঃ। —ঋতুসংহার, শিশির ৮।

চরণে নূপুরখানি—

নিতম্বিনীনাং চরণৈঃ সনূপুরৈঃ। —ঋতুসংহার, গ্রীষ্ম ৫।

নিশাসু ভাস্বৎ-কলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চারোঽভূদ্ অভিসারিকাণাম্।

—রঘুবংশ ১৬।১২।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে—

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালম্ আসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদ্ অত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলি-পটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্
আমন্দ্রাণাং ফলম্ অবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্॥

—মেঘদূত, পূর্ব ৩৫।

জনশূন্য পণ্যবীথি—

গচ্ছন্তীনাং রমণ-বসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং।
রুদ্ধালোকে নরপতি-পথে সূচিভেদ্যৈস্ তমোভিঃ॥

—মেঘদূত, পূর্ব ৩৮।

দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র—

দ্বারোপান্তে লিখিত-বপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ।

—মেঘদূত, উত্তর ১৯।

দুটি শিশু নীপ-তরু পুত্রস্নেহে বাড়ে—

যস্যোপান্তে কৃতক-তনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্ত-প্রাপ্য-স্তবক-নমিতো বাল-মন্দারবৃক্ষঃ।

—মেঘদূত, উত্তর ১৪।

প্রিয়ার কপোতগুলি—

তাং কস্যাঞ্চিদ ভবন-বলভৌ সুপ্ত-পারাবতায়াং। —মেঘদূত, পূর্ব ৩৯।

ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে—

তন্মধ্যে চ স্ফটিক-ফলকা কাঞ্চনী বাস-যষ্টির
মূলে বদ্ধা মণিভির্ অনতিপ্রৌঢ়-বংশ-প্রকাশৈঃ
তালৈঃ শিঞ্জা-বলয়-সুভগৈর্ নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যাম্ অধ্যাস্তে দিবস-বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ বঃ॥ —মেঘদূত, উত্তর ১৮।

অঙ্গের কুসুমগন্ধ কেশ ধূপবাস—

কুসুম্ভ-রাগারুণিতৈর্ দুকূলৈর্
নিতম্ববিম্বানি বিলাসিনীনাম্॥
রক্তাংশুকৈঃ কুঙ্কুম-রাগ-গৌরৈর্
অলংক্রিয়ন্তে স্তন-মণ্ডলানি॥ —ঋতুসংহার, বসন্ত ৪।
গুরূণি বাসাংসি বিহায় তূর্ণং
তনূনি লাক্ষারস-রঞ্জিতানি।
সুগন্ধি-কালাগুরু-ধূপিতানি
ধত্তে জনঃ কাম-মদালসাঙ্গঃ। —ঋতুসংহার, বসন্ত ১৩।
জালোদ্গীর্ণৈর্ উপচিতবপুঃ কেশ-সংস্কার-ধূপৈর্
বন্ধু-প্রীত্যা ভবন-শিখিভির্ দত্ত-নৃত্যোপহারঃ। —মেঘদূত, পূর্ব ৩৫।

চন্দনের পত্রলেখা—

স্তনৈঃ স-হারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ। —ঋতুসংহার, গ্রীষ্ম ৪।
পয়োধরাশ চন্দনপঙ্ক-চর্চিতাঃ। —ঋতুসংহার, গ্রীষ্ম ৬।

হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি
নার্যঃ প্রহৃষ্ট-মনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি। —ঋতুসংহার, শরৎ ২০।

দ্রষ্টব্য—মেঘদূত ও সেকাল ব্যাখ্যা। Tennyson-এর *Recollection of the Arabian Nights.*

মদন-ভস্মের পূর্বে ও পরে

কবিতা দুইটি সম্ভবতঃ ১৩০৪ সালে লেখা। কিন্তু উহারা প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের আশ্বিন মাসের ভারতী পত্রিকায়।

এই যুগ্ম-কবিতার ছন্দ জয়দেবের গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিত ছন্দের অনুরূপ—

বসসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দর- তিমিরমতি- ঘোরম্।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা।
রোচয়তি লোচন-চকোরম্।

প্রাচীনকালের মানুষ মদনকে মদনরূপেই দেহের ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; প্রাচীনকালের সাহিত্যে ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু তাহারও মধ্যে একটি মধুর লীলা ছিল। তখনকার লীলা যদিও কেবল মাত্র দৈহিক ও ইন্দ্রিয়জ ব্যাপার ছিল, এমন কি তাহাকে পশুভাবও বলা যাইতে পারে—

হরিণ সাথে হরিণী আসি' চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

তথাপি তাহার মধ্যে যে লীলা ছিল তাহাতেও একটি কবিত্ব ও মাধুর্য ছিল।

মদনের যখন অঙ্গ ছিল, তখন তাহাকে বাধা দেওয়া সহজ ছিল; কিন্তু অনঙ্গ হইয়া সে দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। আগে মদনের পীড়া বিরহী-বিরহিণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; মদন-পীড়ায় কাতর অথচ সেই কামনা পূরণ করিবার উপায়হীন নরনারীকেই কবিরা ঢাকা দিয়া সভ্য করিয়া বলিয়াছেন বিরহী-বিরহিণী। তাঁহারা পঞ্চশরকে ইন্দ্রিয়রাজ্য হইতে মনোরাজ্যে নির্বাসন দেওয়াতে—অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া অনঙ্গ করাতে—সে এখন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; যাহা আগে ছিল ব্যক্তির, তাহা এখন হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বের ও সর্বের, সেটা এখন অনির্বচনীয়তায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। আগে মদনের আকাঙ্ক্ষা নির্দিষ্ট ছিল—তাহা চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদিতে প্রকাশ পাইত;

কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে তাহার আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিয়াছে অনির্বচনীয়—মদনের ভাবব্যঞ্জনা ইঙ্গিত সঙ্কেত এখন সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া গিয়াছে,—একটি লতা তরুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, একটি ভ্রমর ফুলের বুকে বসিয়া মধু পান করিতেছে, ঘুড়িতে ঘুড়িতে পেঁচ লাগিয়াছে দেখিয়া নরনারীর মনে এখন মিলনের ইঙ্গিত জাগিয়া উঠে। অঙ্গ যখন ছিল তখন মদন ছিল অকপট সরল খোলাখুলি; এখন তাহার সমস্তই গোপন, সবই ইঙ্গিতময় সঙ্কেত মাত্র।

প্রেমের প্রথমাবস্থায় দেহের আকর্ষণ প্রবল থাকে, দেহের প্রলোভন ও তাহার মাধুর্য মনকে মোহিত করে। ইহার লীলাও সুন্দর। কিন্তু তাহার পরে যখন প্রেম গভীর হয়, তখন মনে হয় যে দেহই সর্বস্ব নয়, তখন কেবল মাত্র অঙ্গ লইয়া চিত্ত পরিতৃপ্তি পায় না, অঙ্গাতীত অনন্ত অসীম একটা অনুভব তখন মনকে অভিভূত করে। সেই দেহাতিরিক্ত অসীমতার সন্ধানের ব্যগ্রতা এবং সেই অসীমকে না পাওয়ার দুঃখই তখন হয় সেই প্রেমের মাধুর্য ও আনন্দ। এই কথাটি অবলম্বন করিয়াই কালিদাসের মেঘদূত কাব্য সুমধুর হইয়া রহিয়াছে।

তাই আমাদের কবিও মদনের অঙ্গশোভা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা!

আবার অঙ্গাতীত মধুর আভাস অনুভব করিয়া কবি বলিতেছেন—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

কবি মদনকে রূপলোক হইতে অনঙ্গ করিয়া অরূপলোকে উপনীত করিয়া দিয়াছেন। কবি দেহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন মানসলোকে, ভাবলোকে। মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ, যাহা মিলনের মধ্যেও লুকাইয়া থাকে, তাহারই ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে এই দুইটি কবিতায়।

এই কবিতার সমভাবাত্মক দুটি সংস্কৃত শ্লোক আছে—

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ এ কী রঙ্গ
মমতাহীন পেয়েছে সে যে ভুবনভরা অঙ্গ;
পঞ্চশর ভাঙিয়া তার হয়েছে শর লক্ষ;
করিল প্রাণে কদম সম বিঁধিয়া দেয় বক্ষ।

—কবি রাজশেখর-কৃত সংস্কৃত শ্লোকের
কবিশেখর কালিদাস রায়-কৃত অনুবাদ।

এবং—

স একস্ ত্রীণি জয়তি জগতি কুসুমায়ুধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্॥
কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

—অমরুশতক।

সেই মদন কোমল কুসুমধনু এবং একা হইয়াও তিন জগৎকে জয় করে, শম্ভু তাহার দেহ দগ্ধ করিলেও তাহার বল হরণ করিতে পারেন নাই, সে কর্পূরের ন্যায় দগ্ধ হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাহার শক্তি মান্য হইতেছে, অতএব সেই অবার্যবীর্য কুসুমধনুকে নমস্কার। অর্থাৎ, মদনের দেহ মাত্র ভস্ম হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রভাব বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই কবিতা দুইটির সঙ্গে 'প্রকাশ' নামক কবিতাটি মিলাইয়া পাঠ করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইবে।

তুলনীয়—

And the Spring arose on the garden fair
Like the Spirit of Love felt everywhere.

—Shelley.

সে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণবেশে॥
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

—পূরবী, তপোভঙ্গ।

পিয়াসী

(১৩০৪ সাল)

এই কবিতায় একটি পুরুষ একটি তরুণী সুন্দরীর নিকটে আসিয়া কেবল দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই তরুণী বোধ হয় তাহাকে তাহার ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করাতে সে নিজের কৈফিয়ৎ দিতেছে—সে তাহার নিজের তিনটি

অবস্থা বর্ণনা করিতেছে—(১) দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ; (২) দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ; (৩) পরাণ নীরবে ক্ষুব্ধ। সেই পুরুষ তো মুখ ফুটিয়া কিছু চাহে নাই, সে কেবল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়াছে মাত্র, তাহার সেই নীরব মোহই তরুণীর মনে প্রার্থনারূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে। সে তো কোনো কথা বলে নাই, তাই পাখীর ব্যাকুল কাকলি তরুণী তাহার প্রার্থনা বলিয়া ভুল করিতেছে। তরুণীর কাছে যে তাহার প্রার্থনা পূরণ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে—যিনি মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেই শিবের মন্দিরে যিনি সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী তিনি ভোরের ভজন গাহিতেছেন; তরুণী যে মনে করিতেছে যে সেই পুরুষ তাহার অলক স্পর্শ করিয়াছে, তাহাও ভুল,

উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী কহিয়াছে।

কবিতাটিতে তরুণ-তরুণীর নির্বাক্ অস্বীকৃত প্রণয়ের লীলা অতি সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

পসারিণী

১৩০৪ সালে লেখা। এই কবিতাটি লিখিবার কথা কবির মনে হইয়াছিল বোধ হয় বৈষ্ণব কবি বংশীবদনের একটি কবিতা পাঠ করিয়া—

হেদে লো বিনোদিনী, এ পথে কেমনে যাবে তুমি!
শীতল কদম্ব-তলে বৈসহ আমার বোলে,
সকলি কিনিয়া নিব আমি।
এ ভর দুপুর-বেলা তাতিল পথের ধুলা,
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ, দেখি' লাগে বড় দুখ,
শ্রম-ভরে আউল্যাল কবরী।
অমূল্য রতন সাথে, গোভারের ভয় পথে,
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী,
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া।

কবি বর্তমানকে বলিতেছেন—ওগো প্রত্যক্ষ, ওগো বর্তমান, তুমি

পরোক্ষের সংবাদ অসীমের তত্ত্ব আমাকে বলিয়া যাও, তাহার পরে আবার অসীমের পথে যাত্রা করিয়ো। জীবন-হাটের পসারিণী কবির জীবনের হিসাব-নিকাশ লইয়া পসরা সাজাইয়া চলিয়াছেন, সেই পসরা নামাইয়া কবি একবার জীবনের পরিচয় পাইতে চাহিতেছেন। বিচিত্ররূপিণী যিনি বাহিরে চঞ্চল ও অন্তরে স্থির অচপল, তিনিই পসারিণী-বেশে আমাদের কাছে গতায়াত করেন।

বিশ্বসৌন্দর্য ও মাধুর্য অনন্ত-পথ-যাত্রী। তাহাকে কবি বলিতেছেন যে তুমি তো চিরদিন একস্থানে বন্দী হইয়া থাকিবার পাত্র নও, তুমি অসীম অশান্ত; কিন্তু যাত্রাপথে আমার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয় করিয়া যাইয়ো; বিশ্রামের সময়ে আমি যেমন করিয়া তোমাকে নিকটে পাইব, কর্ম জাগ্রত হইয়া উঠিলে আমি তো আর তেমন করিয়া তোমাকে পাইব না—কর্ম যে বড় কঠিন প্রভু।

কিংবা কোনো নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে—ওগো পসারিণী, তোমার প্রেমের সুধারসের পসরা কাহার জন্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ? তোমার হয়তো ধনী মানী গুণী লোক চাই যাহাকে এই পসরা তুমি সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইবে। কিন্তু তোমার পসরা একবার আমার কাছেও নামাইতে পারো; আমি যদিও তোমাকে রাজপুরের বা রতনের হাটের দর দিতে পারিব না, তথাপি আমি যে মূল্য দিতে পারি তেমন দামের সামগ্রীও তো তোমার চিত্ত-পসরায় কিছু না কিছু আছে। আমার দিকে চাহিয়া দেখ; দূরের যে মোহ তোমাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাও আমার মধ্যে আছে—আমি তোমাকে ঐশ্বর্য দিতে যদি নাও পারি, কিন্তু শান্তি প্রীতি তো দিতে পারিব। যদি আমার কাছে পসরা নামাইলে আত্মবিস্মৃতির সুপ্তি আসে, তবে তাহাতেও ভয় করিয়ো না—এখানে তোমার পথ-চলার ক্লান্তি দূর হইলে আমি নিজেই তোমার সেই সুপ্তির মোহঘোর ভাঙিয়া দিব; আমার কাছে তোমার আকাঙ্ক্ষা না মিটুক, তোমার চিত্ত শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

বিচিত্রিতা পুস্তকের অন্তর্গত "পসারিণী" কবিতাটি এই কবিতার সহিত তুলনীয়।

এই কবিতাটি লেখা হয় ১৩০৪ সালে, কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের প্রদীপ পত্রে।

ভ্রষ্ট লগ্ন কবিতাটি পসারিণী কবিতার বিপরীত—সেখানে পসারিণী রমণীকে কোনো পুরুষ সম্বোধন করিতেছে, আর এখানে লগ্নভ্রষ্টা কোনো নারী কোনো পুরুষকে সম্বোধন করিতেছে।

এই কবিতাটির তিনটি কলিতে তিনটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—সময়ের ও পথিকের উভয়েরই। পথিক যখন প্রথম আসিল তখন প্রত্যূষ এবং তখন সেই নবীন পথিকের সাজসজ্জা মনোরম। সে যখন আবার আসিল তখন গোধূলি-বেলা; সে তখন শ্রান্ত, তাহার অশ্ব ক্লান্ত, এবং তাহার 'বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি'। সেই পথিক যখন রমণীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিতে চলিয়া গেল, তখন রমণী আত্মদানে প্রস্তুত হইল; তখন যামিনী আসিয়াছে, কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক তাহাকে অনুসন্ধান করিতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। 'ফাগুন-যামিনী' মিলনের অনুকূল সময় বটে, কিন্তু সেই রমণী মিলনের শুভ লগ্ন তো নিজেই ভ্রষ্ট করিয়াছে, পথিক হতাশ হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে তাহাকেই অন্বেষণ করিতে।

দিবস আনন্দের ও রাত্রি বিষাদের প্রতীক; তাই পথিক প্রভাতে আসিয়া রাত্রিতে চলিয়া গেল—মিলনের সুযোগটি হারাইয়া উভয়েরই জীবন অন্ধকার হইয়া গেল।

নারীর নিকটে পুরুষ নিজের প্রেমের যে সাড়া ও প্রতিদান চাহিয়াছিল, তাহা সেই নারী তাহাকে যথাসময়ে জানাইতে পারে নাই, নারী নিজের অন্তরের দ্বিধা লজ্জা সঙ্কোচ সমাজ-শাসন প্রথা সংস্কার ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া পুরুষের নিকটে আত্মদান করিতে পারে নাই। যদি সে তাহা পারিত, তাহা হইলে তাহার প্রিয়ের অনেক বৃথা অন্বেষণের ক্ষোভ ও শ্রান্তি সে দূর করিতে পারিত। কিন্তু যখন সেই নারী আত্মদান করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিল, তখন লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন সেই পথিক হতাশ হইয়া তাহারই অনুসন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে।

আমাদের জীবনে কত কত সুবিধা সুযোগ আমাদিগকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে, আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখি না, অথবা দেখিলেও সেই সুযোগকে বরণ করিয়া গ্রহণ করি না। কিন্তু সেই সুযোগ যখন চলিয়া যায়, তখন তাহারই

উদ্দেশে হায় হায় করিয়া হাহাকার করিয়া মরি! ক্ষণিককে আমরা জীবনে বরণ করিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়াই ক্ষণিকের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য আমরা ব্যাকুল হই।

নিকটের বস্তুকে অবহেলা করিয়া মানুষ দূরে চলিয়া যায়, এবং তাহাতে সে নিকটকে তো হারায়ই, দূরকেও সে পায় না,—এই কথাটি কবি বার বার বলিয়াছেন। কবির প্রথম রচনা বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় কাব্যে এবং মায়ার খেলা গীতিনাট্যে এই কথাই তিনি বলিয়াছেন—

কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও?
মনের মতো কারে খুঁজে মরো?
সে কি আছে ভুবনে?
সে যে রয়েছে মনে।

মায়াকুমারীরা গাহিয়াছে—

বিদায় করেছ যারে চোখের জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে-জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে!

লিপিকার মধ্যেও একাধিক কথিকায় এই কথাই কবি বলিয়াছেন।

শরৎ

(১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত)

আমাদের কবি ষড়্‌ঋতুর মধ্যে বর্ষার পরে শরতেরই অধিক গুণগান করিয়াছেন। অনেকগুলি সুন্দর কবিতা ও গান ছাড়া তাঁহার শারদোৎসব নাটিকা তো শরতের আনন্দ লইয়াই লেখা। শরতের শ্রী ও আনন্দ তাঁহার কবিতার কথায় ও ছন্দে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে। শরতের পল্লীচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কবি স্বদেশের মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপরিচয়ের এইটিই বিশেষত্ব—তিনি প্রকৃতিকে মনুষ্যের সহিত ও মনুষ্যকে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াই দেখেন। কবির অনুভূতির রাজ্যে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে যেন কোথাও কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নাই, ইহারা

দুইয়ে যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, সাদা-কালো জলের মেলামেশার ঠেলাঠেলি। জড়প্রকৃতিকে চেতনাময়ী কল্পনা করিয়া কবি আত্মীয়তার আনন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেন।

এইজন্য কবির এই-সব প্রাকৃতিক কবিতা অন্য যে-কোনো কবির ঐ বিষয়ের কবিতা অপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হয়। এই শরৎ কবিতাটি স্পেন্‌সারের সেপ্‌টেম্বর ও অক্‌টোবর, টম্‌সনের Autumn, এবং কীট্‌স ও শেলীর ঐ জাতীয় কবিতা অপেক্ষা উত্তম হইয়াছে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনের *Western Influence in Bengali Literature*, পৃঃ ৩৪৫-৩৫৩ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশ

(১৩০৪ সাল)

এই কবিতার মধ্যে কবি দেখাইয়াছেন যে ভুবনলক্ষ্মীর অনন্ত প্রণয়লীলা প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রণয়ের গোপন-রহস্য কবিই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন—

আদি প্রেম যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনও পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই—সেদিন কোনো কবি উপস্থিত ছিল না, কোনো ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই—কিন্তু সেই দিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল যে এ-জগৎ যন্ত্র-জগৎ মাত্র নহে; প্রেম নামক এক অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজ-বন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন—এবং সেই পঙ্কজ-বনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্য-রূপা লক্ষ্মী এবং ভাব-রূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

—পঞ্চভূত, কাব্যের তাৎপর্য।

এই কবিতায় কাব্য ও বিজ্ঞানের বিরোধিতারও একটু ইঙ্গিত আছে—আগে যাহা কবিত্ব করিয়া বলা হইত ও সত্য বলিয়া উপলব্ধি করা হইত, এখন তাহাকে আমরা বলি রূপক উপমা কবিত্ব। কিন্তু এই রূপক উপমা প্রভৃতিও আদি কবির পরে আর কেহ নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। যেমন এমার্সন বলিয়াছেন যে সব ভাবই প্লেটোর কাছে ধার-করা, সংস্কৃত আলঙ্কারিক যেমন বলিয়াছেন 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্‌' তেমনি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে সব কবিত্বই আদি কবির উচ্ছিষ্ট।

'শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি'—লাইনটি মেঘদূতের একটি শ্লোক মনে করিয়া লেখা—

সরমে নারীগণ নিবাতে আলো তবে
কাগের মুঠি ছোঁড়ে দীপ-শিখায় ;
সে কাজ বৃথা হায়, নেবে না মণি-দীপ
ঘুচাতে রমণীর সে লজ্জায় !

—মেঘদূত, উত্তর ৭।

'ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু পানে'—লাইনটি কালিদাসের শকুন্তলা ও উর্বশীর বর্ণনা মনে করিয়া লেখা।

'কুরবক-সাহা-পরিলগ্‌গং বক্কলং।'—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌, ১ অঙ্ক।

'অম্মো! লদা-বিড়বে এআবলী বৈজঅন্তিয়া মে লগ্‌গা।'

—বিক্রমোর্বশী, ১ম অঙ্ক।

তুলনীয়—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরে ভানুর্‌ জলেষু পদ্মঃ।
ইন্দুর্‌ দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধুর্‌
যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরম্‌। —উদ্ভট

Where shall I grasp thee, Infinite Nature, where? —Goethe.

দ্রঃ—Shelley-র *"Love's Philosophy"* এবং Wordsworth-এর *"The World is too much with us"*.

অশেষ

(১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়)

জীবনের সমস্ত কাজ-কর্ম চুকাইয়া যখন জীবন-সন্ধ্যায় বিশ্রামের সময় উপস্থিত, তখন নূতন পথে যাত্রা করিবার জন্য জীবনদেবতার 'আবার আহ্বান' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যেখানেই যে আশ্রয়কে একান্ত ও শেষ মনে করিয়া দাঁড়ি টানিতে চাই, সেখানেই সেই শেষের মধ্যে অশেষের ডাক আসিয়া পৌঁছায়—তখন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সত্যের অভিসারে যাত্রা করিতে হয়। খণ্ড-সফলতার ক্ষণ-সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ডের জন্য—অশেষের জন্য—কবির এই ব্যাকুলতা। তাই তো কবি পরে বলিয়াছেন—

শেষের মধ্যে অশেষ আছে, এই কথাটি মনে
আজকে আমার গানের শেষে জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।

—গীতাঞ্জলি।

এবং

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে ? —গীতবিতান

বিরাট্ বিশ্বচিত্তের সঙ্গে ব্যক্তিমানব-চিত্তের যে সংঘাত তাহা আরামের বা মাধুর্যের নহে; অশেষের দিক্ হইতে যে আহ্বান আসিয়া পৌছায়, তাহা বাঁশীর ললিত সুর নহে, তাহা শঙ্খের আহ্বান। তাই সেই আহ্বানের উত্তরে কবি বলিতেছেন—রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ইত্যাদি। কবির জীবনের সমস্ত অবসাদ চূর্ণ করিয়া তাঁহার জীবনদেবতা অতি নির্মমভাবে তাঁহাকে সম্মুখে টানিতেছেন। জীবনদেবতার এই যে আহ্বান, তাহা কবির কর্মশক্তিকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ডাকিতেছে, রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নহে।

এই আহ্বানের শেষ উত্তর কবি দিতেছেন—

হবে হবে হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়
হবো আমি জয়ী!

যাহার হৃদয় দুর্বল ও মলিন, মৃত্যু তাহার নিকটে মহাভয়ঙ্কর; সে যূপবদ্ধ পশুর মতো জীবন-যজ্ঞভূমে সহস্রবার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে। কিন্তু যে মহাপ্রাণ, সে আপনার প্রাণসম্পদ্ বিশ্বের প্রাণের কাছে বিলাইয়া দেয়, আপনাকে আপনি মহৎ যজ্ঞে বলিস্বরূপ দান করে, সে-ই মৃত্যুকে আত্মার আরাম বলিয়া বুঝিতে পারে, সে-ই মরিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয়।

কবির জীবনদেবতার মধ্যে অসীম মাধুর্যও আছে, আবার তাঁহার আজ্ঞার মধ্যে কঠোরতাও আছে, তাই কবি তাঁহাকে একই কালে মোহিনী ও নিষ্ঠুরা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। দিন মানুষের কর্মের সময়, এবং রাত্রি বিশ্রামের; কবি কর্ম সমাপন করিয়া যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছেন, তখন জীবনদেবতার 'আবার আহ্বান' হইল। সেই জীবনদেবতা চিরজাগ্রত, তিনি যে রাজ্যের রাণী সেখানে বৈরাগ্যের সুর কখনো বাজে না, সেখানে কেবল কর্ম আর কর্ম। সেই নিয়ন্ত্রী যে বিশ্বসংসারে এত লোক থাকিতেও কবিকেই কর্মের ভার সমর্পণ করিতেছেন ইহা পরম সৌভাগ্য কবির পক্ষে, যদিও সেই সৌভাগ্যজনক কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি সেই দুরূহ সৌভাগ্যের গর্বে কবি তাঁহার কর্তব্য সুসম্পাদন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিবেন এবং তাহার পরে যখন তাঁহার জীবনাবসান হইবে তখন—

কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি' যাব দান,

মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে
তোমার আহ্বান।

একটি কর্মের ভার অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় লওয়ার ভাবটির সহিত প্রাচীন গ্রীসের ও রোমের Lampadedromy বা Torch-bearers' Race এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের Fiery Cross বহনের প্রথার মিল দেখা যায়। সার্ ওয়াল্‌টার স্কটের লেডী অফ্ দি লেক্ কাব্যের তৃতীয় সর্গে অগ্নিময় ক্রশ (Fiery Cross) বহনের চমৎকার বর্ণনা আছে।

তুলনীয়—

Say not now thy task is ended,
Sing the lovely pure and true,
Sing until thy song is blended
With the song for ever new. —Unknown.

I may have run the glorious race,
And caught the torch while yet aflame,
And called upon the holy name
Of him who now doth hide his face, —Oscar Wilde.

How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnished, not to shine in use.
—Tennyson, *Ulysses*.

THE OLD MEN

Old and alone, sit we,
Caged, riddle-rid men;
Lost to earth's 'Listen!' and 'See!'
Thought's 'Wherefore?' and 'When?'
Only far memories stray
Of a past once lovely, but now
Wasted and faded away,
Like green leaves from the bough,
Vast broods the silence of night,
The ruinous moon
Lifts on our faces her light,
Whence all dreaming is gone.

We speak not; trembles each head;
In their sockets our eyes are still:
Desire as cold as the dead;
Without wonder or will,
And One, with a lanthorn, draws near,
At clash with the moon in our eyes;
'Where art thou?' he asks. 'I am here,'
One by one we arise.
And none lifts a hand to withhold
A friend from the touch of that foe:
Heart cries unto heart, 'Thou art old.'
Yet reluctant, we go.

—Walter de la Mare.
(*Georgian Poetry,* 1918-1919)

দ্রষ্টব্য—আমার ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী, ১৩২৪, পৌষ সংখ্যা।

সে আমার জননী রে

এই গানটি কবে রচিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। তবে ইহা প্রথম গীত হয় কবি ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে যে সভায় গান্ধারীর আবেদন নাট্যকাব্য পাঠ করেন সেই সভায়। সেটি ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ঘটনা বলিয়া মনে হয়। ঐ সভায় বহু বিদেশী-পোষাক-পরিহিত বাঙালী উপস্থিত ছিলেন। এই গান শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের মুখ লজ্জায় অবনত হইয়া গিয়াছিল। এই সভার পরে আর এক সভায় কবি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গান 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী' গান করেন। তাহা কল্পনায় 'ভারতলক্ষ্মী' নামে ছাপা হইয়াছে।

বর্ষশেষ

৩০-এ চৈত্র ১৩০৫ সালে লেখা, এবং ঐ সালের চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির রচনার ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি……এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড়

এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে, চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থাম্‌ল। বল্‌লুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এত দিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রম জীর্ণ হ'য়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙ্‌তে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝ্‌লুম বেরিয়ে আস্‌তে হবে।

শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ১৩৩২ বৈশাখ।

কবি নিজের জীবনের মধ্যে যেমন যেমন সত্যের ও সত্যধর্মের উপলব্ধি করিতেছিলেন তেমন তেমন তাঁহার জীবনের যেন এক এক অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া নব নব অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিতেছিল। সেই সত্যবোধ যত অগ্রসর হইতে লাগিল ততই কবির মধ্যে অভ্যস্ত জীবন-যাত্রাকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রথা রীতি সংস্কার অতিক্রম করিয়া নূতনের সন্ধানে, অজানার সন্ধানে চলিবার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা দেখা যাইতে লাগিল। এই অবস্থা-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

এমনি ক'রে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল, ততই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার বর্ষশেষ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

—আমার ধর্ম, প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৪।

এই কবিতার তাৎপর্য আরও ভালো করিয়া বুঝা যাইবে যদি ইহার সহিত আমরা কবির 'পাগল' নামক প্রবন্ধটি মিলাইয়া দেখি। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বা 'সঙ্কলন' পুস্তকে ঐ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পুরাতন ক্লান্ত বর্ষের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিও নিজের পুরাতন কাব্য-জীবনকে বিদায় দিয়া বলিতেছেন—নিছক ভাববিলাসিতা হইতে কর্মের ক্ষেত্রে 'এবার ফিরাও মোরে'। নূতনের আবির্ভাব হয় বর্ষশেষে বসন্তের সৌন্দর্য-প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের ভয়ঙ্কর বেশে। তাই বর্ষশেষে হিন্দুরা রুদ্রের পূজা করে, এবং রুদ্র-পূজার উৎসব করিয়া কাল-বৈশাখীকে অভ্যর্থনা করে।

পুরাতন ক্লান্ত বর্ষের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ভীষণ কালবৈশাখী ঝড় তাহার সমস্ত উদ্দাম আবেগ এবং প্রচণ্ড শক্তির সম্ভার লইয়া আসে, কবীন্দ্র সেই শক্তিকে আবাহন করিতেছেন। মানুষের জীবনে অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়

জড়ভাব সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে ; দেহে ও মনে ক্লৈব্যের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে ; ক্লেদ ও গ্লানিতে বাহির ও অন্তর কলুষিত হইয়া গিয়াছে ; মানুষ মহৎ জীবন লাভ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে,—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি— এ কথা মানুষ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মানব-মনের এই অবস্থা তো সুস্থ নহে, এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। মানুষের জীবন-বস্তুটির স্বরূপ কি ; তাহার ব্যাপ্তি কতখানি, তাহা দেখিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন— অপরিসীম শক্তির একান্ত সাধনা। কালবৈশাখীর অন্তরের উদ্দাম অপ্রতিহত লীলা এবং গতিবেগ সেই ঈপ্সিত শক্তিরই প্রতীক। সেই শক্তি মানুষকে অর্জন করিতে হইবে— নিষ্ক্রিয়তা জড়তা পঙ্গুতা এবং শ্রেয়স্কর জীবন লাভের অতৃষ্ণা সেই অর্জিত শক্তির প্রভাবে বলি দিতে হইবে। অসীম অনন্ত বিরাট্ জীবন লাভের জন্য যে তৃষ্ণা, তাহার পবিসমাপ্তি যাহাতে না ঘটে, সেইজন্য কবি কালবৈশাখীর বর্ষণকে আহ্বান করিতেছেন। মানব-মনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা হইতেছে নব নব অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রবর্তনা লাভ করা। ইহারই অভাবকে কবি টেনিসন বলিযাছেন জীবনের সেই অবস্থা যখন অব্যবহারে জীবনে মরিচা ধরিয়া জীবন ম্লান হইয়া যায়। যাহা কুসংস্কার অজ্ঞতা ও দৈন্য, তাহাব চাপে মানুষ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। কবি বর্ষশেষের ঝড়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের অদম্য ইচ্ছাকে তুমি মানুষের মনে সান্ত বা শান্ত হইতে দিও না। তুমি তোমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিবার শক্তি দান করো, তোমার বর্ষণ যেন মানুষের অখণ্ড জীবন-প্রাপ্তির পিপাসাকে আরো বর্ধিত করিয়া তোলে,—তাহাকে যেন এক অভিজ্ঞতা লাভের পরে আরও নব নব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জীবনের পথে প্রাগ্রসর গতিতে পরিচালিত করে। জীবনের সুরাপাত্র নিঃশেষে পান করিবার প্রবৃত্তি মানুষ যেন অর্জন করিতে পারে।

ঝড়ের বেশে কবির আত্মজীবনের অতৃপ্তিই যেন প্রকাশ পাইয়াছিল। কবির জীবনের দ্বিধা সংকোচ অবসাদ সমস্তই যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে তাঁহার মনের ঝড়ের বেগে। তাঁহার এত দিনের প্রতীক্ষা যাঁহার দর্শন লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছে, আশ্চর্য তাঁহার রূপ—তিনি রুদ্র, অথচ তাঁহার মুখ প্রসন্ন।

এই কবিতাটি কবির অন্তর্জীবনের ঝড়ের কথা। 'অশেষ' কবিতাটিতেও তাঁহার এইরূপ উদ্বেগের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

'এই কবিতার প্রত্যেকটি বিশেষণ ও প্রত্যেকটি শব্দ নূতন নূতন অর্থে পূর্ণ।

প্রত্যেকটি স্ট্যাঞ্জা ঝড়ের প্রকৃতিকে প্রকাশ করিয়াছে, এবং শেষ স্ট্যাঞ্জাটিতে ঝড়ের বিরতি ও শান্তি সূচিত হইয়াছে। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে যুক্তাক্ষরবহুলতা কবিতাটিকে এক গাম্ভীর্য দান করিয়াছে।

কবি এই কবিতায় বলিতেছেন—

আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ 'নূতন' ভয়ঙ্কর রূপে তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর 'নূতন' প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত রূপে এবং মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ আবেগ রূপে আবির্ভূত হয়।

—'আমার ধর্ম' ও 'পাগল' প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

ধরণীর বক্ষ হইতে চৈত্রের ঝড়ে পুরাতন বৎসরের আবর্জনা ঝরিয়া পড়া জীর্ণতা যেমন উড়িয়া যাইতেছে, তেমনি সব নিষ্ফল কামনা কুসংস্কার ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা জড়তা মন হইতেও উড়িয়া যাক, ইহাই কবির কামনা। বাহিরের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেরও পরিবর্তন হোক, এবং নূতনের আবির্ভাবের সকল বাধা দূর হোক। সৃষ্টি যদি ধ্বংসের ভিতর দিয়া না যায় তবে তাহার মুক্তি হয় না, নূতন সৃষ্টির ধারা রক্ষা পায় না। সেই জন্য যিনি বিশ্বেশ্বর তিনি ভোলানাথ, তিনি কিছুই চিরন্তন করিয়া রাখেন না। জীবন যতই অগ্রসর হইয়া চলে, ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দেয়।

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ধ্বংস করিতে করিতে সৃষ্টি করিয়া চলেন, তাই তাঁহার সৃষ্টি বন্ধন হয় না। কিন্তু আমরা নিজেদের সৃষ্টিকে সঞ্চয় করি বলিয়া তাহাকে আমাদের বন্ধন করিয়া তুলি। কিছুকেই আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না—বন্ধন ও মুক্তি 'যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা' তেমনিভাবে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিলেই জীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্বচনীয় মূল্যবান করিতেছে। ফল যেমন পুষ্পদল বিদীর্ণ করিয়া পূর্ণতা লাভ করে, তেমনি নূতন জীবন পুরাতন জীর্ণতাকে ধ্বংস করিয়া সার্থকতা লাভ করে,—সেই পুরাতন যতই মনোহর নয়নরঞ্জক হউক না কেন, তাহার বিনাশ না ঘটিলে নূতনের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। পূর্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন-জীবনের সন্ধিক্ষণে দ্বন্দ্বের দুঃখ ও বিপ্লবের আলোড়ন দেখা দেয়ই।

'নূতন' অশান্তিরূপে আসেন; তাই তাঁহাকে কেহ স্বীকার করিতে চাহে না, পাছে তাঁহার আঘাতে অভ্যস্ত আরামে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু রুদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া মুক্তি দিতে আসেন সেই দুঃখ দিনের রাজা! (তুলনীয়—'আগমন' কবিতা।)

মানুষের জীবন কতকগুলি বর্তমান মুহূর্তের সমষ্টি; বর্তমানকে সার্থক করিয়া তোলাই হইতেছে জীবনের সাধনা। বর্তমানই জীবনের লক্ষ্য। অতীত তো গত, তাহার কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনায় আমাদের ক্ষণস্থায়ী বর্তমানকে নষ্ট করা উচিত নয়; আবার ভবিষ্যৎ তো অনাগত, তাহার সম্বন্ধে আমাদের তো কোনোই অভিজ্ঞতা নাই, তাহার সহিত আমাদের কোনো সম্পর্ক নাও ঘটিতে পারে, অতএব তাহার ভাবনা ভাবিয়াও কোন লাভ নাই। অতএব একমাত্র বর্তমানই আমাদের উপাস্য। পাঁজি পুঁথি টিকি দাড়ি হাঁচি টিক্‌টিকির বিধান মানিয়া আমরা মনুষ্যত্বকে অপমান করিব না। ('উদ্বোধন' কবিতা দ্রষ্টব্য।)

যখন আমরা কেবল নিজের ছোট-আমিকে লইয়া চলি, তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখনই মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করিতে থাকে, তখন দুঃখ-শোক এমন একান্ত হইয়া উঠে যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোথাও সান্ত্বনা দেখিতে পাই না, তখন প্রাণপণে কেবলই সঞ্চয় করি, ত্যাগ করিবার কোনো অর্থ দেখি না, আর ছোট ছোট ঈর্ষা-দ্বেষে মন জর্জরিত হইয়া ওঠে।

বৈশাখ

এই কবিতাটি ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে লেখা। ইহা বর্ষশেষ কবিতাটিরই সহচর ও অনুষঙ্গী কবিতা। এই দুই কবিতায় কবি বলিতেছেন—

আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্‌টে পরেন তখন দেখি শুক্‌নো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পাল্‌টে নেন, তখন সকাল-বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে বেড়াচ্ছেন। —ঋতু-উৎসব, বসন্ত।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, সেন্ট্রিফ্যুগ্যাল—তিনি কেবলই নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে,—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশী নাই, সামঞ্জস্য সুর ইঁহার নহে, ইঁহার মুখে বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। —'পাগল', বিচিত্র প্রবন্ধ বা সঙ্কলন।

মানুষ যে লক্ষ্য মনে রাখিয়া চলিতে চায়, বার বার সে হঠাৎ আশ্চর্য হইয়া দেখে এই পাগল তাহাকে আর-একটা দিকে লইয়া চলিয়াছে। এইটিকে কবি বলিতেছেন মহাদেবের ক্ষেপা-মূর্তির খেলা।

বিশ্বের মূল ভিত্তি ঐশ্বর্যে ও বৈরাগ্যে—পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ছাড়ার উপরে—তাহারই প্রকাশ বর্ষশেষ ও বৈশাখ—এ যেন অন্নপূর্ণা ও রুদ্র ভৈরবের মিলন-রূপ।

এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য ছত্রপতি শিবাজীর গুরু সমর্থ রামদাস স্বামী নিজের গেরুয়া উত্তরীয়ের দ্বারা শিবাজীর রাজবেশ ঢাকিয়া দিয়া একদিন রাজাকে নগরের পথে পথে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। রাজাকে ত্যাগী হইয়া অনাসক্ত হইয়া রাজ্য পালন করিতে হইবে এই শিক্ষা সন্ন্যাসী গুরু তাঁহার রাজা শিষ্যকে দিয়াছিলেন।

রুদ্রের আহ্বান কবির কাছে কালবৈশাখীর রূপে আবির্ভূত হইয়াছে—কবি সেই আহ্বানের মধ্যে সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা খণ্ডিত জীবনের ক্ষুদ্রতা বেদনা ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আদেশ অনুভব করিতেছেন।

অবসান তো শূন্যতা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে আসে না। জীর্ণকে সে সরাইয়া দিতে চায় পূর্ণের নবীন রূপকে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিবার জন্য, মৃত্যুর আচ্ছাদন সে ছিন্ন করিয়া দেয় সত্যের অমৃত-রূপকে তাহার অসীম সিংহাসনে সমাসীন দেখাইয়া দিবার জন্য। সর্বশেষের আহ্বান অবসানের পরপারের কথা জানায়,—সে বলে—আনন্দরূপকে আপনার জীবনের ও কর্মের মধ্যে যদি প্রকাশমান করিতে চাও তবে তাহার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইবে, পুরাতনকে সরাইয়া ফেলিয়া নূতনের স্থান করিতে হইবে। এই জায়গা করিতে পারে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি ত্যাগ ও সংযম। একবার বর্ষ-শেষের বৈরাগ্যের ঝড় জীবনে আসুক; তাহার পরে নববর্ষের আনন্দ-আলোক নির্মল হইয়া দেখা দিবে।

এই কবিতাটি-সম্বন্ধে কবি এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার বৈশাখ কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু। যেমন, 'সোনার তরী' কবিতাটি।......ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদল-দিনের ছবি 'সোনার তরী' কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত। 'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে

মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন চারিদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ঐ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ঐ কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সাম্‌নে ধরতে পারতুম তা হ'লে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠ্‌ত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ রন্ধ্র হ'তে ছুটে আসে।

খোলা জান্‌লায় ব'সে ঐ ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হুহু ক'রে ছুটে আস্‌ছে ঘূর্ণা নৃত্যে, ধুলো বালি শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি।

তার পরে এক জায়গায় আছে

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব 'পরে—

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ।

সেদিনকার বৈশাখ-মধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল ব'লেই ওটা লিখ্‌তে পেরেছি। ধূ ধূ করছে মাঠ, ঝাঁঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী-গাছগুলোর পাতা ঝিলমিল করছে, ঝাউ উঠ্‌ছে নিঃশ্বসিত হ'য়ে, ঘুঘু ডাক্‌ছে স্নিগ্ধ স্বরে,—গাছের মর্মর, পাখীদের কাকলী, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠ্‌তে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে ব'সে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয়তো কি? নৃত্যের ভঙ্গী দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ; কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাইনি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয়, তার গতিই অনুভব করি, তার শব্দ তো শুনিইনে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার যো নেই। ইতি ৪ কার্তিক, ১৩৩৯।

বোলপুরের মাঠে ঝড়ের বর্ণনা ছিন্নপত্রে একাধিক স্থানে আছে।

১

বৈশাখের আসন্ন ঝড়ের উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি যেন রুদ্রের জটাজাল। বৈশাখ তপস্বী, তাহার গ্রীষ্মতাপে প্রতপ্ত। পুরাতন জীবনের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা জীর্ণতা কুসংস্কার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য বজ্রগর্জনে রুদ্রের ডাক প্রত্যেকের নিকটে আসিতেছে।

২

বৈশাখের ছায়ামূর্তি অনুচর ঘূর্ণা বাতাসে ভাসিয়া আসা মেঘজাল অথবা ধূলাবালি খড়কুটা। দগ্ধ তাম্রের ন্যায় আলোহিত মাঠের কোন্ অংশ হইতে যে উহারা ছুটিয়া আসে তাহা নির্ণয় করা যায় না; তাহাদের ভয়ঙ্কর নৃত্য দেখা যায়, কিন্তু নটকে দেখা যায় না—কেবল ঘূর্ণিগতিটাই চোখের সামনে দিয়া নৃত্য করিয়া যায়।

৩

বৈশাখ সন্ন্যাসী, সে অনাসক্ত সঞ্চয়হীন সর্বত্যাগী হইয়া জগতে নূতন বর্ষণের জন্য তপস্যা করিতেছে, সাধনা করিতেছে। সে অনাসক্ত অস্থায়ী বলিয়া সে প্রবাসী। বৈশাখ মাসে খালে বিলে পদ্মফুল ফুটে, সেইগুলি যেন সন্ন্যাসীর তপস্যার পদ্মাসন। প্রচণ্ড তপন তাহার যেন রক্তনেত্র।

৪

বৈশাখ সমস্ত পুরাতনকে উড়াইয়া দিতে উপস্থিত, সেইজন্য বৈশাখের তপ্ত রৌদ্র যেন চিতাগ্নি, এবং বিগত বৎসরের সমস্ত জীর্ণতা মৃতস্তূপ, এবং তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলাই ভস্মসাৎ করা। এই চিতার উপমাটি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। জীর্ণকে সরাইয়া পূর্ণের নবীন রূপকে প্রকাশ করিবার জন্য রুদ্র চিতানল প্রজ্বালিত করেন।

৫

মেঘগর্জনে নববারি বর্ষণের দ্বারা দাহ-নিবারণের সূচনা যেমন বৈশাখের রুদ্রকণ্ঠের শান্তিপাঠ, জীর্ণতা ধ্বংস করার পরে নব সৃষ্টি হইবে ইহারই স্বস্তিবাচন, ধ্বংস হইতে বিরামের শান্তিমন্ত্র পাঠ।

৬

মেঘগুলি যেন বৈশাখের দুঃখলব্ধ তপস্যার ফল [গ্রীষ্মতাপেই জল বাষ্প হইয়া মেঘে পরিণত হয়]; সেই দুঃখলব্ধ তপঃফল বিশ্বে বিতরিত হোক। তোমার নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিশ্বের সুখ-দুঃখে বিলীন ও মিশ্রিত হইয়া যাক।

৭

ক্ষুদ্রতামুক্ত জীবনকে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করিয়া অব্যাহতি দিতে হইবে—নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ করিতে হইবে। বৈশাখের ধূলি-ধূসরতা যেন তাহার গেরুয়া অঞ্চল, বৈরাগ্যের নিশান। ত্যাগের মহিমার দ্বারা সমস্ত

আচ্ছাদিত করিতে হইবে, লক্ষ কোটি নর-নারীর ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ দুশ্চিন্তা ভুলাইয়া দিতে হইবে।

৮

মধ্যাহ্নকাল কর্মের সময়, নিদ্রার কাল নহে। অসময়ের সুষুপ্তি ত্যাগ করিয়া আলস্য বিসর্জন দিয়া নূতনের আহ্বানে দ্বারে বাহির হইতে হইবে। নূতনের আবির্ভাবকে সর্বাগ্রে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাকে একাকী নিস্তব্ধ নির্বাক সাধনায় দুঃসহ তপ করিতে হইবে।

এই কবিতায় পাঁচ পাঁচ লাইনের স্ট্যাঞ্জা এবং সংস্কৃতশব্দ-বহুলতা যেন মেঘগর্জনের মতন থাকিয়া থাকিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে।

চৌর-পঞ্চাশিকা

(১৩০৪ সাল)

গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনে ইংরেজী ১১ শতকে বিল্হণ নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত রাজার মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেন ; ক্রমে তাঁহাদের প্রণয় সঞ্চার হয় এবং আরও কিছু সঞ্চার হয়। রাজা টের পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। সেই সময় তিনি ৫০টি কবিতা রচনা করেন। সেই ৫০টি কবিতার নাম চৌর-পঞ্চাশিকা। রাজা তাঁহাব কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন ও তাঁহাদের দুইজনকে দেশ হইতে বাহির কবিয়া দেন।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

চৌর-পঞ্চাশিকা কাব্যেব টীকাকার রাম তর্কবাগীশের মতে চৌর-পঞ্চাশিকার কবি সুন্দর—বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের নায়ক। তাঁহার মতে রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লী নামক স্থানের রাজা গুণসাগরের পুত্র সুন্দর লোকমুখে নৃপ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার রূপলাবণ্যের ও 'বেদদাক্ষ্যের' কথা শুনিয়া গোপনে বিদ্যার গৃহে বিদ্যার সহিত মিলিত হইল। ক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হইল। রাজা সংবাদ শুনিয়া সুন্দরকে ধরাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। সুন্দর তখন চৌর-পঞ্চাশিকার পঞ্চাশটি শ্লোকের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবী কালিকার স্তুতি করে। —চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত কালিকামঙ্গল কাব্যের ভূমিকা।

সুন্দরের রচিত সেই চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যের শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থক—তাহাদের এক অর্থ কালী-পক্ষে, ও অন্য অর্থ বিদ্যা-পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতাগুলিকে বিদ্যার প্রতি সুন্দরের প্রণয়ের অনুরাগের পরিচয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং সেই পঞ্চাশটি শ্লোক যেন বিশ্বের সমস্ত প্রেমিক-দম্পতীর প্রণয়ের চিরন্তন পরিচয় হইয়া রহিয়াছে।

রাত্রি

(১৩০৬ সাল)

কবি রাত্রির নিঃশব্দতার মধ্যে রাত্রির সভাকবি হইতে চাহিতেছেন। কবি ইহার পূর্বে 'বসুন্ধরা' কবিতায় বিশ্বের যেখানে যে মানব-সমাজ আছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছেন। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গী হইয়া মহান্ আদর্শের জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ মহামানবদের সঙ্গেও মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে, সে-পথ-প্রান্তের এক পার্শ্বে' তিনি স্থান লইয়া যুগযুগান্তের বিরাট স্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছেন। আর এই রাত্রির সভাকবি হইয়া কবি চাহিতেছেন যে যেখানে যত মননশীল মুনি চিন্তাশীল ঋষি জ্ঞানের সাধনা করিতেছেন, পৃথিবীর গোপন জ্ঞানভাণ্ডার যাঁহারা সন্ধান করিয়া নব নব সত্য উদ্‌ঘাটন করিবার তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা তো রাত্রির নির্জন নিঃশব্দতার মধ্যেই ধ্যান করেন, সেই সব ধ্যানীদের সঙ্গে তাঁহারও যেন স্থান হয়, এবং তিনি সেই-সকল মনীষীর মিলন-সাধিকা রাত্রির সভাকবি হইবেন।

নিদর্শনী